এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে সপ্তম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস ও সূচীপত্র দেওয়া হইল। সমুদয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্ররূপে বিস্তারিত সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইবে।

সপ্তম খণ্ডের সূচীপত্র

রঞ্জন-আলো

রঞ্জন-আলো বা এক্স-রেস্‌এর কথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। যদি কখনও দুষ্টামি করিতে গিয়া হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া থাক, তাহা হইলে ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই তোমাকে রঞ্জন-আলোর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কিরূপ ভাবে হাড়টি ভাঙ্গিয়াছে, কি অবস্থায় উহা আছে, তাহা জানিবার

রঞ্জন-আলোর আলোকচিত্রে হাতের হাড়গুলি ও আঙ্গুলের আংটিটি দেখা যাইতেছে

জন্য হাসপাতালে লইয়া যাইয়া রঞ্জন-আলো দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারে চিকিৎসাজগতেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কত দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার সুযোগ যে এই আলোর সাহায্যে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বড় বড় সহরের হাসপাতালে, কলেজের ল্যাবরেটরিতে ও অনেক ডাক্তারখানায় রঞ্জন-আলোর যন্ত্রপাতি থাকে। তোমরা এই সব যন্ত্রপাতি দেখিও এবং কিভাবে উহা ব্যবহার করিতে হয় তাহাও লক্ষ্য করিও, ইহাতে বেশ আনন্দ পাইবে। এইবার তোমাদের নিকট রঞ্জন-আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বেশ মন দিয়া পড়িয়া উহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

কোনও কাচের নলের দুই প্রান্তে দুইটি ধাতু-ফলক স্থাপন করিয়া যদি ঐ দুই প্রান্ত সম্পূর্ণরূপে আঁটিয়া দেওয়া যায়, এবং নলের পার্শ্বস্থ কোনও ছিদ্রদ্বারা যদি নলটিকে বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া নলমধ্যস্থ বায়ুনিষ্কাশন করা

যায়, তাহা হইলে ঐ নলকে Vacuum-Tube বা বায়ুশূন্য নল বলা যায়। বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দিয়া আমরা নলের অভ্যন্তর-ভাগ হইতে ইচ্ছামত বায়ু সরাইয়া চাপ হ্রাস করিতে পারি। এখন ধাতু-ফলক দুইটিকে তার দিয়া তড়িৎ প্রবর্ত্তক কুণ্ডলীর (Induction Coil) দুই মেরুর সহিত যোগ করিলে, নলের মধ্যে নানা বিচিত্র বর্ণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে থাকে। রীতি-মত পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে এই কয়টি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমতঃ যোগমেরু (Anode)র চারিপার্শ্বে
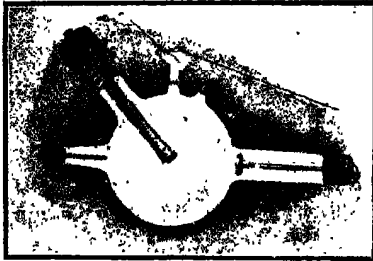
এক্স-রে টিউব

হইতে একপ্রকার গাঢ় লালবর্ণের জ্যোতি-নির্গত হয়, তাহার পরে খানিকটা স্থানে বিক্ষিপ্ত আলো স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। বিয়োগমেরু (Cathode) হইতে সাধারণতঃ বেগুনে রঙ্গের জ্যোতি বাহির হয়। জ্যোতির পরে খানিকটা আঁধার (Crookes' dark space) হইয়া থাকে।

বায়ুর চাপ আস্তে আস্তে কমাইলে বিদ্যুৎবৎপ্রবাহে নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তখন উজ্জ্বল মেরু-জ্যোতিগুলি আস্তে আস্তে কমিতে থাকে, এবং ক্রুক্‌সের অন্ধকারভাগ ক্রমশঃ নলের মধ্যে বিস্তৃত হইতে থাকে। বায়ুর চাপ যখন সাধারণ চাপের ১/৫০০০ ভাগ হয়, তখন মেরুজ্যোতি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় ক্রুক্‌সের অন্ধকারাংশ
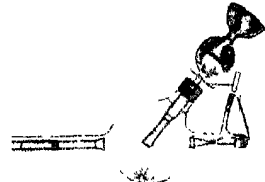
অন্যবিধ এক্স-রে টিউব

সমস্ত নলে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নলের পার্শ্বদেশ হইতে এক প্রকার তীব্র সবুজরঙের প্রস্ফুরক (Phosphorescent) আলো নির্গত হইতে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে ক্রুক্‌স, ভালে এবং জার্ম্মে-নীতে প্লুকার, হিটফ, গোল্ডষ্টাইন্ প্রভৃতি

রঞ্জন-আলোকচিত্রে ব্যাঙ

বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রস্ফুরক আলোর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা

করিয়াছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে নলের মধ্যে একটি ক্রস্ বা অন্য কোনও পদার্থ স্থাপন করিলে, নলের পার্শ্বদেশে ছায়া পড়ে, অর্থাৎ সেই স্থান
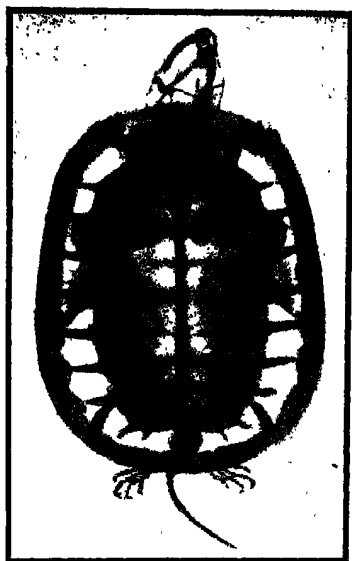
রঞ্জন-আলোকচিত্রে কচ্ছপ

হইতে আর প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয় না। যদি নলের মধ্যে দুইখানি পরদা রাখা যায় তাহা হইলে ঐ বিন্দু দুইটির যোজক-রেখা যে স্থানে নলের পার্শ্বে আঘাত করে, শুধু সেই হইতেই প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয়। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে যোগমেরু (Anode) যেখানেই থাকুকনা কেন, বিয়োগমেরু (Cathode) হইতে বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত কণা সকল মেরুর পৃষ্ঠের লম্বভাবে নির্গত হইয়া সরল রৈখিক পথে ধাবিত হয়। তাহারা যে স্থানে নলকে আঘাত করে সেইস্থান হইতেই প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয়। যদি বিয়োগমেরু কুব্জপৃষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কণা সন্ধি-বিন্দুতে (Focus) সংহত হয়। ঐ সন্ধি-বিন্দুতে ধাতুফলক রাখিলে অনেক সময় তাহা গলিয়া যায়; অন্যত্র ধাতু-ফলক হইতে পূর্ব্বোক্ত তীব্র প্রস্ফুরক রশ্মি নির্গত হইতে থাকে।

যদি এক সরল-রৈখিক পথে ধাবিত বিয়োগ-রশ্মির কণাগুলিকে কোনও চুম্বকের দুইমেরুর মধ্য দিয়া নেওয়া যায় তাহা হইলে রশ্মির পথ সম্মুখের দিকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। যদি কোনও তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্য দিয়া রশ্মিকে চালনা করা হয়, তাহা হইলে যেদিকে যোগমেরু, রশ্মি সেইদিকে ঘুরিয়া যায়।

পাঁচটি আঙ্গুলের রঞ্জন-আলোকচিত্র

এই উপায়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক পেরিন্ প্রমাণ করেন যে, রশ্মিগুলি সরল রৈখিক পথে ধাবমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি এবং এই কণাগুলি বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত।

ইংল্যাণ্ডে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীর

রঞ্জন-আলোর আবিষ্কর্ত্তা অধ্যাপক রঞ্জন (W. C. Rontgen) এবং নিম্নে একজন চিকিৎসক রঞ্জন-আলো যন্ত্রের সাহায্যে রোগিণীর পেট পরীক্ষা করিতেছেন

অধ্যাপক স্যার জে, জে টমসন্ ও জার্ম্মেনী Carlruhe বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেনার্ড প্রমাণ করেন যে, এই কণাগুলির ওজন হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের প্রায় $\frac{১}{১৮০০}$ অংশ এবং তাহারা সকলেই প্রায় এক পরিমাণ তড়িৎ বহন করে। অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই কণাগুলি যে তড়িৎ বহন করে, সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ তড়িৎ থাকিতে পারে না। সুতরাং উহাকে তড়িতের পরমাণু আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তড়িতের পরমাণুর বেগ আলোর বেগের $\frac{১}{১০}$ হইতে প্রায় ·৯৮ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই তড়িতের কণাকে তাড়িত-রেণু বলে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনীর ভুর্জবার্গ (Wurzuburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক রঞ্জন (Rontgen) এইরূপ নল লইয়া অদৃশ্য আলো সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন। অদৃশ্য আলো কাহাকে বলে একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে।

কোনও ত্রিশির কাচের (Prism) ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করাইলে অপর পার্শ্বের পরদায় রামধনুর সমস্ত বর্ণের সমাবেশ লক্ষিত হয়। সাদা রশ্মি সাতরঙের সমষ্টিতে গঠিত এবং উহা যখন বায়ু হইতে একবার কাচে প্রবেশ করে এবং পরে কাচ হইতে পুনরায় বায়ু নির্গত হয়, তখন এই বিভিন্ন রশ্মিগুলি বিভিন্ন পরিমাণে তির্য্যক্‌বর্ত্তিত হইয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। লাল আলো সব চেয়ে কম তির্য্যকবর্ত্তিত হয়, বেগুনে আলো সব চেয়ে বেশী তির্য্যক্‌বর্ত্তিত হয়। এইরূপে একটি সরু আলোকরশ্মি বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহাকে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) বলে। কিন্তু সাদা আলোতে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকারের আলো আছে—আমরা খালি চোখে তাহাদিগকে ধরিতে পারি না, কিন্তু বিশেষ যন্ত্রযোগে তাহারা শীঘ্র ধরা পড়ে। লালের উপর অংশে তাপমান যন্ত্র রাখিলে তাপমান শীঘ্র বাড়িয়া যায়। বেগুনের নীচের অংশে কোনও প্রস্ফুরক পদার্থ রাখিলে তাহা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণচ্ছত্র শুধু একদিকে লাল, অপর দিকে বেগুনে রং এই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের চক্ষু তত সূক্ষ্ম যন্ত্র নয় বলিয়া আমরা

মুখের ভিতর পরীক্ষা করিবার রঞ্জন-আলোকচিত্র

লালের উপর দিকের এবং বেগুনের নীচের দিকের অন্যান্য আলো ধরিতে পারি না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতে আলোক আকাশের স্পন্দনজনিত তরঙ্গশ্রেণী। বৈজ্ঞানিকগণ বিশিষ্ট উপায়ে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, লাল আলোর দৈর্ঘ্য $·৭৩ \times ১০^{-৫}$ c. m. আর বেগুনে আলোর দৈর্ঘ্য $·৪৩ \times ১০^{-৫}$।

জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হার্ত্জ প্রমাণ করেন যে, যদি কোনও তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র স্বতঃপ্রবর্ত্তক কুণ্ডলী (Self Induction Coil) এবং তাড়িতাধারের (Capacity) সহিত এক শ্রেণীতে (Series) যুক্ত থাকে, তাহা হইলে যন্ত্র চালাইলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। স্বতঃপ্রবর্ত্তক কুণ্ডলী এবং আধারের পরিমাণ অনুসারে এই তরঙ্গের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হার্ত্জের পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, আলোর তরঙ্গ ও এই তড়িৎ-জাত তরঙ্গ,

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

উভয়ে একই আকাশের স্পন্দনজাত, শুধু উভয়ের মধ্যে পরিমাণের তফাৎ মাত্র। হার্ত্জের পরে অনেক বৈজ্ঞানিক তড়িৎ-যন্ত্রদ্বারা অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ, এবং নানাবিধ উপায়ে দীর্ঘ আলোক বা তাপের তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া উভয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যে তাড়িতজাত তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য ৪ centimetre। জার্ম্মেনীতে রুবেন্স সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ লোহিতাতীত তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য ৩১৩ m m.। আচার্য্য বসুর পরে জার্ম্মেনীর অধ্যাপক ফন্‌বেয়ার আরও ক্ষুদ্র তাড়িত-তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য দুই মিলিমিটার মাত্র। সুতরাং এখনও আকাশের তরঙ্গের পূর্ণ শৃঙ্খলে আড়াই সপ্তক ব্যবধান আছে।

যাহা হউক, রঞ্জন হিটর্ফের নল হইতে অদৃশ্য আলো উৎপন্ন হয় কিনা তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন।

অদৃশ্য আলো ধরিবার জন্য তিনি নল হইতে খানিক দূরে একটা Barium platino-cyanide পরদা রাখিয়াছিলেন। এই পরদাতে অদৃশ্য আলো পড়িলে উহা হইতে প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে।

নলে যাহাতে বাহিরের আলো প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি কালো কাগজ দিয়া নলটাকে সম্পূর্ণ মুড়িয়া তাড়িত-যন্ত্র চাপাইয়া দেন। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে দূরস্থ পর্দ্দা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতেছে।

রঞ্জন এই দৃশ্য দেখিয়াই উহার সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি পরীক্ষাদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, তাড়িত-রেণু যে স্থানে কাচের নলকে আঘাত করে সেই স্থান হইতে এক প্রকার নূতন অদৃশ্য আলো নির্গত হয়। এই আলো পরদার উপর পড়িলে পরদা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো বাহির হইতে থাকে।

পরীক্ষাতে এই নূতন আলোর নানা আশ্চর্য্যজনক গুণ ও ধর্ম্ম বাহির হইয়া

মানুষের চোয়ালের রঞ্জন-আলোকচিত্র

পড়িল। কাঠ, প্রাণীদেহের মাংস কাগজ ইত্যাদি যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়া সাধারণ আলো যাতায়াত করিতে পারে
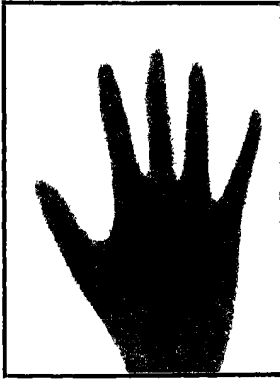
রঞ্জন-আলোর আলোকচিত্র

না, এই নূতন আলোক অনায়াসে তাহাদের ভিতর দিয়া যাইতে পারে। যেমন কোনও কাচের বাক্সকে সাধারণ আলোক দ্বারা আলোকিত করিলে অপর পার্শ্বস্থ পরদায় শুধু বাক্সের মধ্যস্থিত মুদ্রাদির ছায়া পড়ে, বাক্সের ছায়া পড়ে না, সেইরূপ কাঠের বাক্সকে এই নূতন আলো দ্বারা আলোকিত করিলে পরদায় শুধু মধ্যস্থ টাকা পয়সার ছায়া পড়ে। মানবদেহের কোন অংশে রঞ্জন-আলো প্রয়োগ করিলে পরদায় শুধু কঙ্কালের ছায়া পড়ে। রঞ্জন-আলোর এই অদ্ভুত ধর্ম্ম থাকায় উহা এখন অস্ত্র-চিকিৎসায় খুব ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রঞ্জন প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে এই নূতন আলো সাধারণ আলোর মত

রঞ্জন-আলোর আলোকচিত্র

ধর্ম্মবিশিষ্ট—কিন্তু শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। যদি কোন সাধারণ আলোকরশ্মি কোন ধাতুর সমতল পৃষ্ঠের উপর তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে উহা ধাতুপৃষ্ঠ হইতে লম্বের সহিত সমান কোণ করিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ধাতুপৃষ্ঠ সমতল না হইয়া যদি বন্ধুর হয়, তাহা হইলে উহা ধাতুপৃষ্ঠ হইতে লম্বের সহিত সমান কোণ করিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ধাতুপৃষ্ঠ

সমতল না হইয়া যদি বন্ধুর হয়, তাহা হইলে আলোর রশ্মি এক বিশিষ্ট দিকে প্রতিফলিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে ইংরাজীতে Diffuse Reflexion বলে।

প্রাণীদেহের ভিতর দিয়া আলো প্রবেশ করিয়াছে

পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায় যে রঞ্জন-আলো সাধারণ সমতল ধাতুপৃষ্ঠ হইতে নিয়মিত ভাবে প্রতিফলিত হয় না, যে বিন্দুতে ধাতুপৃষ্ঠকে আঘাত করে, সেই বিন্দু হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণ আলো যখন এক স্বচ্ছ পদার্থ হইতে অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করে, তখন রশ্মি তির্য্যক্‌-বর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু রঞ্জন-আলোর রশ্মি কোন বিশিষ্ট দিকে তির্য্যক্‌বর্ত্তিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণ আলোককে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইলে অপর পার্শ্বের পর্দ্দায় ঠিক জ্যামিতিক ছায়া পড়ে না, ছায়ার আশে-পাশে খানিক দূর পর্য্যন্ত আলোক থাকে, ইহাকে ইংরাজীতে Diffraction বা সমাবর্ত্তন বলে। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র ব্যবহার করিয়াও রঞ্জন-আলোর সমাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না।

সুতরাং দেখা গেল যে রঞ্জন-আলোর ধর্ম্ম সাধারণ আলোর ধর্ম্ম হইতে অনেক বিভিন্ন,—সাধারণ আলোর মত রঞ্জন। আলোর প্রতিফলন, তির্য্যক্‌বর্ত্তন বা সমা-বর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা, বা প্রমাণ করা যায় না। এইজন্য একদল বৈজ্ঞানিকের মত ছিল যে রঞ্জন-আলো বাস্তবিক আকাশের স্পন্দন-জাত তরঙ্গ নয়, অতি ক্ষুদ্র ধাবমান তাড়িত-নিরপেক্ষ (electrically neutral) কণা সমূহের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই অনুমানের অনুকূলে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্লাঙ্ক (Planck) ভীন (Wien) এবং ষ্টার্ক (Stark) ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে অন্যবিধ প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন করেন যে, যদি রঞ্জন-আলো বাস্তবিকই সাধারণ আলো বা আকাশ তরঙ্গের প্রকার

হাড়ের ছবি

ভেদ মাত্র হয়, তাহা হইলে উহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১০$^{-৮}$ c m. অর্থাৎ সাধারণ দৃশ্যমান আলোর সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র হইবে। এই উপপত্তির দ্বারা রঞ্জন-আলোর

প্রতিফলন, সম্নমবর্ত্তন বা তির্য্যক্‌বর্ত্তন না থাকার কারণ বেশ বুঝা যায়, আলো যে সমতল হইতে প্রতিফলিত হইবে, সেই সমতলস্থ কণাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব

বাক্সের ভিতরকার ছবি

অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে আলো ঠিকমত প্রতিফলিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাকে ইংরাজীতে Diffuse Reflexion বলে। এজন্যই মসৃণ কাচ-পৃষ্ঠ হইতে আলোক রীতিমত প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু অমসৃণ কাচপৃষ্ঠে কণাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া আলো ভালরূপে প্রতিফলিত হয় না, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ঠিক এই কারণে রঞ্জন-আলোর সমাবর্ত্তন পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। আলোকের সমাবর্ত্তন (Diffraction) ব্যাপারটা একটু ভাল করিয়া বোঝা দরকার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আলোক আকাশের স্পন্দনজাত তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। কোনও স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তরঙ্গ ফিরিয়া না যাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাধাকে অতিক্রম করিয়া যায়। জলের তরঙ্গে অনেকেই এবিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। শব্দতরঙ্গেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—শব্দ বায়ুর তরঙ্গ মাত্র। এই বিষয়ে তোমরা 'শিশুভারতী'তে পড়িয়াছ। মনে কর, কোনও প্রাচীরের দুই পার্শ্বে দুইজন লোক আছে, এক পার্শ্বস্থ লোকটি কোনও কথা বলিলে অপর পার্শ্বের লোক তাহা শুনিতে পায়, বায়ুতরঙ্গ প্রাচীর ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে যাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণ-পটাহে আঘাত করে। তবে প্রাচীরটি যদি খুব উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে শব্দতরঙ্গ আর ততটা ঘুরিতে পারে না, এবং অপর পার্শ্বের লোকে কিছুই শুনিতে পারে না। আলোক-তরঙ্গ সম্বন্ধেও একই কথা, তবে আলোক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি বলিয়া অতি ক্ষুদ্র বাধাতেই সম্পূর্ণ প্রতিহত হয়, বাধা ঘুরিয়া যাইতে পারে না। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, আলো সরল-রৈখিক পথে ধাবিত হইতেছে। তবে বাধা যদি খুব তীক্ষ্ণ ও সোজা হয় (যেমন ছুরির

ভাঙ্গা হাড়ের ছবি

ফলা), তাহা হইলে দেখা যায় যে, অপর পার্শ্বের পরদায় ঠিক বাধাটির ছায়া না পড়িয়া, ছায়ার মধ্যে ও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত খানিক আলো, খানিক আঁধার থাকে,

এবং আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ আঁধার হইয়া যায়। ইহাকেই আলোকের সমাবর্ত্তন বলে।

গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, যদি আলোকের সমযাত্রাবিশিষ্ট

ভাঙ্গা হাড়ের চিত্র

(of the same dimension) কতকগুলি স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রেখা পরস্পর সজ্জিত করা হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া গমন করিবার সময় বিভিন্ন প্রকারের আলো বিভিন্ন পরিমাণে সমাবর্ত্তিত হয়। কোনও কাঠের ফ্রেমে অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি তার পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত করিলে, এই যন্ত্রের গঠন উপলব্ধি করা যায়। এইরূপ যন্ত্রের অপর পার্শ্বে মুকুর (Converging lens) রাখিলে বিভিন্ন প্রকারের আলো বিভিন্ন বিন্দুতে সংহত হয়।

সুতরাং এই উপায়ে আলোককে বিশ্লিষ্ট করা যায়। জার্ম্মানীতে Fraunhofer প্রথমে এই উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু আমেরিকা দেশীয় রোলাণ্ড প্রথমে ইহাকে কার্য্যকরী করেন। তিনি কাচের উপর হীরকের সূক্ষ্মধার দিয়া প্রতি ইঞ্চে পর পর প্রায় চৌদ্দ হাজার সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করেন। ইহাকে ইংরাজীতে Diffraction Grating বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাবর্ত্তন দ্বারা আলোক বিশ্লেষণ করিতে হইলে আলোকের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ অংশ পর পর সজ্জিত করা দরকার।

রঞ্জন-আলোর দৈর্ঘ্য যদি সাধারণ আলোর দৈর্ঘ্যের সহস্র ভাগের এক ভাগ হয়, তাহা হইলে রঞ্জন-আলোর সমাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতে আরও সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথ বা সূক্ষ্ম (Diffraction Grating) প্রস্তুত করা দরকার। কাচের উপর এক ইঞ্চিতে কোটি লাইন অঙ্কিত করিতে না পারিলে রঞ্জন-আলোর সমাবর্ত্তন লক্ষিত হইবে না। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্মযন্ত্র তৈয়ার করা মানুষের সাধ্যাতীত। তবে যদি স্বভাবতঃই এমন জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাপারটা মানুষের সাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনীর মিউনিক (Munich) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাউএ

রঞ্জন আলোকচিত্র

(Laue) গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, স্ফটিক এরূপ Diffraction Grating-এর কাজ করিতে পারে। নানা প্রমাণ প্রয়োগে পদার্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির

করিয়াছেন, যে বস্তুর পরমাণুর ব্যাস ১০$^{-৭}$ c.m, হইতে ১০$^{-৮}$ c.m. পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বস্তুর পরমাণুর ব্যাস ও রঞ্জন-আলোর দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাত্রায়। কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ঐ একই মাত্রার। কিন্তু সাধারণ জিনিষে অণুগুলি এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা Diffraction Grating এর কাজ হইতে পারে না, অর্থাৎ রঞ্জন-আলোর সমাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু যে
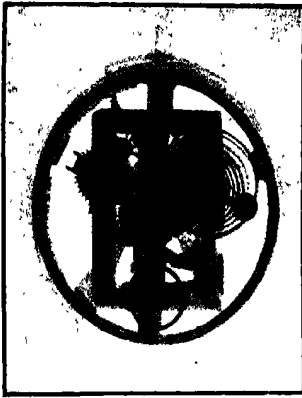
ঘড়ির ভিতরকার চিত্র

সমস্ত পদার্থকে দানা বা (Crystal) স্ফটিকের আকারে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অণুগুলি এক এক বিশেষ শৃঙ্খলামত সন্নিবিষ্ট থাকে।

মনে কর সৈন্ধবলবণের দানা; এগুলিকে ঘনক্ষেত্রাকারবিশিষ্ট দানা আকারে পাওয়া যায়। ফেডোরোভ্ (Fedorov), স্কোনোফ্লাইস্ (Shonoflies), ব্রাভেস্ (Bravais) প্রভৃতি স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই স্ফটিক কতকগুলি ঘনক্ষেত্রাকার আণবিক ইষ্টকের সংযোগে গঠিত। মনে কর, কোনও ঘনক্ষেত্রের (Cube) আটকোণে আটটি সাদা বর্ত্তুল আছে, বর্ত্তুলগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। প্রত্যেক বর্ত্তুলকে আমরা একটি sodium পরমাণু মনে করিতে পারি। এই ঘনক্ষেত্রগুলিকে যদি আমরা সমান ভাবে পর পর সব দিকে সাজাইয়া যাই, তাহা হইলে একটি ঘনক্ষেত্রাকার আয়তন পাইব। প্রত্যেক ঘনক্ষেত্রের পৃষ্ঠায মধ্যবিন্দুতে এক একটি কালো বর্ত্তুল স্থাপন করিলে আমরা আর এক শ্রেণী ঘনক্ষেত্র ১০^{৩} × ১০^{৩} পাই। এই কালো বর্ত্তুলগুলিকে আমরা ক্লোরিণ (Chlorine) পরমাণু বলিতে পারি। প্রত্যেক স্ফটিকের দুই পরমাণুর মধ্যে যে ফাঁক আছে তাহার পরিমাণ রঞ্জন-আলোর পরিমাণের সমতুল্য। সুতরাং এই স্ফটিকের ভিতর দিয়া রঞ্জন-আলো প্রবেশ করাইলে প্রত্যেক পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া আলোক সর্ব্বদিকে সমাবর্ত্তিত হইতে থাকিবে আলোর কতকাংশ বরাবর সরল রৈখিক পথে চলিয়া যাইবে। সুতরাং অপর পার্শ্বে আলোক-চিত্রের ফলক রাখিলে যে স্থানে রশ্মিটি ঠিক সোজা পড়িবে, তথায় একটি সাদা দাগ পড়িবে। প্রত্যেক পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া আলোকের যে অংশ চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার মধ্যে কোন কোন দিকে সমস্ত আলোর তরঙ্গই এক এক কলাতে আলোকচিত্রফলককে পৌঁছিবে। কোন দিকে বিভিন্ন ভাবে পৌঁছিবে। সুতরাং মধ্যবিন্দুর চারিদিকে ছোট ছোট দাগ পড়িবে। তখন গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা সহজেই আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যাইবে।

লাউয়ে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম রঞ্জন-আলোর পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এর উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার সহযোগী

Friedrich এবং Kripping উভয়ে মিলিয়া পরীক্ষা দ্বারা Laueএর অনুমানের যথার্থ প্রমাণ করেন। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ লাউয়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রাকৃতিক দর্শনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অধ্যাপক লাউয়ের আবিষ্কারের পর জার্ম্মেনীতে Friedrich, Debye, Stark এবং ইংল্যাণ্ডে W. H. Bragg, W. L. Bragg, Moseley, Darwin প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ রঞ্জন-আলো সম্বন্ধে অনেক গবেষণা প্রকাশ করিযাছেন। সমস্ত সভ্য দেশেই রঞ্জন-আলো সম্বন্ধে পুরাদমে কাজ চলিতেছে।

এই সমস্ত কর্ম্মীদেব মধ্যে লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Bragg এবং তাঁহার পুত্র W. L. Braggএর কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার রঞ্জন-আলোর বিশ্লেষণ এবং স্ফটিকের আণবিক গঠন সম্বন্ধে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দেব নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। Bragg প্রমাণ করেন যে কোনও স্ফটিকের ভিতর দিয়া রঞ্জন-আলো প্রবেশ করাইলে এক দিকে যেমন আলোকের পরিবর্ত্তনের জন্য ফোটোগ্রাফে বিশিষ্ট ছায়া পড়ে, অপর দিকে তেমনই আলোর কতকাংশ বিশেষ বিশেষ তল হইতে নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়। পূর্ব্বে স্ফটিকেব আধুনিক গঠন সম্বন্ধে স্ফটিক-তত্ত্ববিদ্‌দের মত খানিকটা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনে কর, Zinc Blende স্ফটিক, ইহার সম পরিমাণ দস্তার ও গন্ধকের যোগে গঠিত এবং ঘনক্ষেত্রাকার স্ফটিক আকারে পাওয়া যায়। ঘনক্ষেত্রের যে কোন বাহুর দিক্‌কে আমরা স্ফটিকের অক্ষরেখা বলিতে পারি; এবং অক্ষরেখার সহিত লম্বাভাবে অঙ্কিত তলকে প্রধান তল বলিতে পারি।

স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, যখন আঘাতে বা অন্য কোন কারণে স্ফটিক ফাটিয়া যায়, তখন স্ফটিকের দুই অংশ প্রধান তলে বিশ্লিষ্ট হয়—এই জন্য প্রধান তলকে "অবচ্ছেদের তল" বলা যায়। অভ্র সকলেই দেখিয়াছেন; অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অভ্র অতি ক্ষুদ্র স্ফটিক সমূহের সমবায়ে গঠিত। অভ্রের পাতগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। এই

রঞ্জন আলোর চিত্র

স্তরগুলি স্ফটিকের অবচ্ছেদ তল, অর্থাৎ এই তলে পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা ঘণ সন্নিবিষ্ট।

ব্র্যাগের মতে এই সমস্ত বিশিষ্টতলে পরমাণুগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই তল হইতে রঞ্জন-আলো নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হইবে। পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার নিজেদের অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে ঠিক সমতল পাওয়া গেলে রঞ্জন-আলো ও সাধারণ আলোর ন্যায় নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ কুব্জপৃষ্ঠ কাচ হইতে সাধারণ আলো যেমন প্রতিফলিত

হইয়া সন্ধিবিন্দুতে সংহত হয়, অভ্রের কুব্জ-পৃষ্ঠ মুকুর হইতেও রঞ্জন-আলো সেইরূপ প্রতিফলিত হয়।

ব্র্যাগ (Bragg) এই প্রতিফলিত রঞ্জন-আলোর (intensity) প্রখরতা মাপিবার জন্য খুব সূক্ষ্ম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সাধারণ গ্যাস্ তাড়িত-অপরিচালক, কিন্তু গ্যাসকে রঞ্জন-আলোর দ্বারা আলোকিত করিলে, গ্যাসের অণুগুলি বিয়োগতড়িৎযুক্ত তড়িৎরেণু (Electrons) এবং যোগতড়িৎ-যুগ (অণুবীজ) (positive nucleus) আংশিক এই দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তড়িৎ সহজেই গ্যাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে। এই প্রথাকে ইংরাজীতে ionization বলে, বাঙ্গলায় আমরা রেণু বিভাজন বলিতে পারি। রঞ্জন-আলোর প্রখরতা বা তেজ যত অধিক হইবে, রেণুবিভাজনও ততই প্রবল হইবে।

প্রতিফলিত রঞ্জন-আলোককে এইরূপ অল্পচাপে আবদ্ধ বাষ্পপূর্ণ আধারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইলে মধ্যস্থ বাষ্পের 'রেণু-বিভাজন' হইতে থাকে ;—সুতরাং 'রেণু-বিভাজন' মাপিলেই প্রতিফলিত আলোকের তেজ বা প্রখরতা ঠিক্ পরিমাণ করা যায়। ব্র্যাগের উল্লিখিত 'রঞ্জন-আলোর বর্ণচ্ছত্র মাপক যন্ত্র' লাউয়ের যন্ত্র অপেক্ষা খুব অল্প সময়ে ভাল ফল দান করে।

সাধারণ আলোক যেমন নানা আয়-তনের তরঙ্গের সমষ্টি, রঞ্জন-আলোও তেমনি নানা আয়তনের তরঙ্গের সমষ্টি, ব্র্যাগের 'বর্ণসূত্রের মাপকযন্ত্রে' তরঙ্গগুলি বিভিন্ন পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

লাউয়ের আলোক-লিপি (Radio-gram) এবং ব্র্যাগের 'বর্ণচ্ছত্র মাপক যন্ত্রের সাহায্যে স্ফটিকের আভ্যন্তরিক গঠন নির্ণয় করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করা যাইতেছে। এই দুই যন্ত্রেই কাজ করিতে খানিক সময়ের প্রয়োজন হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টেরাডা, আলোক-চিত্রের ফলক ব্যবহার না করিয়া প্রস্ফুরক পরদা ব্যবহার করেন। লাউএর উদ্ভাবিত উপায়ে আলোর যেখানে দাগ পড়ে, টেরাডার উদ্ভাবিত প্রণালীতে সেই সমস্ত স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে। সুতরাং শুধু চোখে দেখিয়াই স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই উপায় ততটা সূক্ষ্ম নয় বলিয়া স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌গণ এখনও উহার সম্যক ব্যবহার করেন না।

লাউএর যুগপ্রবর্ত্তক আবিষ্কারের পর হইতে রঞ্জন-আলো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বত্র কাজ করিবার সাড়া পড়ি-য়াছে। জার্ম্মেনী এবং ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক-গণ এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও কর্ম্মীর অভাব নাই। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই কাজ কর্ম্মের ধারা কতকটা বুঝা যাইবে। প্রধানতঃ স্ফটিকের মধ্যে পরমাণবিক সংস্থান, এবং রঞ্জন-আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় লইয়াই বর্ত্তমানে আলোচনা হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে স্ফটিকতত্ত্ব ঠিক Schonfleis, Bravais, Fodorov প্রভৃতি মনীষিগণ স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুমান করিয়াছিলেন সে সমস্ত প্রায়ই ঠিক্।

এখন বোধ হয় তোমরা রঞ্জন-আলো বা X-ray সম্বন্ধে অনেক কথাই শিখিতে পারিলে। রঞ্জন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দৈবক্রমে এই আলোর আবিষ্কার করিয়া জগতের যে কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনা

দ্বারা শেষ করা যায় না। ডাক্তারেরা ইহার সাহায্যে চিকিৎসা করিবার একটি নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছেন। তোমার হাড় ভাঙ্গিয়াছে—কতটা ভাঙ্গিয়াছে, ডাক্তার রঞ্জন-আলোর সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া ঠিক্‌ভাবে তাহা যোড়া লাগিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলেন। এই ভাবে একদিন মানুষের যাহা কল্পনারও অগোচর ছিল, তাহাই সম্ভব হইল। প্রস্তর বল, কাঠ বল, মাংস বল, প্রায় অধিকাংশ পদার্থের ভিতর দিয়া এই আলো প্রবেশ করিতে পারে। রঞ্জন-আলো পুরু

রঞ্জন-আলোর আলোকচিত্র—মাথার খুলিতে গুলির চিহ্ন

সীসকের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য যদি মানুষের শরীরের ভিতর গুলি প্রবেশ করে, তাহা হইলে রঞ্জন-আলোর সাহায্যে গৃহীত চিত্রে একটি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের মত দেখাইবে। ছবিতে দেখ একজন সৈনিকের মাথার ভিতরে যে গুলি প্রবেশ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণবর্ণ স্থানটিতে একটি তার জড়াইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কোথায় গুলি লাগিয়াছে। রঞ্জন আলোর দ্বারা গৃহীত চিত্রের নাম X-Radiographs এক্স-রেডিওগ্রাফ।

কেবল যে ডাক্তারেরাই রঞ্জন-আলোর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসায়ীরাও ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে উহার সাহায্যে জিনিষপত্র যাচাই করেন। এই আলো এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থূল ইস্পাতের দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। উহার মধ্যে যদি কোনরূপ রন্ধ্র বা ছিদ্র থাকে তাহা হইলে সহজেই ধরা পড়ে। কঠিন কাষ্ঠখণ্ডের প্রায় ১২ ইঞ্চি পরিমাণ ভিতরে এই আলোক প্রবেশ করিতে পারে, কাজেই কাঠের ভিতরে ফাটল থাকিলে তাহা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। হাওয়াই জাহাজ বা Aeroplane তৈয়ারী করিবার সময় এঞ্জিনিয়ারেরা এইরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দোষ দ্রব্যাদি দ্বারা যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারেন।

রঞ্জন-আলোর সাহায্যে আমরা এমন অনেক জিনিষের আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে পারি, যাহা পূর্ব্বে কখনও সম্ভবপর ছিল না, যেমন নকল মণি মুক্তা ও আসল মণি মুক্তা চিনিয়া লওয়া, বুটজুতা পায়ে পরিয়া থাকিলেও পায়ের হাড়ের ছবি তোলা যায়। খামের ভিতরের চিঠি খাম না খুলিয়াও পড়া যাইতে পারে। যক্ষ্মার ন্যায় কঠিন ব্যাধির চিকিৎসাও এই আলোর সাহায্যে পরীক্ষা করা অনেকটা সহজ হইয়াছে। এক কথায় এই আলোর সাহায্যে অনেক দুরারোগ্য রোগের প্রতীকারের পথ সুগম হইয়াছে। রঞ্জন-আলোর যন্ত্রের ব্যবহার করা অতি কঠিন কাজ এবং উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। এই যন্ত্র পরিচালনার সময় অসতর্কতা বশতঃ অনেকে তাহাদের হাত, বাহু, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন; ইহা পরিচালনায় দক্ষতার প্রয়োজন।

পাণিনি

২৩৮০ পৃষ্ঠার পর

বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার অনেক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পরবর্ত্তীকালে দশখানা ব্যাকরণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চান, তাঁহারা এই দশখানিরই কোনও একখানি অবলম্বন করিয়া শিক্ষা করেন, এবং পরে হয়ত আরও কোনও কোনওখানি পড়েন। এই দশখানির নাম—পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠঃ, সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র বা কলাপব্যাকরণ, চন্দ্রগোমীর চান্দ্রব্যাকরণ, দেবনন্দীর জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, শাকটায়নের শব্দানুশাসন, হেমচন্দ্রের শব্দানুশাসন, ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, নরেন্দ্রাচার্য্যের (বা অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের) সারস্বত ব্যাকরণ, বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, এবং পদ্মনাভদত্তের সৌপদ্ম ব্যাকরণ। ইহার মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথম লেখা হইয়াছিল, আর শেষখানি লেখা হইয়াছিল খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে।

পাণিনির আগে কি ব্যাকরণ ছিল না? ছিল। পাণিনি নিজেই আপিশালি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি কয়েকজন ব্যাকরণ-রচয়িতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল ব্যাকরণ পাণিনির অনেক দিন পরে পর্য্যন্তও পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। পাণিনির ব্যাকরণ এত ভাল ও এত সঠিক যে ক্রমশঃ ঐ সকল ব্যাকরণের আদর কমিয়া গিয়াছিল। এখন এক পাওয়া যায় যাস্কের নিরুক্ত, কিন্তু সেখানা নিঘণ্টু নামক একখানা বৈদিক শব্দকোষের টীকা, উহাকে ঠিক ব্যাকরণ বলা চলে না।
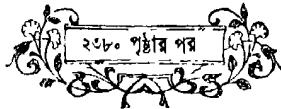
পাণিনির ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য উহাকে বলে 'অষ্টাধ্যায়ী' সূত্রপাঠঃ। উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪,০০০ সূত্র আছে। বিদ্যার্থীরা যাহাতে সহজে মুখস্থ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি ছোট ছোট সূত্রের আকারে বইখানি রচনা করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ শেষ করিয়া পাণিনি একখানা 'ধাতুপাঠ' ও একখানা 'গণপাঠ' ও লিখিয়াছিলেন।

পাণিনি যে কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে তিনি যে চাণক্যের এবং আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে ছিলেন, একথা নিশ্চিত। সম্ভবতঃ তিনি যিশুখৃষ্টের ৪০০ বৎসর আন্দাজ পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন।

পাণিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি নামক একজন পণ্ডিত পাণিনির ব্যাকরণের উপর একখানা ভাষ্য রচনা

করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পাণিনিকে 'দাক্ষীপুত্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বোঝা যায়, পাণিনির মাতার নাম ছিল দাক্ষী। কিন্তু তাঁহার পিতার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন হইতে হুয়েন-সাং বা ইউ-য়ান্-চাং নামক যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে, গান্ধারদেশে (অর্থাৎ পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া কান্দাহার পর্য্যন্ত ভূভাগে) এক উচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে মহাদেবের এক মন্দির ছিল, তাহারই নিকটে শালাতুর নামে এক পল্লীতে পাণিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল সম্বন্ধে কানিংহাম নামক একজন খুব পণ্ডিত ইংরেজ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান য়্যাটকের বা আটকের নিকট 'লহউর' বলিয়া যে গ্রাম আছে, উহাই প্রাচীন 'শালাতুর'। এই গ্রাম এখন যদিও অতি নগণ্য ও একরকম পরিত্যক্ত বলিলেই হয়, কিন্তু হুয়েন-সাং বা ইউ-য়ান্ চাংয়ের সময়েও উহা সমৃদ্ধিশালীই ছিল।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বত দেশের তারনাথ নামে একজন বৌদ্ধ লামা 'বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস' সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, পাণিনি পশ্চিমদেশে 'ভীরুকবন' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভীরুকবন কোথায় তাহা জানা যায় না। কিন্তু ১১৪০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান নামে একজন লেখক তাঁহার একখানা বইয়ে (গণরত্নমহোদধি) পাণিনিকে 'শালাতুরীয়' অর্থাৎ শালাতুরের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তাহার পূর্ব্বে 'অলিন' নামক স্থানে প্রাপ্ত বলভী রাজ সপ্তম শিলাদিত্যের ৭৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনেও পাণিনিকে 'শালাতুরীয়' শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে (Fleet, C. I. I., p. 175 l 26). অতএব ইউ-য়ান্ চাংয়ের কথাই ঠিক। আর ভীরুকবন যদি শালাতুরের মধ্যে, অথবা শালাতুর যদি ভীরুকবনের মধ্যে কোনও স্থান হইয়া থাকে, তবে তারনাথের কথাও ঠিক।

পাণিনি কেমন করিয়া এই চমৎকার ব্যাকরণ খানি লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে তারনাথের বইয়ে একটা গল্প আছে। পাণিনি ছিলেন নন্দের (মগধের রাজা) একজন সহচর। একদিন তিনি এক জ্যোতিষীকে হাত দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন ত, ব্যাকরণে বিদ্যালাভ করার শক্তি আমার আছে কি না। গণৎকার হাত দেখিয়া কহিলেন, না। তখন পাণিনি একখানা ধারাল কাচি লইয়া, হাতে যে রকম রেখা থাকিলে ব্যাকরণে পণ্ডিত হয়, সেই রকম রেখা করতলস্থ মাংস কাটিয়া কাটিয়া সৃষ্টি করিলেন। তারপর তিনি যেখানে যত লোক ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বই যোগাড় করিয়া খুব আগ্রহ সহকারে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না। তখন তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ইষ্টদেবতা অবশেষে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং অ, ই এবং উ এই তিনটি স্বরশব্দ উচ্চারণ করিলেন। ইহাতেই পাণিনি ত্রিজগতের যত শব্দ আছে, তাহার জ্ঞানলাভ করিয়া ফেলিলেন। হিন্দুরা বলেন এই দেবতার নাম ঈশ্বর, আর বৌদ্ধেরা বলেন যে তিনি অবলোকিতেশ্বর।

কাশ্মীরের কবি সোমদেব ভট্টের 'কথাসরিৎ-সাগর' নামক গল্প-পুস্তকেও দেখা যায় যে, (মগধের) পাটলিপুত্র নগরে (পাটনায়) মহারাজ নন্দের রাজত্বকালে বর্ষ নামক একজন শিক্ষকের কাছে কাত্যায়ন (বররুচি), ব্যাড়ি, ইন্দ্রদত্ত প্রভৃতি পড়িতেন। পাণিনিও আসিয়া বর্ষের শিষ্য হইলেন। পাণিনির বুদ্ধিটা ছিল অত্যন্ত জড়, অর্থাৎ তিনি সহজে কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। সেকালে শিষ্যদিগকে গুরুর সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত। কিন্তু পাণিনি বর্ষের সেবা করিতেও কাতর হইলেন। বর্ষের স্ত্রী ইহাতে পাণিনির উপর ভারি বিরক্ত হইয়া, তাহাকে ঐ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বিদ্যা-কামনায় তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। সেখানে কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে

সকল বিদ্যার মুখস্বরূপ ব্যাকরণশাস্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি আবার পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া বররুচিকে বিচারের অর্থাৎ তর্কের জন্ম আহ্বান করিলেন। ক্রমাগত সারারাত্রি ধরিয়া দুইজনে তর্কাতর্কি চলিল, শেষে অষ্টম দিবসে পাণিনি হারিয়া গেলেন, বররুচি জয়লাভ করিলেন। তখন মহাদেব আকাশ হইতে এক অতি ঘোরতর হুঙ্কারধ্বনি করিলেন। সেই হুঙ্কারের চোটে বররুচির ব্যাকরণ পৃথিবী হইতে পলায়ন করিল, আর সকলে পাণিনি কর্তৃক পরাজিত হইয়া মূর্খ হইয়া রহিলেন।

এই গল্পে কেবল দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে, (১) পাণিনি বররুচি বা কাত্যায়নের এবং মহারাজ নন্দের সমসাময়িক ছিলেন, এবং (২) পাণিনি পাটলিপুত্রে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' যদিও একাদশ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল, কিন্তু উহার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল প্রায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎ-কথা' হইতে। তবুও প্রথম কথাটা, অর্থাৎ পাণিনি কাত্যায়নের সমসাময়িক ছিলেন ইহা সত্য কিনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ, পাণিনি একটি সূত্রে বাঙ্গালার গৌড়ের নাম করিয়াছেন, অথচ পাণিনির আগের কোনও বইয়ে গৌড়ের উল্লেখ নাই। পাটলিপুত্রে না আসিলে, শালাতুরে বসিয়া পাণিনি গৌড়ের কথা জানিলেন কিরূপে? এক হইতে পারে যে, লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, কারণ গৌড় পরে যতই সমৃদ্ধশালী হউক না কেন, পাণিনির সময় উহা একটা ছোট-খাট সাধারণ নগরই ছিল। এইরূপ একটা বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ স্থানের খ্যাতি পাণিনি সেই সুদূর শালাতুরে বসিয়া শুনিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার সংলগ্ন বিহারের পাটনায় আসিয়াও শুনিয়াছিলেন, ইহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। পাণিনি যে পাটলিপুত্রে পড়িতে আসিয়াছিলেন, একথা সোমদেব ও তারনাথ ছাড়াও আর একজন বলিয়াছেন, তিনি কবি রাজশেখর (৯০০ খৃঃ)।

পাণিনির জীবনী সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কেবল 'পঞ্চতন্ত্র' নামক নীতি-গ্রন্থে দেখা যায় যে, পাণিনি এক সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ইহা সত্য কিনা, কে জানে?

সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও কোথাও একজন কবি পাণিনির কথা পাওয়া যায়। কাশ্মীরের বল্লভদেব নামক কবি প্রাচীন অনেক কবির লেখা হইতে ভাল ভাল শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া 'সুভাষিতাবলী' নামে একখানা কোষ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উহাতে কবি পাণিনির শ্লোকও আছে। কিন্তু কবি পাণিনি ও বৈয়াকরণ পাণিনি একই ব্যক্তি বলিয়া আজকাল আর কেহ স্বীকার করে না। কবি পাণিনি 'পাতাল-বিজয়' ও 'জাম্ববতী-বিজয়' নামে দুইখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এবং কবি পাণিনির লেখা কতগুলি শ্লোক বাঙ্গালী শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' (১২০৫ খৃঃ) নামক সংগ্রহ-গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

বানরের কথা

১৩৫২ পৃষ্ঠার পর

ওরাং-উটানের ও অন্যান্য বানরদের কথা এইবার বলিতেছি। ওরাং-উটান অথবা বনমানুষ বোর্ণিও সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসী। ওরাং-উটান (Orang-Utan) মালয় শব্দ। ইহার অর্থ বনমানুষ (man-of-the-woods)। ওরাং-উটানের বৈজ্ঞানিক নাম—

ওরাং-উটান
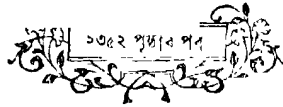
Simia-satyrus। বোর্ণিও সুমাত্রা দ্বীপের বনে ইহাদের বাস। ইউরোপের লোকেরা ১৭৬৬-৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই বনমানুষ জাতীয় বানরের সম্বন্ধে কোনও সংবাদই জানিতেন না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ শাসনকর্তা Baron Wurmb ওরাং-উটানের একটি কঙ্কাল হল্যাণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। তারপর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে একটি ওরাংউটান জীবিতাবস্থায় ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপে ইউরোপের লোকেরা প্রথমে ওরাং-উটানের কথা জানিতে পারেন। ওরাং-উটান সম্বন্ধে রাজা স্যার জেমস্‌ব্রুক (Raja Sir James Brooke of Sarawak) এবং ডাক্তার এ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Dr Alfred Russel Wallace) তাঁহার রচিত "Malaya Archipelago" নামক গ্রন্থে এই জাতীয় বনমানুষ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

ওরাং-উটানেরা পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলে উচ্চতার পরিমাণ প্রায় চার ফুট

হয়। ইহাদের হাত এইরূপ লম্বা যে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে হস্ত দুইখানি মৃত্তিকা স্পর্শ করে। ইহাদের কপোল উচ্চ ও প্রশস্ত। সারা শরীর কতকটা ধূসর ও লাল রঙের লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা। যৌবনে ওরাং-উটানের চিবুক ও ঘাড়ের নিম্নভাগ লম্বা লম্ব দাড়িতে আচ্ছন্ন থাকে। ইহারা বেশ শক্তিশালী জন্তু।

ওরাং-উটানেরা ঘন বনের মধ্যে বৃক্ষের শাখায় বাস করে। তাহারা খাদ্য সংগ্রহের সময় ছাড়া

ওরাং-উটান বনে জঙ্গলে

বড় একটা মাটিতে নামিতে চায় না। ইহারা গাছের শাখায় অতি দ্রুত চলাফেরা করে। নিমেষের মধ্যে এক গাছ হইতে অন্য গাছে এবং এক বন হইতে অন্য বনে চলিয়া যায়। গাছের বড় বড় পাতায় যে শিশির-কণা সঞ্চিত থাকে, তাহা পান করিয়া ইহারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে থাকিতেই ইহারা ভালবাসে।

ওরাং উটানেরা যে একমাত্র বোর্ণিও এবং সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসী আজ পর্যন্ত একথাই আমরা জানি। এই একজাতীয় ওরাং-উটান ছাড়া অন্য কোন জাতীয় ওরাং-উটান আছে কিনা সেবিষয়ে কোনও মীমাংসা হয় নাই। একবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বোর্ণিও দ্বীপের এবং সুমাত্রা দ্বীপের ওরাং-উটানদের দুইটি বিভিন্ন

গাছের শাখায় ওরাং-উটান

শ্রেণীর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে ঠিক নয়, সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুমাত্রা হইতে বোর্ণিও দ্বীপেই ওরাং-উটানেরা অধিক সংখ্যায় বাস করে। গরিলার মত ওরাং-উটানেরাও তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের দল বাঁধিয়া বনে বনে বিচরণ করে। বাপ, মা এবং দুই চারিটি শাবকই ইহাদের সঙ্গীরূপে দেখা যায়। ওরাং-উটান গাছের পাতা, ছোট ছোট গাছের শিকড়, বিশেষ করিয়া ইহারা বাঁশের কচি

মানুষ ও তার জ্ঞাতিবর্গের কঙ্কাল

পাতা ও মূল খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। ফল ইহাদের খুব প্রিয়। কাঁঠাল ওরাং-উটানের প্রিয় খাদ্য। ইহারা ছোট ছোট গাছের শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। সাধারণতঃ ২০ ফিট

হইতে ৩০ ফিট উচু গাছের শাখায় বাসা তৈরী করিয়া ইহারা বাস করিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে বাসা নির্ম্মাণ করে, যাহাতে বড় বড় গাছের আড়ালে থাকার দরুণ তাহাদের উপর ঝড়ঝাপ্‌টার আপদ বিপদ না আসে। সূর্য্য উঠিবার অনেক পরে,—বেশ বেলা হইলে ওরাং-উটানেরা খাদ্য অন্বেষণের জন্য নিম্নে অবতরণ করে।

ওরাং-উটানের স্বভাবটিকে মোটের উপর বেশ শান্ত শিষ্ট বলা যাইতে পারে কিনা সন্দেহ। বন্যাবস্থায় ইহাদের প্রকৃতি মন্দ নয়, বদ্ধাবস্থায় বেশ

ভাবুক-ওরাং-উটান

শান্তশিষ্ট থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু ইহারা একবার কাহারো উপর ক্ষেপিলে আর রক্ষা নাই।

ডাক্তার ওয়ালেস্ সাহেবের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই জীববিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত অনেক দিন বোর্ণিও দ্বীপের নিবিড় অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিয়া ইহাদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাঁহার লিখিত দুই একটি গল্প বলিতেছি। একবার বোর্ণিও দ্বীপের কয়েকজন অধিবাসী নদীর পাড়ের একটি বনের মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে একটা বয়স্ক ওরাং-উটান মনের আনন্দে গাছের মূল ও পাতা ইত্যাদি খাইতেছে। তাহারা উহাকে দেখিবামাত্র

মানুষের পোষাকে বানর

তাহাদের বল্লম ও শকি ইত্যাদি লইয়া ঐ জন্তুটাকে আক্রমণ করিল। ওরাং-উটানটা কাছের একটা

শিম্পাঞ্জীর কেশ আঁচড়ান

লোককে ধরিয়া তাহার হাতে এমন কামড় দিয়াছিল যে যদি তাহার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি সেই

হিংস্র জন্তুটাকে মারিয়া না ফেলিত তাহা হইলে তাহার আত্মরক্ষা করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

বৃদ্ধ ওরাং-উটান

অনেক দিন ভুগিয়া সেই লোকটি বাঁচিয়াছিল, তাহার হাতখানি কিন্তু একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছিল।

একবার ডাক্তার ওয়ালেস্ বোর্নিওতে একটি বাচ্চা ওরাং-উটান পাইয়াছিলেন। সে সময়ে ঐ

গাছের শাখায় ওরাং-উটানের নীড়

শাবকটি এক ফুটের বেশী উচ্চ ছিল না। ওয়ালেস্ সাহেব উহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার পর, কোন সুযোগে সেই বাচ্চা ওরাং-উটানটি এমন করিয়া তাঁহার দাড়ি ধরিয়াছিল যে অতিকষ্টে তাহার হাত হইতে উহা মুক্ত করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে উহার একটিও দাঁত উঠে নাই।

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটি ওরাং উটান বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল—জেনি (Jenny)। জেনিকে দর্শকেরা অত্যন্ত ভালবাসিত। সে বেশ কায়দা করিয়া চায়ের বাটি হইতে চা পান করিত, মাথায় টুপি পরিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও রাজ পরিবারের সকলে জেনিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জেনির

চলতি পথে গরিলা

রক্ষক সেদিন কিন্তু কোনরূপেই তাহার গায়ের জামাটি পরাইতে পারে নাই। জেনি নেহাৎ অসভ্যের মত মহারাণীকে দর্শন দিয়াছিল। জেনি তাহার রক্ষীকে খুব ভালবাসিত। সে তাহাকে আদর করিয়া বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিত; এবং আমোদের সহিত কত কি শব্দ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত তাহা সেই জানিত ভাল। জেনির এইরূপ মানুষের মত বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া সে দর্শকমাত্রেরই প্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নিকট দর্শকেরা প্রিয় ছিল না। সে লোকজনের ভিড় দেখিলে খাঁচার এক কোণে যাইয়া আত্মগোপন করিতে চাহিত।

গিবন

মানবাকৃতি বানরের মধ্যে গিবন হইতেছে আকারে সব চেয়ে ছোট। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা বড় তারাও তিন ফুটের বেশী উচু হয় না। গিবনকে উল্লুক বলা যাইতে পারে। গিবনের শরীরের মধ্যে ইহাদের ভুজদ্বয় দেখিবার মত বটে। ছবি হইতেই বেশ বুঝিতে পারিতেছ, ইহাদের হাত দুইখানি কেমন লম্বা। ইহারা অতি সহজে গাছে গাছে শাখা হইতে শাখান্তরে এমন দ্রুতবেগে

গিবন—হাত দু'খানি কত লম্বা

গমনাগমন করে যে অনেক সময় তাহা লক্ষ্য করিতেই পারা যায় না।

গিবনেরা নানাজাতীয় হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদিগকে Hylobatidae শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণভাগে মালয় উপদ্বীপে ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চাতের পা দুইখানির উপর ভর দিয়া চলিতে ইহারা গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি মানবাকৃতি বানরদের অপেক্ষা অধিক দক্ষ। গিবনেরা সহজেই পোষ মানে। এমন কি বয়স্ক গিবনদিগকে পোষ মানাইতেও কোন অসুবিধা হয় না। পোষা গিবন সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।

সাদা ভ্রূওয়ালা গিবন

ষ্টারনডেল (R. B Starndale) সাহেব লিখিয়াছেন যে—আমি একটি গিবন পুষিয়াছিলাম। সেই গিবনটি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে ভালবাসিত। অনেক সময় আমার হাতের উপর হাতখানি রাখিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার আর একটি প্রধান গুণ ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। তাহাকে শুইবার জন্য কম্বল

শ্বেতহস্ত বিশিষ্ট গিবন

দিয়াছিলাম, সে কম্বলখানিকে দিয়া মাথায় দিবার জন্য দিব্য একটি বালিস প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। এজন্য তাহাকে আর একখানি কম্বল

দিয়াছিলাম। সে এইখানি গায়ে দিয়া শুইত। বেচারা শেষটায় নিউমোনিয়া রোগে প্রাণ হারায়।

পবিত্র (Sacred)। লঙ্গুর (langur) নামেও ইহারা পরিচিত। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই হনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের

শিম্পাঞ্জীর খেলার সাথী

আর একটি গল্প শোন বার্লিন নগরের চিড়িয়াখানার একটি গিবন কোন স্ত্রীলোককে দেখিলেই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলে যাইয়া বসিত। যদি স্ত্রীলোকটি বিরক্তি প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে সে কোনরূপেই কোল হইতে নামিত না।

গিবনেরা নিরীহ প্রাণী হইলেও সময় সময় ক্ষেপিয়া উঠিয়া প্রভুর উপর কিংবা রক্ষীর উপর অত্যাচার করিতে ছাড়ে না।

মানুষের নিকট জ্ঞাতি বনমানুষেদের কথা বলিয়াছি, এখন অন্যান্য জাতীয় বানরদের কথা শোন।

হনুমান-বাঁদর

আমাদের দেশে হনুমানের অভাব নাই। হনুমানের বৈজ্ঞানিক নাম—গ্রীক্ শব্দ Semnos হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেমনস শব্দের অর্থ

সর্ব্বত্র, দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গে ওড়িষ্যা, গুজরাট, বোম্বে, কাথিওয়ার এবং সিন্ধ ও পঞ্জাব প্রদেশে এমনকি

হনুমান বাঁদর

দাক্ষিণাত্যপ্রদেশেও হনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহারা আছে।

হনুমান তোমরা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ। ইহাদের দেহের দৈর্ঘ্য ৪॥ হইতে ৫।৬ ফুট লম্বা। ইহাদের লেজ শরীর হইতেও দীর্ঘ। শরীরের উপরের দিকটা ছেয়ে ধূসর বর্ণ এবং নীচের অংশ লেজের দিক ঘোর কৃষ্ণ। দেহের বাকী অংশটা তামাটে এবং একটু লালচে। হাত ও পায়ের পাতা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। হনুমানের মুখ লম্বা এবং মুখপোড়া। লঙ্কায় মাহা বা মহা নামে একজাতীয় মর্কট আছে। ইহারা অনেকটা হনুমানের মত।

যবদ্বীপের গিবন

এই শাখামৃগেরা অতিশয় দীর্ঘাকায় ও বলবান্। ইহাদের প্রকৃতি ও অত্যন্ত উগ্র। মহামর্কটেরা গভীর বনের মধ্যে বাস করে সহজে বাহিরে আসিতে চাহে না।

মুখপোড়া হনুমান বা নিগ্রো লঙ্গুর

নানাজাতীয় বানর

চীনদেশে বিশেষতঃ চীনের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একশ্রেণীর বানর দেখা যায় তাহাদিগকে ভোঁতা নাকওয়ালা বানর বলা যাইতে পারে। এই বানরেরা আকারে ছোট। ইহাদের নাক উপরের দিকে এমনভাবে উল্টান যে একেবারে কপাল পর্য্যন্ত যাইয়া ঠেকে।

এক শ্রেণীর বানর আছে তাহারা কাকড়া খাইতে খুব ভালবাসে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের নাম দিয়াছেন (M. Cynomolgus)। ইংরাজীতে ইহার নাম হইয়াছে Crab-eating Macaque। এই জাতীয় বানরেরা শ্যামদেশ, মালয় উপদ্বীপ, নিম্নব্রহ্মদেশ এবং আরাকানের অধিবাসী।
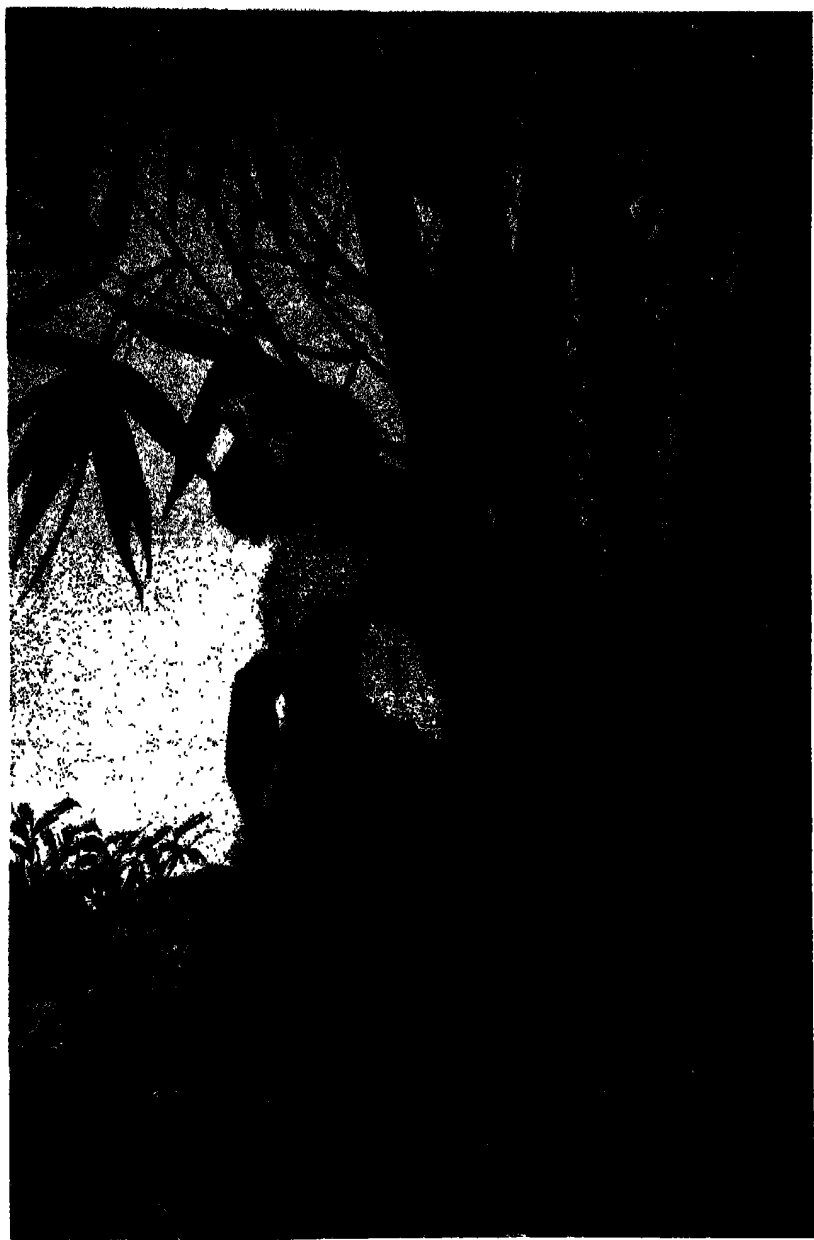
বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থিত নিকোবর দ্বীপে ও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নিকোবর

ভোঁতা নাকওয়ালা বানর

দ্বীপে সম্ভবতঃ ইহারা মানুষের দ্বারা নীত হইয়াছিল।

পশ্চিম ভারতে এক জাতীয় বানর সিংহের মত লেজ বিশিষ্ট বানর নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের নাম দিয়াছেন—(M. Silerous) বা The Lion tailed Monkey। ইহাদের লেজ ছোট। সাধারণ কথায় উহাদের নাম ওয়ানদারু।

কাঁকড়াখেকো বানর

এই জাতীয় বানরেরা বেশীর ভাগ মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, এবং কোচিনে বাস করিয়া থাকে। ইহারা বড় একটা সমতল ভূমিতে বাস করে না। সাধারণতঃ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চ শিখরে

সিংহের মত লেজওয়ালা বানর

বাস করে। ওয়ানদারু বানরেরা দশ বারোটিতে দল বাঁধিয়া বিচরণ করিয়া থাকে।

বাঙ্গালাদেশের বানর

বাঙ্গালাদেশে যে জাতীয় বানরের সংখ্যা খুব বেশী তাহারা চলিত কথায় বান্দর বা বাঁদর নামে

ম্যাকাব্ জাতীয় বানর

পরিচিত। বৈজ্ঞানিকেরা এইশ্রেণীর বানরের নাম দিয়াছেন—(M. rhesus) রুসাস্ বান্দর। এই

জাতীয় বানরের পরিচয় তোমাদের কাছে বিশেষ করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলার বানরেরা বেশ বুদ্ধিমান ও চতুর। সহজেই পোষ মানে। পথে ঘাটে সচরাচর বেদেরা ইহাদিগকে নানারূপ শিক্ষা দিয়া খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ম্যাকাক (Macaque) জাতীয় বানরের মধ্যে ক্ষুদ্র লেজবিশিষ্ট এক শ্রেণীর বানর আছে, ইংরাজীতে তাহাদিগকে Pig-Tailed Monkey

দাঁড়ান শিম্পাঞ্জী

নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের লেজ শরীর ও মাথার সহিত তুলনায় উহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র। এই বানরের হাত পা বেশ লম্বা লম্বা। আর ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও সুগঠিত।

বাঙ্গালাদেশের বানরদের সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাদের গলার আওয়াজ, চলাফেরা ও গতিবিধি ঠিক সেইরূপ। সুমাত্রা-দ্বীপের লোকেরা এই বানর পুষিয়া ইহাদিগকে উচ্চ নারিকেল গাছে চড়িতে শিখায়। এইরূপ

দাঁড়ান ওরাং-উটান

ভাবে পোষা এবং শিক্ষিত বানরেরা ডাব ও ঝুনো বা পক্ক নারিকেল ফল চিনিয়া গাছ হইতে পাড়িয়া নীচে ফেলিয়া দেয়। ইহাদের পালক তাহা কুড়াইয়া লয়। এসব কাজে স্ত্রী বাঁদর এবং ছোট ছোট শাবকেরাই বেশী পটু এবং সহজেই পোষ মানে। বয়স্ক বানরেরা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এবং হিংস্র প্রকৃতির হয়। ব্রহ্মদেশের কোন কোন স্থানে এবং আরাকানে এই জাতীয় বানর আছে। ব্রহ্মের এই বানরের সহিতও বাঙ্গালাদের বানরের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

আফ্রিকার বানর

আফ্রিকায় অনেক জাতীয় বানর আছে। আবেসিনিয়ায় এক প্রকার বানর আছে তাহারা

গায়ারে-জা (Guereza) নামে পরিচিত। গায়ারেজা বানরেরা গাছে গাছে থাকে, কিন্তু

নিশানের মত লেজওয়ালা বানর

উহাদের আকার একটু অদ্ভুত রকমের। ইহাদের সাদা দাড়ি, লম্বা লম্বা হাত পা এবং লাঙ্গুলে বেশ চামরের মত ঘন ঘন লোমবিশিষ্ট। এজন্য-ইংরাজীতে ইহাদিগকে Flag Tailed Guereza বলে। ইহাদের শরীরের মধ্যে মাথাটা কালো, দেহেরও কতকটা কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কপোল-দেশ শুভ্র। অধরাংশ ও গ্রীবাও শুভ্র। শরীরেরও অনেকটা সাদা, এবং ঘন ঘন লোমে ঢাকা।

ম্যাকাব বানর

ম্যাঙ্গাবি জাতীয় বানরেরা দেখিতে বেশ সবল ও শক্তিশালী। ইহাদের বাড়ী হইতেছে পশ্চিম আফ্রিকা। ম্যাঙ্গাবি (Mangabey) নামক স্থানে এই বানরের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া সে অঞ্চলের নাম হইতে ইহাদের নাম ঐরূপ হইয়াছে। মাদাগাস্কার দ্বীপেও এই বানরের বাস আছে। এই জাতীয় বানরেরা বেশ দুরন্ত, আমোদপ্রিয় ও খাদ্য সংগ্রহে ক্ষিপ্রহস্ত। ইহাদের দৌরাত্ম্যে পশ্চিম আফ্রিকার লোকেরা এবং মাদাগাস্কার দ্বীপের অধিবাসীরা সর্ব্বদা অস্থির থাকে কারণ সুযোগ পাইলেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য ঘরে ঢুকিয়া

গায়ারেজা বানর

খাদ্য চুরি করিতে কিংবা লুণ্ঠন করিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করে না।

আফ্রিকার ডায়ানা বানর সাদা কালায় চিত্র বিচিত্র মূর্ত্তি। গ্রীকদেবী ডায়নার নামে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। ডায়না দেবীর কপোলদেশ যেমন অর্দ্ধচন্দ্রালঙ্কৃত এই বানরদের কপোলও তেমনি। এই বানরের মেজাজ ভাল এবং ইহারা মানুষ ভালবাসে।

এখানে বনমানুষ ও বানরের হাত ও পায়ের ছবি দিলাম, উহা হইতে তোমরা ইহাদের হাত ও
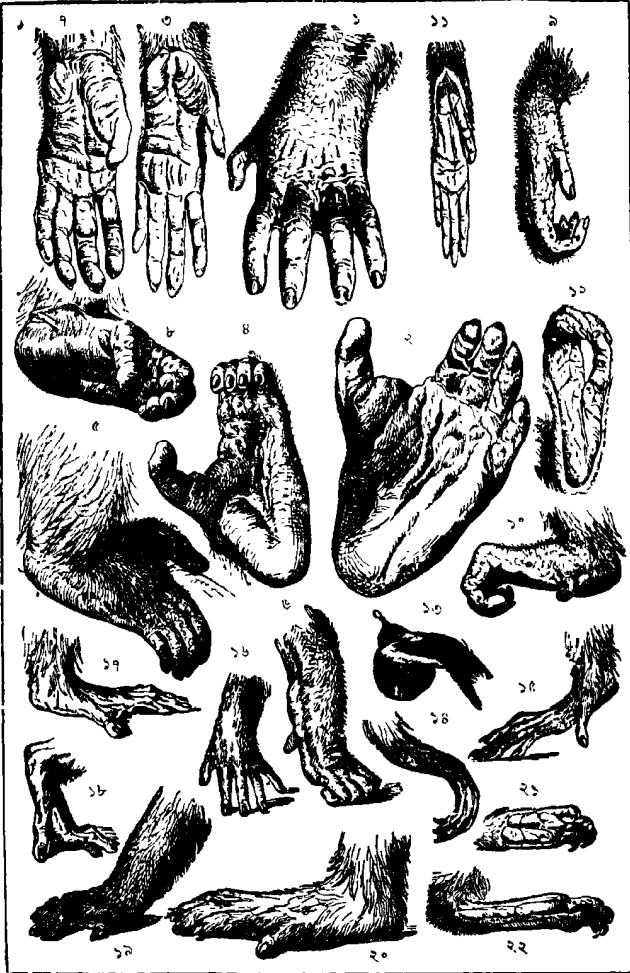
বনমানুষ ও বানরের হাত পা

১, ২ গরিলা ; ৩-৮ শিম্পাঞ্জী; ৯, ১০ ওরাং-উটান; ১১-১৩ গিবন; ১৪, ১৫ গায়ারেজা , ১৬-১৮ মাকাক , ১৯ ২০ বাবুন ; ২১, ২২ মার্মোসেট্

পায়ের গঠন সম্বন্ধে বেশ একটা অনুমান করিয়া লইতে পারিবে। ছবির নীচের পরিচয় না দেখিয়া যদি উহাদিগকে চিনিতে চেষ্টা করিয়া চিনিতে পার তাহা হইলে বুঝিব যে ইহাদের সহিত তোমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। বানরদের প্রকৃতি, গতিবিধি আলোচনা করিবার যোগ্য। আফ্রিকা, আমেরিকার বানর, চীনদেশের বানর, বাবুন বানর, মাকড়সা বানর প্রভৃতি নানা জাতীর

বাচ্চা গরিলা

বানর আছে বনমানুষ ও বানরদের মধ্যে যে আকার ও রূপের প্রভেদ আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। ডায়না বানরের সাদা দাড়িই তার সৌন্দর্য্য। তার মনে মনে দাড়ির জন্য বেশ একটা অহঙ্কার আছে! সে যখন জলপান করে, তখন সে এক হাত দিয়া দাড়ি ধরিয়া সরাইয়া রাখে।

বর্ণিও দ্বীপে এক প্রকার লাল বানরের বাস। এই বানরেরা যেমন চঞ্চল তেমনি চতুর। ইহাদের গাল ছোট, মুখ কালো। গায়ের চামড়া লাল কটাসে। মাথার উপর কয়েক গোছা চুল।

কোচীন চীনের এক জাতীয় বানর দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের গায়ে প্রকৃতি যেন নিজের হাতে পোষাক সেলাই করিয়া পরাইয়া দিয়াছেন। চুল ফেরান এবং জুলপী আঁচড়ান, মুখ দেখিতে ঠিক যেন একটি ডাগর কমলা লেবু। উরু এবং অঙ্গুলী কৃষ্ণবর্ণ, পা ও পায়ের গাঁট উজ্জ্বল লাল। গলার রং সাদা। ইহারা কিন্তু ভীরু।—কোচীন চীনে আরও কয়েক রকমের বানর আছে।

লঙ্কাদ্বীপে যে বানর আছে, তাহারা প্রায়ই মাটিতে পা দেয় না। ফল মুকুলের সন্ধানে দল বাঁধিয়া প্রায়ই গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। লঙ্কার বানরেরা যেমন লাফাইতে, তেমনি ঝুলিয়া থাকিতে, তেমনি হস্তপদ পরিচালনা করিতে অত্যন্ত দক্ষ। ইহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কর্ম্মী এবং চটুল। এই বানরেরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের দেহ আপাদ মস্তক, ১৬ ইঞ্চি লম্বা, লাঙ্গুল লম্বা ২০ ইঞ্চি। বর্ণ গাঢ় ধূসরের সহিত ঈষৎ তামাটে। ওষ্ঠ, চিবুক, গোঁফদাড়ি প্রভৃতি আধশুভ্র।

আফ্রিকার আর এক জাতীয় বানরের নাম মোনা। মোনার বর্ণ সুন্দর, আকার সুগঠিত। মেজাজ অতি মিষ্ট। অঙ্গ ভঙ্গী ও হাবভাব, সৌন্দর্য্য ও সভ্যতা-ব্যঞ্জক। মোনার গায়ের বর্ণ অতি সুন্দর স্বর্ণ-সবুজ (Golden Green) তাহার পৃষ্ঠ এবং পার্শ্ব তকতকে তাম্রবর্ণ। সে বর্ণের মধ্যে কৃষ্ণ রেখা। মোনার লাঙ্গুল ও অন্যান্য অঙ্গ সেই রঙ্গে রঞ্জিত।

বানরদের খেলা ধুলা, ক্রীড়া-কৌতুক, তাহাদের চঞ্চলতা, সে ত তোমরা প্রায় প্রত্যহই দেখিয়া থাক। যাহাদের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে তাহাদের বানর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ সহজ—শুধু একটু লক্ষ্য করিলেই তাহাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিতে পারিবে। চিড়িয়াখানায় যাইয়া পশু-পক্ষীর গতি-বিধি ও আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে অনেক কথা জানিতে ও শিখিতে পারিবে। বানরদের ইতিহাস বড় সহজ ইতিহাস নয়, আমরা যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই তোমরা বানরদের সম্বন্ধে যাহা জানিবার প্রয়োজন তাহা জানিতে পারিয়াছ।

গুপ্ত রাজাদের শেষ কথা

২৩২৭ পৃষ্ঠার পর

কুমার গুপ্তের রাজত্বের শেষ ভাগে, গুপ্ত সাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্র ও হূণজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গাজিপুর জেলায় ভিটারি নামক স্থানে একটি স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত "পিতৃকুলের বিচলিত রাজলক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য এক রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ যুবরাজকে রণক্ষেত্রেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তাহার পর পিতার মৃত্যু হইলে আপনার বাহুবল দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া ও "বিচলিত কুললক্ষ্মীকে" পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সানন্দে, "দেবকীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়" সাশ্রুনয়না জননীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া মাতা দেবকীর নিকট গিয়াছিলেন সেইরূপ মাতৃভক্ত বিজয়ী বীর সর্ব্বপ্রথমে জননীর নিকট বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়াছিলেন ও জননীর চক্ষু হইতে সন্তানের বীরত্বে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপে স্কন্দগুপ্ত ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন। বহিঃশত্রুদিগের মধ্যে পুষ্যমিত্রদের বিষয় কিছুই জানা যায় না। হূণদের বিষয় ইতিহাসে অনেক কিছু জানা যায়। ইহারা একটি যাযাবর জাতি ছিল। মধ্য এশিয়ার মরুপ্রান্তর হইতে নির্গত হইয়া তাহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল। একটি দল ইউরোপের দিকে গমন করিয়াছিল ও অন্য দল অকসস্ নদীর অধিত্যকায় বাস করিয়াছিল। এই দ্বিতীয় দলটি ইতিহাসে শ্বেতহূণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্বেতহূণেরা সমগ্র মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ও পারস্যদেশ জয় করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। স্কন্দগুপ্ত হূণদিগকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হয় নাই। এইজন্য স্কন্দগুপ্তকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রাজ্যের প্রান্তসকল রক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। তিনি সৌরাষ্ট্র-দেশের শাসনের ভার পর্ণদত্ত নামক সুযোগ্য অমাত্যের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

পর্ণদত্তের পুত্র চক্রপালিত গিরিনগরের (আধুনিক জুনাগড়) শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বনাগ নামক সামন্তের হস্তে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী অন্তর্বেদী প্রদেশের শাসন ভার অর্পিত হইয়াছিল। কৌশাম্বী প্রদেশ ভীমবর্ম্মার শাসনাধীন ছিল।

হূণেরা ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পর পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। দেশ-রক্ষার নিমিত্ত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত হয়ত হূণযুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি দেশকে শত্রুকবলিত হইতে দেন নাই। বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে বোধ হয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ একটু স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা হয়ত সম্রাটের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই রাজ্যপরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তা'ছাড়া সম্রাটের জীবিতকালে তাঁহার অধিকার সৌরাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশ অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল।

সম্রাট স্কন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় তাঁহাকে পরম ভাগবত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে দেশের সর্ব্বত্রই 'ধার্ম্মিক স্বাধীনতা' বিরাজ করিত অর্থাৎ রাজা যদিও পরমবৈষ্ণব ছিলেন তথাপি তাঁহার জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি ছিল, কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না।

সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৬৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সমাপ্ত হইয়াছিল। অনেকের ধারণা যে তাঁহার মৃত্যুর পরই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। শিলা-লিপি ও সাহিত্যিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে যে গুপ্তসাম্রাজ্য পঞ্চম শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধেও পূর্ব্ব-মালব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভেও গুপ্তরাজগণের অধিকার উত্তর-বঙ্গ, বিহার, প্রয়াগ, অযোধ্যা, যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী দেশ (বুন্দেলখণ্ড বঘেলখণ্ড, জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ইত্যাদি) হইতে লুপ্ত হয় নাই। পরিব্রাজক বংশীয় রাজা সংক্ষোভ ৫২৮ খৃষ্টাব্দে ডভালা নামক দেশ (আধুনিক জব্বলপুরের নিকট-বর্ত্তী স্থান) গুপ্তসম্রাটের অধীনে শাসন করিতে-ছিলেন। আবার ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে একজন পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গুপ্তসম্রাটের পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ শাসনের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইহার পরেও ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় রাজগণ মগধে ও মালবদেশে দীর্ঘকাল শাসন করিয়াছিলেন। অবশ্য ৪৬৭ খৃষ্টাব্দের পর পশ্চিম মালব ও সৌরাষ্ট্রদেশে গুপ্তাধিকারের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এই সব দেশে হূণদের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহাদের সেনাপতি তোরমাণ মালবদেশ জয় করিয়াছিল ও ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পুরগুপ্ত কুমারগুপ্তের প্রধানা মহিষী অনন্তদেবীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তিনিই বৃদ্ধবয়সে গুপ্তসাম্রাজ্য পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া পুরগুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী বৎসদেবীর গর্ভজাত তনয় নরসিংহগুপ্ত পিতার পর সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু ৪৭৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে হইয়াছিল। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল মহালক্ষ্মীদেবী। মহালক্ষ্মীদেবীর গর্ভজাত পুত্র কুমারগুপ্ত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৪৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সমাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে তিনজন সম্রাট, **পুর, নরসিংহ** ও দ্বিতীয় **কুমারের**, রাজত্বকালের সমষ্টি মাত্র দশ বৎসর।

দ্বিতীয় কুমারের পর বুধগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বুধগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তসম্রাটগণের সহিত সম্বন্ধ সুস্পষ্ট নহে। হইতে পারে যে তিনি প্রথম কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন ; পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক ছিল না, তিনি পর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র নরসিংহ গুপ্ত ও পৌত্র কুমার-গুপ্ত দ্বিতীয়কে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। অবশেষে পৌত্রের মৃত্যুর পর কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনিই শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুধগুপ্ত নিজের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শিলা-লিপির প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে বুধ-গুপ্তের অধিকার পুণ্ড্রবর্দ্ধণভুক্তি (উত্তরবঙ্গ) ও কাশীতে অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্ব্বমালব ও তাঁহার অধি-কারভুক্ত ছিল। এরণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ৪৮৪ গুপ্তাব্দে যখন মহারাজ সুরশ্মিচন্দ্র কালিন্দী ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী দেশে শাসন করিতে-ছিলেন, তখন সম্রাটের আশ্রিত অরিকিণের (পূর্ব্বমালবের) শাসনকর্ত্তা, মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণুও ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজস্তম্ভ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় বুধগুপ্তের সাম্রাজ্যে—পূর্ব্বমালব ও মধ্যভারত অন্তর্গত ছিল। আবার এরণের দ্বিতীয় শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ হূণ সম্রাট তোরমাণের রাজত্বের প্রথম বর্ষে মাতৃবিষ্ণুর মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ ধন্যবিষ্ণু ভগবান বরাহের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, ৪৮৪ খৃষ্টাব্দের পর পূর্ব্বমালব হূণকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। হূণেরা এখন পশ্চিমমালব হইতে পূর্ব্বমালবাভিমুখে বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর একবার গুপ্তসম্রাটের বাহুবলের অগ্নি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছিল।

৪৯৬ ৯৭ খৃষ্টাব্দে বুধগুপ্তের রাজত্বকালের পরি-সমাপ্তি হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর **তথাগত-গুপ্ত** নামক একজন গুপ্তসম্রাটের নাম পাওয়া যায়, তথাগতগুপ্তের পর **ভানুগুপ্ত বালাদিত্য গুপ্ত** সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় গুপ্তসাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, নিষ্ঠুর বর্ব্বরেরা দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কিন্তু ভানুগুপ্ত স্বর্গ হইতেও পবিত্র দেশকে শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পণ করিলেন। গুপ্ত সংবৎ ১৯১ অর্থাৎ ৫১০ খৃষ্টাব্দের এরণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে অর্জ্জুনের তুল্য বীর পরাক্রমী শ্রীভানুগুপ্তের সহিত সেনাপতি গোপরাজ সেখানে (অর্থাৎ এরণে) গিয়াছিলেন ও বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও "তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী সতী হইয়া-ছিলেন" ইহা হইতে অনুমান করা কঠিন নহে যে গোপরাজ হূণদের সহিত অরিকিণের রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া-ছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে হূণেরা মধ্যভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। কারণ ৫১০ ও ৫২৮ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক মহারাজ হস্তী ও সংক্ষোভ গুপ্তসম্রাটের অধীনে বঘেলখণ্ড ইত্যাদি প্রদেশ শাসন করিতে-ছিলেন। অরিকিণের যুদ্ধক্ষেত্রে হূণপক্ষের সেনা-পতির নাম ছিল মিহিরকুল। চৈনিক পরিব্রাজক ইউ য়ান্ চাং বলিয়াছেন যে বালাদিত্য মিহিরকুলকে বন্দী করিয়াছিলেন কিন্তু জননীর আদেশে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। মিহিরকুলকে উত্তরে (সম্ভবতঃ কাশ্মীরে) একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। ইউ-য়ান্ চাংয়ের লিখিত বালাদিত্য ও লিপির ভানুগুপ্ত সম্ভবতঃ অভিন্ন।

হূণরাজ মিহিরকুলের অন্তিম পরাজয় 'জনেন্দ্র' যশোধর্ম্মের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। মালবসংবৎ ৫৮৯ অর্থাৎ ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মন্দসোরের শিলাস্তম্ভ-লিপিতে যশোধর্ম্মের বিজয় বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই লিপি হইতে জানা যায় যে, যে সকল দেশ গুপ্তরাজগণ তথা হূণদেরও অধিকারভুক্ত হয় নাই সেই সকল দেশ জনেন্দ্র যশোধর্ম্মা নিজের অধীনে আনিয়াছিলেন। লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদীর উপকণ্ঠ হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বত (পূর্ব্বঘাট) পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের রাজাগণকে তিনি নিজের পদানত করিয়াছিলেন। রাজা মিহিরকুল "চূড়া পুষ্পোপহারের" দ্বারা তাঁহার পদযুগলের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ মিহিরকুল মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন।

হূনবিজেতা যশোধর্ম্মার বিষয় আর কিছুই জানিতে পারা যায় না তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি রহস্য বিশেষ। যাহা হউক ভানুগুপ্ত বালাদিত্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা যজ্ঞে যশোধর্ম্মা পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

ঘণ্ট-মঙ্গল

বাঙ্গলা দেশের এক পল্লী-গ্রামে বহুদিন আগে এক পণ্ডিত ছিল। সেখানকার লোকেরা তাকে বলত পণ্ডিত, কিন্তু তার মতো হস্তিমূর্খ সে সময়ে আর দু'টি ছিল না।

গ্রামের লোকেরা ছিল জাতে জেলে। তারা সকলেই ছিল তার যজমান। তাদের সকলকারই ধারণা ছিল—এ রকম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভূ-ভারতে আর দু'টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পণ্ডিত নিজে কিন্তু এত বোকা ছিল যে, কবে কোন্ তিথি—তাও সে গণনা করে বলতে পারত না। ফলে তাকে একটা বুদ্ধি খাটিয়ে তিথিটা অন্ততঃ ঠিকঠাক জেনে রাখতে হ'ত।

সে করত কি—রোজ সকালবেলা উঠে ঘরের মেঝেতে এক খণ্ড করে ইটের টুকরো রেখে দিত। এই রকম পর পর পনেরো দিনের গণনায় তিথির হিসাবটা তার ঠিকই থাকত।

শুক্লপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে এই ছিল তার একমাত্র কাজ। কিন্তু এইভাবে হিসাব রেখেও এই পণ্ডিত একদিন মহাবিপদে পড়ে গেল।

রাত্তিরে কোত্থেকে দু'টো বেড়াল এসে ঝগড়া বাধিয়ে ইটের টুক্রোগুলো চারদিকে কোথায় ছড়িয়ে ফেলল।

সকালবেলা উঠেই ত' পণ্ডিত মশায়ের একেবারে চক্ষুস্থির।
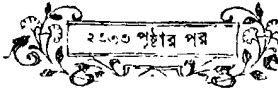
কিন্তু বিধাতার আবার এমনি পরিহাস যে, ঠিক সেই সময় জনকয়েক জেলে এসে শুধোলে, ঠাকুরমশাই, আজ কি তিথি? পণ্ডিত মশাই দেখলে সমূহ বিপদ।

চারিদিকে তাকিয়ে সে কোনো হিসেবেরই হদিস পেলে না।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠে বল্লে, আরে তোরা জানিসনে? আজ যে **ঘণ্ট-মঙ্গল**!

জেলেরা ত' অবাক। বল্লে, কৈ ঠাকুর, তুমি ত' কোনোদিন এই তিথির কথা আমাদের বল নি! আমরাও কখনো জীবনে এ তিথির কথা শুনিনি।

পণ্ডিত মশাই এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বল্লে, হতে পারে তোমরা জান না—কিন্তু জগতে এমন অনেক জিনিষ আছে তা তোমরা জানো না। আমার মতো দু' একজন বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত ছাড়া এই ঘণ্ট-মঙ্গল তিথির কথা খুব কম লোকেই জানে। তোমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

জেলেরা ভাবলে—তাদের ঠাকুরমশাই কত বড় পণ্ডিত! তাই ভক্তি গদগদ হ'য়ে জিজ্ঞেস্ করলে, আচ্ছা ঠাকুরমশাই এই উৎসবের বিধি-ব্যবস্থা আমাদের বলে দিন।

পণ্ডিত মাথা নেড়ে বল্লে, ব্যবস্থা দেবো বৈকি। এ একটি বিরাট অনুষ্ঠান। পূজোর ব্যবস্থা করতে

হ'বে—পুরোহিতের ভালো রকম দক্ষিণার সুবন্দোবস্ত করতে হ'বে। ষোড়শোপচারে ঘট-মঙ্গল দেবীর পূজা করে—তাঁর তুষ্টিসাধন করা চাই।

জেলেরা উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু ঠাকুর, দেবীর মূর্ত্তি কি রকম হ'বে?

পণ্ডিত খানিকটা ভেবে নিয়ে জবাব দিলে, তাতে তোমাদের বিশেষ মুস্কিলে পড়তে হ'বে না—প্রত্যেক বাড়ীতে দু'টো করে মাটির বেড়াল তৈরী করো—পূজার ভার রইল আমার উপর।

মহাখুসী হয়ে জেলের দল চলে গেল। খানিকবাদেই গোটা গ্রামে খবরটা রটে গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টার শব্দে গ্রামে কান পাতে কার সাধ্য।

ঠিক ঐ সময়টায়—সেই দেশের রাজার এক সভাপণ্ডিত ঐ গ্রামের পাশ দিয়ে পাল্কী করে

পণ্ডিত দেখলেন দুটো করে বেড়ালের মূর্ত্তি

যাচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ অসময়ে পূজোর বাদ্য শুনে ভাবলেন—কৈ আজকে কোনো পূজোর তিথি আছে বলে ত' মনে পড়ছে না।

কৌতূহলী হ'য়ে তিনি পাল্কী বেহারাদের বল্লেন, গ্রামের ভেতর দিয়ে নিয়ে যা।

গ্রামের ভেতর ঢুকে তিনি দেখলেন—সর্ব্বত্রই মহা-সমারোহে পূজো হ'চ্ছে এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই দু'টো করে মাটির বেড়াল তৈরী করে তার সম্মুখে ফুল-বিল্বপত্র স্তূপ করে রাখা হ'য়েছে।

দু' একজন গ্রামবাসীকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই—তারা একজন হেসে জবাব দিলে—তুমি ঠাকুর আমাদের পণ্ডিত মশাইয়ের মতো অত বিদ্বান নও। আমাদের ঠাকুরের সমস্ত বিদ্যা একেবারে নখাগ্রে। তার অজানা কিছুই নেই। তিনিই ত' আজ আমাদের পূজো করতে বল্লেন।

মুচকি হেসে সভাপতি বলেন, হ্যা সে ত' ঠিক কথাই। এ পূজার কথা আমি ত' জানিনে। কিন্তু এ পূজার নাম কি?

একটা জেলে বুক ফুলিয়ে
ও হরি! তাও জান না?—এর নাম হ'চ্ছে "ঘণ্ট-মঙ্গল" পূজো।

সভাপণ্ডিত বল্লেন, কিন্তু তার মূর্ত্তিটা কি রকম?

জেলেরা বল্লে, দেখনি বুঝি? ঐ যে দুটো করে বেড়ালের মূর্ত্তি ঐ হচ্ছে আমাদের ঘণ্ট-মঙ্গল দেবী।

সভাপণ্ডিত তখন উৎসাহিত হ'য়ে বল্লেন,—ভাই সব। তোমাদের ঠাকুর মহাশয়ের মতো জ্ঞানী পণ্ডিতের নাম আমি কখনো শুনিনি। আমার ভারী ইচ্ছে—তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দু' একটি বিষয়ে আলোচনা করি।

গ্রামবাসীরা বলে উঠল, কিন্তু তিনি যে সে পণ্ডিত ন'ন। তোমার মতো সাধারণ পণ্ডিত তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে কেন?

সভাপণ্ডিত বেগতিক দেখে বল্লেন, সে ত' বটেই—সে ত' বটেই—তবু তোমরা গিয়ে আমার খবরটা একটু দাও—

জেলের দল তখন দল বেঁধে গিয়ে তাদের পণ্ডিতের কাছে সমস্ত খবর জানিয়ে বল্লে, ঠাকুর মশাই, আপনারই মতো তিলক ফোঁটা কাটা মাথায় শিখা এক পণ্ডিত এসেছে—সে ত' ঘণ্ট মঙ্গল পূজোর কথা শুনে একেবারে অবাক! বলে কিনা তোমার সঙ্গে আলোচনা করবে? এসেছে পাল্কীতে চড়ে! কি আলোচনা করবে?...

পণ্ডিত দেখলে সমূহ বিপদ। হরির নাম স্মরণ করে মনে বল আন্‌বার চেষ্টা করিতে লাগল। তারপর জোর করে হেসে ফেলে বল্লে, আরে ও নিছক ঠাট্টা! নইলে ও আমার সঙ্গে কি আলোচনা করবে? যাই হোক, তোমরা গিয়ে তাকে বল—যদি তার কিছু জানবার বাসনা থাকে ত' সে আমার কাছে আসুক।

গ্রামবাসীরা ফিরে গিয়ে সভাপণ্ডিতকে জানালে, আমাদের ঠাকুর মশাই ত' যে সে পণ্ডিত নন্—যদি তর্ক করবার ইচ্ছে থাকে তোমাকেই তার কাছে যেতে হ'বে।

সভাপণ্ডিত বল্লেন, তা' তোমাদের ঠাকুর মশাই ত' ঠিক কথাই বলেছেন, আচ্ছা, তা হ'লে এক কাজ করা যাক্। এখান থেকে ঠাকুর মশাইদের বাড়ীর মধ্যপথে একটা যায়গা স্থির করা হোক। তিনিও আদ্ধেক পথ আসুন—আমিও আদ্ধেক পথ যাই। তা হ'লে আর তাঁর কোনো সম্মানের হানি হবে না।

মহা উৎসাহিত হ'য়ে তখন জেলের দল মাঝপথে একটা যায়গা বেছে নিয়ে মাদুর-পা'টি সব বিছিয়ে দেল্লে।

সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে তারা সভাপণ্ডিতকে খবর দিতেই তিনি পাল্কী করে এসে সেখানে আসন গ্রহণ করলেন।

তখন সবাই দল বেঁধে গেল—তাদের পণ্ডিতের কাছে।

পণ্ডিত দেখলে—আর কোনো রকমেই এড়ানো চলে না। কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় একটা
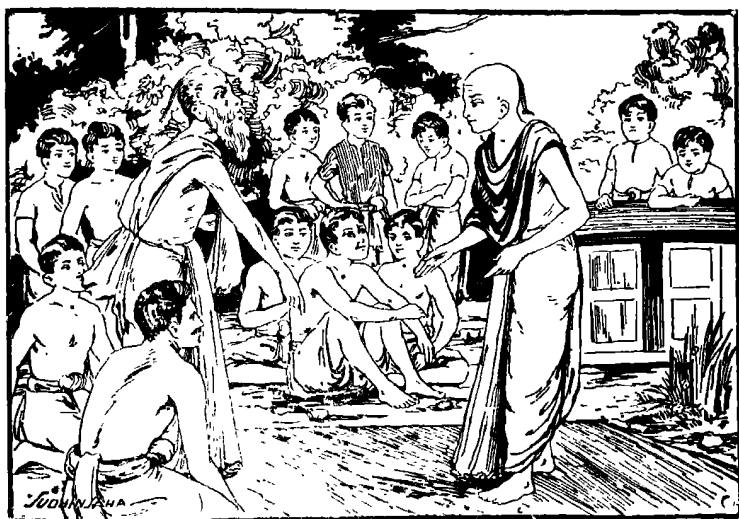
—তুই তিষ্ঠ—তোর বাপ ছিল তিষ্ঠ—তোর চৌদ্দপুরুষ তিষ্ঠ।

জেলের দল এই কথা শুনে মহা খুসি হ'য়ে তাদের পণ্ডিতকে এই খবর জানা'লে।

তখন আর উপায় নেই দেখে পণ্ডিত বল্লে, আচ্ছা তোমরা সেই পণ্ডিতকে নিয়ে যায়গা ঠিক করে আমায় খবর দাও—আমি যাচ্ছি।

সভাপণ্ডিত সেই কথা শুনে বল্লে, আমিত ত' তোমাদের গ্রামের কোনো যায়গাই চিনিনে—তবে যেখানে তোমরা ভালো বিবেচনা কর, আমার কোনো আপত্তি নেই।

বুদ্ধি খেলে গেল। গম্ভীরভাবে জেলেদের জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, ও পণ্ডিত কিসে চড়ে এলো?

সবাই সমস্বরে বল্লে, পাল্কী।

পণ্ডিত বল্লে, হুঁ। আমি যাবো বুঝি পায়ে হেঁটে? তাতে বুঝি আমার সম্মান বাড়বে?

জেলের দল অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লে, কিন্তু ঠাকুর-মশাই, এ গাঁয়ে ত' একটিও পাল্কী নেই।

পণ্ডিত সুযোগ বুঝে বল্লে, তাহলে কিছুতেই আমি যাবো না। যাও তোমরা তাকে গিয়ে বলে এসো—

তার পরই আপন মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে।

গ্রামবাসীরা তখন আবার সভাপণ্ডিতের কাছে গিয়ে নতুন বিপদের কথা জানালে।

সভাপণ্ডিত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বল্লেন, আরে তোমরা ত' বড় বোকা। পাল্কী পাওয়া যায়নি তাতে আর কি হয়েছে? তোমরা সবাই মিলে তাকে কাঁধে করে নিয়ে এসো না—না কাঁধে নয়—আনবে একেবারে মাথায় করে—। তাহলে তোমাদের পণ্ডিতের সম্মানটা কত বাড়বে বুঝতে পাচ্ছ ত'?

মহা উল্লসিত হয়ে জেলের দল আবার তাদের পণ্ডিতের কাছে ফিরে গেল। বল্লে, তুমি আমাদের গুরু, আমরা তোমায় মাথায় করে নিয়ে যাবো ঠাকুর,—চল।

পণ্ডিত ভাবলে—গেলেও বিপদ না গেলেও বিপদ। গেলে তর্কে হারবার সম্ভাবনা—আর না জেলের দল মনে করবে তাদের গুরু ভয়ে এগুলো না। যাক্ দুর্গা বলে রওনা হয়ে পড়ি—সমস্ত জীবন এদের মাথায় কাঠাল ভেঙে খেয়েছি—আজ কপালে কি আছে—এক ভগবানই জানেন। যা হ'বার রঙ্গভূমিতেই হ'বে—

তারপর তাদের দিকে তাকিয়ে বল্লে, তোমরা একটু দাঁড়াও আমি সাজ-পোষাকটা সেরে নি।

ঘরের ভেতরে ঢুকে পণ্ডিত কপালে প্রকাণ্ড শ্বেতচন্দনের ফোটা কাটলে—নামাবলী দিলে গায়—তারপর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো রওনা হ'ল।

জেলের দল তাদের পণ্ডিতকে কাঁধে তুলে হৈ-হৈ করতে করতে রওনা হ'ল।

তাকে আসতে দেখে—সভাপণ্ডিত অতি ভদ্র ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন—তারপর পণ্ডিত আরো নিকটবর্ত্তী হয়ে—জেলেদের কাঁধ থেকে নামতে—তিনি তাকে অভ্যর্থনা করে বল্লেন, আগচ্ছ—আগচ্ছ—।

এখন ব্যাপার হ'ল এই যে, জেলেদের পণ্ডিত সংস্কৃতের নাম-গন্ধও জানতো না—। সে মনে মনে ভাবলে—এর একটা ভালো রকম জবাব দিতে না পারলে—জেলের দল মনে করবে সে তর্কে হেরে গেল। তাই বিষম চীৎকার করে বল্লে—আমি কেন আগচ্ছ হ'তে যাবো—তুই নিজেই ছ—।

সভাপণ্ডিত ত' অবাক। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বল্ল, তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—

পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে তুই তিষ্ঠ—তোর বাপ ছিল তিষ্ঠ—তোর চোদ্দ পুরুষ তিষ্ঠ!

সভাপণ্ডিত ত' একেবারে হতভম্ব। তবু নিজের মান রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি বল্লেন, স্থিরোভব—স্থিরোভব—

পণ্ডিত আবার গলা চড়িয়ে হাকলে তুই নিজে স্থিরোভব—তুই কোনো কাজের নোস্—।

ব্যাপার দেখে সভাপণ্ডিত একেবারে থ' বনে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে জেলেদের পণ্ডিত—চোখ ঘুরিয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে আর ঘন-ঘন গোঁফ পাকিয়ে এমন একটা ভাব দেখালে, যে তাকে ঠকান যার-তার কাজ নয়।

তখন গ্রামবাসীরা মনে করলে, নতুন পণ্ডিত কোনো কাজের কথা নয়—সে গেছে হেরে। না হেরে গেলে ঐ রকম বোকার মতো চুপ করে থাকে না।

প্রথমে অবশ্য গ্রামবাসীরা কিছু বল্লে না, কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের গা টিপে কেউ বা আবার চোখ মুখের ইঙ্গিতে পরস্পর পরস্পরকে জানালে—আমাদের পণ্ডিতই শ্রেষ্ঠ! তার সঙ্গে কিনা আবার লড়তে আসা।

এতক্ষণ সভাপণ্ডিতকে কোন কথা বলতে না দেখে, তারা আর চুপ করে থাকতে পারলে না—সবাই একযোগে চীৎকার করে উঠল—আমাদের ঠাকুর জিতে গেছে রে—আমাদের ঠাকুর জিতে গেছে!

সভাপণ্ডিত ভেবে দেখলেন, এখানে নিজেকে পণ্ডিত প্রতিপন্ন করা একেবারে অসম্ভব। তাই স্থির করলেন—এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে জেলের দল তাকে আরো বেকুব ঠাওরাবে।

পালিয়ে মান রক্ষা করাই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু যাবার আগে এই বোকা বামুনকে একটু জব্দ করতে হবে।

এই না ভেবে—নীচের দিকে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন—সেই বোকা পণ্ডিতের দাড়ির একগাছা সাদা চুল মাটিতে পড়ে আছে। ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাবার সময় হয়ত পড়েছে।

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি এগিয়ে গিয়ে খুব ভক্তিভরে চুলটা হাতে ঘিরে ফেলে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ ঠাকুর,—তুমি আমাদের গুরুর দাড়ির চুল তুলে নিলে কেন?

সভাপণ্ডিত উত্তর দিলেন, দেখলে না আমি ওকে হেরে গেলাম। কিন্তু কেন হারলাম জান?

সবাই জিজ্ঞেস করলে, কেন? কেন?

সভাপণ্ডিত তখন বল্লে, ঐ যে দেখছ তোমাদের পণ্ডিত,—তাঁর দাড়ির এমন গুণ যে, একগাছা নিয়ে ঘরে রাখবে—সে হবে তাঁরই মত বিশ্বজয়ী পণ্ডিত। আমি বরাৎক্রমে একগাছা পেয়ে গেছি।

সবাই মিলে দাড়ি উপড়াতে সুরু করলে

তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালেন—তারপর উত্তরীয়তে বেঁধে পাল্কীর দিকে অগ্রসর হ'লেন।

সমস্ত জনতা—বেশ কৌতূহলের সঙ্গে এই ব্যাপার দেখছিল। তারা মনে করলে—নিশ্চয়ই তাদের পণ্ডিতের দাড়িতে কোনো অলৌকিক গুণ আছে—নইলে হেরে গিয়ে ঐ পণ্ডিত অত ভক্তিভরে, তাদের গুরুর দাড়ির চুল চাদরে বেঁধে নেবে কেন?

ইতিমধ্যে সভাপণ্ডিত গিয়ে পাল্কীতে উঠেছেন। তখন জেলের দল গিয়ে তাঁর পাল্কী কিন্তু তোমরা ত' আর তা' পাবে না। আর মজা এই যে, কিছুর বিনিময়েই তোমাদের পণ্ডিত একগাছা দাড়ির চুল দিতে রাজী হবেন না—কেন না তাঁর সমস্ত গুণ যে ওরই ভেতর লুকিয়ে আছে।

এই কথা শুনে জেলের দল সবাই তাদের পণ্ডিতের পিছনে ছুটে বল্তে লাগলো, ঠাকুর মশাই, তোমার একগাছা দাড়ি আমায় দাও—

ঠাকুর মশাই যতই অস্বীকার করে—ততই তাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, তাদের পণ্ডিতের সমস্ত বিদ্যে লুকিয়ে আছে ঐ দাড়ির ভেতর।

আর যাবে কোথা। সবাই মিলে এক সঙ্গে পণ্ডিতের দাড়ি ওপড়াতে সুরু করলে। তখন এই সংবাদ চারিদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। পঙ্গপালের মতো লোক ছুটে আসতে লাগলো পণ্ডিতের একগাছা দাড়ির জন্যে।

পণ্ডিত প্রাণভয়ে চীৎকার করতে লাগলো, ওরে আমায় খুন করলে—কে আছিস আমায় বাঁচা।

সেই সভাপণ্ডিত তখন পাল্কীর ভেতর থেকে চীৎকার করে বলেন, তোমাদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—দাড়ির চাইতে একগাছা গোঁফের গুণ আরো অনেক বেশী।

ইতিমধ্যে সকলের চেষ্টায় দাড়ি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল এইবার গোঁফের কথা শুনে যারা পায়নি তারা আবার সিংহ-বিক্রমে পণ্ডিতকে আক্রমণ করলে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই পণ্ডিত রাস্তায় পড়ে আধমরা অবস্থায় ধুকতে লাগলো।

সভাপণ্ডিত তখন বেহারাদের আদেশ দিলেন ওরে পাল্কী তোল্

কৃপণের দান

ফরাসীদেশের এক সহরে এক বৃদ্ধ বাস করিত। বৃদ্ধ অতি দরিদ্র ভাবে থাকিত। তাহাকে কেহ কোনদিন ভাল পোষাক পরিতে দেখে নাই। পথ দিয়া চলা ছিল তার ভারি বিপদ। সে যখন পথ দিয়া যাইত, তখনই সেখানকার লোকেরা ছেলে-বুড়ো সকলে মিলিয়া তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, নানা ভাবে গাল মন্দ দিত, এমন কি পথ দিয়া চলিবার সময় তাহার গায়ে ঢিল ছুড়িতেও ইতস্ততঃ করিত না, কিন্তু এত উৎপাত ও লাঞ্ছনার মধ্যেও বৃদ্ধকে কেহ কোন দিন রাগ করিতে দেখে নাই, সে আপনার মনে প্রশান্ত মুখে তাহাদের লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপ এড়াইয়া পথ চলিত। এরূপ অবস্থায় তাহার চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি ও মুখের প্রশান্ত ভাব দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যাইত না।

বৃদ্ধ রাজপথ দিয়া আপনার মনে একপাশ দিয়া চলিতেন, যেন কোন প্রকার লাঞ্ছনা বা উপদ্রব সহিতে না হয়, তবু কি কেহ তাহাকে ছাড়িত? ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা চেচামেচি করিতে করিতে তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া বলিত 'অই যায়রে কৃপণ বুড়ো!' দোকানি-পশারিরা পর্যান্ত একজন নিরীহ পথিককে এইরূপ তাড়নার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিত না।

একজন বিদেশী লোক একদিন পথে ঐ বৃদ্ধের প্রতি ঐরূপ অত্যাচার কেন হয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, তোমরা এই বুড়ো বেচারাকে এই অপমান ও লাঞ্ছনার হাত হইতে বাঁচাও না কেন? হায়! হায়! নিরীহ বেচারা।'

অমনি তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'তার মশাই বলেন কেন? এ সহরে ও লোকটার মত বড় কৃপণ কেউ নেই। এ লোকটা কাকেও কখন কি এক পয়সাও দান করেছে? না সহরের কোন ভাল কাজ করেছে? কুড়ি বছর যাবৎ দেখতে পাচ্ছি, একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীতে পড়ে আছে।'

'আচ্ছা একটা কথা, সে কি কাক কোন ক্ষতি করেছে?'

'না না সে ক্ষমতা ওর নেই।

'তা হলে তোমরা এই নিরীহ লোকটার উপর এত অত্যাচার কর কেন?

'কথাটা কি জানেন? লোকটা ভারি কৃপন। কেবল বছরের পর বছর পয়সাই জমাচ্ছে। পরের উপকারের জন্য যেমন এক পয়সা ব্যয় করেনা, তেমনি নিজের খাওয়া পরার জন্য ও ওকে একটি আধলাও ব্যয় করতে দেখিনি।'

লোকটার এত পয়সা হলো কি করে?

দোকানীরা বলিল—খেটে মশায়। খেটে। লোকটা অসাধারণ পরিশ্রমী. সে দিন রাত খাটে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সকাল থেকে রাত দুপুর পর্য্যন্ত কেবলি খাট্‌ছে। মানুষ এমন খাটতে পারে না।

আগন্তুক কহিল এই তার অপরাধ।

এই লোকটির নাম ছিল গ্যায়ো। সে সহরের একপাশে একখানি ছোট বাড়ীতে বাস করিত। তাহার আপনার জন কেহই ছিল না। কেহ তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্য তৎপরা প্রকাশ করিত না, সে থাকিত আপনার মনে—বাহিরের লোকেরাও তেমন তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইত না, সেও তেমনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইত না।

—একদিন সকালে লোকটিকে আর পথে দেখা গেল না! পথের লোক গুলি ব্যস্ত হইয়া পড়িল,—এ কি রকম। আজ ত তাহা হইলে দিনটাই বৃথা হইল। এমন সময় কতক গুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আসিয়া সংবাদ দিল যে গ্যায়োর বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ। পুলিশে খবর দেওয়া হইল। সহরের বড় বড় লোক আসিয়া জড় হইল। ঘরের দরজা ভাঙ্গিলে পর দেখা গেল—গ্যায়ো একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দুইটি মুদিত, মুখে একটা শান্ত ভাব। চিকিৎসক তাহাকে বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হতভাগা মরেছে!

একজন রাজকর্ম্মচারী তাহার ঘরের সব জিনিষ-পত্র নাড়া-চাড়া করিতে করিতে অনেকগুলি দলিলপত্র পাইলেন। সেই সব দলিলপত্র পড়িয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে বৃদ্ধ অনেক ধন-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ গ্যায়োর উইলখানি সকলে আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলেন পড়িতে পড়িতে তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া গেলেন এই কি কৃপণের কাজ?

যে বৃদ্ধকে সহরের লোকেরা একদিনও গাল-মন্দ না দিয়া জলগ্রহণ করে নাই। যে বৃদ্ধকে ছেলে বুড়ো সকলে মিলিয়া প্রতিদিন নির্য্যাতন করিয়াছে সেই বৃদ্ধের উইল বা চরমপত্র সহরের প্রকাশ্য দরবার গৃহে পড়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। রাজকর্ম্মচারীরা বৃদ্ধের মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা করিবার আদেশ দিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় দরবার-গৃহে নগরবাসীরা মিলিত হইয়াছে। সকলের মুখে মুখে এই কথা কৃপণ গ্যায়োর উইলে আবার কি থাকিতে পারে?

নগরাধ্যক্ষ সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ কৃপন গ্যায়োর দানপত্র পড়িতে লাগিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার উইলে লিখিয়াছেন: "আমি আমার বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি যে আমাদের এই সহরের দরিদ্রেরা জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে অত্যধিক মূল্য দিয়া জল কিনিতে হয়। তাহাদের এই জলকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আমি সারাজীবন ক্লেশ করিয়া যে অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছি, সেই অর্থ দিয়া একটা জলবাহিনী নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমার সমুদয় সঞ্চিত অর্থ দান করিলাম।" দানপত্র পাঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জন-মণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গ্যায়োর নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। আগুনের মত বেগে সহরের সর্ব্বত্র গ্যায়োর দানের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল।

একদিন যাহারা বৃদ্ধ গ্যায়োকে ঘৃণা করিয়াছে, উৎপীড়িত করিয়াছে, আজ তাহারাই এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বৃদ্ধ গ্যায়োর দেহ সমাধিস্থ করিল। আজ সকলে বুঝিতে পারিল এই নির্য্যাতীত বৃদ্ধের জরাজীর্ণ দেহের ভিতরে দয়ার কি গোপন মাধুর্য্যই না লুকাইয়াছিল। মরিয়া সে অমর হইল।

সাঁতারের বিভিন্ন রীতি

চিৎ-সাঁতার

৪৫১ পৃষ্ঠার পর

জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে চিৎ-সাঁতার একান্ত প্রয়োজন। চিৎ-সাঁতার দিয়া বিনা আয়াসে ভাসিয়া থাকা যায়। ইহার মত আরামপ্রদ ও বিশ্রামের উপযোগী সাঁতার আর নাই। ইহাতে কোনরূপ পরিশ্রম হয় না বলিলেও চলে। চিৎ-সাঁতারকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:—

(ক) জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য চিৎ-সাঁতার

(খ) হাত গুটাইয়া চিৎ-সাঁতার

(গ) হাত পিছন বা নীচে রাখিয়া চিৎ-সাঁতার

(ঘ) মাথা বেড়া চিৎ-সাঁতার

(ক) জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য চিৎ-সাঁতার এই কৌশলে কেবল পা দিয়া সাঁতার কাটিতে হয়। হাত দিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিকে টানিয়া আনিতে হইবে বলিয়া হাত একেবারে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

প্রথমে জলের সহিত সমান্তরালভাবে চিৎ হইয়া কাণ পর্য্যন্ত মাথা ডুবাইয়া থুৎনি উচু করিয়া রাখিতে হইবে। বুক পরিমাণ জলের সহিত উচু হইয়া রহিবে। হাঁটু ও জলের একটু উপরে উঠিয়া থাকিবে। পদদ্বয় দ্বারা জলের নীচের দিকে ধাক্কা দিতে হইবে। হাত কোমরে সংলগ্ন পায় রহিবে।

অভ্যাস কালে কেহ যদি পিঠে হাত দিয়া শরীরের ভার বহনের সাহায্য করে তাহা হইলে শিক্ষার্থী অল্প সময়ে এই পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, অল্প জলে মাথা সোজা রাখিয়া পায়ের দ্বারা ধাক্কা মারিয়াও এই সাঁতার অভ্যাস করা যাইতে পারে। কাণে জল ঢুকিয়া যাইবার ভয় করিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সাঁতার কাটিবার সময় হাতের সাহায্যে সাঁতার কাটা চলিবে না। পায়ের গতি ধীরে ধীরে হইবে। পদদ্বয় ঠিক সোজা নীচের দিকে না যাইয়া নীচের দিকে ও বাহিরের দিকে ধাক্কা দিবে। গতিভঙ্গীর সময় সর্ব্বদাই গোড়ালিদ্বয় একত্র থাকিবে, কিন্তু হাঁটুদ্বয় ফাঁক থাকিবে। ঐ সময়ে হাঁটু, ও উরু ও শরীরের সমসূত্রে বা সোজা হইয়া থাকিবে। কিন্তু জলমগ্ন ব্যক্তিকে প্রকৃত পক্ষে উদ্ধার করিতে যাইবার সময় যথা সম্ভব দ্রুতগতি অবলম্বন করিতে হইবে।

(খ) **হাত গুটাইয়া চিৎ-সাঁতার** এই সাঁতার দিবার সময় চিৎ হইয়া হাত পাশে ছড়াইবে। তাহার পর হাত জলের একটু নীচে,

জলের উপরি ভাগের সহিত সমান্তরাল রাখিয়া উরু হইতে অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি পর্যান্ত ধাক্কা দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ ভঙ্গীর গতি খুব ধীরে ধীরে করিতে হইবে। ধাক্কা দিবার সময় হাতের তেলো খুলিয়া শরীরের দিকে মুখ করিয়া রাখিতে হইবে। যাহাতে জোরে ধাক্কা দিয়া অগ্রসর হইতে পারা যায়। দুই হাতের গতি পর পর হইবে। পায়ের গতি একটার পর একটা বা একত্রে হইতে পারে। হাঁটু যখন বাঁকিয়া পিছন দিকে আসিবে, হাত সেই সময় বাহিরের দিকে যাইবে।

(গ) হাত পিছনে বা নীচে রাখিয়া চিৎ-সাঁতার এই কৌশলে পায়ে করিয়া জলে ধাক্কা দিবার ভঙ্গী প্রায়ই পূর্ব্ব প্রণালীর মত। হাতের ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কৌশল অবলম্বনে সাঁতার কাটিতে হইলে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও হাতের গতির বিরাম থাকিবে না।

প্রথমে হাত উঠাইয়া চিৎ-সাঁতার দিবার মত হাত পাশে রাখিয়া জলের সহিত সমান্তরালভাবে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে হইবে। হাত যেন জলের উপরি ভাগে না উঠে সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। তাহার পর কনুই পিছন দিকে বাঁকাইয়া হাত উপরে তুলিতে হইবে। হাতের তালু সম্মুখ দিকে থাকিবে। কাঁধের নিকট ধাক্কা দিয়া কোমর পর্য্যন্ত হাত লইয়া আসিতে হইবে। মাথা উঠিয়া থাকিবে। হাত যখন পায়ের নিকট যাইবে পদদ্বয় দিয়া তখন জলে ধাক্কা দিয়া পদদ্বয় সোজা করিবে। কনুই হইতে বাকী হাতটারই কেবল গতি হইবে।

(ঘ) মাথা বেড়া চিৎ-সাঁতার

পূর্ব্বের মত চিৎ হইয়া জলের উপরে সমান্তরাল হইয়া শয়ন করিতে হইবে। তাহার পর হাত সম্মুখ হইতে মাথার দিকে লইয়া গিয়া জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরাল হইতে হইবে। এই সময়ে হাতের তালু চিৎ হইয়া থাকিবে। বাহু সোজা থাকিবে। হাত মাথার উপর হইতে সোজা করিয়া জোরের সহিত কোমর পর্য্যন্ত ধাক্কা দিয়া আনিয়া শরীরের সহিত সমান করিবার সময় পদদ্বয় দ্বারা পাশের দিকে ধাক্কা মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিকে লইয়া আসিতে হইবে। হাত ও পায়ের ভঙ্গী এক সঙ্গে করিবার সময় প্রায়ই হাত পিছন ও নীচে রাখিয়া সাঁতার দিতে হইবে।

উল্টা হামাটানা চিৎ-সাঁতার

এইরূপ কৌশলে পদদ্বয় সোজা করিয়া রাখিতে হইবে। সাঁতার কাটিবার সময় পদদ্বয় বেশী ফাঁক

চিৎ-সাঁতার

না করিয়া এক পা উপরে তুলিতে থাকিবে আর সেই সময় অপর পা নীচে নামাইতে থাকিবে। কিছুক্ষণ অভ্যাসের ফলে এইরূপ সাঁতার আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

প্রথমে এক হাতের কনুই সম্মুখ দিক দিয়া উপরে তুলিতে হইবে। হাতের তালু বাহিরের দিকে থাকিবে। হাত জলে নামাইবার সময়

F. 6—31

জলের সহিত সমান্তরাল করিয়া নামাইতে হইবে। কনুই যতদূর সম্ভব উপর দিকে উঠাইয়া পরে মাথার উপর দিকে জলে হাত নামাইতে হইবে। তাহার পর ঐ হাত জলের ভিতর অর্দ্ধবৃত্তাকারে নীচের দিকে ধাক্কা দিয়া প্রথম অবস্থায় লইয়া আসিতে হইবে।

বিপরীত হাতে ঠিক পূর্ব্ববৎ অভ্যাস করিতে হইবে। এইবার পর পর দুই হাতে অভ্যাস কনুই যখন মাথার উপর দিকে যাইবে অপর হাত তখন জলের ভিতর দিকে গিয়া পূর্ব্বস্থানে থাকিবে। জলের ভিতর দিকে যাইবার সময় হাতের তালু খুলিয়া খুব শক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। হাতের তালু বাটীর মত আকার করিয়া যথাশক্তি চালনা করিতে হইবে। পায়ের গতি খুব জোর না করিয়া স্বাভাবিক ভাবে করিতে হইবে।

এইরূপ কৌশলে সাঁতার কাটিবার সময় শরীর

মাথা বেড়া চিৎ সাঁতার

করিতে হইবে। দুই হাতে অভ্যাস করিবার সময় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত সমস্ত পা জলে ডুবিয়া থাকিবে। পা উঠা নামা করিবার সময় হাটুতে হাটুতে যেন না ঠেকে। জলের সহিত সমান্তরাল করিয়া শরীরকে খুব সহজ অবস্থায় রাখিতে হইবে। আপন পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিতে পাওয়া যায় মাথা জলের এরূপ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকিবে। এক হাতের ঘোরাল বা কোমর মোচড়ান কখনই উচিত নহে। হাত ও পায়ের গতির তাল সমভাবে জোর রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। হাত উপরে উঠাইবার সময় শিথিল ও ধাক্কা দিবার সময় শক্ত করিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে ঘাড় ও শরীর শক্ত না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাতের গতি খুব দ্রুত হইবে।

কাৎ-সাঁতার

অগ্রে যে কোন একটা হাত পাশের দিকে লম্বা করিয়া আগাইয়া দিতে হইবে। হাতের তালু নিম্নমুখে রহিবে। হাত সম্মুখের দিকেও পাশে আনিবার সময় বাহুমধ্যে কাণ স্পর্শ করিবে। তাহার পর হাত নীচের দিকে দিয়া শরীরের পাশে আনিতে হইবে। হাত আনিবার সময় শরীরের জলের সহিত সংস্পর্শ রাখিয়া সম্মুখে আগাইতে হইবে।

পায়ের গতি হাটু বাঁকাইয়া ডান পা বাম দিকে ও বাম পা ডান দিকে ধাক্কা মারার মত করিতে হইবে। হাটু সম্মুখে ও পিছনে করিয়া ধাক্কা মারিতে হয়। এক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অপর পায়ের গোড়ালির মধ্যে বেশী ফাঁক থাকিবে না।

বাম হাত যখন জল হইতে সোজা হইয়া সম্মুখে

কাৎ সাঁতার

খুব নিকট দিয়া আনিতে হইবে। অপর হাত দিয়া পূর্ব্বের হাতের মত অভ্যাস করিতে হইবে। দুই হাতে অভ্যাস হইয়া গেলে পর পর এক এক হাতে অভ্যাস করিতে হইবে। এক হাত যখন জলের নীচের দিকে যাইতে থাকিবে অপর হাত তখন আগাইবে সেই সময় দক্ষিণ হস্ত জলের নীচের দিক দিয়া পিছন দিকে সোজা হইবে। যখন যে হাত মাথার উপর দিয়া জলের সহিত সমান্তরাল হইবে তখন সেই দিকে কাৎ হইতে হইবে। কাৎ হইবার সময় সেইদিককার কাণ ও চোখ ডুবিয়া যাইবে।

সমুদ্র জলের স্রোত

২১৬৮ পৃষ্ঠার পর

মহাসমুদ্রের জলরাশি দণ্ড-মাত্রও স্থির নয়—দিন নেই, রাত নেই, সারাক্ষণ লহরমালা নাচছে সাগরের বুকে। এ কথা গেলবারে তোমরা শিখেছ। এ কথাও তোমরা জান যে তরঙ্গ মানে জলের নৃত্য, জলপ্রবাহ নয় অর্থাৎ ঢেউ উঠলে জল নাচে, কিন্তু কোন দিকে বহে চলে না। তাই বলে মনে কোরো না যেন, যে সাগরজলের এই এক তরঙ্গ-ভঙ্গ ছাড়া আর কোনও গতি নেই। গতি নানা রকমের আছে। আর, তার কারণও নানা প্রকার। বিষয়টা জটিল, সহজ কথায় তোমাদিগকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।
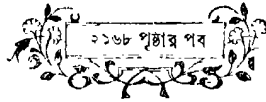
তোমাদের মধ্যে যারা সমুদ্র কিনারায় কি খাড়ির ধারে, কি বড় নদীর মোহনার কাছে, বাস করেছ, তাদের সঙ্গে জোয়ার ভাটার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। দিবা রাত্রির আট প্রহরে দুই প্রহর ধরে জল বাড়ে আবার দুই প্রহর ধরে জল কমে, আবার দুই প্রহর জল চড়ে ও দুই প্রহর নামে এই রকম অনবরত চলেছে। শুধু জল যে ওঠে নামে তা নয়, জলে একটা বেশ জোর টান হয় এই জোয়ার ভাটার দরুন। তোমরা অনুভব করে থাকবে যে এই টানের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটতে কি নৌকার দাঁড় টানতে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। বড় বড় জাহাজও যখন কোন খাড়িতে কি নদীর মোহনায় ঢোকে তখন কয়লা বাঁচাবার জন্য জোয়ারের জল-স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ঢোকার ব্যবস্থা করে। আচ্ছা, এই জোয়ার ভাটার রহস্য কি, তোমরা ঠিক জান? বুঝিয়ে বলি, শোন। জড় জগতের একটা সনাতন নিয়ম এই যে প্রত্যেক জড়কণা অন্য জড়কণাকে নিয়ত সর্বক্ষণ টানছে। সেই টানের নাম পণ্ডিতেরা দিয়েছেন মাধ্যাকর্ষণ। এই আকর্ষণের জন্যই আম, জাম, কাঁটাল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে। এরই জন্য, তুমি যত জোরেই লাফাও ভূমিতলে আবার এসে পড়বেই। এরই জোরে, তোপ বন্দুকের গোলা গুলি যে দিকে যত জোরেই ছোড় অবশেষে মাটিতে এসে পড়বেই। এখন দেখ, পৃথিবী যেমন তার উপরের পদার্থ মাত্রকে ক্রমাগত টানছে তেমনই আকাশের জড়-পিণ্ডগুলোও পৃথিবীকে অনবরত টানছে। যারা দূরে আছে তাদের আকর্ষণ কম, যারা নিকটে আছে তাদের আকর্ষণ বেশী। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে চন্দ্র, সুতরাং তারই টান খুব বেশী। সূর্য্যদেব অনেক দূরে থাকলেও তাঁর আয়তন বিশাল, তাই তাঁরও টান হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। এই চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণের ফলেই সাগরে জোয়ার ভাটা হয়। অত দূরের থেকে চন্দ্র সূর্য্যের এমন শক্তি নেই যে
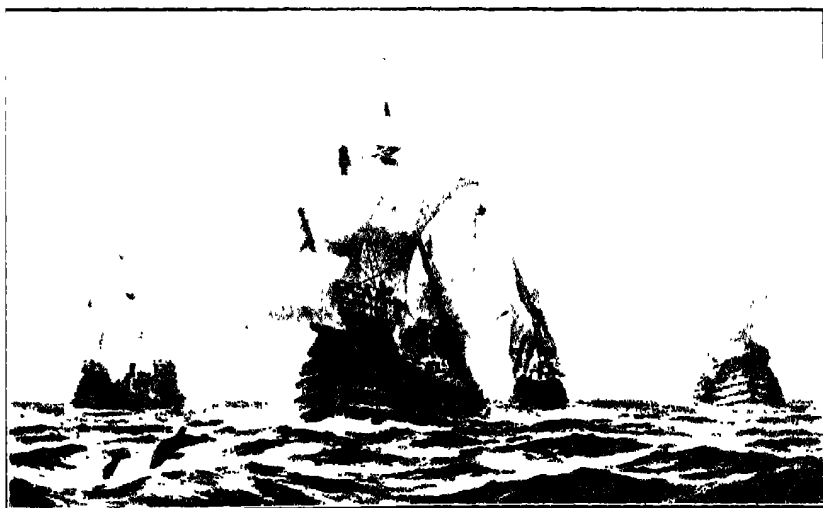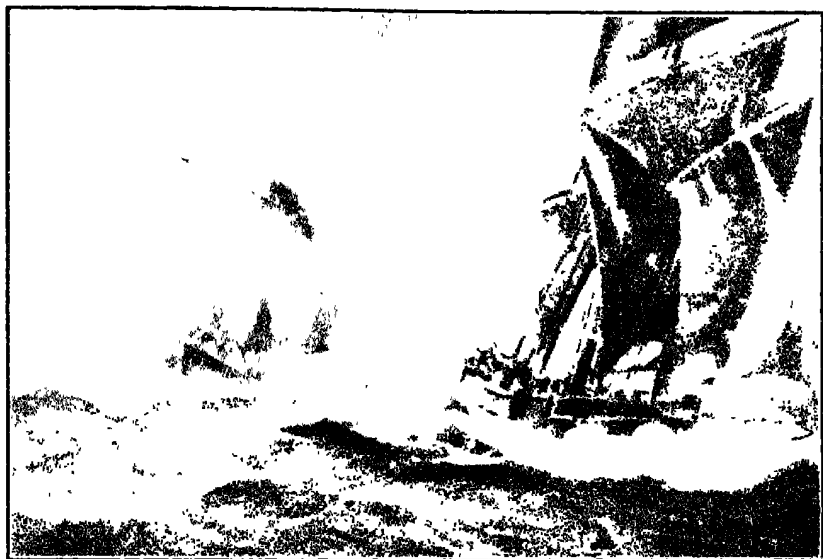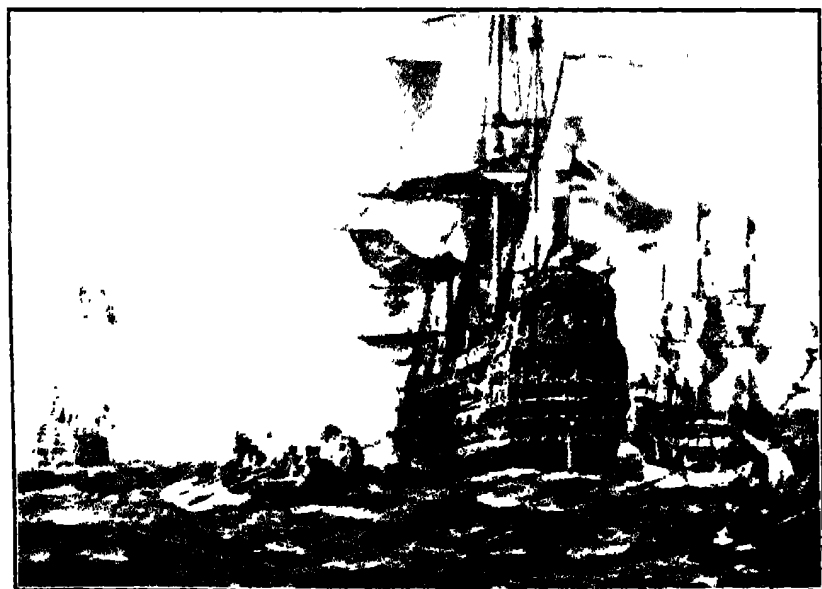
সাগরের জলকে ভূমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেতে পারে। তবে জল তরল পদার্থ, এই দুই গ্রহের আকর্ষণের দরুন ফুলে লাফিয়ে ওঠে। তোমরা জান যে পৃথিবী ও চন্দ্র দু'জনার কেউই দাঁড়িয়ে নেই। পৃথিবী ক্রমাগত চরকীপাক খেতে খেতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে, আর চন্দ্র অনবরত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এই ঘুরপাক খাওয়ার সময় পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের সামনে আসছে সেখানকার সমুদ্রের জল তখনই ফুলে উঠছে, অর্থাৎ সেই স্থানে জোয়ার আসছে। কিন্তু শুধু যদি এই রকম হত, তা হলে চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার জোয়ার আসত, কেন না পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খায়। কিন্তু কি হয় জান, যখন চন্দ্রের ঠিক কাছের জায়গাটায় জোয়ার আসে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্য পিঠে অর্থাৎ চন্দ্র হইতে দূরতম প্রদেশেও সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে। অর্থাৎ যখন ইংলণ্ডে জোয়ার, তখন তার ঠিক উল্টো পিঠে নিউজিল্যাণ্ডেও জোয়ার এসেছে। যখন ভারতবর্ষে জোয়ার, তখন তার উল্টো পিঠে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু বলিভিয়াতেও জোয়ার এসেছে। একটা ছবি দিলাম এই ব্যাপার তোমাদিগকে বোঝাবার জন্য। দেখছ ত দু'পিঠে জোয়ার, মাঝখানে ভাটা। এই রকমে আট প্রহরে দুবার জোয়ার, দুবার ভাটা হয়। এর মধ্যে আবার আর একটু কথা আছে ঠিক ছয় ঘণ্টা অন্তর কিন্তু জোয়ার ভাটা হয় না। যদি শুধু পৃথিবী ঘুরত আর চন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে তাই হত। কিন্তু তা ত নয়, পৃথিবী যেমন ঘুরছে চন্দ্রও তেমনই ঘুরছে। উভয়ের ঘোরার ফলে জোয়ার ভাটার সময় প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে পেছিয়ে যায়। নইলে রোজ ঠিক একই সময়ে জোয়ার ভাটা হত।

এত গেল শুধু চন্দ্র গ্রহের আকর্ষণের ফল। এখন দেখা যাক সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য আবার কি তফাৎ হয়। সূর্য্য বহুদূরে থাকলেও আয়তনে এত প্রকাণ্ড যে সমুদ্রের জলের উপর তার প্রভাব থাকতেই হবে। সে প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায় পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন, যখন সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী এক লাইনে সারবন্দি এসে যায়। সমুদ্রের জল এই দুইদিন একসঙ্গে দুই গ্রহের আকর্ষণের ফলে অনেক বেশী ফুলে ওঠে। পূর্ণিমা অমাবস্যার এই জোর জোয়ারকে ইংরাজী Spring Tide বলে। উপরোক্ত কারণেই যখন সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীকে আড়দিক হতে টানে, যেমন অষ্টমী তিথিতে, তখন জোয়ারের জল অনেক কম চড়ে। এই নীচু জোয়ারের জলকে ইংরাজীতে Neap Tide নাম দেওয়া হয়েছে। খোলা সমুদ্রে সাধারণতঃ জোয়ার ভাটার ব্যাপারকে মাঝি মাল্লারা বড় একটা গুণাতর মধ্যে আনে না। কিন্তু খাড়ির মুখে কি নদীর মোহনায় পূর্ণিমা অমাবস্যাতে জলের এত টান হয়, যে তাকে অবহেলা করা চলে না।

এ পর্য্যন্ত সাগর জলের উপর পৃথিবীর বাহিরের আকর্ষণের ফল দেখা গেল। কিন্তু এ ছাড়াও প্রধানতঃ সূর্য্যতাপের প্রভাবে সমুদ্রে নানা রকম স্রোত এবং প্রবাহের সৃষ্টি হয়। সেগুলোকে বুঝতে হলে পদার্থবিদ্যার দুই একটা নিয়ম সম্বন্ধে তোমাদের সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই সাধারণ নিয়মটা তোমাদের মনে রাখা দরকার যে তরল পদার্থ বা বাষ্পীয় পদার্থ গরম হলে হালকা হয়ে যায়, হালকা হলেই উপরে উঠে যায়, এবং চারিদিক থেকে ঠাণ্ডা, অতএব ভারী, পদার্থ এসে তার স্থান অধিকার করে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে জল অপেক্ষা পাথর মাটি অল্প সময়ে তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং অল্প সময়ে জুড়িয়ে যায়। এও তোমরা মনে রেখো যে নোনা জল বিশুদ্ধ জলের চেয়ে ওজনে ভারী, আর যে জলে যত নুন আছে সেই জলের ওজন তত বেশী। মহাসমুদ্রের সর্ব্বত্র লবণের পরিমাণ যে এক নয়, তা তোমাদিগকে আগে বলেছি। তেমনই সর্ব্বত্র জলের তাপও এক নয়। স্বাভাবিক কারণে বিষুবরেখার কাছের জলের তাপ অত্যধিক, মেরুপ্রদেশের জল তুষার-শীতল। অতএব তোমরা বুঝতেই পারছ যে, সকল সমুদ্রের জলের ওজন এক রকম নয়। তাপ ও লবণের পরিমাণ-ভেদে কোথাও জল ভারী, কোথাও জল হালকা। ওজনের এই তারতম্যের দরুন সমুদ্রে নানা রকম জলস্রোত উৎপন্ন হয়।

কিন্তু সাগর জলের প্রবাহাদি প্রধানতঃ নির্ভর করছে বায়ুপ্রবাহের উপর। তাই জগতের প্রধান

প্রধান বায়ুপ্রবাহগুলো সম্বন্ধে তোমাদের একটা ধারণা থাকা উচিত। আগে একটা ছোট-খাটো ব্যাপারের কথা বলি শোন। তোমাদের মধ্যে যারা সমুদ্রতীরে থেকেছ, তারা দেখেছ যে সারাদিন জল থেকে ডাঙ্গার দিকে একটা হাওয়া সামনে বইতে থাকে। আবার সন্ধ্যার সময় সেই হাওয়া ঘুরে যায়, এবং সারা রাত্রি ডাঙ্গা থেকে জলের রকমে হয়, আমরা তাকে বলি বর্ষাকাল বা Monsoon। গ্রীষ্মের সময় পৃথিবীর উষ্ণ প্রদেশের স্থলভাগ অত্যন্ত তেতে উপরে ওঠার দরুন আষাঢ় শ্রাবণে সমুদ্র থেকে জোর ঝড় হইতে আরম্ভ হয়। সেই ঝড়ের সঙ্গে যে জলীয় বাষ্প উড়ে আসে, সেইটাই বৃষ্টিরূপে ডাঙ্গায় পড়ে উত্তপ্ত ডাঙ্গাকে শীতল করে।
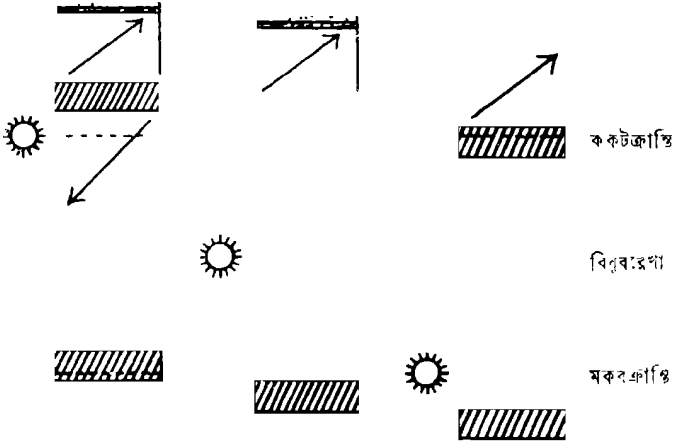
পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ
সূর্য্যের উত্তরায়ন দক্ষিণায়ন গতির জন্য বায়ুস্রোতের কতটা পরিবর্ত্তন

পানে হাওয়া বইতে থাকে। এর কারণ তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারবে। সকাল বেলা জলের চেয়ে আগে ডাঙ্গা তেতে ওঠে। তাই ডাঙ্গার উপরের বায়ুস্তর গরম হয়ে ওপরে ওঠে যায় আর সমুদ্রের উপর থেকে ঠাণ্ডা ভারী হাওয়া এসে তার স্থান অধিকার করে। সন্ধ্যার পরে ডাঙ্গা আগে জুড়িয়ে যাওয়াতে উলটো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপারটাই যখন খুব বড়

ভূগোলে পৃথিবীকে মোটামুটি কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, পাশে তার ছবি দিলাম। উত্তরে দখিণে অতি শীতল মেরুপ্রদেশ, কটিদেশে কর্কটক্রান্তি হতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত অত্যুষ্ণ প্রদেশ, তার মধ্যস্থলে বিষুবরেখা। এই অত্যুষ্ণ ভাগের উত্তরে ও দক্ষিণে মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম নাতি-শীতল দেশ। একটা কথা তোমরা ভুলো না যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান বায়ু প্রবাহগুলির

মূল কারণ সূর্য্যের তাপ মোটামুটি বলতে গেলে পৃথিবীর কটিদেশস্থ হাওয়া অত্যুষ্ণ হওয়ার দরুন এবং মেরুদেশের হাওয়া অতি শীতল হওয়ার দরুন বাণিজ্য-বায়ু বা Trade wind, Anti-Trade wind, Polar wind, ইত্যাদি প্রধান বায়ুস্রোত গুলি উৎপন্ন হয়। যদি পৃথিবী গতিবিহীন হত তবে এই বায়ুপ্রবাহ গুলো উত্তর-দক্ষিণ বা দক্ষিণ-উত্তর বইত। কিন্তু পৃথিবী অনবরত পাক খাচ্ছে বলে Ferrel's Law অনুসারে হাওয়ার গতি তেরচা হয়ে যাচ্ছে। পাশের নক্সা হতে মোটামুটি বুঝতে পারবে হাওয়ার এই তির্য্যক গতি। একটা সাধারণ
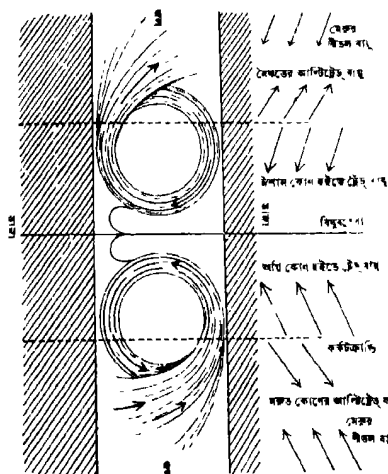
নিয়ম এই যে হাওয়া বেশী চাপের স্থান থেকে কম চাপের স্থানে বহে যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে এইরূপ বায়ুস্রোত বইছে তা নয়। মাঝে মাঝে নির্ব্বাত প্রদেশে খানিকটা করে আছে। এই নির্ব্বাত প্রদেশগুলির সাধারণ নাম Doldrum। সব চেয়ে বিখ্যাত Doldrum বিষুবরেখার কাছ বরাবর। এখানটার বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম এবং এখানে সর্ব্বদাই একটা উৰ্দ্ধমুখ বায়ুস্রোত বইছে।

বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলব না। পরে বায়ুমণ্ডলের বিষয়ে সব খুঁটিনাটি কথা তোমাদিগকে বোঝাতে চেষ্টা করব

এখন তোমাদের বুঝতে হবে যে অনবরত একটা বায়ুস্রোতের দ্বারা তাড়িত হলে সাগর জলের কি গতি হয়। একবার হাওয়ার ধাক্কা খেলে জলে ঢেউ ওঠে, এ কথা তোমরা শিখেছ। কিন্তু ক্রমাগত সমানে যদি জলের উপর হাওয়ার ঝাপটা মারে, তাহলে শুধু ঢেউ উঠে ত থামবে না। অবিরাম বায়ুস্রোত করবে কি, জলের উপরের স্তরটাতে একেবারে ঠেলে সামনে নিয়ে যেতে থাকবে। পৃথিবীর মৌসুমী হাওয়া গুলোর ফলে সমুদ্রে নিয়ত এই রকম জল প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রবাহকে ইংরাজীতে বলে Drift, কেন না জলের উপরের সমস্ত স্তরটা হাওয়ার আগে আগে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে। এই Driftকে ঠিক স্রোত বলা যায় না। স্রোত বলতে বেগবতী নদীর জলের তোড়ের মত গতি বোঝায়। অর্থাৎ একটা জলরাশি যেমন উপর থেকে নীচের পানে তোড়ে বহে যায় সেই রকম ব্যাপার বোঝায়। এই জাতীয় বেগে বহমান জল-স্রোতের ইংরেজী নাম Stream। জগতের মধ্যে সেরা সামুদ্রিক Stream হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের Gulf Stream। তোমাদিগকে একটু সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করি যে কি ভাবে এই বিখ্যাত স্রোতের উৎপত্তি হয়।

উত্তর বিষুব রেখার জলপ্রবাহের ও দক্ষিণ বিষুব রেখার জলপ্রবাহের অনেকটা ভাগ প্রবল Trade windএর তাড়নায় গিয়ে Mexico উপসাগরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেখানে মিসিসিপি নামক বিখ্যাত মহানদ অনবরত তার সমস্ত জলরাশি ঢালছে। নদীর মোহানার জল ও সমুদ্র প্রবাহের বিশাল বারিরাশি দুইয়ে মিলে একটা অবস্থা হয় যে এই উপসাগরের সমস্ত জল স্তূপাকার হয়ে ফুলে ওঠে। জলের Level সাধারণসাধারণ সমুদ্রের Level হতে প্রায় চার ফুট উঁচু হয়ে ওঠে। ফলে উপ-সাগরের মাঝে যেন একটা নদীর উৎপত্তি হয়। ফ্লোরিডার পাশ দিয়ে একটা প্রচণ্ড জলস্রোত বেরিয়ে খোলা সমুদ্রে পড়ে। এই স্রোতের বেগ গঙ্গা বা ইরাবতীর বেগের চেয়ে একটুও কম নয়। ঘন নীল উত্তপ্ত এই জলস্রোত বহুদূর পর্য্যন্ত আপন বিশেষত্ব বজায় রাখতে পারে। এই Gulf-Streamএর জন্যই ইউরোপের পশ্চিম উপকূলের

অনেক স্থান বেশ গরম। উত্তর আটলান্টিক দিয়ে যেতে যেতে এক স্থানে এই অত্যুষ্ণ জল-স্রোতের সঙ্গে তুষার শীতল Labrador স্রোতের দেখা হয়। সাক্ষাৎ হওয়ার পরই কিন্তু উভয় স্রোত আপন আপন গন্তব্য পথে চলে যায়। এ রকম শোনা যায় যে কখন কখন একটা সমুদ্রগামী জাহাজের সামনের ভাগটা থাকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে, আর পিছনটা থাকে উত্তপ্ত Gulf Stream এর মধ্যে। আটলান্টিকে যেমন নানা জলপ্রবাহ ও জলস্রোত আছে যেখানে তরঙ্গ বই অন্য কোন জলের গতি নেই। নক্সাতে এই জায়গা গুলো দেখানো হয়েছে। তোমরা নজর করে দেখো।

আর একটা নক্সাও এই সঙ্গে দিচ্ছি যার থেকে তোমরা বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে জলপ্রবাহের সম্বন্ধ অনেকটা বুঝতে পারবে।

এ পর্য্যন্ত যে সব স্রোত বা প্রবাহের কথা বললাম সে গুলো উপর জলের। গভীর জলেও নানা রকম স্রোত আছে যার কারণ আজও স্পষ্টভাবে

সমুদ্রের জলের স্রোত
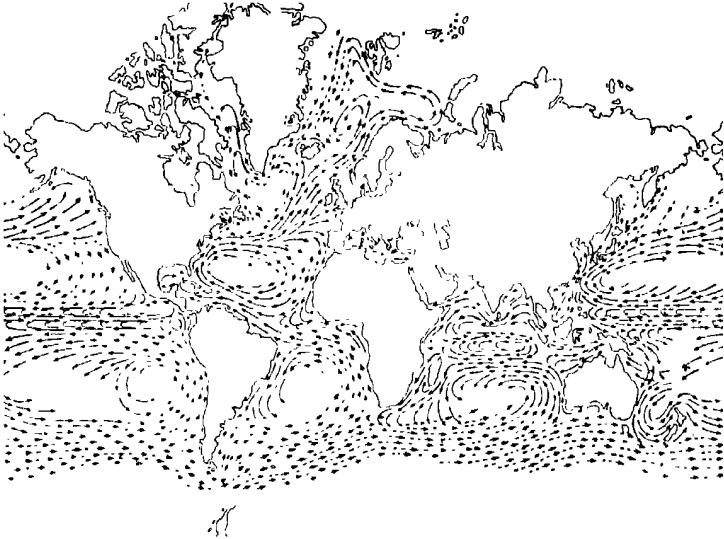
আছে, প্রশান্ত মহাসাগরেও তেমনই আছে। এই মহাসাগরের বিখ্যাত উষ্ণ-স্রোতের নাম কুরোসিটো বা জাপানী স্রোত। আর বেশী স্রোতের বা প্রবাহের নাম বলে তোমাদের ধাঁধা লাগাব না। পৃথিবীর যে ম্যাপ দিচ্ছি সেটা ভাল করে দেখো। সমুদ্রের স্রোতগুলো আরম্ভে যত সরু থাকে পরে তত থাকে না। ক্রমশঃ অনেকটা চারিয়ে পড়ে, দুই ভাগও হয়ে যায়। এই স্রোত ও প্রবাহ সমূহের মাঝে মাঝে এমন সব জায়গা নির্দ্ধারিত হয় নেই। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলি। সময় সময় সমুদ্রের মাঝে দেখা যায় যে একটা পরিষ্কার মিঠে জলের স্রোত তলা থেকে উঠে আসছে। চারিদিকে নোনা জল, মাঝখানে মিঠে জল, দেখে নাবিকদের তাক্ লেগে যেত। তারা মনে করত, এ এক ভৌতিক কাণ্ড। আসলে কিন্তু এ গুলো সমুদ্রতলের প্রস্রবণ বই কিছু নয়। মিঠে জল হালকা, উপরন্তু পেছনে আছে প্রস্রবণের বেগ, তাই উপরে ভেসে ওঠে।

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছা করে
নদীটির ঐ পারে,—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকা
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে,
জাল টেনে নেয় জেলে,
গরু-মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধ্যা হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে,
শুধু রাত্রি দুপুরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউ ডাঙাটার পরে।
মা, যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।
শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মত।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখি যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর
মাণিকযোড়ের ঘর
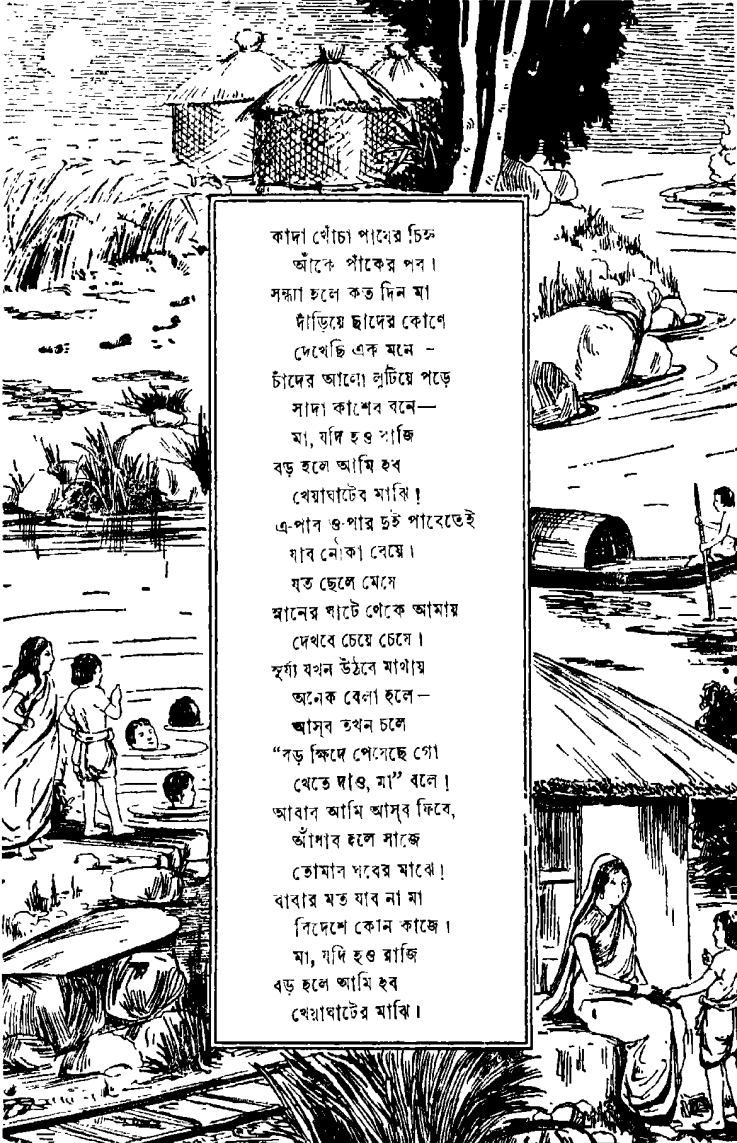
কাদা খোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।
সন্ধ্যা হলে কত দিন মা
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি এক মনে —
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে—
মা, যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি!
এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকা বেয়ে।
যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে—
আসব তখন চলে
“বড় ক্ষিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও, মা” বলে!
আবার আমি আসব ফিরে,
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে!
বাবার মত যাব না মা
বিদেশে কোন কাজে।
মা, যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

আমরা যেমন চোখ দিয়া দেখি তেমনি সব প্রাণীরাও দেখে। কিন্তু এখানে একটা কথা, আমাদের চক্ষু দিয়া যে ভাবে কোন জিনিষ দেখিয়া থাকি, মশা, মাছি, পাখী, টিকটিকি, গিরগিটি, মাছ প্রভৃতি কিও সেই ভাবে দেখিয়া থাকে? তাহাদের চোখেও কি আমাদের মত দেখিবার জিনিষ প্রতিফলিত হয়? তাহা নহে। কেন না মানুষের চোখের গঠনের সহিত জীবজন্তুদের চোখের গঠনের অনেক তফাৎ। তোমরা দেয়ালের সামনে দেখিতে পাও একটা টিকটিকি কিরূপ ভাবে দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠে এবং পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়।—বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় প্রাণীদের চোখে আমাদের দেখা জিনিষ কিরূপ দেখায়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর রংবেরঙের ছবি আঁকিয়াছেন, সেগুলি প্রতিলিপি হইতে দেখিতে পাইবে।
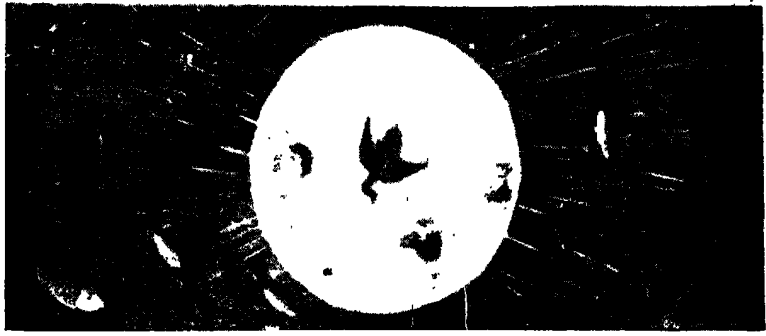
টিকটিকি ঠিক্ ঠিক্
দেখে আর ভাবে
সবাই বুঝি তার মত
নীচু দিকে নাবে!
ঘর বাড়ী কাঠ খড়
সবি নেবে যায়
ঘাড নেড়ে খালি তাই
করে হায়! হায়!

বিশ্বসাহিত্য

আজব দেশে এ্যালিস

২১৯৫ পৃষ্ঠার পর

এইবার ইঁদুরটা একটু নরম সুরে এ্যালিসকে বলিল, "আচ্ছা চল, আগে পারে যাওয়া যাক্। তারপরে আমি তোমাকে বলবো কেন আমি কুকুর ও বেড়ালদের দুচোখে দেখ্‌তে পারি না।"

তারপর ইঁদুরটার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া এ্যালিস্ ঘরের যেদিকটা শুকনা ছিল, সেই দিকে

ইঁদুরটা সাঁতার কাটিয়া এ্যালিসের শুকনা ঘরের দিকে গিয়া উঠিল
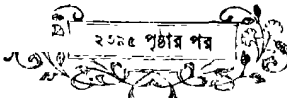
গিয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা সেই শুকনা ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখিল যে, সেখানে বহু পশুপক্ষী ভীড় করিয়া জমা হইয়াছে। প্রত্যেকের গায়ের পালক ও লোম একেবারে ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছিল। কারণ তাহাদেরও ঘরের অপর পার হইতে, সেই লোণা চোখের জলের পুকুর পাড়ি দিয়া তবে এ্যালিসেরা যে পারে ছিল, সেই পারে আসিতে হইয়াছিল।

ভিজিয়া-যাওয়া পশু-পক্ষীদের বুদ্ধি-শুদ্ধি যে লোপ পাইয়াছিল তাহা এ্যালিস্ খুব সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল"। তাহাদের বোকার মত কথাবার্ত্তা শুনিয়া সকলেই ভিজিয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ সব জন্তু-জানোয়ারদের প্রথম দুর্ভাবনা হইল যে,

কি করিয়া তাহাদের গায়ের জল শুকাইবে; এবং সেই সম্বন্ধেই তাহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছিল। উহাদের মধ্যে ইঁদুরটাকেই সব চেয়ে হোম্‌রা-চোম্‌রা বলিয়া মনে হইল। সেই প্রথমে চোখ পাকাইয়া গাল ফুলাইয়া মহাবিজ্ঞের মত ইতিহাসের সব চেয়ে নীরস গল্পগুলি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যাইতে লাগিল। কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের নীরস গল্প শুনিলে তাহাদের সকলের গায়ের জল শুকাইবে। কিন্তু ইহাতে

ডোডো পাখী প্রস্তাব করিল—এস আমরা খানিক দৌড়াদৌড়ি করি

বিশেষ কোনই সুবিধা হয় নাই এবং ইঁদুরের গল্প শুনিয়া এ্যালিস্ দেখিল যে, তাহার জামা-কাপড় এতটুকু শুকাইল না।

তখন চশমা চোখে ডোডো পাখী প্রস্তাব করিল—"এস আমরা খানিক দৌড়াদৌড়ি করি। তাহা হইলে আমাদের গায়ের জল শুকাইবে নিশ্চয়।"

এই কথা বলিয়া তাহারা সবাই মিলিয়া একটা দৌড়ের প্রতিযোগিতা দিল। কিন্তু তাও আবার অতি অদ্ভুত। যাহার যখন ইচ্ছা তখন সে দৌড় সুরু করিল এবং যে যেখানে খুসী দৌড় শেষ করিল। শেষকালে যখন কথা উঠিল যে, কে প্রথম হইয়াছে তখন ডোডো পাখী খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "সবাই প্রথম হইয়াছে।" এ্যালিস্ মনে মনে ভাবিল, "অবাক কাণ্ড! সবাই আবার কেমন করিয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়?" যাহা হউক, ডোডো পাখীর সিদ্ধান্ত যখন অন্য সব পশু-পাখীরা মানিয়া লইল, তখন এ্যালিস্ও তাহা স্বীকার করিল।

দৌড়াদৌড়ি করিয়াও এ্যালিস্ বা সেই পশু-পাখীগুলার গায়ের জল শুকায় নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের গায়ের জল শুকাইয়াছিল তাহাদের গায়েই।

এইবার তাহাদের মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। তাহারা বলিয়া উঠিল, "প্রাইজ?" প্রত্যেককে প্রথম পুরস্কার দেওয়া সেত কম কথা নয়। যাই হোক এ্যালিসের কাছে কয়েকটা মিষ্টি ছিল। সে পুরস্কার হিসাবে ঐ মিষ্টি সকলকে ভাগ করিয়া দিল। সকলেই মহানন্দে ঐ মিষ্টি খাইতে লাগিল।

তাহারা যখন দিব্যি মজা করিয়া খাবার খাইতে ব্যস্ত, তখন এ্যালিস্ দেখিল যে, সেই সাদা খরগোশ সাহেবটি এদিক ওদিক চাহিয়া কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে আসিতেছে। খরগোশটিকে দেখিয়াই বোঝা গেল যে, সে মহা চিন্তাতেই পড়িয়াছে এবং নিজের মনে বক্‌বক্ করিয়া বলিতেছিল, "হায় আমার পোড়া কপাল! কোথায় যে আমি আমার দস্তানা জোড়া আর পাখাটা ফেললাম কে জানে? সেগুলো খুঁজে না পেলে মহারাণী আমার উপর যা চ'টে যাবেন, তাতো বুঝতেই পারছি। চাই কি, এতে তিনি আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন।" এই রকম সব নানান কথা বলিতে বলিতে খরগোশটা চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার নজর পড়িল এ্যালিসের উপর। এ্যালিস্‌কে দেখিয়াই খরগোশটা তাহাকে তাহার ঝি বলিয়া ভুল করিয়া বলিয়া উঠিল, এই মেরী! এখানে তুই কি করছিস্। যা দিকিন্, বাড়ী গিয়ে আমার দস্তানা জোড়া আর পাখাটা খুঁজে নিয়ে

আয়।” এ্যালিস বুঝিল যে, খরগোশ তাহাকে তাহার ঝি বলিয়া মনে করিয়াছে। ইহাতে সে চটিল না মোটেই। বরং তাহার খুব মজা লাগিল এবং হাসি পাইল। যাহা হউক, সে হাসি চাপিয়া মনে মনে ভাবিল, “যাক্! বেচারীকে ওর দস্তানা জোড়া আর পাখাখানা এনে দেওয়া যাক্।” এই কথা ভাবিয়া এবার সে যেই একটা দরজার দিকে আগাইয়া গেল, অমনি দেখিল যে, সেই দরজাটা খোলাই আছে এবং দরজার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে **“সাদা খরগোশ”**।

এ্যালিস সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পাখা আর দস্তানা লইয়া বাহির হইয়া আসে ত হয়। তাহা না করিয়া সে উৎসুক হইয়া ঘরের এ-জিনিষ ও-জিনিষ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল। টেবিলের উপর একটা সুন্দর রঙীন শিবাপের মত পানীয় ছিল। এ্যালিস উহা পান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু যেই না সেই জিনিষটা খাওয়া আর যায় কোথা। সঙ্গে সঙ্গে এ্যালিস এমনি বড় হইতে আরম্ভ করিল যে, খরগোশের বাড়ীর ছাদ ফুড়িয়া তাহার মাথা উপরের দিকে প্রায় উঠিবার উপক্রম। ইহা দেখিয়া খরগোশেরও একেবারে চক্ষুস্থির। রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া খরগোশ তাহার এক টিকটিকি বন্ধুকে লইয়া এ্যালিসের দিকে ঢিল্ ছুড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু মজা এই যে ঢিল-পাটকেলগুলো ভিতরে যায় আর নানান্ রকমের মিষ্টি মিষ্টি মিঠাই হইয়া যায়। ইহাতে এ্যালিসের আনন্দ দেখে কে। সে টপাটপ্ উহা তুলিয়া তুলিয়া খাইতে লাগিল।

ঐ মিষ্টিগুলা খাইয়া এ্যালিসের কিন্তু উপকার হইল খুবই। সে এইবার ক্রমশঃ ছোট হইতে লাগিল। তারপর এ্যালিস যখন দেখিল যে, সে দরজা দিয়া গলিয়া যাইবার মত ছোট হইয়াছে, তখন ঐ ঘর হইতে এক দৌড়ে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহির হইয়াই সে গিয়া পড়িল একেবারে সেই রেগে-ওঠা খরগোশ, টিকটিকি ও অন্যান্য পশু পাখীদের মাঝখানে। তাহারা এমনিই রাগিয়া গিয়াছিল যে, এ্যালিসকে সামনে পাইয়া খুব একচোট উত্তম মধ্যম দিবার জন্য তাহাকে করিল তাড়া। এ্যালিসও প্রাণের ভয়ে একেবারে উঠিয়া পড়িয়া দিল ছুট। তারপর কাছেই একটা খুব ঘন বন ছিল, তাড়াতাড়ি তাহার মধ্যে পলাইয়া তবে এ্যালিস তাহার প্রাণ বাঁচাইল।

বনের মধ্যে এ্যালিস্

বনের মধ্যে ঢুকিয়া এ্যালিস মহা চিন্তাতেই পড়িল। কি করিয়া সে তাহার পূর্ব্বেকার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, সেই ভাবনাতে বেচারী একেবারে মুষড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, সেই রাক্ষুসে মিঠাইগুলো খাইয়া, তখন তাহার দৈর্ঘ্য এক বিঘতের বেশী ত নয়ই—তাহার কমও হইতে পারে।

নানান উপায় চিন্তা করিতে করিতে এ্যালিস বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। শেষকালে একটা ব্যাঙের ছাতার উপর তাহার নজর পড়িল। এ্যালিস দেখিল যে, ঐ ব্যাঙের ছাতাটাও তাহার চেয়ে লম্বা। সেইজন্য সে ডিঙি মারিয়া ঐ ছাতার উপরটা দেখিতে গেল। দেখিতে গিয়াই তাহার নজরে পড়িল একটা নীল রঙের শুবরে পোকা। শুবরে পোকাটা দিব্যি আরামে ঐ ব্যাঙের ছাতার উপরে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া শুইয়া একটা গুড়্গুড়ির নল মুখে দিয়া তামাক টানিতেছিল। আর ঝিমাইতেছিল।

এ্যালিস ঐ শুবরে পোকাটার কাছেই পরামর্শ চাহিল যে, কি করিয়া সে আবার বড় হইবে? নেশার ঘোরে শুবরে পোকাটা ত প্রথমে ঢুলুঢুলু চোখে একবার এ্যালিসের দিকে চাহিয়া তারপর নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই আবার চোখ বুজিল। কিন্তু এ্যালিস পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর সে রাগে ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, “তুমি অবাক্ করলে যে। তিন ইঞ্চি ঢেঙা কি কম হ'ল?

“এ্যালিস বুঝিল যে ঐ শুবরে পোকাটা নিজে তিন ইঞ্চির বেশী লম্বা নয়, তাই ঐরকম কথা বলিল। সেইজন্য এ্যালিস না দমিয়া বা ভয় না পাইয়া ফের বলিল, “কিন্তু তিন ইঞ্চি লম্বা হওয়াটা তো আমার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কাজে কাজেই আমাকে

ব'লে দিন কি করে আমি আবার লম্বা হতে পারবো।"

এবারে এ্যালিসের কথা শুনিয়া গুব্‌রে পোকাটা চোখ তাকাইয়া চাহিয়াও দেখিল না। কারণ তখন সে খুব জোরে হুঁকায় একটা টান দিতেছিল।

গুব্‌রে পোকাটা তাহার মুখের ভিতরকার একরাশ ধোঁয়া নাকমুখ দিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে খানিক চায় নাই। সেইজন্য এবারে সে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া জড়সড় হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। কারণ তাহার আশা এই যে, সে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে হয়ত একটা উপায় বেশ খুশি হইয়াই বলিয়া দিবে।

প্রায় মিনিট খানেক কি মিনিট দু'য়েক পরে সেই গুবরে পোকাটার তন্দ্রা ভাঙিল। সে তার মুখ হইতে হুঁকার নলটা নামাইয়া বার দু'য়েক হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর ধীরে ধীরে সেই হুঁকাটা হাতে করিয়া ব্যাঙের ছাতার উপর হইতে নামিয়া দিব্বি জমীদারী চালে ধীরে ধীরে ঘাসের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে এ্যালিসকে বলিয়া গেল, "ঐ ব্যাঙের ছাতাটার একদিকটা খেলে তুমি আবার লম্বা হবে, আর অপর

গুবরে পোকা গুড়্‌গুড়ির নল মুখে দিয়া তামাক টানিতেছিল

পরে দিব্বি উদাসীনভাবে বিজ্ঞের মত উত্তর দিল, "শীঘ্রই তুমি এতে অভ্যস্ত হ'য়ে যাবে।" এই কথা বলিয়া গুবরে পোকাটা আবার তাহার হুঁকা টানাতে মনোযোগ দিল ও চোখ বুজিয়া দিব্বি আরামে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

এ্যালিস বারবার গুব্‌রে পোকাটাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাহার দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে

দিকটা খেলে তুমি বেঁটে হ'তে থাকবে।" এই কথা বলিয়া শুঁয়ো পোকাটা সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এ্যালিস পড়িল মহা মুস্কিলে, ব্যাঙের ছাতা তো গোল। তার আবার এদিক ওদিক কি? যাহাই হউক ব্যাঙের ছাতাটার এপাশ ওপাশ দুইদিক হইতে একটু একটু করিয়া খাইয়া সে পরখ করিতে লাগিল কোন্‌টায় সে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় পৌছাইবে। প্রথমে সে যেখান হইতে ছিঁড়িয়া খাইল, তাহাতে কেবলই ছোটই হইয়া যাইতে লাগিল। শেষে সে দেখিল যে, সে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় আর কি। তখন ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি তাহারই অপর দিকটা ছিঁড়িয়া খাইয়া আবার লম্বা হইতে লাগিল। এইরকমে একবার এপাশের আর একবার ওপাশের ছাতা ছিঁড়িয়া খাইয়া খাইয়া এ্যালিস্ তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া এ্যালিস বনের মধ্যে হাঁটিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া'ই এ্যালিসের চোখে পড়িল একখানা বাড়ী। বাড়ীখানা ঐ দেশের ছোট রাণীর। বাড়ীর মধ্যে উঁকি মারিয়া এ্যালিস্ দেখিল যে, বাড়ীর উঠানে ছোটরাণীর সহিত তাহার বামনীর ভীষণ মারামারি লাগিয়া গিয়াছে। বামনীটা তাহার হাতের কাছে যাহা কিছু পাইতেছিল, তাহা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ছোটরাণীকে মারিয়া একেবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া এ্যালিস্ সেই বাড়ীখানার উঠানের একপাশে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে গেল। রাণীর কোলে তাঁহার শিশুটি ছিল। সেজন্য তাঁহার মারামারি করিতে ভয়ানক অসুবিধা হইতেছিল। তাই এ্যালিসকে দেখিয়াই তিনি সেই শিশুটিকে ছুঁড়িয়া এ্যালিসের কোলে ফেলিয়া দিয়া মারামারি আরম্ভ করিলেন। এ্যালিস শিশুটিকে লুফিয়া লইয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু মারামারির অবস্থা ক্রমশই বেগতিক হইয়া উঠিতে দেখিয়া এ্যালিস সেখান হইতে ফস্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

এ্যালিসের কোলে সেই শিশুটি ছিল। কিন্তু কি মজা! যেই সে শিশুটিকে লইয়া বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছে, অমনি সেটা একটা শূয়র হইয়া গেল। ছেলেটাকে এভাবে হঠাৎ শূয়র হইয়া যাইতে দেখিয়া এ্যালিসের গা ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া উঠিল, সে ভয়ে আৎকাইয়া উঠিয়া, "ও মা গো!" বলিয়া সেটাকে ধপ্ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। সেটাও অমনি ছাড়া পাইয়া এক লাফ মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে গিয়া গা-ঢাকা দিল।

এ্যালিস আবার হাঁটিয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া এবারে সে দেখিল যে, একটা প্রকাণ্ড গাছের

বিড়ালটা দাঁতমুখ খিচাইয়া ল্যাজ দুলাইয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল

ডালের উপরে একটা বিড়াল বসিয়া আছে। বিড়ালটা তাহাকে দেখিয়াই দাঁতমুখ খিচাইয়া গোঁফ পাকাইয়া ল্যাজ দুলাইয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল। এ্যালিস বুঝিল যে, উহার সহিত বিনীতভাবে কথা না বলিলে রক্ষা নাই। হয়ত বা

কামড়াইয়াই দিবে। সেইজন্য খুব নম্রভাবে এ্যালিস বলিল, "পুষি ভাই! এই বনের কোন্ দিকে কে কে থাকে আমাকে ব'লে দিতে পার?" বিড়ালটা খুশী হইয়া একগাল হাসিয়া তাহার ডান থাবাটা উঠাইয়া একদিকে ঘুরাইয়া বলিল, "ঐদিকে থাকে একটা কালো খরগোশ।" তারপর বাঁ থাবা ঘুরাইয়া বলিল, ঐদিকে থাকে একটা টুপিওয়ালা। কিন্তু দুটোই পাগল।"

এ্যালিসের ত চক্ষুস্থির। কিন্তু কি আর করে। অনেক ভাবিয়া সে ভয়ে ভয়ে টুপিওয়ালার বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

পাগলা খরগোশদের চা-পার্টিতে এ্যালিস

টুপিওয়ালার বাড়ীর সাম্নে একটা গাছের নীচে একখানা টেবিল পাতা ছিল। ঐ টেবিলের ধারে

এই, এই এখান থেকে ভাগো—এখানে জায়গা নেই

বসিয়া কালো খরগোশ ও টুপিওয়ালা দু'জনেই মহানন্দে চা খাইতেছিল। তাহাদের দুইজনের মধ্যখানে কিন্তু একটা কাঠবিড়ালী দিব্যি অকাতরে ঘুম দিতেছিল, আর তাহার দুইপাশে বসিয়া খরগোশ ও টুপিওয়ালাতে মিলিয়া নানান্ খোস্ গল্প করিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহারা গল্প করিতে করিতে ঐ কাঠবিড়ালীটার উপর তাকিয়ার মত ঠেস দিয়াও বসিতেছিল। কিন্তু তাহাতে উহার কোনও হুঁস-পব্ব ছিল না। এ্যালিস ত হাঁটিতে হাঁটিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু এ্যালিসকে সেদিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা মহা কলরব করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই, এখান থেকে ভাগো। এখানে জায়গা নেই।"

তাহাদের কথায় এ্যালিস মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "প্রকাণ্ড টেবিল আছে তোমাদের। তার একপাশে আমার ঢের জায়গা হবে।" এই কথা বলিয়া সে টেবিলের এক মাথায় গিয়া বসিয়া পড়িল।

বনের মধ্যেকার বিড়ালটা এ্যালিসকে পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, উহারা দুইজনেই পাগল, তাহা এ্যালিস সেখানে অল্পক্ষণ বসিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রথমতঃ খরগোশটা আর টুপিওয়ালা আবোল-তাবোল বকিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ, সেই কালো খরগোশটা মাঝে মাঝে তাহার ওয়েষ্ট-কোটের পকেট হইতে তাহার চেনশুদ্ধ ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখিতেছিল। আর সেটা ঠিকমত চলিতেছে না বলিয়া সেটাকে গরম চায়ের কাপের মধ্যে ডুবাইয়া লইয়া বারবার পকেটে রাখিতেছিল। তারপর, তাহারা সেই ঘুম-কাতুরে কাঠবিড়ালীটাকে একবার একটা গল্প বলিতে বলিয়াছিল। কিন্তু সে পারিবে কেন গল্প বলিতে। বারে বারেই সে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। ইহাতে চটিয়া গিয়া তাহারা ঐ কাঠবিড়ালীটাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া একবার চায়ের কাপের চায়ের মধ্যে চুবাইতে গিয়াছিল। বেচারী কাঠবিড়ালী। সে বহুকষ্টে উহাদের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল।

এ্যালিস যখন দেখিল যে, খরগোশটা আর টুপিওয়ালাটা বাস্তবিকই বদ্ধ-পাগল, তখন সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। তাহার ভয় ছিল—পাছে তাহারা যাইবার সময়ে তাহাকে ডাকে অথবা তাড়া করে। তাই সে পিছুদিকে চাহিতে

চাহিতে আগাইতেছিল। কিন্তু উহারা তাহার চলিয়া যাওয়া লক্ষ্যও করিল না।

তাসের দেশে এ্যালিস্

এ্যালিস এবারে হাটিতে হাটিতে গিয়া পড়িল একটা সুদৃশ্য বাগানের মধ্যে। বাগানটি ঐ আজব-দেশের মহারাণীর। সে দেশের রাজা, রাণী ও সৈন্যসামন্ত সবই তাসের। এ্যালিস্ এই আবার আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিল।

খেলার না ছিল নিয়ম-কানুন, না ছিল বল বা গোলপোষ্ট। বলের বদলে তাঁহারা কি একটা যেন গোলাকার জন্তুকে বল করিয়া খেলিতেছিলেন। তাহাতে মজা হইতেছিল এই যে, বলে লাথি না লাগিতেই সেটা গুটি গুটি এদিক ওদিক আসা-যাওয়া করিতেছিল। প্রত্যেক দিকে দুইটা করিয়া তাসের গোলাম দাঁড়াইয়া থাকিয়া খেলার গোল-পোষ্টের কাজ করিতেছিল। ঐ অদ্ভুত খেলাটা খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ একরকম চলিল। কিন্তু

বেচারা কাঠবিড়ালী

ঐ দেশের মহারাণী ছিলেন হরতনের রাণী। মহারাণীটি তাসের হইলে কি হয়। তাঁহার মেজাজটা ছিল কিছু কড়া রকমের আর এ্যালিস্ শুনিল যে তিনি নাকি একটুতেই রাগিয়া গিয়া লোকের মাথা কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দেন।

এ্যালিস্ যখন ঐ বাগানটার মধ্যে গিয়া পৌঁছিল, তখন মহারাণী ছোটরাণীর সহিত বাগানের মধ্যে বল খেলিতেছিলেন। সে এক অদ্ভুত খেলা। ঐ রকম এলোমেলো খেলায় যা ফল হয় তাহা হইল অবিলম্বেই। বল খেলার নিয়ম-কানুন ও সিদ্ধান্ত লইয়া দুই রাণীর মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হইয়া গেল। শেষে মহারাণী রাগিয়া ছোটরাণীর মাথাটা কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। সেখানেই খেলা সাঙ্গ হইল।

এইবার এ্যালিসের উপর নজর পড়িল মহারাণীর। তিনিই একজন অনুচর দিলেন

এ্যালিসের সঙ্গে এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন, "এই মেয়েটিকে আমাদের দেশ দেখিয়ে দাও ত।"

সেই অনুচরটা সে দেশের কয়েকটা অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তুর সহিত দেখা করাইয়া এ্যালিস্‌কে লইয়া গিয়া হাজির করিল একেবারে রাজসভাতে। শোনা গেল

এই মেয়েটাকে আমাদের দেশ দেখিয়ে দাও ত'

যে, হরতনের গোলাম নাকি মহারাণীর খানিকটা আচার চুরি করিয়াছিল, তাই সেদিন তাহার বিচার হইবে। এ্যালিস্ ভাবিল, "মজা মন্দ নয়। দেখা যাক্ না আজব দেশের পাগ্‌লাদের বিচার।"

রাজসভা তখন লোকে লোকারণ্য। সব পশু-পাখী এবং নানা রঙের সমস্ত তাসেরাই ঐ সভাতে উপস্থিত ছিল। রাজা আর তাঁহার মহারাণী একটা উঁচু সিংহাসনের উপর তাহাদের ভাঁটার মত চোখ পাকাইয়া বসিয়াছিলেন। একপাশে কাঠগড়ার উপরে আসামী হরতনের গোলামটা শিকল দিয়া বাঁধা ছিল, আর তাহার দুইপাশে দুই অস্ত্রধারী সৈন্য। সেই সাদা খরগোশটা রাজামহাশয়ের নিকটে একহাতে একটা শিঙা এবং অপরহাতে একতাড়া কাগজ লইয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজসভার মাঝখানে একখানা টেবিলের উপরে সেই চোরাই মাল আচারের শিশিটা রাখা ছিল। উহা দেখিয়া এ্যালিসের জিভে রীতিমত জল আসিল। এমনি সময়ে রাজার হুকুম পাইয়া সেই সাদা খরগোশটা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আদালতে সবাই চুপ করুন। বিচার আরম্ভ হইবে এইবার।"

রাজামশাই তখন সাদা খরগোশকে বলিলেন, "তোমার অভিযোগ প'ড়ে শোনাও দেখি এইবার।"

হুকুম পাইয়া খরগোশ বার তিনেক তাহার শিঙায় ফুঁ দিল, তারপর একটা পাকানো কাগজের মোড়ক খুলিয়া হরতনের গোলামের বিরুদ্ধে রাণীর অভিযোগ পড়িয়া শুনাইল।

এইবার বিচারের পালা। রাজা হুকুম দিলেন সাক্ষী ডাক। খরগোশ ডাকিল, "প্রথম সাক্ষী হাজির।"

আসামী হরতনের গোলামটাকে ধরিয়া নিল

প্রথম সাক্ষী সেই টুপিওয়ালা পাগল। সে ত তাহার একহাতে সেই চায়ের কাপ আর অপরহাতে মাখন-মাখানো এক টুক্‌রা রুটি লইয়াই একেবারে আদালতে গিয়া হাজির। আদালতের মধ্যে ঢুকিয়াই সে বুঝিল যে, ঐ ভাবে রুটি ও চা লইয়া

যাওয়া তাহার অন্যায় হইয়াছে। তাই সে দু-একবার ঢোক গিলিয়া বলিল, "মহারাজ আমাকে মাপ করতে আদেশ হয়। কারণ আমি এই চায়ের কাপ ও রুটির টুকরোটা হাতে নিয়েই এখানে উপস্থিত হয়েছি। আর আমারই বা দোষ কি বলুন? আমি খাচ্ছিলাম চা, আর বলা নেই, কওয়া নেই এবং আমাকে ধ'রে নিয়ে এল, বললে 'সাক্ষী দিতে হবে'।"

মহারাজ বোধ হয় তার এই অপরাধ মার্জনা করিয়াছিলেন। কারণ এ সম্বন্ধে তিনি আর কোন কথাই বলেন নাই। বরং তিনি রাগিয়া উঠিয়া কর্কশ-স্বরে বলিলেন, "এই! তুমি সম্মানটা পর্যন্ত দেখাতে জানো না। তোমার টুপি খুলে ফেল শীঘ্র।"

টুপিওয়ালা উত্তর দিল, "মহারাজ, ও টুপি আমার নয়।"

রাজা বলিলেন, "তবে কার। চোরাই মাল বুঝি? তাহলে ত তোমার জেল দিতে হচ্ছে।"

টুপিওয়ালা বলিল, "না মহারাজ! আমি টুপি বিক্রয় করি। যতক্ষণ না একটা টুপি বিক্রয় হয়, ততক্ষণ সেটা আমার মাথাতেই থাকে।"

রাজা আবার বলিলেন, "বেশ। এবার তুমি বল - এই চুরি সম্বন্ধে তুমি কি জানো।"

রাজামহাশয়ের আশ্বাস পাইয়াও টুপিওয়ালার ভয় দূর হয় নাই। একেই সে বেচারী পাগল, তাহার উপর আবার হঠাৎ উহার চোখ পড়িয়া গেল মহারাণীর ড্যাবা ড্যাবা গোল গোল রক্তবর্ণ চোখের দিকে। সে দেখিল যে তাহার অদ্ভুত কথাবার্তা শুনিয়া মহারাণীর চোখ রাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তিনি তাহার চশমা চোখে ধরিয়া ভাল করিয়া টুপিওয়ালার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই ব্যাপার না দেখিয়া টুপিওয়ালা গেল ভীষণ ভড়কাইয়া। সে ঘাবড়াইয়া গিয়া একেবারে যা তা আবোল তাবোল বকিতে ত লাগিলই, তাহার উপর রুটিতে কামড় দিতে গিয়া ভুল করিয়া একবার চায়ের কাপের খানিকটা কাচই কামড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাতে তাহার দাঁতে বেজায় লাগিল, এবং "উহু উহু" করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। মহারাজ যখন টুপিওয়ালার এইরকম সঙ্গীন অবস্থা দেখিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "দাও এইটাকে বিদায় ক'রে।"

টুপিওয়ালা ত ছাড়া পাইয়া তাহার জুতা-ছাতা প্রভৃতি আদালতে ফেলিয়া রাখিয়াই দিল দৌড়। মহারাণী কিন্তু টুপিওয়ালার বাড়-বাড়ন্ত দেখিয়া ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি উহাকে দৌড়াইয়া পালাইয়া যাইতে দেখিয়া অনুচরদের হুকুম দিলেন, "উহার মাথাটা কাটিয়া দুখণ্ড করিয়া ফেল। কিন্তু অনুচরেরা তাহাকে ধরিবে কি। সে একদণ্ডে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

রাজামহাশয় আবার হুকুম দিলেন, ডাক এর পরের সাক্ষীকে।" উৎসুক হইয়া এ্যালিস্ এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, কে পরের সাক্ষী আছে। তারপর খরগোশটা যখন "এ্যালিস্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল তখন এ্যালিস্ চমকাইয়া উঠিয়া অবাক হইয়া ভাবিল—"এরা অবাক করলে দেখছি। আমি কি চুরি-ডাকাতি দেখেছি যে সাক্ষী দেবো? যাহাই হউক, রাজার হুকুম। মানিতেই হইবে।

হতভম্ব হইয়া তাড়াতাড়ি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিতে গিয়া এ্যালিসের পায়ের ধাক্কা লাগিয়া জুরীদের বেঞ্চিখানা গেল উল্টাইয়া। ফলে সেই বেঞ্চির সব পশুপক্ষী পা হুড়মুড় করিয়া মেঝেতে পড়িয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

অপ্রতিভ হইয়া এ্যালিস্ বেঞ্চিখানা ঠিক করিয়া উহাদের ধরিয়া ধরিয়া ফের ঠিক করিয়া বসাইয়া দিল এবং রাজামহাশয় ও জুরীদের কাছে ক্ষমা চাহিল।

এইবার আরম্ভ হইল মোকদ্দমার জিজ্ঞাসা করবার পালা। রাজা এ্যালিস্কে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই মোকদ্দমা কি জান?'

এ্যালিস্ উত্তর দিল, "কিছুই না?'

রাজা বলিলেন, "কিছুই না?"

এ্যালিস্ আবার বলিল, "না।"

মহারাজ জুরীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা লিখে নিন।" এটা খুব দরকারী কথা বটে। মামলার রায় দেওয়াতে এটা আমাদের খুব সাহায্য করবে।"

রাজার কথা শুনিয়া খরগোশটা চোখ কপালে

তুলিয়া বলিল, "মহারাজ। সাক্ষীর এই কথাগুলো দরকারী না বাজে কথা ?"

রাজা বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বাজে কথাই ত বললাম।" তারপর সহসা আইনের বই পড়িয়া রাজামহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "যাহারা একমাইলের বেশী ঢেঙা, তাহারা আদালতে থাকিতে পারিবে না।"

ইহাতে সকলেই এ্যালিসের দিকে চাহিল। এ্যালিস নিজেকে সমর্থন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল' "কই আমি ত একমাইল লম্বা নই।"

রাজামহাশয় বলিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি একমাইল লম্বা।"

রাণী আবার রাজার কথাটাকে একটু বাড়াইয়া গম্ভীরভাবে রাজার কথার পিঠে বলিয়া উঠিলেন, "প্রায় দু-মাইল।"

রাজা বলিলেন, "তুমি তাহ'লে এবার আদালত থেকে বিদায় হও।"

এ্যালিস কিন্তু দমিল না সে নির্ভয়ে ঠোঁট উল্টাইয়া তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল, "ভারী ভয় দেখাচ্ছেন আপনারা। আমি আপনাদের মোটেই ভয় করি না। কারণ আপনারা ত এক বাক্স তাস ছাড়া আর কিছুই নন।" এই কথা বলিতেই সব তাসগুলি দরদর্ করিয়া এ্যালিসকে শাস্তি দিবার জন্য এ্যালিসের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এ্যালিস দুই হাত দিয়া তাসগুলি সরাইয়া দিতে লাগিল।

এই অবস্থায় এ্যালিসের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল যে, সে তাহার দিদির কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এবং ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এতক্ষণ ধরিয়া চমৎকার স্বপ্নটি দেখিতেছিল।

তাহাকে জাগিতে দেখিয়া তাহার দিদি আদর করিয়া এ্যালিসকে বলিলেন, "বোনটি আমার। ঘুম ভাঙল ? চা খাবার সময় যে হ'য়ে এল। দেরী হ'লে চা জুড়িয়ে যাবে যে।"

তাসের দেশে এ্যালিস

এ্যালিস উঠিয়া তাহার স্বপ্নের কথা তাহার দিদিকে বলিল। তাহার দিদি অবাক্ হইয়া বলিলেন,—"বাঃ, ভারী মজার স্বপ্ন দেখেছ তো।"

সভাগৃহে শব্দ—বিজ্ঞান

২৩৭৫ পৃষ্ঠার পর
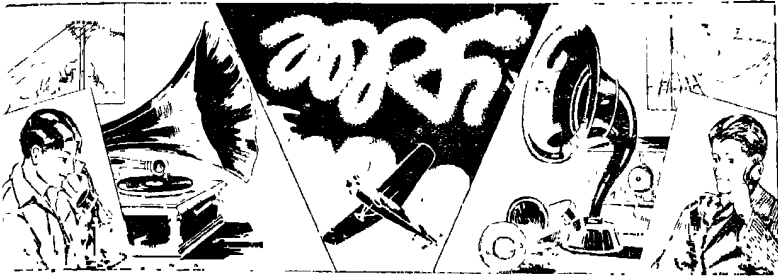
সবাক্ চিত্রের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে তোমাদের কাছে বলিয়াছি, এইবার শব্দ-বিজ্ঞানের অন্য একটা দিকের কথা বলিতেছি। তোমরা জান ভারতবর্ষে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির, মসজিদ এবং অট্টালিকা আছে। সেকালে ও একালে সমান ভাবেই ইহাদের ব্যবহার চলিতেছে, তবে যেগুলি প্রাচীন ও পরিত্যক্ত তাহাদের কথা বলিতেছি না।
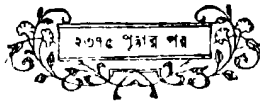
মন্দিরে মন্দিরে আরতির সময় ও পূজার সময় শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হয়, মসজিদে "আজানের" পবিত্র রব প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে—আর প্রাসাদ ও অট্টালিকায় দরবার, সভাসমিতি, মজলিস বসিত এবং এখনও যে না বসে তাহা নহে। এই যে মন্দির, মসজিদ, প্রাসাদ ও অট্টালিকার কথা বলিলাম, ইহাদের প্রত্যেকটির স্থাপত্যরীতি বিভিন্ন প্রকারের। প্রাচীন গ্রীক বা রোমসাম্রাজ্যে যে সকল স্থানে বক্তৃতা দেওয়া হইত সে সকল স্থান ছিল একেবারে মুক্ত—উদার অনন্ত আকাশের তলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে অবস্থিত। ঐ সকল স্থানে চারিদিক ঘিরিয়া গ্যালারি বা বসিবার মঞ্চ থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল অট্টালিকা তৈরী হইতেছে তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কোনও লক্ষ্য রাখা হয় না,—বক্তৃতার জন্য ব্যবহৃত হইবে, কি অভিনয়ের জন্য বা সবাক্‌চিত্রের জন্য, কি নৃত্যগীতের জন্য, কি কাছারী গৃহের জন্য উহার ব্যবহার হইবে, এবং সেইরূপ বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহার করিতে হইলে ঐরূপ অট্টালিকার আয়তন ও গঠনপ্রণালী দ্বারা কোনও সাহায্য পাওয়া যাইবে কিনা, এ সকল বিষয়ে বড় একটা বিবেচনা করা হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে সরকারি অট্টালিকার গম্বুজ রাখিয়া স্থাপত্যবিদ্যার পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সেই স্থানে বক্তৃতার জন্য ব্যবহার হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই গৃহ একেবারেই বক্তৃতা দিবার উপযোগী নহে। কেহ হয়ত বক্তৃতা দিতেছেন, তাহার কিছুই স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না।

মন্দিরে ওম্ শব্দ বা বম্ বম্ শব্দ করা হয়। দেবালয়ের গঠন প্রণালী সেকালে এইরূপ হইত যে তাহাতে ঐরূপ ধ্বনি বা স্তবস্তুতি করিলে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া কিছুকাল স্থায়ী হইত। ইহাতে মনের মধ্যে একপ্রকার ধর্ম্ম ভাবের সৃষ্টি হয়। মসজিদেও সে উদ্দেশে গম্বুজ রাখা হইয়া থাকে। তোমরা যদি কেহ আগ্রা গিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাজমহল দেখিয়াছ। তাজমহলের ভিতরে ঢুকিয়া কোনও শব্দ করিয়া দেখিয়াছ কি? যদি শব্দ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার কথাটি বেশ বুঝিতে পারিবে। একবার আমি ও আমার একজন মুসলমান বন্ধু আগ্রার তাজমহল দেখিতে

গিয়াছিলাম। আমার মুসলমান বন্ধু যেমনি উচ্চারণ করিলেন,—"আল্লাহো আকবর" অমনি প্রায় বারো সেকেণ্ডের ও উপর তাহা গুঞ্জরিয়া উঠিতে লাগিল—আল্—লা—হো—আ—ক—ব—র—অ—এইরূপ। আমি রবীন্দ্রনাথের তাজমহল হইতে যেমন আবৃত্তি করিতে লাগিলাম,—

হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্।
শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

অমনি তাহা গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে ও শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেখিয়াছি, উহা প্রায় সাত আট সেকেণ্ড পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে। এইরূপ ধ্বনির সুর যাহাতে কিছুকাল স্থায়ী হইয়া শব্দের তরঙ্গমালা পুলকে নৃত্য করিতে করিতে গুঞ্জরিত হইয়া কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল সৌধ-সমূহের গঠন-প্রণালী স্থির করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি সরকারি সভাগৃহ আছে। কিন্তু এমন একটিও নাই, যাহাতে চারিদিক হইতে বেশ সুস্পষ্ট ভাবে বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌয়ের সভামণ্ডপে সভ্যেরা গুঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পান না। এই সভাগৃহে গম্বুজ রহিয়াছে। স্থাপত্যসৌন্দর্য্য এবং গঠনপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে গম্বুজের মধ্যস্থলে কাচের আচ্ছাদন (চাঁদোয়া) দিলে অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি ইহার প্রতিকারের জন্য (Asbestos এর বা শব্দালেপন দেওয়া হইতেছে।

আগ্রার 'দেওয়ানিআম' ও কলিকাতার দেওয়ানি খাস প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এই সকল স্থানে দরবার বসিত ও বক্তৃতা দেওয়া হইত। সম্রাট—এই সবস্থানে বসিয়াই প্রজাদের আবেদন ও নিবেদন শুনিতেন। এইসকল প্রসাদের ছাদ সমতল। এবং গম্বুজবিহীন। খোলা বারান্দা। সেকালে সভাগৃহের শব্দবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা কাহারও ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু তৎকালীন এঞ্জিনিয়ারগণ এ সকল বিষয় বেশ বুঝিতেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যে সকল সবাক্‌চিত্রগৃহ বা হলঘর নির্ম্মিত হইতেছে, এখন সে সব স্থানে শ্রুতি সম্বন্ধে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইতেছে। কারণ সবাক্‌চিত্রের অভিনয়ের কথোপকথন, সঙ্গীত প্রভৃতি যদি সুস্পষ্ট ভাবে দর্শকবৃন্দ শুনিতে না পান, তাহা হইলে সেখানে লোকসমাগম হইবে কেন? বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিশেষজ্ঞ শব্দতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শব্দবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে ইচ্ছামত গুঞ্জন কমাইয়া যাহাতে শ্রুতি সম্বন্ধে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

সঙ্গীতশালা, সভাগৃহ ও নাট্যশালার প্রধান দোষ হইতেছে অধিক র গুঞ্জন। গুঞ্জনধ্বনি মাত্রাতিরিক্ত হয় তাহা হইলে বক্তৃতা ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায় না। গীতবাদ্য ও বাক্য গুঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া রূপান্তরিত হয় এবং শ্রুতিকটু শুনায়। গুঞ্জন যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে একের পর এক শব্দ উচ্চারণ করিলে, দুইটি একই সময়ে হলঘরে গুমরাইতে থাকে এবং শ্রোতাদের পক্ষে শব্দের বিভিন্নতা বুঝিতে অত্যন্ত কঠিন হয়। ধর একটি শব্দ (Syllable) উচ্চারণ করিতে ½ সেকেণ্ড সময় লাগে এবং পরে অন্য একটি পদ উচ্চারণ করা হইল। কিন্তু হলঘরে গুঞ্জন সময় এক সেকেণ্ড। এস্থলে দুইটি পদই একই সময়ে শুনাইবে এবং সেই হেতু শ্রোতাদিগের পক্ষে পদটি নির্ব্বাচন করা কঠিন হইবে।

গুঞ্জন কেন হয়?

সকলেই গুঞ্জনযুক্ত অট্টালিকার গুঞ্জন শুনিয়া থাকিবে। প্রত্যেক হলঘরেই ছোট কিংবা বড়, কিছু কিছু গুঞ্জন বর্ত্তমান থাকে। কোনও কোনও ঘরে ৩, ৪, সেকেণ্ড বা ২ সেকেণ্ড মাত্র গুঞ্জন হইতে থাকে। একটু কান পাতিয়া শুনিলেই ইহা অনায়াসে শুনিতে এবং বুঝিতে পারা যায়। গুঞ্জন কি কারণে হয় এবং কেমন করিয়া ইহার প্রতিকার করা যায় এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সর্ব্বপ্রথমে আচার্য্য স্যাবাইন্ (W. C. Sabine) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে

আরম্ভ করেন। তাঁহারই গবেষণার ফলে আজকাল আমরা হলঘরের "শব্দতত্ত্ব" (Sound Properties) সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যাবাইন আমেরিকা যুক্তরাজ্যে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। সেইখানেই বিজ্ঞানাগারে কয়েকটি "অর্গান পাইপ" লইয়া পরীক্ষা করিয়া হলঘরের "শব্দতত্ত্বের" জটিল সমস্যার মীমাংসা

আচার্য্য স্যাবাইন

করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই সিদ্ধান্তের ফল এখন আমরা উপভোগ করিতেছি।

গুঞ্জন কেন হয়? তাহা তিনি অতি সহজে বুঝাইয়াছেন।

খোলা যায়গায় একটি শব্দ করা হইল। এই শব্দ ১।১০ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ১১১ ফিট ব্যাসার্দ্ধ বায়ুর গোলকের মধ্যে বিস্তৃত হইবে। এবং কোনও ব্যক্তি ইহার মধ্যে অবস্থান করিলে তিনি শব্দটি একবার শুনিবেন। কিন্তু যদি শব্দটি কোনও হলঘরের মধ্যে উচ্চারণ করা হয় তাহা হইলে কি হইবে? শব্দের ঢেউ অগ্রগামী হইয়া ঘরের দেওয়াল, ছাদ, দরজা জানালা, ও অন্যান্য আসবাব পত্রের সহিত আঘাত পাইবে। সমতল দেওয়াল, ছাদ, বড় বড় দরজা (বন্ধ অবস্থায়) প্রভৃতি হইতে প্রতিফলিত হইয়া, পুনরায় শ্রোতার কানের পাশ দিয়া যাতায়াত করিবে। একবার প্রতিফলিত হইয়া যদি শব্দটি শ্রোতার কানের নিকট দিয়া যায়, তাহা হইলে শ্রোতা দ্বিতীয়বার শব্দটি শুনিবেন। যদি অন্যস্থান হইতে আর একটি প্রতিফলিত শব্দ শ্রোতার নিকট পৌঁছে, তিনি তৃতীয়বার শব্দটি শুনিবেন। এইরূপে, যদি নানাস্থান হইতে, দরজা, ছাদ, চারিদিকের দেওয়াল প্রভৃতি হইতে এক এক করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিফলিত ৫০ বার শব্দ শ্রোতার কানের নিকট দিয়া গমনাগমন করে তাহা হইলে তিনি ৫০ বার শব্দটি শুনিলেন। যদি আরও অধিক বার ধর একশতবার প্রতিফলিত শব্দ কানের নিকট দিয়া গমনাগমন করে, তবে শ্রোতার মনে হইবে শব্দটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হলঘরে বিদ্যমান আছে। প্রথম হইতে শেষবার প্রতিফলিত শব্দ কানের নিকট পৌঁছিতে যে সময় লাগে, সেই সময় পর্য্যন্ত শব্দটি কানের কাছে গুঞ্জন করিবে। ধর এই সময়টি এক সেকেণ্ড এবং এক্ষেত্রে গুঞ্জন সময় এক সেকেণ্ড হইবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে গুঞ্জনের সৃষ্টি হইতেছে শব্দ প্রতিফলিত হইয়া। খোলা যায়গায় মোটেই শব্দ প্রতিফলিত হইবে না এবং শ্রোতা শব্দটি একবার শুনিবেন এবং শব্দ বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। এইজন্য গ্রীক্ এবং রোম সাম্রাজ্যে খোলা যায়গায় বক্তৃতা হইত। হলঘরের মধ্যে গুঞ্জন কমাইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন সময় কম করিতে হইলে কি করিতে হইবে? প্রতিফলিত শব্দের মাত্রা কোনও রূপে কম করিলে পুনঃ পুনঃ ৫০ বার প্রতিফলিত হইবার পর তাহার মাত্রা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গেল। এবং শব্দটি আর শুনা যাইতেছে না। এস্থলে গুঞ্জন সময় কমিয়া গেল. দরজা, জানালা প্রভৃতি বন্ধ থাকিলে তাহাদিগকে খুলিয়া দিলে এইরূপে

ছাদ বা দেওয়াল হইতে যে সকল শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় দরজা, বা জানালা হইতে প্রতিফলিত হইত, এবং আর কতকগুলি শব্দতরঙ্গ যাহারা প্রথমবার দরজা জানালা হইতে প্রতিফলিত হইত, এই সকল ঢেউ খোলা দরজা বা জানালার ভিতর হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে। প্রতিফলিত ঢেউয়ের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। ফল এই হইল যে ৫০টি পুনঃ পুনঃ প্রতিফলিত ঢেউ শ্রোতার নিকট পৌঁছিল, এবং গুঞ্জন সময় কমিয়া গেল। শ্রোতার পক্ষে শব্দ বুঝিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। গুঞ্জন সময় আরও কম করিবার জন্য প্রতিফলিত ঢেউয়ের মাত্রা কম করিতে হইবে। কঠিন চূণ বালি দিয়া লেপ দেওয়া দেওয়াল হইতে শব্দ তরঙ্গ শতকরা ৯৭% প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। পুনঃ পুনঃ ওইরূপ দেওয়াল হইতে যদি শব্দ ঢেউ প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বারে, প্রতিফলিত ঢেউয়ের মাত্রা অতি অল্প মাত্রায় কমিবে। কিন্তু যদি দেওয়ালে ফেল্ট আটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে শতকরা ৫০% প্রতিফলিত ঢেউয়ের মাত্রা প্রত্যেকবারে কমিবে, এবং ৪।৫ বার পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ফেল্ট আটা দেওয়াল হইতে প্রতিফলিত হইবার পর, প্রতিফলিত ঢেউয়ের মাত্রা অতি ক্ষীণ হইবে। শ্রোতা আর ৫০ম্ প্রতিফলিত ঢেউ শুনিতে পাইবেন না, ১৫ম্ বারেই মাত্রা এত ক্ষীণ হইবে যে আর প্রতিফলিত শব্দ শুনা যায় না। এইরূপে গুঞ্জন সময় কমিয়া গেল, এবং শ্রোতা শব্দটি বেশ বুঝিতে পারিবেন।

আচার্য্য স্তাবাইন এইখানেই ইহার শেষ করেন নাই। তাঁহার গবেষণার ফলে এখন আমরা 'হলঘরের' গুঞ্জনের সময় কাল, হলঘর নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিতে পারি। তবে হলঘরের আয়তন, দরজা, জানালা, আসবাব পত্র সব জানা চাই।
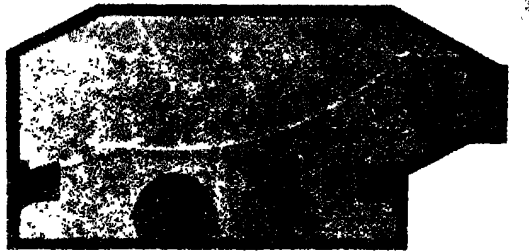
১। ঘরের ভিতর শব্দ কিরূপে প্রতিফলিত হয়, তাহারই আলোক চিত্র
২। ঘরের প্রতিকৃতি তৈয়ার করিয়া জলের ঢেউ কি ভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা দেখান হইতেছে

আসবাব পত্রের শব্দ প্রতিফলিত করিবার মাত্রা—

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ছাদ, দেওয়াল, এবং অন্যান্য দ্রব্যের শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলিত করিবার মাত্রা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কারণে আজকাল সকল প্রদেশেই বিজ্ঞানমন্দিরে প্রতিফলিত করিবার মাত্রা পরীক্ষা (experiment) দ্বারা নির্ণয় করা

হইতেছে। এবং নূতন নূতন শব্দ-শোষক বোর্ড তৈয়ার হইতেছে। নিম্নে কতকগুলি দ্রব্যের শোষণ মাত্রা দেওয়া হইল।

শব্দ শোষকের মাত্রা

প্লাষ্টার	০৩১	ট্রিটেক্স
কাষ্ঠ		লালটুন
ধাতু		embossed metal plate
কাচ		(Coated with blue paint)
বসিবার স্থান		Celotex
শ্রোতা		
বেল্ট		
Asbestos আসবেসটস	১৪৬	

উপরোক্ত তালিকার মধ্যে তিনটি দ্রব্যের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। celotex, treetex এবং লালটুন কাপড়। ভারতবর্ষে celotex এবং Treetexএর আমদানি হইতেছে। এবং নানা স্থানে দেওয়ালের গায়ে আঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। celotex তৈরী হয় আখের ছিবড়া হইতে, আর Treetex তৈরী হয় কাঠ শাঁস হইতে। আমাদের দেশে আখের চাষ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে, এবং রস নিংড়াইয়া তাহার ছিবড়া সাধারণতঃ পোড়ান হয়। কিন্তু মার্কিন প্রদেশে ছিবড়া হইতে celotex বোর্ড তৈয়ার হইতেছে। একটন ছিবড়া যদি একটন কয়লার সমান হয় তাহার দাম প্রায় ৫০৲ টাকা হইবে। কিন্তু একটন ছিবড়া হইতে celotex তৈয়ার করিলে তাহার দাম। ৩০০০৲ টাকা। অবশ্য তৈয়ার করিবার খরচা বাদ দিতে হইবে। শুধু শব্দ শোষণের জন্য এই সকল বোর্ডের ব্যবহার হয় না, আরও অন্যান্য কাজে লাগে। তাপ নিবারণ করিতে হইলে, কিংবা তাপ সমান ভাবে রাখিতে হইলে এই সকল বোর্ড দেওয়ালে আঁটিয়া দিতে হয়। বোর্ড তৈয়ার করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

লালটুনের কথা

১, বোর্ডে যেন শীঘ্র আগুন না লাগে।
২, " " " পোকা না লাগে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বক্তৃতা ঘরে যদি শুনিবার অসুবিধা হয়, তবে প্রথমতঃ জানালা দুয়ার খুলিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতেও যদি না হয়, তাহা হইলে ছাদের নীচে লালটুন টাঙ্গাইয়া দিলে সুফল পাওয়া যাইবে। গম্বুজ থাকিলেও তাহার মধ্যস্থলে ঐরূপে লালটুন কাপড় টাঙ্গাইয়া দিলেই প্রতিদোষ নিবারণ হইবে। অনেক সময় কেবল পর্দ্দা টাঙ্গাইলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ছাদ সমতল না হইয়া ধাপকাটা হইলে ভাল হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে বক্তৃতা দেওয়া এবং শোনা দুইই অসম্ভব ছিল। ইহার (Ceiling) ছাদ একেবারে সমতল। জানালা, দুয়ার, খোলা বারান্দা সকলই আছে। অতএব ছাদই ইহার প্রধান দোষনীয়। এই ভাবিয়া ছাদে লালটুন কাপড় টাঙ্গান হইল। ইহাতে অতি আশ্চর্য্য সুফল পাওয়া গিয়াছে। এখন সেনেট হাউসে, বক্তৃতা, গীত, বৈঠক অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতেছে। কোনরূপ শব্দ গুঞ্জরিত হইয়া শুনিবার পক্ষে বাধা জন্মায় না।

ইসলামের ইতিহাস

কোর্-আন
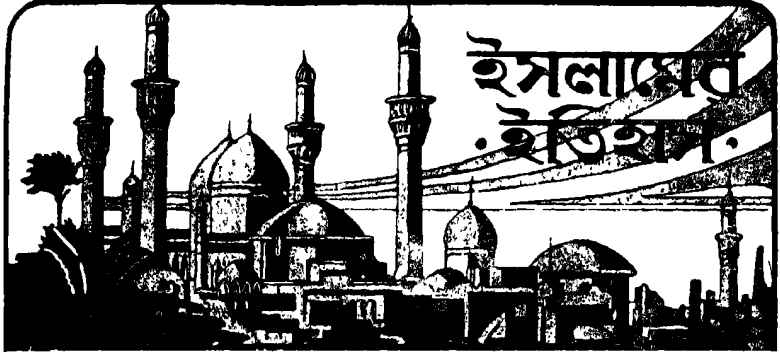
কোব্-আনেব বিধানমতে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের পাঁচটি অঙ্গ। ১। কালেমা ২। নমাজ ৩। রোযা ৪। থাকাৎ এবং ৫। হজ্ ।

প্রথমোক্ত তিনটী প্রত্যেক মানবেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শেষোক্ত দুইটী শুধু ধনীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিধানগুলি সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলা দরকার।

১। আল্লার একত্বে বিশ্বাস এবং হজরৎ মোহাম্মদকে তাঁহার 'রছুল' বা প্রেরিত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করাকে 'কালেমা' বলে।

২। সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লার নিকট প্রার্থনা করাকে 'নমাজ' বলে। 'নমাজ' শব্দটি পোস্ত ভাষার শব্দ। পাঠান যুগ হইতে ইস্লাম ধর্ম্মের মধ্যে ইহার প্রচলন হইয়াছে। আরবীতে নমাজকে "ছলাৎ" বলে।

পবিত্র কোব্-আনের প্রথম অধ্যায়টিকে "ফাতেহা" বলা হয়। 'ফাতেহা' শব্দের অর্থ আরম্ভ। এই অধ্যায়টি কোব্-আনেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনার অধ্যায়। নমাজের প্রত্যেক "রেকা-আতেই" ইহা পাঠ করিতে হয়। এই হিসাবে

প্রত্যেক উপাসককে দৈনিক অন্ততঃ ২৮বার এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাতে সাতটি বাক্য আছে। এইজন্য ইহাকে "পুনঃপুনঃ উচ্চারিত বাক্যসপ্তক" বলা হয়। এই বাক্যসপ্তকের সহিত কোব্-আনের অন্য যে কোন অংশ নমাজে পাঠ করিতে হয়। 'কোরআন' শব্দের অর্থ "পঠনীয়"। এইজন্য কোব্-আনকে নমাজে এবং অন্য সময়ে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হয়। কোব্-আনের এই প্রার্থনার অধ্যায়টি নিম্নে দেওয়া গেল—

"যিনি অনন্তকোটী সৌরজগৎসমন্বিত সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যিনি যাচিত ও অযাচিত ভাবে করুণা বিতরণ করেন, যিনি শেষ বিচারের দিনের অধীশ্বর, তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক, হে করুণাময়, হে বিচারদিনের অধীশ্বর, আমরা তোমারই ন্যায় মহিমান্বিত, তোমারই ন্যায় দয়ার আধার যে প্রভু, তাঁহারই উপাসনা করি, তুমি ব্যতীত অন্য কোন জীব জড় বা দেবতার, অথবা শক্তির উপাসনা করি না, এবং বিপদের সময়েও অন্য কোন জীব, জড়, দেবতা বা শক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি না শুধু তোমারই ন্যায়

প্রতিপালক, তোমারই ন্যায় দয়াময়, তোমারই ন্যায় সর্বগুণান্বিত প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

"অতএব হে আমাদের প্রতিপালক, হে আমাদের দয়াল প্রভো! আমরা অজ্ঞ, আমরা স্বল্পদর্শী, আমরা পথ চিনিনা, যে পথ সরল, যে পথ সোজা, যে পথ তুমি পছন্দ কর, যে পথে তোমার সম্মতি আছে, আমাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দাও, সেই পথে চালিত কর। কিন্তু যে পথে তোমার সম্মতি নাই বরং তোমার অভিসম্পাত আছে, এবং যে পথে চলিয়া আমাদের পূর্ববর্ত্তিগণ পথ ভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তোমার অভিসম্পাত ভোগ করিয়াছিল, হে দয়াল প্রভো! হে প্রতিপালক, আমাদিগকে সে পথে চালাইও না। তোমার বাঞ্ছিত পথেই আমাদিগকে চালাও। আমিন।"

প্রার্থনাটীর দিকে তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে উহা কত উদার! কত অমায়িক! উপাসক যদি মনের আবেগে প্রাণের সহিত ভক্তিভরে তাহার উপাস্যের নিকট অন্ততঃ ২৮বার "সরল সোজা পথে" চলিবার কামনা জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে সে কখনই কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারে না। তোমরা দৈনিক অন্ততঃ পাঁচবার "সত্যকথা বলিব" বলিয়া আন্তরিক কামনা প্রকাশ করিবে। দেখিবে কখনই মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না।

বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নমাজ প্রত্যেক মানুষের অবশ্য পালনীয়। পিতামাতা অভিভাবক যদি স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে "সরল সোজা পথে" চলিবার জন্য শিক্ষা দেন এবং পুত্রকন্যাগণও যদি আগ্রহের সহিত "সরল সোজা পথে" চলিবার জন্য স্বীয় উপাস্যের নিকট অন্তরের ঐকান্তিক কামনা জ্ঞাপন করে, তবে জগৎ বাস্তবিকই অনাবিল শান্তির আবাস হইয়া পড়ে।

আরও লক্ষ্য করিবে নমাজের সময় প্রত্যেক উপাসক জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যেক মানবকে "সরল সোজা পথে" চালিত করিবার জন্য তাহার উপাস্যের নিকট নিস্বার্থভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকে। নিঃস্বার্থ পরকীয় কল্যাণ কামনার কি স্বর্গীয় আদর্শ। তোমরাও এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে পরের কল্যাণ কামনা করিতে শিখিবে।

কোর-আনের বিধানমতে প্রত্যেককে দৈনিক পাঁচবার নমাজ পড়িতে হয়। প্রকৃতির সহিত সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়া এই সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তোমাদের প্রত্যেকের হাতে পায়ে পাঁচটী করিয়া আঙ্গুল আছে। জীবের পাঁচটী ইন্দ্রিয়। এই বিশ্বজগৎ পঞ্চভূতে নির্ম্মিত ইত্যাদি।

কোর-আনে এই পাঁচবার নমাজের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে।

প্রথম—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে। ইহাকে "ফজর" অভিহিত করা হয়। 'ফজর' শব্দের অর্থ ঊষাকাল।

প্রাতরুত্থানকে সর্ব্বশাস্ত্রই স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বলা হইয়াছে। কোর-আন ধর্ম্মের অনুশাসনের দ্বারা এই স্বাস্থ্যের বিধি পালন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত রাত্রির বিশ্রাম সুখ ভোগের পর, দিনের আগমনে, জীবিকা-অর্জ্জনের আশায়, দিবা ও রাত্রির সৃষ্টি কর্ত্তা এবং জীবিকার বিধান কর্ত্তার নিকট হৃদয়ের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়—দ্বিপ্রহরের পর হইতে ছায়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেড়গুণ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত। ইহাকে 'জোহর' বা মাধ্যাহ্নিক নমাজ বলা হয়। 'জোহর' শব্দের অর্থ মধ্যাহ্ন।

প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কর্ম্মের প্রশস্ত সময়। সুতরাং এই সময় কোন উপাসনার ব্যবস্থা করা হয় নাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শরীর স্বভাবতঃই একটু ক্লান্তি বোধ করে। সুতরাং একটু বিশ্রাম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। এই বিশ্রাম টুকু আলস্যে অতিবাহিত না করিয়া উপাসনার ভিতর দিয়া উপভোগ করাই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ।

তৃতীয়—ছায়া যখন দেড়গুণ হয় তখন হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ইহাকে "আছর" বা অপরাহ্নিক নমাজ বলা হয়। 'আছর' শব্দের অর্থ দিনের শেষ ভাগ।

সমস্ত মধ্যাহ্নের পরিশ্রমের পর অপরাহ্নের শেষ ভাগে আর একটু বিশ্রাম কর্ম্মী ব্যক্তির আবশ্যক। এই বিশ্রাম উপভোগের জন্য এই সময়ের উপাসনার ব্যবস্থা।

চতুর্থ—সূর্যাস্তের পর হইতে রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত। ইহাকে মগরেব বা সূর্য্যাস্তকালের নমাজ বলা হয়। মগরেব শব্দের অর্থ সূর্য্যাস্ত কাল।

এই সময় সমস্ত দিনের পরিশ্রম হইতে অবসর লওয়ার সময়। জীব মাত্রেই এই সময় দিনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাত্রির কোলে আশ্রয় লইতে উৎসুক হয়। এই সময় গাছে পাখীদিগের কলরব তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। এই দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে জীবিকা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান-কর্ত্তার নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চম - রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পর হইতে মধ্য রাত্র পর্যন্ত। এই সময়কে "এশা" নামে অভিহিত করা হয়। "এশা" শব্দের অর্থ রাত্রির পূর্ব্বভাগ।

জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া রাত্রির বিশ্রামসুখ লাভের আশায়, জীবিকা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানকর্ত্তার নিকট হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে কার না মনে সাধ হয়।

নমাজের ৪টী অবস্থা—১। দণ্ডায়মানাবস্থা ২। অর্দ্ধনমিতাবস্থা। ৩। উপবেশনাবস্থা ৪। প্রণিপাতাবস্থা। এই চারিটী অবস্থার ও গভীর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে।

মানুষ সৃষ্টজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৃক্ষ লতা, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাকৃতিক যাবতীয় পদার্থের নিকট হইতে যে প্রভূত উপকার পাইয়া থাকে সুতরাং এই উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহার ধর্ম্ম। কিন্তু সে বিবেকী প্রাণী। সুতরাং উপাস্যজ্ঞানে ঐ সকল প্রাকৃতিক পদার্থের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া, যিনি ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়া মানবের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছেন, তাঁহারই নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা—একমাত্র উপাস্য জ্ঞানে তাঁহারই উদ্দেশে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতামিশ্রিত ভক্তি নিবেদন করাই মানবোচিত কার্য্য। এইজন্য দণ্ডায়মানাবস্থায় বৃক্ষাদির আকার ধারণ করিয়া, অর্দ্ধনমিতাবস্থায় পশুপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া, উপবেশনাবস্থায় পর্ব্বতাদির আকার ধারণ করিয়া, বাক্যতঃ এবং কার্য্যতঃ, ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক পদার্থের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের জন্য ঐগুলির সৃষ্টি-কর্ত্তার নিকট মানুষ, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সর্ব্বশেষে সকল অহঙ্কার, সকল অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়া, উর্দ্ধাঙ্গ অবনত করিয়া, সেই পরাৎপর মহান্ আল্লার পায়ে, নদ নদীর ন্যায়, হৃদয়ের অফুরন্ত ভক্তির ধারা ঢালিয়া দেয়।

নমাজ তিন প্রকারের। আল্লার আদেশে যাহা পাঠ করা হয় তাহাকে "ফরজ" বলা হয়। 'ফরজ' শব্দের অর্থ অবশ্য কর্ত্তব্য। দিবা রাত্রিতে সর্ব্ব-সমেত ১৭ 'রেকাআৎ' 'ফরজ' নমাজ। কিন্তু হজরৎ মোহাম্মদের ব্রহ্মময় চিত্ত এই সামান্য উপাসনায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি প্রত্যেক নমাজের সময়, আরও অতিরিক্ত কয়েক 'রেকাৎ নমাজ পাঠ করিতেন। ইহাদের মধ্যে কয়েক 'রেকা-আৎ' নিয়মিত ভাবে পাঠ করিতেন, অপর কয়েক রেকা-আৎ ইচ্ছানুযায়ী পাঠ করিতেন। তিনি এইরূপ নিয়মিত ভাবে যাহা পাঠ করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকেও পাঠ করিতে বলিতেন, সেই গুলিকে 'ছুন্নত' বা তাঁহার অনুকরণ বলা হয়। অবশিষ্ট যে সমস্ত রেকা-আৎ তিনি যখন কখন পাঠ করিতেন এবং শিষ্যমণ্ডলীকে ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদন করিতে বলিতেন, তাহাকে 'নফল' বা ইচ্ছাধীন বলা হয়। প্রত্যেক নমাজের সময়ই এই তিন প্রকার নমাজই সম্পন্ন করিতে হয়।

নমাজ উচ্চৈস্বরে পাঠ করিতে হয়। কিন্তু হজরৎ মোহাম্মদ যখন ইস্লাম প্রচার করিতেছিলেন, তখন কোরেশগণ তাঁহার এতই ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠে যে তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে নমাজ পর্য্যন্ত পড়িতে দিত না। তাই তিনি গোপনে নমাজ পড়িতেন। অতি প্রত্যুষে, সূর্য্যাস্তের পর এবং রাত্রিতে। পৌত্তলিকগণ সে সময়ে গৃহের বাহিরে আগমন করিত না। কিন্তু সমস্ত দিন তাহারা হজরতের অনিষ্ট সাধনে এবং তাঁহার উপাসনা কার্য্যে বাধা প্রদানে ব্যাপৃত থাকিত। এইজন্য তিনি দ্বিপ্রহরে ও অপরাহ্নে উচ্চৈস্বরে নমাজ পাঠ করিতে পারিতেন না। এখনও সেই স্মৃতি রক্ষার্থে

মোছলমানদিগকে দ্বিপ্রহরে ও বৈকালে, নিঃশব্দে নমাজ পাঠ করিতে হয়। এবং প্রাতঃকালে, সূর্য্যাস্তের সময়, এবং রাত্রিতে শুধু 'ফরজ' নমাজই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হয়।

একসঙ্গে অনেকে মিলিয়া নমাজ পড়াই শ্রেয়ঃ। ইহাতে একজন 'এমাম' বা আচার্য্যের আসনে দণ্ডায়মান হয়, অন্য সকলে তাঁহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ইঙ্গিতে সুশিক্ষিত সৈন্যবাহের ন্যায় নমাজ সমাধা করে। এরূপ ভাবে নমাজ পড়াতে এক নেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার অভ্যাস জন্মে এবং মানুষের মন হইতে উচ্চ, নীচ, ধনী দরিদ্র, শেখ, ছৈয়দ, ইত্যাদি ভেদজ্ঞান মুছিয়া যায়, একমানুষ অন্য সকল মানুষকে সমান চোখে দেখিতে শিখে। এখানে এক লক্ষপতি ধনি,—এক সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, এক, পথের ভিখারীর অধিনায়কত্বে, তাহারই পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারই পদতলে মস্তক রাখিয়া এক আল্লার উপাসনা করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন না।

পূর্ব্বে দেখিয়াছ প্রত্যেক উপাসক বিশ্বের কল্যাণের জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবকে 'সরল ও সোজা' পথে চালিত করিবার জন্য স্বীয় উপাস্যের নিকট আন্তরিক কামনা জ্ঞাপন করে, ইহাই মানব সভ্যতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা, সুন্দর সুন্দর শিল্পকলা, দর্শন বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ইত্যাদি সভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নাই ; কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে পরকীয় কল্যাণ কামনা, উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া বিশ্বের সকল মানবকে সমান চোখে দেখা এবং সকলের সঙ্গে এক যোগে কাজ করা, ইহাই সভ্যতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নমাজের পূর্ব্বে "অজু" বা হস্তপদ প্রক্ষালন করাও কোর্-আনের বিধান। অজুর সময় প্রত্যেক বার দাঁতন দ্বারা দাত পরিষ্কার করিয়া তৎপর মুখগহ্বর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হয়। দাত ও মুখ পরিষ্কার রাখা স্বাস্থ্যের পরম উপকারী। যাহাদের দাঁত পরিষ্কার নয়, তাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় ; অকালে দাঁত পড়িয়া যায়, দাতের নানা ব্যারাম হয় এবং তজ্জন্য পেটের অসুখ হয় এবং স্বভাব খিটখিটে হয়। তোমরা দাঁত ও মুখ খুব পরিষ্কার রাখিবে।

নাকের মধ্যে নিঃশ্বাসের সহিত অনেক ধূলাবালি প্রবেশ করে। অজু করিবার সময় জল দিয়া তিন বার নাক পরিষ্কার করিতে হয়। দৈনিক পাঁচ বার নমাজের সময় ঐ ভাবে নাকের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করিলে নাকে কোনরূপ ময়লা থাকিতে পারে না। নাকে ময়লা থাকিলে নিঃশ্বাসের সহিত উহার অনেকাংশ ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহাতে অনেক পীড়া হয় তাহা তোমরা তোমাদের স্বাস্থ্যের বই এ পড়িয়াছ।

তৎপর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শীতল জলে তিন বার মুখমণ্ডল ধৌত করিতে হয়। ইহাও চক্ষুর পরম হিতকর। ইহাতে চক্ষুর ময়লা ধৌত হইয়া যায় এবং শীতল জলের সংস্পর্শে চক্ষু শীতল হয়। চক্ষুর ময়লা পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বদা চক্ষু ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে কোন চক্ষুরোগ হইতে পারে না। চক্ষুর প্রতি যত্নবান না হইলে অচিরে দৃষ্টিহীন হইতে হয়।

অতঃপর কনুই হইতে হস্তের পুরোভাগ ধৌত করিয়া, মস্তক ও গ্রীবা মুছিয়া পদদ্বয় ধৌত করিতে হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে গ্রীবার শিরার উপরে শীতল জল ঢালিলে অচিরে রক্ত রোধ হয়। সুতরাং অজুর সময় শীতল জলে গ্রীবা মুছিবার উপকারিতা তোমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। হস্তপদ প্রক্ষালনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা তোমরা সকলেই অবগত আছ। এইরূপে তোমরা দেখিবে অজুর দ্বারা শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হইয়া শরীর শান্ত হয়, সুতরাং 'অজু' স্বাস্থ্যের পরম কল্যাণকর।

রোযা সম্বন্ধে কোর্-আন বলিতেছে—হে বিশ্বাসিগণ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণের জন্য যেমন রোযার বিধান করা হইয়াছিল, তোমাদের জন্যও তদ্রূপ বিধান করা গেল.... ইত্যাদি। কোর্-আনের এই আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মোছলমানকে বৎসরে এক মাস রোযা পালন করিতে হয়। আরবদেশে চান্দ্রমাস অনুযায়ী বৎসর গণনা করা হয়। এই চান্দ্র বৎসরের মধ্যে

'রমাযান' নামে একটি মাস আছে। এই মাসে এই রোযাব্রত পালন করিতে হয়।

সৌর বৎসর ৩৬৫'২৪ দিনে এবং চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ ২৪ দিনে হয় সুতরাং চান্দ্র বৎসরের দিন সংখ্যা ১০·৮৮ কম। এইজন্য চান্দ্র বৎসর প্রতিদিন বৎসরে সৌর বৎসর অপেক্ষা ৩২'৬৪ দিন অর্থাৎ প্রায় এক মাস পিছাইয়া পড়ে; এবং তজ্জন্য 'রমাযান' মাসও প্রতি তিন বৎসরে সৌর বৎসর অপেক্ষা এক মাস পিছাইয়া পড়ে। সুতরাং প্রতি ৩৪ বৎসরে 'রমাযান' মাস সৌর বৎসরের প্রত্যেক মাসে একবার ঘুরিয়া আইসে। সুতরাং প্রত্যেক মোছলমানকে জীবনে অন্ততঃ ১ বার প্রত্যেক ঋতুতে 'রোযা' পালন করিতে হয়। বৎসরের সকল ঋতুতেই উপবাস ব্রত পালন করিবার জন্য প্রত্যেকেই প্রত্যেক ঋতু উপযোগী কষ্টসহিষ্ণুতা অর্জন করিবার সুযোগ লাভ করে। মানব-জীবন কর্ম্মক্ষেত্র। সুতরাং এইরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা অর্জন করা জীবনের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা লাভের অন্যতম উপায়।

সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে, দিবা ও রাত্রির ভেদরেখা যখন প্রকাশিত হয়, সেই সময় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার পানাহার বর্জ্জন করার নাম 'রোযা' ইহা প্রত্যেক মোছলমানেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে রুগ্ন ও প্রবাসী ব্যক্তি সাময়িক ভাবে অক্ষম হইলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে তাহারা যে কোন সময় ঐ একমাস 'রোযা' পালন করিতে পারেন কিন্তু একবারে অক্ষম ও বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রত্যেক রোযার জন্য অন্ততঃ একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করাইলেই ঐ কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপবাসের উপকারিতা প্রত্যেক শাস্ত্র প্রত্যেক ধর্ম্মই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়; কিন্তু আহার্য্যের কতক অপকারী অংশ শরীরে সঞ্চিত হইয়া নানা পীড়ার কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে, জ্বরের সময় উপবাস বা লঘু পথ্যের ব্যবস্থা আছে। উপবাসের দ্বারা শরীরের ঐ সঞ্চিত খাদ্যাংশ কতক পরিপাক হয় কতক ঘর্ম্মমল মূত্রাদির দ্বারা শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। উপবাস ব্যতীতও ঐগুলি ঐরূপ ভাবে শরীর হইতে নির্গত হয়, কিন্তু যাহা নির্গত হয় আহারের দ্বারা তাহা আবার সঞ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং খরচ ঠিক রাখিয়া জমা কমাইলে তবেই সঞ্চিত আবর্জ্জনা নিঃশেষিত হইতে পারে। উপবাসে এই আবর্জ্জনা সঞ্চিত না হইয়া বরং উহা শরীর হইতে নির্গত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। এই ভাবে সম্বৎসরের সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি রোযার দ্বারা নিঃশেষিত হইয়া শরীর ক্লেদশূন্য হইয়া পড়ে। তোমরা খেজুর গাছের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে ২১৷ দিন পর্য্যন্ত রস নির্গমনের স্থানটি পচিয়া দুর্গন্ধ হয়। আবার ২১৷ দিন শুষ্ক হইতে দিলেই উহা পুনরায় পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করে। এইরূপে পেটের অসুখ, বাত, সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যাধি রোযার দ্বারা উপশম হয়।

দৈহিক পানাহার বর্জ্জন যেমন রোযার একটি অঙ্গ, মনের কুপ্রবৃত্তিকে পরিহার করাও তেমনি উহার আর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। পানাহারে সংযত হইতে না পারিলে যেমন রোযা সিদ্ধ হয় না, ষড়রিপুকে সংযত করিতে না পারিলেও তেমনি রোযা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং রোযা পালনকারী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পানাহার বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ষড়রিপুকে দমন করিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। পানাহার বর্জ্জনের দ্বারা দেহ ক্লেদ শূন্য হয়—স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ হয়, রিপু দমনের দ্বারা আত্মা কলুষ মুক্ত হয়—মানুষ পূর্ণত্ব লাভের যোগ্য হয়।

৪। রোযার মাসে দরিদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য বা অর্থ-দান করা প্রত্যেক মোছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই অর্থকে 'বয়তুল মাল' বা সাধারণের সম্পত্তি বলা হয়। এই সাধারণের সম্পত্তির দ্বারা দুঃস্থ ব্যক্তিকে যথা সম্ভব সাহায্য করা হয়। কোর্-আনে এই অর্থ বিতরণের সুন্দর বিধি আছে। তোমরা কোর্-আন পাঠ করিলেই উহা জানিতে পারিবে।

মীরাবাই

ভারতবর্ষের মধ্যখানে রাজপুতনা নামে একটি দেশ। সেখানে মেবার, মাড়বার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে রাজপুত রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাহার মধ্যে একটি রাজবংশের নাম ছিল রাঠোর। প্রায় চারিশত বৎসর আগে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে এই রাঠোর বংশে রাও রতনসিংহের ঘরে একটি কন্যার জন্ম হয়। পিতামাতা নাম রাখিলেন মীরা।

মেয়েটি অপূর্ব্ব সুন্দরী। বয়স যত বাড়িতে লাগিল, তাহার স্বভাবের মাধুর্য্যও ততই বাড়িতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেমন করিয়া শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার অদ্ভুত টান। শিশুরা সারাদিন খেলাধূলায় মাতিয়া থাকে, মীরাবাইএর একমাত্র খেলা ছিল কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করা।

মীরা যখন বড় হইয়া বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন, পিতামাতা অনেক রাজপুত্রের সন্ধান করিয়া অবশেষে মিবারের রাণাপুত্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। কে যে এই রাণাপুত্র তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ইনি রাণা কুম্ভের প্রপৌত্র কুমার ভোজরাজ। আমরা ইতিহাসের মতে যাহা পাই তাহাই বলিলাম। যাহাই হউক, ইনি যে মিবারের রাণা ছিলেন, একথা সত্য। মিবারের রাণা-বংশই বীরত্বে ও গৌরবে রাজপুতনার সকল রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাই তাঁহার হাতে অতি আদরের কন্যাটিকে সঁপিয়া দিয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইলেন।

মীরাবাই চিতোরের রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী গুণময়ী বধূকে বরণ করিয়া চিতোর রাজকুল আনন্দের সঙ্গে মনে করিল, মিবার সিংহাসনের যোগ্য রাণীই ইনি বটে! কিন্তু মীরাবাইএর কোনও দিকেই লক্ষ্য নাই। এই রাজসম্পদ, এই সম্মান, এই ভোগবিলাস ইহা দিয়া তাঁহার কি হইবে? এ সকলকে তিনি তো কখনও ভালবাসিতে শিখেন নাই! তাঁহার সবচেয়ে বড় আনন্দ যে ভগবানের পূজায়। রাজপুতনার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা, বীর, সুপুরুষ তাঁহার স্বামী। কিন্তু তাহাতে কি? তিনি যে বাল্যকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহার স্বামী বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কাহাকেও তো তিনি প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে পারেন না।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাঁহার দিন কাটে। কিন্তু চারিপাশের কোনও বিষয়ের মধ্যেই মন বসে না। তিনি পূজায়, ধ্যানে, কীর্ত্তনে সমস্তদিন রজনী

ডুবিয়া থাকিতেন। যে সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসী বিষ্ণুর ভজনা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সারা দিন বসিয়া ভগবানের গুণগান, ধর্মের আলোচনা করিয়াই দিন কাটাইতেন। রাজপরিবারের চক্ষে ইহা বড় অস্বাভাবিক ঠেকিত। কিন্তু রাণী অত্যন্ত ধার্ম্মিকা ও ভক্তিমতী এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল বলিয়া কেহ বিশেষ কোনও আপত্তি করিতেন না। মীরাবাই অতিশয় সুগায়িকা ছিলেন, ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া তিনি হরিনাম-কীর্ত্তনে ধ্যানস্থ হইয়া যাইতেন।

মহারাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর রতন সিংহ এবং রতন সিংহের মৃত্যুর পর বিক্রমজিৎ রাজা হইলেন। মীরার অপূর্ব্ব ভক্তির কথা শুনিয়া অনেক ভগবৎপ্রেমিক সাধু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। মীরা লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে হরিগুণ গান করিতেন। রাণা বিক্রমজিৎ এইজন্য মীরাকে নানা রকম যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। কথিত আছে চরণামৃত বলিয়া মীরাকে সত্যসত্যই বিষ দেওয়া হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, মীরাবাইয়ের উপর এই বিষের কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই। দ্বারকাতীর্থের রণছোড়জীর মুখ হইতে না কি তাহা আবীরের ন্যায় বাহির হইয়া গিয়াছিল।

এদিকে আরও একটি বিঘ্ন ঘনাইয়া আসিতেছিল। চিতোরের রাজবংশ ছিল শাক্ত অর্থাৎ কালীর উপাসক, মীরাবাইয়ের বিষ্ণুপূজা তাহার বিপরীত। এইজন্য রাজমাতা ইহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এবার তিনিও বাধা দিয়া আদেশ করিলেন, চিতোরের রাজপ্রাসাদে বিষ্ণুর পূজা আর চলিবে না।

মীরাবাই শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সাধুসঙ্গহীন হইয়া, বিষ্ণুপূজা বঞ্চিত হইয়া কেমন করিয়া তিনি দিন কাটাইবেন? অথচ স্বামী ও শাশুড়ীর আদেশও অমান্য করিবার নয়। কিছুদিন কাটিল। মীরাবাইএর জীবন যেন অসার হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণবিহীন জীবন তাঁহার কাছে মরণের সমান। দিনে দিনে তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিতে চায়, এমন করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিলে তিনি বাঁচিতে পারিবেন না। অনেক দুঃখ বেদনার মধ্যে অবশেষে মীরাবাই ভাবিয়া স্থির করিলেন চিতোরের সিংহাসন থাক্, তিনি ভিখারিণী হইয়া বনে চলিয়া যাইবেন, সেখানে কেহ তো তাঁহাকে কৃষ্ণপূজায় বাধা দিতে আসিবে না।

তারপর একদিন রাজপুরীময় সোরগোল পড়িয়া গেল—মহারাণী প্রাসাদ ত্যাগ করিয়াছেন। দিকে দিকে রাণার অনুচরগণ রাণীর সন্ধানে ছুটিল।

কিন্তু তাঁহাকে আর পাওয়া যাইতেছে না। অনেক দিন পরে বৃন্দাবন হইতে কে খবর দিল, সেইখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী, অদ্ভুত গায়িকা গোপীকে তাহারা দেখিয়াছে। রাণা তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু হায় হায়, লোক পৌঁছিবার আগেই মীরাবাই বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায় উধাও হইয়াছেন। নিরাশ হইয়া লোকজন ফিরিয়া আসিল।

মীরাবাই তাঁহার প্রিয় দেবতা গিরিধরলালজীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজপথে লোক অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

একদিন চিতোরে সংবাদ আসিল মীরাবাই দ্বারকায়। দ্বারকায় লোক গেল। সত্য সত্যই মীরাবাইএর সন্ধান সেখানে মিলিল। রণছোড়জীর মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া সেই মহিষী মীরাবাই ধ্যানে গদগদ। কিন্তু রাণার দূত তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। মীরাইয়ের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রাণহীন দেহ-লীলা শেষ করিয়া ধরার ধূলিতে লুটাইল।

তিরোধানের তিথি ও বার কেহ বলিতে পারে না, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, এইটুকু মাত্র জানা যায়।

মীরাবাই চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তি, তাঁহার সঙ্গীত ও তাঁহার অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও সাধনার কথা আজও লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাই। তাঁহার রচিত সঙ্গীত এখনও সর্ব্বত্র শোনা যায়—

পাথর পূজকে হরি মিলে তো মৈ পূজে পাহাড়,
তুলসী পূজকে হরি মিলে তো মৈ তুলসীকো ঝাড়,
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎসবালা,
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা।

গ্রীস-এথেন্স

২১৯০ পৃষ্ঠার পর

থীটসদের যে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এমন একটা সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন আপনা হইতেই তাহাদের আবার রাষ্ট্রীয় অধিকার জন্মিয়াছিল। এ সময়ে গ্রীসের বাণিজ্য বাড়িতেছিল, সমুদ্রের বুক দিয়া নানা দেশে তাহাদের বাণিজ্য-তরী যাতায়াত করিত। এই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত তাহাদের নৌ-বহরেরও উন্নতি হইল। থীটসরা সুদক্ষ নাবিক ছিল, তাহারা এ সমুদয় বাণিজ্য তরীর নাবিকরূপে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। তাহাদের জন্যই এথেন্সের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকায় রাষ্ট্রের উপরও তাহাদের অধিকার জন্মিল। কেন না এথেন্সের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির মূলে বৈদেশিক বাণিজ্যই ছিল প্রধান।

সপ্তম শতাব্দীতে দেশের একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে সময়ে দেশে টাকার প্রচার হয়, ইহাতে জনসমাজের মধ্যে একটা অশান্তির ভাব দেখা গিয়াছিল। এইরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও থীটসরা রাষ্ট্রীয় শক্তিতে বিশ্বাস হারায় নাই।

৬৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিলন (Cylon) নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এথেন্স অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করেন। সিলন থ্যাগেনসের (Theagenes) কন্যাকে বিবাহ করেন। থ্যাগেন্স ছিলেন মেগারার (Megara) রাজা। সিলন মেগরার সৈন্য এবং এথেন্সের কতিপয় সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের সাহায্যে এই বিদ্রোহ করেন। তাঁহার এই বিদ্রোহে কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারে নাই।

সিলন এ্যাক্রোপোলিস্ (Acropolis) অধিকার করিলেন; কিন্তু কোন সুফল হইল না। বিদেশী সৈন্যদিগকে দেখিয়া আথিনীয়গণ সিলনের সহায়তা করিলেন না। সিলন দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। অনেক দিন পরে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মুক্তিলাভ করেন। দুর্গের অবশিষ্ট লোকজন এথেনা-পোলিয়ান (Athena-Polian) মন্দিরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। আর্কন তাহাদিগের প্রাণনাশ করিবেন না বলিয়া অভয় দান করিলে পর তাহারা দেবতার মন্দির ত্যাগ করিয়াছিল। সে সময়ে মেগাক্লেস (Megacles) নামে একব্যক্তি এথেন্সের আর্কন ছিলেন। তাঁহার ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহী দলের লোকদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। দেবতার মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া অঙ্গীকার করিয়া যাহাদের

প্রাণদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি এই অবিচার ও অন্যায় ভাবে নিহত করার জন্য নগর কলুষিত হইয়াছে বলিয়া নাগরিকদের মধ্যে বেশ তীব্র উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। এদিকে যেমন সিলন ও তাঁহার ভ্রাতা চিরদিনের জন্য দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন তেমনি মেগাক্লেসের বিরুদ্ধে সিলনের বন্ধুজনেরাও উত্তেজিত নগরবাসীদিগকে আরও উত্তেজিত করায় মেগাক্লেস ও তাঁহার সঙ্গিগণের বিচার হইল। বিচারে তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল এবং তাঁহারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইলেন।

সিলনের ষড়যন্ত্রে এইবার মেগারার (Megara) সহিত এথেন্সের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধের ফলে দেশের ভয়ানক দুর্দশা উপস্থিত হইল। গ্রামের লোকদের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। অ্যাটিকের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলির আর্থিক অবস্থা হইয়াছিল সবচেয়ে খারাপ। মেগারার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার দরুন, তেলের ব্যবসায় একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল।

এ সময়ে এথেন্সের পূর্ব প্রবর্তিত আইন কানুনের কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল এবং ড্রাকো (Draco) নামে একব্যক্তি অতিরিক্ত বিচারক বা বিধানকর্তা (Thesmothetes) নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উপর ভার পড়িল দেশের শাসনের জন্য নূতন বিধি প্রবর্তন এবং প্রাচীন বিধির পরিবর্তন। ড্রাকোই সর্বপ্রথম এথেন্সের আইন কানুনকে বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহার এই বিধান সৃষ্টির দরুন, দেশের মধ্যে ভয়ানক দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রীক-ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ড্রাকো তাঁহার বিধি ব্যবস্থাগুলি কালির অক্ষরে লিখেন নাই—লিখিয়াছিলেন রক্তের অক্ষরে। ড্রাকোর আইনের বিধান এমন কঠোর ছিল যে কেহ যদি শাক-সব্জী বা ফল চুরি করিতে তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। ড্রাকোর বিধানের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য গুরুদণ্ডের বিধান থাকিলেও নরহত্যা এবং অন্যান্য প্রকার দুর্ঘটনা বশতঃ মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে কি কি প্রভেদ হইতে পারে, তাহা বেশ শৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। একথা না বলিলেও চলে যে তিনি ধনী-সম্প্রদায়ের পক্ষ টানিয়াই বিধিগুলি প্রণয়ন করেন, তবু তাঁহার লিখিত বিধি-ব্যবস্থার ফলে দরিদ্রেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ধনীসম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের কোন্ কোন্ স্থানে প্রভেদ বিদ্যমান।

সোলোন-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—ড্রাকোর বিধানেও কিন্তু দেশের গোড়ার যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তাহা দূর হইল না। বৎসরের পর বৎসর কেবল ধনীসম্প্রদায়ের অত্যাচার ও অবিচার এবং কৃষকদের দুর্দশা বাড়িয়া চলিল। মূলধনের অভাবে তাহাদের টাকা ধার করিতে হইত কিন্তু টাকাই বা কি ভাবে পাওয়া যায়। জমিজমা বন্ধক দিয়া বেশী সুদে টাকা ধার করিয়া তাহারা ক্রমাগত ধ্বংসের পথে চলিতে লাগিল। সাধারণ শ্রমজীবী বা হেক্‌তেমোরিদের (hektemori) অবস্থা হইয়াছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাহারা বেতনস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের যে অংশ লাভ করিত, তাহা দ্বারা তাদের জীবিকাই নির্বাহ হইত না। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহারা মনিবদের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইত। টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে তাহাদিগকে আত্মবিক্রয় করিয়া ক্রীতদাস হইতে হইত। এ সময়ে ধনীসম্প্রদায়েরা দিন দিনই অধিকতর অর্থশালী হইতে লাগিলেন আর কৃষকেরা ও ক্ষুদ্র জোতদারেরা ক্রমশঃ গৃহহীন, অন্নহীন ও সম্পত্তি বিহীন হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িতে লাগিল।

দেশের এই দুর্দিনে একজন দেশহিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। ইহার নাম সোলোন (Solon)। ইনি মেদানতিদ্ (Medantids) বংশীয় ইসেস্‌টাইড্‌স্ (Excestides) নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। সোলোন একজন ধনী বণিক ছিলেন। ইওনিক (Ionic) ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল, তিনি সে ভাষায় বেশ কবিতাও লিখিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত কবিতা এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা এখনও পাওয়া যায়। তিনি জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য এ সকলের প্রচার করিতেন। এ সময়ে দেশের লোকেরা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আবার আইন কানুন ও বিধি ব্যবস্থার দিক্ দিয়া

একটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সোলান আর্কনের পদ গ্রহণ করিলেন। সোলোন আর্কনের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই আদেশ দিলেন—"ঋণে আবদ্ধ ব্যক্তিদের বন্দকী জমিজমা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং যাহারা ঋণের দায়ে ক্রীতদাস হইয়াছিল তাহারা মুক্ত হইলেন। সোলানের এই ঘোষণা সারা দেশের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। সোলানের এই সাহসিক সামাজিক সংস্কার Seisachtheia নামে পরিচিত। এই ঘোষণার ফলে ঋণ মুক্ত ব্যক্তিরা মহানন্দে এক ভোজ দিয়াছিল।

অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত রূপ কতকগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন।

১। কোন ব্যক্তি ঋণদায়ে আবদ্ধ হইলেও সে ক্রীতদাস হইতে পারিবে না। ২। প্রত্যেক ব্যক্তির জমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। কেহ নির্দ্দিষ্ট জমির অতিরিক্ত জমি ভোগ দখল করিতে পারিবে না।

তাঁহার এই ব্যবস্থায় ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু অনেকে যেরূপ আশা করিয়াছিল যে সোলোন ধনী ব্যক্তিদের দখলিকৃত জমিজমা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা পুনরায় কৃষকদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন, তিনি কিন্তু তাহা করেন নাই। সাধারণ শ্রমিকদের উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ বেতন স্বরূপ পাইবার যে রীতি চলিয়া আসিতেছিল, সে নিয়মেরও তিনি কোনরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই। সুধু তাহারা দাসত্বের দারুণ দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক হিসাবে সোলোনের নাম আজ পর্য্যন্তও ইউরোপের সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

এথেন্সের প্রজাতন্ত্র এতদিন নাম মাত্র ছিল, সোলোনই উহার মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাকে নানা দিক্ দিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিলেন। তিনি যে সংস্কার করিলেন, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে সম্ভ্রান্ততন্ত্র Aristocracy of wealth) বা বিত্ততন্ত্র (Timocracy) মনে হইলেও উহার মধ্যে গণতন্ত্রের আভাষ ছিল পরিস্ফুট। তিনি প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে অবস্থানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিলেন। এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে থীটসরা চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইল এবং কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকারও লাভ করিল। প্রথম তিন শ্রেণীর লোকদিগকে গুরুভার অস্ত্রধারী পদাতিকের ভার দেওয়া হইল, থীটসেরাও পদাতিক হইল আর নাবিকের কাজও পড়িল তাহাদের উপর। সোলান কিন্তু রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই। থীটসেরা রাজকীয় কোন অফিস ইত্যাদিতে কাজ পাইবার অধিকার না পাইলেও তাহারা এক্লিসিয়া (Ecclesia) বা নাগরিক সভায় যোগদান করিতে পারিত। এই সভায় যোগ দিবার অধিকার লাভ করিবার কালে তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট বা শাসনকর্ত্তা নিয়োগের সময় নির্ব্বাচন-মত (vote) দিতে পারিত।

এই ভাবে প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই যে কোন দেশেই ধনী সম্প্রদায় নিজেদের সুযোগ, সুবিধা ও সাধারণের উপর আপনাদের প্রভুত্ব লোপ করিতে চাহেন না। কিন্তু অত্যাচারের ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়াই মঙ্গলের শুভ্র আলোক-রেখা আসিয়া দেখা দেয়। ক্রীতদাসের প্রথা, প্রাচীন গ্রীসের কলঙ্ক স্বরূপ। কাজেই ড্র্যাকোর নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বড় সহজ ব্যাপার নহে। সোলান সেই অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় একজন বুদ্ধিমান রাজনীতিবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে একটা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে হইলে একদিনে তাহা সম্ভবপর হয় না। কাজেই সোলোন এথেন্সের যে সকল সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্যই হইয়াছিল।

রাঁধিবার সময় পাত্রের মুখে ঢাকা চাপা দেয় কেন ?

১৪০০ পৃষ্ঠার

বাতাস জলের উপর চাপ দিতেছে। জলে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা হইতে যে বাষ্প হয় তাহা বাতাসের চাপকে ঠেলিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যতক্ষণ না বাষ্পের চাপ বাতাসের চাপ অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ উহা অতি ধীরে ধীরে বাহির হইবে। জলে যত অধিক তাপ প্রয়োগ করিবে বাষ্পও তত অধিক জমিবে। অবশেষে যখন জলের তাপমান একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছিবে তখন জলের মধ্যে সঞ্চিত বাষ্পের চাপ বাতাসের চাপ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বাষ্প খুব দ্রুত বাহির হইতে থাকিবে এবং তাহার ফলে জলও ফুটিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু জল যখন ফুটিতে থাকে তখন উহা হইতে যে বাষ্প উঠে তাহা জল হইতে তাপ লইয়া যায় বলিয়া যতই তাপ প্রয়োগ করা যাউক না কেন জলের তাপমান আর বর্দ্ধিত হয় না। এখন যদি জলের উপরিস্থিত চাপের পরিমাণ যদি কমান বা বাড়ান হয়, তাহা হইলে উহার সহিত জলের স্ফুটনাঙ্কও কমিবে বা বাড়িবে। পাত্রের মুখে ঢাকা চাপা দিলে জল হইতে যে বাষ্প উঠিবে তাহা বাহিরে না আসিতে পারায় জলের উপরিস্থিত চাপের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে জলের স্ফুটনাঙ্ক ও বর্দ্ধিত হয়। সেইজন্য ভাত তরকারী শীঘ্র সিদ্ধ করিতে হইলে জলের তাপমান বর্দ্ধিত করা দরকার বলিয়া পাত্রের মুখে ঢাকা চাপা দেওয়া হয়।
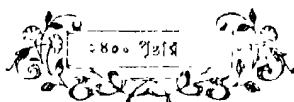
ভয় পাইলে মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যায় কেন ?

ভয় পাইলেই হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া এবং তাহার সহিত রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। রক্তের জন্য মুখের রং উজ্জ্বল দেখায়। সেইজন্য রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যাইলে মুখের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়।

আমাদের ভ্রূ থাকে কেন ?

ভ্রূ থাকার জন্য আমাদের সুশ্রী দেখায়, না থাকিলে কুৎসিত দেখাইত। আমাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভ্রূর আরও এক কাজ, আমাদের চোখকে ঘাম হইতে রক্ষা করা। পরিশ্রান্ত হইলে যখন ঘাম বাহির হয় তখন ভ্রূ না থাকিলে উহা

আমাদের চোখে পড়িত এবং দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া যাইত। শুধু তাহাই নহে, ঘাম আমাদের দেহের দূষিত বিষাক্ত পদার্থ। যদি উহা অনবরত আমাদের চোখে পড়িত তাহা হইলে আমরা অন্ধ হইয়া যাইতাম।

টাকা আধুলি প্রভৃতি মূল্যবান মুদ্রার ধার কাটা থাকে কেন?

পূর্ব্বে লোকেরা মূল্যবান মুদ্রা হাতে পাইলেই তাহার ধার ঘসিয়া উহার ধাতু বাহির করিয়া লইত। ইহাতে মুদ্রাগুলি শীঘ্র ক্ষইয়া হাল্কা হইয়া যাইত। ঘসিয়া ধাতু বাহির করা নিবারণ করিবার জন্য মুদ্রাগুলির ধার কাটা করা হইয়াছে। ইহাতে ধাতু বাহির করিয়া লইলে কাটা দাগগুলি উঠিয়া যাইবে এবং যে ব্যক্তি ধাতু বাহির করিয়া লইবে সেও ধরা পড়িবে। টাকা আধুলি প্রভৃতি হাতে আসিলে ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য যেমন বাজাইয়া লইতে হয় সেইরূপ উহার কাটা দাগগুলিও পরীক্ষা করা উচিৎ।

আমাদের নখে সাদা সাদা দাগ থাকে কেন?

কিছুদিন রোগ ভোগ করিলে আমাদের নখে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়, কারণ রোগ ভোগ করিলে রক্তের স্বল্পতা ঘটে বলিয়া নখের কোষগুলির কার্য্য সম্যকরূপে সাধিত হয় না। যে সকল ব্যক্তির শরীর সাধারণতঃ সুস্থ ও সবল নহে তাহাদের নখে প্রায়ই ঐরূপ সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।

রেল লাইনের ধারের টেলিগ্রাফ পোষ্ট গুলিতে ২৩, ১৪, ২৩ প্রভৃতি সংখ্যা লেখা থাকে কেন?

পোষ্টের গায়ের এই সংখ্যাগুলি প্রধান ষ্টেশন হইতে পোষ্টগুলির দূরত্ব নির্দ্দেশ করে এবং ইঞ্জিন-চালককে গাড়ী চালাইতে সাহায্য করে। এই সংখ্যাগুলির সাহায্যে পরবর্ত্তী ষ্টেশনের দূরত্ব নির্ণয় করিয়া ইঞ্জিনচালক সহজেই গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

কে কোথায় কবে প্রথম দর্পণের ব্যবহার করিয়াছিল?

তোমরা আজ কাল সকলেই আয়নায় মুখ দেখ। আয়নাকে আমরা বিশুদ্ধ ভাষায় দর্পণ বলি। ধাতু-দ্বারা নির্ম্মিত দর্পণের প্রচলন সব দেশেই অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের সে প্রায় চতুর্থ শতাব্দী পূর্ব্বে ধাতুনির্ম্মিত দর্পণের ব্যবহারের প্রচলন ইউরোপে ছিল। কিন্তু মুখ দেখিবার আয়না বা দর্পণের (যার পশ্চাতে পারদ মাখান থাকে)। সেইরূপ দর্পণের ব্যবহার ১৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভেনিস্ নগরে হইয়াছিল, লণ্ডনে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

পোকা মাকড়েরা কি পরস্পরের মনের ভাব জানাতে পারে?

পৃথিবীর মধ্যে পোকামাকড়েরা বড় অদ্ভুত প্রাণী। তাদের নেহাৎ যা-তা মনে করো না। কেবল জিহ্বা থাকিলে, ঠোঁট থাকিলে এবং স্বরোচ্চারণ করিবার শক্তি থাকিলেই যে মনের ভাব বিনিময় করা যায় তাহা নহে। যাদের জিহ্বা ও নাই ঠোঁট ও নাই এবং গলার স্বরও নাই, তারাও কিন্তু বেশ ভাব-[illegible] করে। পোকা মাকড়েরা তাদের পা, শুঁয়া এ সকলের স্পর্শ দ্বারা পরস্পরে ভাববিনিময় করিয়া থাকে। ধর একটা মৌচাকের ভিতরকার রাণী মৌমাছিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোথায় গেল সে? প্রথমে দুই একটি মৌমাছি সে সংবাদ জানিতে পারিল। তারপর পরস্পরে যেমন দেখা অমনি শুঁয়া দিয়া স্পর্শ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিল। এই ভাবে মৌচাকের সব মৌমাছিরা জানিতে পারিল যে তাহাদের রাণী হারাইয়া গিয়াছে। অমনি মৌচাকের মধ্যে গুঞ্জরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

মৌমাছিদের মত পিপীলিকারাও তাহাদের শুঁয়ার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তোমরা ত প্রায় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই পিপীলিকাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাক, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে কথাটি সত্য কি না?

ধাঁধা ও হেঁয়ালি

চোখের ধাঁধা

[২৩৯৮ পৃষ্ঠার পর]

চোখে যাহা দেখি তাহাকে তো আর অবিশ্বাস করা চলে না, কিন্তু চোখও যে সময়ে ভুল দেখে তাহা জান কি? আকাশে "মরীচিকা" দেখা যায়, বোধ হয় শুনিয়াছ? ইহা চোখের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ ভুল দেখার দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। যাহা আমরা দেখি, তাহার আকার প্রকার সম্বন্ধেও আমাদের চোখ অনেক সময়ই মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেয়, এবং এই ভুল ধারণাই 'চোখের ধাঁধা'। এরূপ কয়েকটা দৃষ্টান্ত তোমাদের কাছে একে একে উপস্থিত করিব।
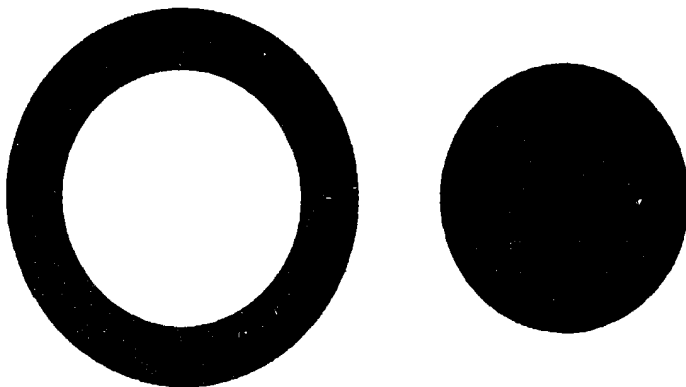
বৃত্তের আকার কালো বৃত্তের (ক) মধ্যে সাদা গোল বৃত্ত আছে, সেটি কালো (খ) বৃত্তের চেয়ে বড়ই যেন মনে হয় কিন্তু মাপিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবে যে কালো বৃত্তটিই সামান্য একটু বড়।

ছবির কথা

মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করিবার কিছুকাল পরেই, তাহার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, ছবি আঁকিবার সখ হইয়াছিল, এ কথা মনে করিবার কারণ আছে। যে সময়ে ভাষারও সৃষ্টি হয় নাই, ছবি তখন হইতেই আঁকা আরম্ভ হইয়াছে। বহু প্রাচীন গুহায়, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে,—ইতিহাসের যুগের বহুকাল আগে আঁকা প্রাচীনকালের জীবজন্তুর ছবি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। (শিশু-ভারতী ১৫২১ পৃষ্ঠা দেখ) সে সকল জন্তু পৃথিবী হইতে কোন্ কালে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু সেকালের মানুষের হাতে আঁকা (খোদাই করা) ছবি আজও তাহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। তখনকার দিনে তুলি, রং কিছুরই ব্যবহার জানা ছিল না, ধাতুর ব্যবহারও জানা ছিল না। সামান্য পাথরের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত নরম পাথরের উপর খোদাই করিয়া আদিম মানুষ তাহার চিত্রবিদ্যার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছে—বহু সহস্র বৎসর পরও সে সকল চিত্র পর্ব্বতের অন্ধকার গুহায়, কালের ধ্বংসকারী প্রভাব হইতে রক্ষা পাইয়া, সভ্যতার যুগের মানুষের কাছে ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে চিত্রবিদ্যা সভ্যতার ধার ধারে না, ভাষারও দাস নহে। অনুকরণপ্রিয় মানবের বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গেই তাহার চিত্রবিদ্যাও বিকাশ হইয়াছে।

বহু সহস্র বৎসর মানুষ, পাথর ও অন্যান্য জিনিষের উপর খোদাই করিয়া ছবি আঁকিয়াছে। নানা যুগের প্রস্তর-খোদিত লেখা, মূর্ত্তি প্রভৃতি আজও তাহার সাক্ষী। যে ছবি খোদাই করিয়া আঁকা হয় নাই, কোন্ কালে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—আজ তাহার চিহ্নও নাই। ক্রমে, বহু শতাব্দী পরে, মানুষ রংয়ের ব্যবহার শিক্ষা করিল; খোদিত মূর্ত্তিতে এবং অন্যান্য জিনিষের উপর রংয়ের সাহায্যে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল। মিশর, ব্যাবলিন, চীন এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ যে সকল ধ্বংসাবশেষ আজও রহিয়াছে, তাহা হইতে

রংয়ের ব্যবহারের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনদেশের প্রাচীন কীর্ত্তিসকলের মধ্যে

সেকালের মানুষের হাতে আঁকা ছবি

সুন্দর রঙিন বাসন ও চীনামাটির মূর্ত্তি সে যুগের চীনাদের চিত্রবিদ্যার পারদর্শিতার সাক্ষ্য।

বহুকাল প্রায় একভাবে চলার পর, কাগজের আবিষ্কার হওয়ায় চিত্রবিদ্যারও দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। ক্রমে তুলি, রঙ প্রভৃতির আবিষ্কার ও উন্নতি হইয়া কাগজে আঁকার প্রণালীর চল হয় এবং সকলের পক্ষে ছবি আঁকার উপায় সহজ হইয়া যায়।

এসকলের অনেককাল পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে রঙিন ছবি আঁকার কতটা উন্নতি হইয়াছিল, অজন্তার প্রাচীন গুহার ছবিগুলি দেখিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেকালের চিত্রকর যে প্রণালীতে পাথরের গায়ে রঙিন ছবি আঁকিতেন, সভ্যতার যুগের মানুষের পক্ষেও তাহা বিস্ময়কর। সহস্র সহস্র বৎসর যে সকল রং কালের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, আজ তাহার স্থানে স্থানে মেরামতের আবশ্যক হওয়ায় বিংশ শতাব্দীর অতি-শিক্ষিত চিত্রকর রং মিলাইতে গিয়া হার মানিয়াছেন। এতকাল স্থায়ী রং কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে এবং লাগাইতে হয়, তাহার প্রণালী সে কালের চিত্রকরেরই জানা ছিল; আজ সে সকল প্রণালী কেহই জানে না।

কাগজে ছবি আঁকার চল হওয়ার কিছুকাল পর ইউরোপে তৈল রং এর (oil-colour) সাহায্যে ক্যানভাস-কাপড়ের উপর আঁকার চল হইল। এই প্রণালীতে বৃহৎ আকারের ছবি আঁকা যায় এবং ছবি বহুকাল স্থায়ী হয়। সে জন্য আজও বহু প্রাচীন চিত্রকরের হাতের আঁকা তৈল-চিত্র নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মুরিলো, র‍্যাফেল, রেমব্রাণ্ট, টিশিয়ান, ভেলাস্কেজ, ভ্যানডাইক, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত
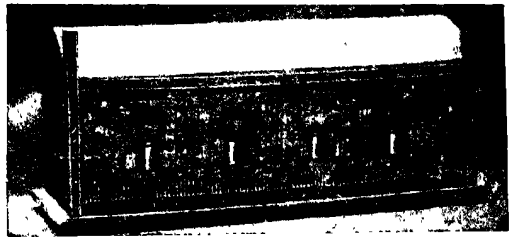
মিশরের চিত্রিত শবাধার

প্রাচীন চিত্রকরগণের আঁকা তৈল-চিত্র আজও ইউরোপের নানা চিত্রশালা অলঙ্কৃত করিয়া সে সকলের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে।
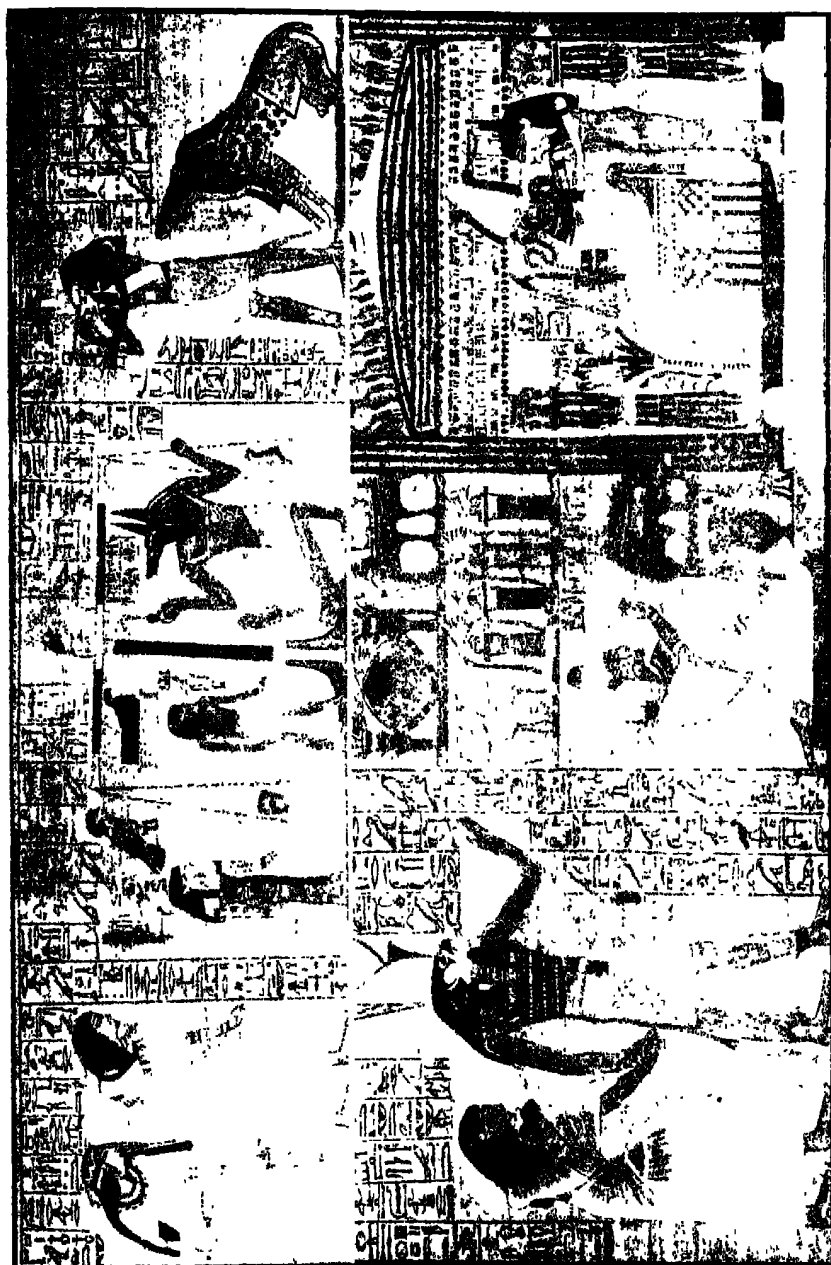
আজকাল পৃথিবীতে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—তৈল-চিত্র (তৈল রং বা oil-colourএ আঁকা) ও জল-রংএ আঁকা (water-colour) ছবি।

মিশরের চিত্রিত পাত্র

ভারতবর্ষের প্রাচীন চিত্র সবই জল-রংএ আঁকা। আধুনিক চিত্রকর কাগজ, কাঠ, রেশম প্রভৃতির উপর তৈল রংএ ছবি আঁকেন, রেশমী কাপড়, কাঠ এবং অন্যান্য জিনিষের উপরও জল-রংএ ছবি আঁকেন।

ছবি আঁকার প্রণালীর এবং শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে চিন্তা আসিল, "ছবির নকল সহজ প্রণালীতে এবং বহু সংখ্যায় কেমন করিয়া করা যাইতে পারে?" এই সমস্যার সমাধান প্রথমে চীন দেশে হইয়াছিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে কাঠ খোদাই করিয়া ছবি এবং লেখা ছাপার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। বহুকাল এই প্রণালীর বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। ক্রমে, ইহার উন্নতি হইয়া, সুন্দর ও পরিষ্কার ছাপার এবং রঙ্গিন ছবি ছাপার উপায় আবিষ্কৃত হইল। আজও জাপানে রঙ্গিন কাঠ-খোদাইএর চল আছে এবং জাপানী কাঠ-খোদাইএর ছাপা অতি সুন্দর হয়। বলা বাহুল্য, এই কাঠখোদাই ছবি ভালরূপে ছাপিতে হইলে সুদক্ষ কারিকরের আবশ্যক এবং তাহারই দক্ষতার উপর ছাপার উৎকর্ষ প্রধানতঃ নির্ভর করে। এই ছবি ছাপিতে অনেক সময়েরও আবশ্যক। এই সকল কারণে, জাপানী কাঠখোদাই ছবি সুলভে বিক্রয় হওয়া অসম্ভব।

ইউরোপেও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাঠ-খোদাইএর চল হয়। সে সময়কার দু'একজন কাঠ খোদাই শিল্পীর নাম (জার্ম্মেনীর ডুবার প্রভৃতির) আজও শুনিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কাঠ-খোদাইএর আবার চল হইয়াছে। লিনোলিয়াম, শক্ত রবর প্রভৃতির উপর খোদাইএর কাজও আজকাল অনেক দেখা যায়। এই প্রণালীতে রঙিন চিত্রের ব্লকও কাটা হইতেছে। কলিকাতার গভর্ণ-

মিশরের পাথরের তৈরী—পূজার বেদী

মেণ্ট স্কুল অব্ আর্টসের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কাঠ ও লিনো-লিয়াম খোদাইএর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীযুক্ত সুধাংশু রায় ও কাঠখোদাইএর কাজ বেশ ভাল করেন।

কাঠ-খোদাইএর পর আসিল ধাতুর উপর খোদাই। কাঠ-খোদাই অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম কাজ ধাতুর উপর করা সম্ভব এবং ধাতুর স্থায়িত্বও অনেক বেশী। সে জন্য ধাতু-খোদাইএর কাজের (Steel-Engraving, Copper-plate-Engraving প্রভৃতি) চল সহজেই হইল। কিন্তু, ছবি অপেক্ষা নানা প্রকার অক্ষর লেখার (চিঠির কাগজের শিরোনামা, প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট, প্রভৃতি) কাজেই ধাতু-খোদাই-এর ব্যবহার বেশী হইতে লাগিল।

র‍্যাফেলের আঁকা ছবি—শিশু যীশু ও সেণ্ট্ জন্

ক্রমে আসিল 'এচিং' (Etching)

নামক ধাতু-খোদাএর প্রণালী। ইহার সাহায্যে ধাতুর উপর ছবি আঁকিয়া খোদাই করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়িল। হল্যাণ্ড দেশেই এই কাজের বিশেষ উন্নতি

বিখ্যাত চিত্র শিল্পী চার্লস মেরিয়োনের এচিংয়ের আদর্শ

দেখা গেল। 'এচিং করিতে হইলে প্রথমে তামার পাতের উপর খুব পাতলা করিয়া মোম গালাইয়া লাগাইয়া লওয়া হয়। মোম শুকাইয়া গেলে তীক্ষ্ণ লোহার ছুঁচের ন্যায় একটি যন্ত্রের সাহায্যে মোমের উপর (মোম বিদ্ধ করিয়া) ছবি আঁকা হয়। যে যে স্থানে ছুঁচ চালান হইয়াছে সেখানের মোম উঠিয়া গিয়া তামা বাহির হইয়া পড়ে। তাহার পর মোমের উপর দ্রাবক (এসিড) ঢালিয়া দিলে, যে যে স্থানে তামা বাহির হইয়া পড়িয়াছে সেই সেইস্থানে তামা দ্রাবকে গলিয়া গিয়া গভীর খোদাই হইয়া যায়। ইহার পর মোম উঠাইয়া তামা হইতে ছাপা উঠান হয়।

সাধারণ ছাপার সহিত 'এচিং'এর ছাপার প্রণালীর প্রভেদ আছে। ইহার রেখাগুলি উঁচু নহে—গভীর বা নীচু। কাজেই সাধারণ প্রণালীতে ছাপা চলে না। প্রথমে পাতলা কালি তামার পাতের গায়ে মাখাইয়া দেওয়া হয়। রেখার গভীর খাদে সে কালি প্রবেশ করে, তামার মসৃণ অংশেও কালি লাগে। ইহার পর. মসৃণ অংশ হইতে কালি চাঁছিয়া উঠাইয়া লইলেই 'এচিং' ছাপার জন্য প্রস্তুত হইল। এবার চাপ দিয়া কাগজের উপর ছাপা উঠাইলেই হইল। এই প্রণালীর ছাপাকে Intaglio printing (অর্থাৎ, গভীর খাদ হইতে ছাপা) বলে।

আজও পৃথিবীর সর্ব্বত্র 'এচিং'এর চল রহিয়াছে। আমাদের দেশে, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে, 'এচিং' বিদ্যায় বিশেষ

এচিংয়ের আদর্শ যীশুখৃষ্টের প্রচার

পারদর্শী। এ দেশে তিনিই প্রথমে 'এচিং'-এর কাজ ইউরোপ হইতে শিখিয়া আসেন।

'এচিং', কাঠ-খোদাই, ধাতুর উপর খোদাই প্রভৃতি ছাপা বহুকাল হইতে

প্রচলিত। এই সকল প্রণালীর ছাপার নানা প্রকার রকম-ফের করিয়া সুন্দর রঙিন ও একরঙা ছবি হল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ছাপা হইতেছে। Baxtertype, Mezzotype, Mezzotint প্রভৃতি নামে এই সকল ছাপা পরিচিত।

ক্রমে, আলোক-চিত্র বা ফটোগ্রাফির যুগ আসিল। তখন হইতেই নানা দেশের বৈজ্ঞানিক এবং চিত্রকরেরা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ফটোগ্রাফির সাহায্যে কেমন করিয়া ছবি খোদাই করা যায়?" তাহা হইলে, ছবির অবিকল নকল লওয়ার সুবিধা হইবে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ছবি খোদাইও হইয়া যাইবে।

এই যুগের প্রারম্ভে (প্রায় ১১০ বৎসর পূর্ব্বে) সেনেফেল্ডার নামক এক জার্ম্মান লিথোগ্রাফির আবিষ্কার করেন। সেনেফেল্ডার তামার উপর হাতে এবং দ্রাবকের সাহায্যে খোদাই করিয়া গানের স্বরলিপি ছাপিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, পাথরের উপর খোদাই করিয়া ছাপিবেন, এবং সে বিষয় লইয়া নানারূপ পরীক্ষাও করিতে লাগিলেন। একদিন একখণ্ড পাথর লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ধোপার একটি হিসাব লিখিয়া রাখা আবশ্যক হইল। হাতের কাছে অন্য কিছু না থাকায় একখণ্ড পাথরের উপর তেলা কালির সাহায্যে ধোপার হিসাবটি লিখিলেন। কাজ হইয়া গেলে, কালি তুলিয়া ফেলার পরও পাথরের উপর লেখাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। জল দিয়া ধুইয়া দেখিলেন, লেখার স্থানে জল লাগিল না। কৌতুহল হওয়ায়, খানিকটা পাতলা তেলা ছাপার কালি পাথরের উপর লাগাইলেন। যে স্থানে লেখা ছিল সেখানে কালি লাগিল; অন্য জায়গা

ষ্টীল এনগ্রেভিংএর আদর্শ—মাদ্রাজের প্রাচীন চিত্র

জলে ভিজান থাকায় তেলাকালি সেখানে লাগিল না।

তখন হইতে সেনেফেল্ডার এই বিষয় লইয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই "লিথোগ্রাফি"

সেনেফেল্ডার

নামক পাথর হইতে ছাপার প্রণালীর চল হইল।

'লিথো (litho) অর্থাৎ পাথর। 'লিথোগ্রাফি'র ছাপা পাথরের উপর হইতে কাগজের উপর তোলা হয়। ছাপার পাথরে কোনরূপ উচু নীচু খোদাই থাকে না। পাথরের যে যে অংশে ছবি থাকে, পাথরে জল লাগাইলে সে সকল অংশে জল লাগে না—বাকি অংশ জলে ভিজিয়া যায়। তাহার পর তেলা কালি পাথরের উপর লাগাইলে, ভিজা অংশে কালি লাগে না, কারণ "তেলে জলে মিশ খায় না"। বাকি অংশ (অর্থাৎ, যে অংশে ছবি থাকে) কালি-মাখা হইয়া যায়। তাহার পর, পাথরের উপর ছাপার কাগজ রাখিয়া কলের সাহায্যে চাপ দিলেই ছাপা উঠিবে।

লিথোগ্রাফির ক্রমোন্নতি হইয়া সুন্দর রঙিন লিথো (Chromolitho) ছাপা হইতে লাগিল এবং বড় বড় পাথর হইতে খুব বড় ছবিও ছাপা হইতে লাগিল। ছাপার কল, কালি ও সরঞ্জামের বহু উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সেনেফেল্ডারের আবিষ্কৃত প্রণালীতে আজও লিথো ছাপা হইয়া থাকে;—গত বৎসরে তাহার অতি সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র হইয়াছে।

বর্ত্তমানে, পাথরের পরিবর্ত্তে দস্তার চাদরের উপর লিথো ছাপার প্লেট তৈয়ারী হয়। ইহার নাম 'লিথোগ্রাফি'র পরিবর্ত্তে প্লেনোগ্রাফি' (Planography)—অর্থাৎ সমতল জমি হইতে ছাপা—রাখা হইয়াছে।

আজকাল, ফটোগ্রাফির সাহায্যে আঁকা ছবি হইতে বা ফটোগ্রাফ হইতে লিথো ছাপার প্লেট (পাথরে বা দস্তায়) প্রস্তুত করা হয়; একই ছবির ৮-১৬-৩২ বা ততোধিক নকল একই পাথরে বা দস্তার চাদরে ছাপিয়া ছাপার খরচ অনেক পরিমাণে সংক্ষেপে করা হয়।

লিথো-বা প্লেনোগ্রাফি সম্পর্কে 'অফসেট' (Offset) ছাপার কথা বলা আবশ্যক। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ছাপার চল হয়। সাধারণ ছাপার সহিত এই ছাপার

প্রভেদ এই যে, 'অফ্‌সেট' ছাপায় প্রথমে রবারের উপর ছাপা উঠাইয়া, রবারের উপর হইতে কাগজে ছাপা উঠান হয়। কাগজ মসৃণ না হইলেও তাহার উপর 'অফ্‌সেট' ছাপা খুব সুন্দর উঠে। সাধারণ লিথো অপেক্ষা 'অফ্‌সেট' ছাপা অনেক দ্রুত হওয়াও সম্ভব।

লিথো ছাপার প্রচলনের কয়েক বৎসর পর তামার উপর গভীর-খোদাই ছাপার (Intaglio-Printing) আরও উন্নতি হইল। ফটোগ্রাফের সাহায্যে, তামার পাতের উপর গভীর ছাপার প্লেট প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে মানুষ প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাড়ী-ঘর, জিনিষপত্র প্রভৃতির সুন্দর ছবি ছাপা হইতে লাগিল। এই ছাপার নাম হইল "Photogravure"।

এই প্রণালীতে ছাপা পূর্ব্বে অনেক সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ছিল। প্লেটের সমতল স্থান হইতে কালি ঘষিয়া তোলার ব্যাপারটিই ছিল একটি কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ কাজ। ক্রমে 'রোটারি ছাপার প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্লেটখানি একটি চোঙ্গার গায়ে খোদাই করিয়া চোঙ্গার গায়ে লম্বালম্বিভাবে একটি ছুরি বসাইয়া, কলের সাহায্যে অতি সহজে এবং দ্রুত কালি চাঁছিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার ফলে ছাপা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভবপর হইল। এই প্রণালীতে ছাপা ছবি ফটোগ্রাফের ন্যায় মোলায়েম এবং সুন্দর হয় বলিয়া ইহার আদর খুব বেশী হইয়াছে। ইহার নাম Ratogravure (Rotray এবং Photogravure এই দু'টি কথার সংযোগে) রাখা হইয়াছে।

আমরা সচরাচর মাসিক পত্রিকাদিতে যে সকল ছবি দেখি, তাহার অধিকাংশই 'হাফটোন' এবং 'লাইন' প্রণালীতে উচু-খোদাই করা 'ব্লক' বা প্লেট হইতে ছাপা—তামা বা দস্তার পাতে এ সকল ব্লক প্রস্তুত হয়। ইহাও ফটোগ্রাফির সাহায্যেই হইয়া থাকে।

'হাফটোন' ব্লক (অর্থাৎ, যে ব্লকে 'হাফ' বা সাদা-কালোর মাঝামাঝি 'টোন' বা

লিথো-চিত্র

আভাসকল উঠান যায়) প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ক্যামেরার মধ্যে, প্লেটের সম্মুখে একটি কাচ (Screen) লাগান হয় যাহার উপর আড়াআড়িভাবে (Cross-lines) অতি সূক্ষ্ম কালো লাইন (জালির মতন) টানা আছে। এই ক্যামেরায় কোনও ফটো বা আঁকা ছবির ছবি বা 'নেগেটিভ' তুলিলে ছবিখানিতে আগাগোড়া

ছোট-বড় অতি সূক্ষ্ম ফুটকি বা দানা দেখা যায়। এই ছবি বা নেগেটিভ হইতে তামা বা দস্তার পাতের উপর ছবি তোলা হয়। সেই ছবি আরক বা দ্রাবকের সাহায্যে খোদাই করিলে হাফটোন ব্লক প্রস্তুত হইল। সাধারণ কাগজে (সংবাদপত্র প্রভৃতিতে) ছাপার জন্য মোটা জালির কাচ (ইঞ্চি প্রতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় [মোটা স্ক্রীনের ছবি]

৬০ হইতে ৮৫ লাইন) ব্যবহার করা হয় এবং ভাল কাগজে ছাপাবার সূক্ষ্ম কাজের জন্য সূক্ষ্ম জালির কাচ (১০০ হইতে ২০০ লাইন) ব্যবহার করা হয়।

রঙিন ছবির রঙিন নকল ছাপার জন্য তিনখানি হাফটোন ব্লক প্রস্তুত করিতে হয়। সব ছবিরই মূল রং তিনটি—হলদে, লাল ও নীল। ছবিতে যে রংই ব্যবহার করা যাউক না কেন, ঐ তিনটি রংএর সাহায্যে সেই রংএর নকল করা যায়;—যেমন, লাল এবং নীল মিলাইয়া বেগুনি; নীল এবং হলদে মিলাইয়া সবুজ; লাল এবং হলদে মিলাইয়া কমলা রং; লাল, নীল এবং হলদে বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া মেটে, ধূসর, কালো প্রভৃতি রং করা যাইতে পারে। মূল ছবির যেখানে যে পরিমাণ হলদে, লাল এবং নীল রং আছে, তাহার তিনটির যদি আলগা ফটো লইয়া তাহাদের ব্লক করা যায় এবং সেই তিনটি ব্লক যথাক্রমে হলদে, লাল এবং নীল কালিতে পর-পর (একের উপর অন্যটি) ঠিক মিলাইয়া ছাপা যায় তাহা হইলে মূল ছবির অবিকল নকল পাওয়া যায়।

যে সকল ছবিতে শুধু রেখা বা লাইন এবং গাঢ় কালো অংশই থাকে (মাঝামাঝি কোনও আভা থাকে না) তাহার ব্লক করিতে হইলে জালিদার কাচ ব্যবহার করার আবশ্যক হয় না। সাধারণ ফটোর মত নেগেটিভ করিয়া তাহা হইতে দস্তা বা তামার ব্লক প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল। ইহাকে 'লাইন ব্লক' (Line-Block) বলে।

"শিশু-ভারতীর" মলাটের রঙিন ছবির প্লেট প্লেনোগ্রাফি প্রণালীর ও "অফসেট" প্রণালীতে ছাপা। ভিতরের রঙিন ছবিগুলি হাফটোন প্রণালীতে প্রস্তুত। লেখার সঙ্গে ছাপা যে সমুদয় ছবি দেখিতে পাও সে ছবিগুলির ব্লক লাইন ও হাফটোন প্রণালীতে প্রস্তুত।

গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস্

১৪১৯ পৃষ্ঠার পর

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মগধের নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাগমনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি গ্রীসের সেনাপতিদিগকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাবে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন এবং তৎপরে তাঁহার মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া লন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিদিগের ভিতর বিভক্ত হয় এবং ভারতবর্ষের নিকটস্থ সিরিয়া প্রদেশে **সেলিউকাস্ নিকেটর্** নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে পুনরায় গ্রীক আধিপত্য স্থাপন করার ইচ্ছা স্বতঃই তাঁহার মনে উদিত হয় এবং একটা প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিমতে চন্দ্রগুপ্ত কয়েকটি নূতন প্রদেশ প্রাপ্ত হন ঐ প্রদেশগুলি বর্তমান সময়ে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান নামে পরিচিত। চন্দ্রগুপ্ত তৎপরিবর্তে সেলিউকাস্‌কে মাত্র ৬০০ হস্তী উপঢৌকন দেন। এই সময় হইতে সিরিয়া ও মগধের রাজবংশের ভিতর বিশেষ সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। সেলিউকাস এই বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে তাঁহার বিখ্যাত রাজদূত মেগাস্থিনিস্‌কে প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে ও মৌর্যবংশীয় রাজাদের সহিত প্রতীচ্যদেশীয় রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের পর বিন্দুসার এই মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মিসর, সিরিয়া, ও মেসিডোনিয়া প্রভৃতি গ্রীক রাজাদের দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার অনুশাসনে উল্লিখিত আছে। রাজারাও তাঁহাদের দূত এদেশে প্রেরণ করিতেন; তন্মধ্যে তিনজনের সহিত আমরা পরিচিত। সেলিউকাস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় **মেগাস্থিনিস্** ও তৎপুত্র বিন্দুসারের নিকট **ডেইমেকাস্‌কে** প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিসরের গ্রীক রাজা টোলেমীর দূত
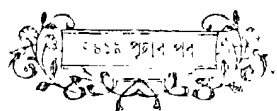
পরিচিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত বহু যোগী-সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। মেগাস্থিনিস্ কিছু কিছু দার্শনিক মতবাদও উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ। তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম মহারাজ অশোকের সময়ের ন্যায় জনপ্রিয় ছিল না। বোধ হয় সেইজন্য তিনি শ্রমণদের উপদেশের বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করেন নাই।

যোগী সম্প্রদায়ের বিষয়ে গ্রীক রাজদূত যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মেগাস্থিনিসের লিখিত মূল গ্রন্থখানি লোপ পাওয়ায় আমরা ঠিক ধারাবাহিকরূপে তাঁহার মতামত এবং বিবরণ পাই নাই। কিন্তু মেগাস্থিনিসের বিবরণের সহিত অশোকের অনুশাসনাবলী ও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের লিখিত অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থের তুলনামূলক বিচারের ফলে তৎকালীন সমাজের একটা স্পষ্ট চিত্র পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মেগাস্থিনিসের বিবরণ সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থখানা আবিষ্কার হওয়ায় পর সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সাধারণতঃ সে সময়ের লোকেরা সুখে-স্বচ্ছন্দেই সময় কাটাইত এবং সভ্যতার যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল এবং বিভিন্ন দূরবর্ত্তী দেশের সহিত ও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য বিষয় দুইটা শাসন কার্য্যের অতীব সুচারু বন্দোবস্ত এবং দেশবাসী লোকের সততা ও বুদ্ধিমত্তা।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে আমরা সেকালের ভারতবাসীর যে পরিচয় পাই তাহাতে আমাদের গৌরব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন :—রাজধানী পাটলিপুত্র খুব বড় সহর ছিল। শোণ ও গঙ্গা এই দুইটি নদীর তীরে এই সহর অবস্থিত ছিল। রাজা নানারূপ শিল্পকার্য্য করা সুন্দর বাড়ীতে বাস করিতেন। রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল এবং সোণালি কারু-কার্য্যও ছিল। লোকে ঘরের কপাট বন্ধ না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইত। দেশের লোকেরা খুব সাহসী, বিশ্বাসী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। সমাজে জনসাধারণ বিশেষ স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিত। দাসত্ব প্রথা একেবারেই ছিল না।

চুরি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান, কলহ, বিবাদ মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি একান্ত বিরল ছিল। কৃষক এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায় শান্ত, কর্ম্মী এবং শ্রমনিপুণ ছিলেন। প্রাচীন ভারত রাষ্ট্রনীতিতে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে তাহার স্পষ্ট বিবরণ জানিতে পারি। বর্ত্তমান যুগে যেমন নানারূপ সুনিয়মিত বিধি-ব্যবস্থা ও বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সে সময়েও এইরূপ ছিল। সে কালের মন্ত্রিগণ রাজ্যশাসন সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। রাজা তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতেন। কোনরূপ গুরুতর রাজকার্য্য সমাধানের জন্য একটি মন্ত্রণা পরিষদ ছিল। রাজা, মন্ত্রী ও পরিষদবর্গকে মিলিত করিয়া সভা আহ্বান করিতেন এবং তাঁহারা যে মীমাংসায় আসিতেন তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। রাজা কখনও জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না। তিনি আপনাকে রাজ্যের একজন বেতনভুক্ রক্ষাকারী রূপে প্রজার কল্যাণের জন্য আত্মশক্তি নিয়োগ করিতেন। চন্দ্রগুপ্তের বিস্তৃত সাম্রাজ্য অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সাধারণতঃ রাজপরিবারভুক্ত (কুমারেরা) ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হইতেন। গ্রাম্য শাসনবিধি গ্রামিকদের হাতে সমর্পিত ছিল। গ্রামবাসীরা বোধ হয় সম্মিলিত হইয়া গ্রামিক নিযুক্ত করিত।

মেগাস্থিনিসের জীবনী সম্বন্ধে আমরা তেমন কিছু জানিতে পারি না। নাই বা জানিলাম কিন্তু তাঁহার বিবরণী হইতে আমাদের দেশের যে গৌরবময় চিত্র জানিতে পারি তাহাতে আমাদের যে কত বড় গৌরব করিবার আছে তাহা এই বিবরণী হইতে সহজেই বুঝিতে পার।

রবিন হুড্

১০৭ পৃষ্ঠার পর

ইংলণ্ডের রাজা, সে সময়ে একদিন শেরউড্ বনের মধ্যে একটি সুন্দর বালক ছেলে ও একটি সুন্দরী মেয়েকে বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। ছেলেটির নাম রবার্ট দি আর্ল অব হান্টিংডনের পুত্র আর মেয়েটির নাম ম্যারিয়ান—লর্ড ফিটজওয়াল্টারের কন্যা। রবার্ট ও ম্যারিয়ান দুইজনেই শেরউড্ বনের সবুজ শোভা, ফুলে ফলে ভরা তরুশ্রেণীর সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসিত, তাই দুইজনে যখনই সুযোগ পাইত, তখন এখানে বেড়াইতে আসিত। রবার্ট ও ম্যারিয়ান্ দুইজনের মধ্যে ছিল খুব ভালবাসা। বিবাহের পর তাহাদের জীবন কতই না আনন্দের মধ্য দিয়া কাটিবে, সে সব কল্পনা লইয়া তাহারা দুইজনে বিভোর হইয়াছিল—দুইজনেরই বয়স খুব কম, কাজেই তাহাদের হৃদয় ছিল উৎসাহ ও আনন্দে ভরা।

মানুষ যাহা ভাবে তাহাত আর হয় না। রবার্ট ও ম্যারিয়ানের সুখের স্বপ্নও মিলাইয়া গেল। রিচার্ড সে সময়ে প্যালেষ্টাইনে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। তাঁহার ভাই জন ল্যাকল্যাণ্ড (John Lackland) তখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ল্যাকল্যাণ্ড লোকটি বড় ভাল ছিলেন না। একদিন যে কোন কারণে যে কোন লোক তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছে বা কাজ করিয়াছে—তিনি এইবার খোঁজ পাইয়া তাহাদিগের প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে হাণ্টিংডনের আর্ল রবার্টের পিতাকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। রবার্ট চোখের সামনে দেখিতে পাইল যে—একদিনের মধ্যে তাহার বাবাকে হত্যা করা হইল, তাহাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করা হইল, তাহাদের ধনসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল—আর সে হইল গৃহহীন বন্ধুবান্ধববিহীন বে-আইনী লোক।

কোন রকমে জনের সৈন্যদের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া রবার্ট গভীর বনে পলাইয়া গেল। সেই বন তাহার অতি প্রিয় শেরউড্ (Sherwood)। সেখানে যাইয়া যখন সে আপনাকে নিরাপদ মনে করিল, তখন বনের সবুজ তৃণের উপর তাহার সাধের তীর-ধনু ফেলিয়া রাখিয়া মনের দুঃখে খানিক ক্ষণ কাঁদিল! কেন তাহার অদৃষ্টে এত দুঃখ-দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল! —কেন?—কেন তাহার এই বিপদ!

পরেরদিন সকাল বেলা নতুন দিনের নূতন আলো তাহার প্রাণে নতুন আশার বাণী জাগাইয়া দিল। সে ভাবিয়া স্থির করিল, কি ভাবে কেমন করিয়া তাহার দিন কাটাইবে। সে দেখিল সোণালি রবির আলো গাছের ডালে ডালে সোনা ছড়াইয়া দিয়াছে। সে শুনিল পাখীরা মধুর স্বরে গান গাহিয়া যাইয়া তাহাকেই যেন বন্দনা করিতেছে। তার কাছে এই বন আবাসের মত এই নিবিড় বন নিরাপদ স্বর্গ রাজ্য বলিয়া মনে হইল। সেদিন সেই সুন্দর প্রভাতে সে প্রতিজ্ঞা করিল আজ হইতে আমি স্বাধীন, আজ হইতে আমার পণ হইল এই অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া। আর আজ হইতে আমার নাম হইল শেরউড বনের রবিনহুড (Robin of Sherwood) তাহার এই সব দস্যুতার কথা, মারিয়ান্‌কে সে লিখিয়া জানাইল—তাহার মত একজন দস্যুর সহিত যে মারিয়ানের বিবাহ হইতে পারে না, সেই কথাটিও লিখিয়া জানাইতে তাহার প্রাণ বেদনায় যে কতখানি কাতর হইয়া পড়িয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

রবিনহুডের বেশীদিন একা শেরউড বনে বাস করিতে হইল না। তাহার পিতার অধীনে যে সকল সাহসী বলিষ্ঠ প্রজা বাস করিত, তাহারা সব দলে দলে আসিয়া রবিনহুডের সঙ্গী হইল তাহারাও তাহারই মত আউট ল হইল। রবিনহুডকে তাহারা তাহাদের রাজা মানিয়া লইল। এই দলের লোকেরা সকলেই ছিল বিখ্যাত তীরন্দাজ। নটিংহামের কাছাকাছি এইদলের লোকেরা রাজার শাসন না মানিয়া হাসিয়া খেলিয়া বনের মধ্যে শিকার করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। এইভাবে রবিনহুডের অধীনে শেরউড বনের মধ্যে একটা মস্তবড় দল গড়িয়া উঠিল।

এখন কথা হইল এই দলের লোকেরা কেমন করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে? কোথা হইতেই বা টাকাকড়ি আসিবে?

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে ইংলণ্ডের পথঘাট তেমন ভাল ছিল না। সেই সব পথ দিয়া সে সময়ে গির্জার যাজকেরা ধনী-মহাজনেরা বণিকেরা ও সম্ভ্রান্ত বণিকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া চলাফেরা করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে টাকাকড়ি ধনরত্ন সব থাকিত। খাদ্য দ্রব্যাদির সব বড় বড় দলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে থাকিত। রবিনহুড তাহার দলের লোকদের বলিলেন—দেখ, এই সব লোকদের বোঝার ভার আমরা যদি হাল্কা করে দিই, তাহলে আমাদের খাওয়া পরার কোন ভাবনাই থাকবে না। আমরা এদের প্রাণেও মারবোনা, শারীরিক নির্যাতনও করবোনা, শুধু এদের বোঝার ভার না বইবার মত ব্যবস্থা করে দিব—আর কি করে তা করতে হবে, তার ভার আমিই নিলাম সবদের আগে। দলের সকলেই রবিনহুডের সঙ্গে একমত হইলেন।

একদিন রবিনহুড এবং ধর্মযাজকের ছদ্মবেশে দুইজন যাজককে তাহাদের আড্ডার কাছে আনিলেন এবং তাহাদের কাছে যে প্রচুর সোনার মোহর লুকানো ছিল তাহা কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন—তোমরা বাপু যাজক মানুষ তোমাদের এই ধন দৌলত দিয়ে দেবের উপাসনা করবো।

জীবনে আর মিথ্যা কথা বল্‌বেনা

তোমাদের এমন টাকা কড়ির বোঝা বয়ে আর কি হবে?—বেচারা যাজক দু'জন এইরূপ শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়া দুই ঘণ্টা কাল হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, মোটা

ছিলেন আর কি। অতি কষ্টে তিনি পালাইতে পারিয়াছিলেন। ছোট জনের ত ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তারপর বেচারা আহত ও হইয়াছিল,—শেষটায় মাক তাহাকে অনেক দূর পর্যন্ত পিঠে লইয়া আসিয়াছিল তাই সে সে যাত্রায় বাঁচিতে পারিয়াছিল!

একদিনের কথা বলিতেছি। রবিনহুড্ আপনার মনে ঘোড়ায় চড়িয়া বনপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। দুইজনে বাধিয়া গেল একটা দ্বন্দ্ব। তরুণ যুবকটি আহত হইলেন। রবিনহুড্ প্রকৃত বীরের মত আহত ব্যক্তির কাছে

মাক্ ছোটজনকে পিঠে করিয়া নিতেছে

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া যেমন তাহাকে পরীক্ষা করিতে যাইবেন ঠিক সেই সময়ে যুবকের শিরো-স্ত্রাণটি পড়িয়া গেল দেখা গেল যে যুবক আর কেহই নহে **ম্যারিয়ান্**। ম্যারিয়ান্ পুরুষের ছদ্মবেশে আসিয়াছে রবিনহুডের সঙ্গে মিলিত হইতে। তখন দুইজনের প্রাণে যে কিরূপ আনন্দ হইল তাহা সহজেই বুঝিতে পার। ম্যারি-য়ান্‌কে লইয়া রবিনহুড্ তাহাদের আবাসস্থানের কাছে আসিয়া শিঙ্গাধ্বনি করিলেন, অমনি তাহার দলের লোকেরা নানাদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেখানে মিলিত হইল। তারপর এক শুভদিনে তাহাদের দলের পাদ্রী টাক্ ম্যারিয়ানের সহিত রবিনহুডের বিবাহ দিলেন। দলের লোকেরা রবিন-হুড্‌কে রাজা এবং ম্যারিয়ানকে মানিয়া লইলেন তাঁহাদের দলের রাণী।

আর একদিনের একটি ঘটনা শোন। এ্যালান-আ-দেল নামে একজন যুবকের সহিত একদিন রবিনহুডের দেখা হইল। রবিনহুড্ তাহার কাছে শুনিতে পাইলেন, যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে সে মেয়েটির বাবা ভয়ানক কৃপণ ও অর্থলোলুপ সে তাহার মেয়েকে টাকা কড়ির লোভে মেয়েটির দাদা ম'শায়ের বয়সী এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিতেছেন। পরের দিনই এই বিবাহ হইবে। বেচারা এ্যালান-আ-দেলের দুঃখে রবিনহুডের মনে খুবই কষ্ট হইল। রবিনহুড্ বলিল, কিছু ভাবনা নেই তোমার, বেশ মজা করে খাও দাও আর ঘুমাও।—পরের দিন রবিনহুড্ দল বাধিয়া চলিলেন সেই বিবাহ রোধ করিবার জন্য। পুরোহিত মহাশয় বিবাহের মন্ত্র পড়াইতেছেন, ঠিক সে সময়ে যাজক টাক্, এ্যালান-আ-দেলকে লইয়া গীর্জ্জায় হাজির হইলেন। পুরোহিতকে বলিল,—আপনার বর বড় বুড়ো, এই মেয়ের সঙ্গে একেবারেই মানায় না। তারপর মেয়েটিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—দেখ দেখি বাছা! ইহার মধ্যে কাহাকে তোমার পছন্দ হয়। না বলিলেও চলে যে সে এ্যালান-আ-দেলকেই মনোনীত করিল। টাক এইবার পুরোহিত হইয়া তাহাদের দুইজনকে বিবাহ দিল।

একবার রবিনহুড্ একজন গাড়োয়ানের পোষাক পরিয়া নটিঙ্গহামের বাজারে যাইয়া মালপত্র বেচিয়া আসিয়াছিল। আর একবার একজন মাংস-বিক্রেতার সহিত পোষাক বদলাইয়া মাংসবিক্রেতা সাজিয়া সহরের লোকদের কাছে অতি সস্তা দামে মাংস বেচিতে লাগিল।

নটিঙ্গহামের শেরিফ একথাটা শুনিয়া ভাবিলেন এই বোকা লোকটাকে ঠকাইতে হইবে। তাই তাহাকে ডাকিয়া আপনার কাছে বসাইয়া বলিলেন—হাঁ হে তোমার কত বিঘা জমি-জমা আছে?

এই দু'শো বিঘে আন্দাজ!

কতগুলি গরু হবে?

উঃ সে কি আর বলবো—কমসে কম হাজার দু'হাজার, আর সেগুলো শিংওয়ালাও বটে!

শেরিফ লোকটি ছিলেন ভয়ানক কৃপণ। তাঁর মনের ভাবটা ছিল এই রকম, যদি কোন রকমে বোকা কসাইটাকে ঠকাতে পারি, তবে বেশ হয়। আর রবিনহুড্ ভাবিতেছিল, কেমন মজা! যে তাঁহাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাতে চায়, সেই বিনা আদর করে তার পাশে বসিয়েছে। পাছে অন্য লোকে শুনিতে পায়, এজন্য শেরিফ বলিলেন, ওহে একটু আস্তে আস্তে কথা বলো—আচ্ছা মার জমিজমা, আর গরু বাছুর সব ব

রবিনহুড ও কসাই

টাকা হ'লে বেচতে পারো?—সে মশাই তিন হাজার টাকার কমে হবে না!

শেরিফ ভাবিলেন, এমন সস্তাদরে জমিদারির মত এত বড় একটা খামার ছাড়া যায় না। তাই পরদিন সকাল বেলা এই বোকা কসাইয়ের সঙ্গে জমি-জমা ও গরু বাছুর দেখিতে চলিলেন। এইভাবে দুইজনে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন—শেষটায় যখন সেরউড্ বনের কাছাকাছি আসিলেন, তখন শেরিফের চৈতন্য হইল,—হাঁ হে, এ কোথায় এলে?

রবিনহুড্ বলিল—সেরউড্ বন মশায়!

শেরিফ ভীতভাবে চুপি চুপি কহিলেন, কাজটা বড় ভাল করলে না, এখানে একজন খুব দুষ্ট লোক থাকে, জান তার নাম?

আজ্ঞে না!

তার নাম হচ্ছে রবিনহুড্। ভয় হচ্ছে যদি তার হাতে পড়ি! রবিনহুড হাসিয়া বলিল, সে ভয় করবেন না। ক্রমেই দু'জনে গভীর বনের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দলে দলে হরিণেরা সব এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। রবিনহুড্ বলিল, কেমন দেখলেন? এত শিংওয়ালা সব গরু ছুটে পালাচ্ছে!

সে দিন শেরিফ মহাশয়কে তিন হাজার টাকা দণ্ড দিয়া অনেক রাত্রিতে নটিংহামে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

রবিনহুডের আর একজন প্রধান শত্রু ছিলেন হেরফোর্ডের ধর্ম্মযাজক। এ্যালান-আ-ডেলের সেই বিবাহের ব্যাপারটা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। একবার একদল সৈন্য সঙ্গে লইয়া অনেক টাকা-কড়ি লইয়া হেরফোর্ডের পুরোহিত মহাশয়কে একটা দূরবর্ত্তী মঠে যাইতে হইয়াছিল, যাইবার পথ ছিল সেই সেরউডবন। এই ধর্ম্মযাজকের মনে এই ভাবটাও ছিল যে যদি এই সুযোগে রবিনহুডকে ধরিতে পারি তাহা হইলে বেশ একটা মোটা বর্খশিস্ মিলিবে। দৈবের ঘটনায় সেদিন একাকী আপনার মনে রবিনহুড্ বন-পথে বেড়াইতেছিলেন। ঠিক সেই পথেই হেরফোর্ডের যাজক দল-বলে যাইতেছিলেন। রবিনহুড্ এই ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সৈন্যেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পেছনে ছুটিতে লাগিল। রবিনহুড্ প্রাণ ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটি গরীব স্ত্রীলোকের কুটীরের কাছে আসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটিকে তাহার বিপদের কথা জানাইয়া বলিল যে, হেরফোর্ডের যাজক মহাশয় এখনি আসিয়া পড়িতেছেন। তুমি এখানে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাক—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি যাজকের অত্যাচারের কথা বেশ ভাল ভাবেই জানিত, কাজেই একদিকে রবিনহুডের জীবন রক্ষা অন্যদিকে যাজককে জব্দ করা, কাজেই বৃদ্ধা বেশ প্রফুল্ল মনে রবিন-

হুডের ও বস্ত্র-বিনিময় করিল। সৈন্যেরা আসিয়া বৃদ্ধাকেই রবিনহুড্ মনে করিয়া লইয়া চলিল। এদিকে খানিক দূর অগ্রসর হইলেই তাহারা দেখিতে পাইল যে রবিনহুড্ ও তাহার সঙ্গীরা তীর-ধনুক হাতে করিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যাজক ভীতভাবে কহিলেন—এই ধন-সম্পত্তি স্যান্টমেরি মঠের জন্য আমরা বহন করিয়া নিতেছি।

রবিনহুড্ বলিলেন এই ধন-সম্পত্তি সব দীন-দুঃখীদের প্রাপ্য, যাহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের টাকা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও!

অসহায় যাজক তাহাই করিলেন।

একবার একজন গরীব ভদ্রলোককে রবিনহুড্ দুই হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটি একজন কৃপণ ও সুদখোর পুরোহিতের নিকট হইতে ঐ টাকাটা ধার করেন। পুরোহিত-মহাশয় একজন বিচারককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং কিভাবে দলিল পত্র লেখা পড়া করিয়া ঋণদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকটির নিকট

সুদখোর পুরোহিতের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল

হইতে তাহার জমি-জমা আদায় করিয়া দলিল পত্র লেখাইয়া নিবেন, তিনি এইরূপ আয়োজন করিতেছিলেন—ঠিক্ সেই সময়েই ভদ্রলোক তাহার ঋণের দুই হাজার টাকা পুরোহিত মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন। পুরোহিতের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল!—ভদ্রলোক সারা জীবন রবিন-

রবিনহুড্ ও ফিরোদার

হুডের • করিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিতেন।

ফাউনটেন নামে একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন যাজক ক্রিষ্টোফার। দৈবক্রমে এই বীর ও যোদ্ধা যাজকের সঙ্গে রবিনহুডের একটা প্রতিযোগিতা-মূলক লড়াই চলিয়াছিল। রবিনহুড্ যতবার তীর ছোঁড়েন ততবারই ক্রিষ্টোফার তাহার ঢাল দিয়া উহা আটকাইয়া ফেলেন। তারপর দুইজনে অসিযুদ্ধ হইল। উভয়ে সমানে সমান হইলেন—ইহার পর হইতে দুইজনে দুইজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন।

সিংহবিক্রম রাজা রিচার্ড প্যালেষ্টাইন হইতে ফিরিয়া আসিয়া রবিনহুড্ সম্বন্ধে এ ধরণের নানা গল্প শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কতবার তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া সেরউড-বনপথে যাতায়াত করিলেন, কিন্তু একদিনও রবিনহুডের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল না। সকলের পরামর্শে একবার রিচার্ড পুরোহিতের পোষাক পরিয়া সেরউড্ বনে যাইতেই রাজার সহিত রবিনহুডের দেখা হইল। রবিনহুড্ যেমন

ছদ্মবেশী রাজাকে ধরিতে গেলেন, অমনি তিনি তাহাকে এমন জোরে একটা ধাক্কা দিলেন যে রবিনহুড্ মাটিতে পড়িয়া গেল।

রবিনহুড্ ও তাহার দলের লোকেরা এই পুরোহিত মহাশয়কে খুব আদর যত্ন করিল এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও করিল প্রচুর পরিমাণে। খাইতে খাইতে রাজা তাঁহার হাতের আংটি দেখাইয়া বলিলেন, যদিও তিনি একজন ধর্মযাজক তবু তিনি আসিয়াছেন রাজার দূতরূপে। তখন রবিনহুড্ ও তাহার দলের সকলে মিলিয়া উচ্চৈস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া বলিল 'ভগবান রাজা রিচার্ডকে দীর্ঘজীবী করুন।'

রবিনহুড ও তাহার দলের লোকদের এইরূপ রাজভক্তি দেখিয়া রিচার্ড আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না, আপনার পরিচয় দিলেন। তখন রবিনহুডের দলের মধ্যে বড় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে রাজার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিল। মহাপ্রাণ রাজা রিচার্ড রবিনহুড ও তাহার দলের সকলকে

রবিনহুড মাটিতে পড়িয়া গেল

ক্ষমা করিয়া রাজধানী লণ্ডনে লইয়া আসিলেন। যতদিন রাজা রিচার্ড জীবিত ছিলেন, ততদিন তাহারা মহা আনন্দের সহিত লণ্ডন নগরীতে বাস করিয়াছিল। তাহাদের কেহ উৎপীড়ন করে নাই।

রিচার্ডের মৃত্যুর পর জন যখন রাজা হইলেন, তখন তাহাদিগকে আবার সেই সেরউড্ বনের নিভৃত স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহাদের লোকালয় হইতে দূরে বনের মধ্যে বাস করিতে

যুবকদের তীরধনুকের খেলা দেখিয়া মনে পড়িত আগেকার কথা

করিতে এমন অভ্যাস হইয়াছিল যে তাহাদের কাছে বনই ছিল অতিশয় প্রিয়। রাজা জনকে তাহাদের ভয় করিয়া চলিবার মত কিছুই ছিল না। এই বনভূমিই ছিল তাহাদের প্রিয় রাজ্য।

বৎসরের পর বৎসর চলিতে লাগিল। যুবকদের তীর ধনুকের খেলা দেখিতে দেখিতে তাহার মনে পড়িয়া যাইত—সেই কতদিন আগেকার কথা। এখন কোথায় তাহার সেই শক্তি, বল ও সাহস! দিন দিনই রবিনহুড অশক্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িল। সে সময়ে তাহার ইচ্ছা অনুসারে ছোট জন রবিনহুডের এক নিকট আত্মীয়ার নিকট লইয়া গেল। এই মহিলা রবিনহুড্কে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, যে লোক পাদ্রীর ও সাধু-সন্ন্যাসীর টাকাকড়ি অপহরণ করে, সে কি মানুষ নাকি?

ছোট জন্—মহিলাকে বলিল—আমি আমার মনিবের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে চাই।

মহিলা কিছুতেই তাহাতে রাজী হইলেন না। তাহাকে বাগানে থাকিতে বলিলেন। তারপর

তিনি রক্ত মোক্ষণের জন্য রবিনহুডের বাহুতে একটা ক্ষত করিলেন কিন্তু ভাল করিয়া পটি বাঁধিলেন না, বরং এমন ভাবে আলগা করিয়া বাঁধিলেন যাহাতে রক্ত বন্ধ না হয়। রক্ত পড়িতে লাগিল ক্রমশঃই তাহার শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। কেহ তাহাকে দেখিবার নাই! মরণের কালো ছায়া ক্রমশঃই নিবিড় হইয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে—রবিনহুড্ তাহার শিঙ্গায় তিনবার ফু দিলেন।

বাগানের ভিতর ছোট জন্ দাঁড়াইয়াছিল। রবিনহুডের শিঙ্গার এত ক্ষীণ আওয়াজ! তখন সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকার আকাশের রক্ত আভাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। ছোট জনের হৃদয় কাঁপিল—রবিনহুডের শিঙ্গার এত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ধ্বনি? তবে কি সে মরণোন্মুখ!

জন দৌড়িয়া চলিল। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া রবিনহুডের কক্ষে গেল; এবং দরজা ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার ঘরে যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ক্ষীণ কণ্ঠে রবিনহুড্ বলিল—আমি মরিতেছি জন্! এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই রবিনহুড্ তাহার বুকের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তারপর যখন জ্ঞান হইল তখন ছোট জনকে বলিল—জন্, একবার একটা ভাল দেখে তীর ধনু দাও ত। জনের হাত হইতে তীর ও ধনুকটি লইয়া রবিনহুড্ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া কহিল—একবার এই শেষ বারের মত আমি তীর ছুঁড়িব। বুঝলে জন্, যেখানে আমার তীর পড়িবে, সেইখানে আমার সমাধি দিও। দুর্ব্বল রবিনহুডের নিক্ষিপ্ত তীর জানালার নীচে অতি অল্প দূরে যাইয়া পড়িল।

জনের দুই চক্ষু দিয়া জলের ধারা বহিতেছিল। সে বলিল—চমৎকার তীর ছুঁড়েছেন।

সত্যি কি তাই?

হাঁ, বন্ধু!

রবিনহুডের বুঝিতে বাকী রহিলনা যে জন্ তাহার মনস্তুষ্টির জন্যই এইরূপ কথা বলিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার সব শেষ হইয়া আসিতেছে। চোখের দীপ্তি ক্রমশঃ তাহার কমিয়া আসিতেছিল। তখন তাহার মনে পড়িতেছিল সেই যৌবনের সাহস, উদ্যম ও তেজস্বিতার কথা।—মনে তাহার অনুতাপ আসিল, সেও মানুষের মতন মানুষ হইতে পারিত, যদি তাহার জীবনের প্রথম অবস্থায় নানা দিক হইতে আঘাত না আসিত! একদিন তাহার জন্য যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহারাও একে একে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে! ম্যারিয়ান্—চলিয়া গিয়াছে, সে ছিল তাহার সুখ দুঃখের সাথী! তাহার ত আপনার বলিতে কেহ নাই।—তারপর দেখের সে শক্তি ও আর নাই।—

—তাই অতি দুঃখের সহিত একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রবিনহুড্ কহিল ভাই জন্

> শ্যামল গাছের শীতল ছায়ায় কবর দিও মোরে
> ভোরের পাখী গাইবে গান আমার শিয়র পরে।
> ইট-পাথরে গড়োনা ভাই সমাধি মন্দির,
> সবুজ দূর্ব্বার আবরণে ঢেক আমার শির।

তারপর একবার রবিনহুড্ মাথা তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। জানালার ভিতর দিয়া তখন দেখা যাইতেছিল—অন্ধকারের লীলা। জন্।—শুনছো জন্! সত্যিই কি আমি চমৎকার তীর ছুঁড়েছিলাম—? সত্যি? আর নয়—অলক্ষ্যে জনের বুকে মাথা রাখিয়া রবিনহুড্ চলিয়া গেলেন।

রবিনহুডের গল্প সব দেশের ছেলেমেয়েদেরই খুব প্রিয়। অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হইয়া তিনি দীন-দুঃখীদের দুরবস্থার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই রবিনহুড্ যখনই সুযোগ পাইতেন, তখনই যাহারা যাহারা বিপদে পড়িয়া তাহার সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছে, তাহাদিগকেই রবিনহুড্ ও তার দলের লোকেরা সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের এই পণ ছিল যে তাহারা দুষ্ট ধনীদের ধন-দৌলত কাড়িয়া নিয়া সেই ধন দিয়া গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করিবে। রবিনহুড্ ও তার দলের লোকেরা এ প্রতিজ্ঞা বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা কখনও কোন স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করে নাই।

খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

২৯৭২ পৃষ্ঠার পর

বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বমালব পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের গুপ্ত সম্রাট বুধগুপ্তের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় হূণ আক্রমণের সূত্রপাত হইয়াছিল। ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে হূণেরা পারস্য দেশ জয় করিয়াছিল ও কাবুলের কুষাণ রাজাকে ধ্বংস করিয়াছিল ইহার ফলে ভারত আক্রমণের পথে সমস্ত বিঘ্ন দূর হইয়াছিল। পঙ্গপালের ন্যায় তাহারা উত্তরভারতের সমতল ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের সর্দ্দার তোরমাণ ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মালবদেশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যভারতে হূণাধিপত্য অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, ভানু গুপ্তের পুত্র বালাদিত্য (দ্বিতীয়) নামক গুপ্তরাজা স্বীয় বাহুবলে তাহাদিগকে মধ্যভারত হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভানুগুপ্ত নামক একজন গুপ্তরাজার নাম এরিকণের (Eran) লিপিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই ভানুগুপ্ত ও বালাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। লিপিতে ভানুগুপ্তকে "পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠবীর ও পার্থের ন্যায় শক্তিশালী নরেশ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইঁহার সহিত গোপরাজ নামক সেনাপতি এরিকিণের যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে সম্মুখ-সমরে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভানুগুপ্ত যে হূণরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবতঃ তোরমাণ পুত্র মিহিরকুল। মিহিরকুল অত্যাচারী-রক্তপিপাসু-রাক্ষস বিশেষ ছিলেন। বালাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পরেও মিহিরকুল নৃশংস অত্যাচারের দ্বারা ভারতবাসীদের ত্রাসের কারণ হইয়াছিল। অবশেষে মাণ্ডাসোরের (Mandasor) রাজা **জনেন্দ্র-যশোধর্ম্মদেব** ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই নরপিশাচের কবল হইতে ভারতের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে **যশোধর্ম্মদেবের** আবির্ভাব অতিশয় রহস্যময়। আবার তাঁহার অন্তর্দ্ধানও ঐতিহাসিকদের পক্ষে একটা প্রহেলিকা বিশেষ। তাঁহার মাণ্ডা-সোরের লিপিতে লিখা আছে যে হূণ সম্রাট ও যে সকল দেশে নিজ অধিকার স্থাপিত করিতে পারেন নাই সেই সকল দেশেও রাজা যশোধর্ম্ম-দেবের শাসন অপ্রতিহত ছিল। তিনি লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদী হইতে পশ্চিম পয়োধি পর্য্যন্ত ও হিমালয় হইতে মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত সামন্ত

রাজগণের অভিমান চূর্ণ করিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল, হূণদের নিরন্তর আক্রমণের দ্বারা জর্জ্জরিত গুপ্তসাম্রাজ্য বুঝি বা আবার একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই মহা-পরাক্রমী সম্রাট ভারতের রাজনৈতিক গগন হইতে অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, তিনি কতদিন রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও বংশধর ছিল কিনা এ সকল প্রশ্নের আমরা কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ নহি ; যদিও সম্প্রতি "**আর্য্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প**" নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের সাহায্যে আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু অনেক কারণবশতঃ "মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প"কে সম্পূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই।

যশোধর্ম্মদেবের রাজকবির নাম ছিল **বাসুলি**। এই অজ্ঞাতনামা কবি তাঁহার আশ্রয়দাতা সম্রাটের যে কীর্ত্তিগাথা গাহিয়াছিলেন তাহাই মান্দাসোরের লিপির সাহায্যে আজ আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহাই যশোধর্ম্মদেবের ইতিহাসের জন্য আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

মান্দাসোরের (Mandasor) লিপি উৎকীর্ণ হইবার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তবংশের এক প্রাদেশিক নৃপ যাঁহাকে একটী লিপিতে পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশের পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে শাসন করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নামটী লিপি হইতে কালের প্রভাবে মুছিয়া গিয়াছে।

যশোধর্ম্মদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মিহিরকুল কাশ্মীরে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। গান্ধারদেশ জয় করিয়া হূণাধিপ নৃশংসভাবে ... প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

যশোধর্ম্মদেবের মৃত্যুর পর আর্য্যাবর্ত্তের শাসন সূত্র 'মৌখরি' নামক রাজবংশের নৃপতিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌখরিগণ প্রথমে মগধে বাস করিতেন। পরে তাঁহারা কান্যকুব্জে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর আর্য্যাবর্ত্তের রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। যে পদে পূর্ব্বে পাটলিপুত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই গৌরবময় পদ কান্যকুব্জের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল।

মৌখরিবংশের রাজগণ গুপ্ত-সম্রাটদের পদ ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই বংশের উৎপত্তির বিষয় সঠিক জানা যায় নাই। মৌখরি নামের একটী প্রাচীন গোত্রের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। একটী প্রাচীন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারা যায় যে অন্ততঃ মৌর্য্যকালে এই গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকাবৃত্তি নামক পাণিনি-রচিত বিশ্ব-বিশ্রুত অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ-সূত্রের টীকা গ্রন্থে ... রূপেই **মৌখরী** শব্দের উল্লেখ [illegible]

মৌখরি নামের উৎপত্তি যাহাই হউক, এই নামের দুইটী বিভিন্ন রাজবংশের অস্তিত্ব বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গয়ার নিকটবর্ত্তী অবস্থিত বরাবর ও নাগার্জ্জুনী নামক পর্ব্বতমালায় অবস্থিত 'গুহা মন্দিরের' (Cave-temple) ভিত্তিগাত্রে খোদিত লিপি হইতে মৌখরি রাজ **অনন্তবর্ম্মা** তাঁহার পিতা **শার্দ্দূলবর্ম্মা** ও পিতামহ **যজ্ঞবর্ম্মার** নাম পাওয়া গিয়াছে। এই তিন জনের শাসনকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইঁহারা সম্ভবতঃ ... গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত ছিলেন। মৌখরি-বংশের অপর শাখা গৌণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

আজকাল যে প্রদেশকে যুক্তপ্রদেশ বলা হয় সেইখানে মৌখরিদের প্রধান শাখা রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। এই বংশের প্রথম তিন জন রাজার নাম **হরিবর্ম্মা, আদিত্যবর্ম্মা** এবং **ঈশ্বরবর্ম্মা**। শেষোক্ত রাজার সময় হইতেই মৌখরি বংশের প্রাধান্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। ঈশ্বরবর্ম্মা ও তাঁহার পিতা আদিত্যবর্ম্মা উভয়েই গুপ্তবংশের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের দ্বারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ঈশ্বরবর্ম্মার উত্তরাধি-কারীর নাম ঈশানবর্ম্মা তিনিই সর্ব্বপ্রথম

তুলা, কফি, নীল, চা প্রভৃতি চাষও এদেশে হইয়া থাকে।

কম্বোজে তিন চারি জাতীয় লোকের বাস। বেশীর ভাগই কম্বোজীয়। তাছাড়া আনামী আছে, চীনা আছে এবং মালয়ের লোক আছে। এদেশের

মন্দির পথে

স্ত্রীলোকদের দেখিলে বিশ বেশ সুস্থ সবল ও কর্মপটু।

কম্বোজ দেশের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। দেশটি নদীমাতৃক। মেকং নদীর শাখা-প্রশাখা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে দেশে এত নদ-নদী সে দেশ যে শস্যশ্যামল হইবে সে ত স্বাভাবিক। তাই যে দিকে তাকাইবে সে দিকেই দেখিতে পাইবে—"নদীভরা বনে বনে ক্ষেতে ভরা ধান।" ধানের ক্ষেত বাতাসে দুলিতেছে। নারিকেল তালগাছের আড়াল দিয়া দেখা যায় ছোট ছোট গ্রামগুলি খড় চালা ঘরের

বর্ষায় যখন নিম্ন-

ঠিক সেইরূপ।

জোয়ারের জল গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামের পথ ঘাট সব ভরিয়া যায়, তখন গ্রামের পথগুলি দেখিতে হয় ঠিক

গ্রামের লোকেরা নৌকাতে করিয়া চলা ফেরা করে।

এই সব গ্রামের লোকদের মধ্যে বেশীর ভাগই মৎস্যজীবি, তাহাদের চাল চলতি—এমন কি মাছ ধরিবার জালগুলি পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশের মৎস্যজীবিদের মত।

এক সময় কম্বোজবাসীরা অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল। তাহারা নানা দেশের লোকের সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়াছে। আনাম ও শ্যামের সহিত কম্বোজবাসীদের অনেকদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে

রাজা নবোদোম

কম্বোজ, ফরাসীদের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা **নরোদোম, প্নোম্-পেন্**

[illegible]

(Phnompenh) নামক স্থানে কম্বোজের রাজধানী পরিবর্তন করেন। প্নোম শব্দের অর্থ উচ্চভূমি। বর্তমান সময়ে রাজধানী প্নোম-পেন্ বেশ একটি প্রসিদ্ধ সহর। এখানে এসিয়ার নানা জাতীয় লোকের বাস। ফরাসীদেরও বেশ একটি উপনিবেশ [illegible]

রাজা নরোদোমের প[illegible] [illegible]ঙ্কে ভাই **শিসোয়াথ** (Sisowath) সিংহাসন লাভ করেন। বর্তমান রাজার নাম **মণি বং** (Manivong) ইনি ১৯২৭ সালে শিসোয়াথের পর রাজা হইয়াছেন। এ দেশে এখনও রেলপথ প্রসার লাভ করে নাই। নদী অনেক, সে পথেই [illegible] ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চলা ফেরা হইয়া থাকে। ১৯২১ সালের জনগণনা হইতে জানা যায় যে এদেশে মোট লোক সংখ্যা ২,৮০৬,০০০। ইহাদের মধ্যে ২,০০০ দুই হাজার ইউরোপীয়। ১৮৮,০০০ চীনা এবং ২৭৬,০০০ জন আনামী।

রাজধানী প্নোম-পেনে একটি যাদুঘর আছে। সেখানে কম্বোজের প্রাচীন কীর্তির নানা নিদর্শন সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। কম্বোজের রাজার প্রাসাদ রাজধানীতেই অবস্থিত।

এঙ্কোরভট্ বা অঙ্কোর ভট্—কম্বোজের প্রাচীন রাজধানী। ঐস্থানে হিন্দুরাজত্বের অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দেখিবার জন্য নানা দেশবিদেশ হইতে লোক আসে। "শিশু-ভারতী"তে, এই এঙ্কোরভট্ (Angkor-vat) সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা

ঘণ্টাঘর ওয়াট পো

হইয়াছে (শিশু-ভারতী ৪১৩, ৪৮১ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন এঙ্কোর এখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইতে বসিয়াছে।

ওয়াট-চা ব্যাঙ্কক

মন্দিরবীথি ওয়াট-চা°

হইতে। কম্বোজের সহিত আনামীদেরও শ্যামরাজ্যের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছে। ২৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম এদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। এবং ক্রমশঃ উহা ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে বিস্তার লাভ করে।

১২৮০ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট **কুবলাই খাঁ** দক্ষিণ চীন হইতে থাইদের বিতাড়িত করেন, এই সুযোগে রামখামহেং নামে শ্যাম দেশীয় একজন থাই প্রধান, প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। চতুর্দশ
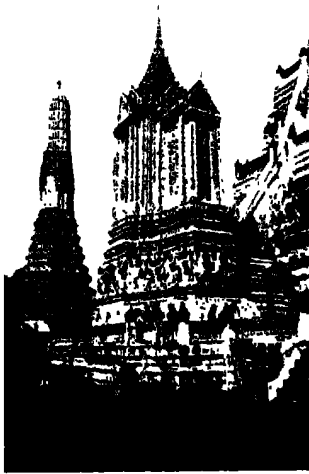
শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৩৫০ খৃঃ অঃ) চাও উথং **অযুথিয়া** (Ayuthia Siaynthia) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। অযুথিয়া মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত। এই বিজয়ের ফলে প্রা রামথিবাদী বা রাম (Pra Ramthibadi) নামে একজন নৃপতি সর্ব্বপ্রথম সমগ্র শ্যামদেশের সার্ব্বভৌম নৃপতি হইলেন। (১৩৫০-১৩৬৯) তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় প্রারামসুয়েন (Praramsuen) ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে কম্বোজীয়দের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং পরাজিতও হইয়াছিলেন।

এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি কম্বোজদের রাজধানী অঙ্করভাট অধিকার করেন (১৩৮৫ খৃঃ অঃ)—এজন্যই কম্বোজীয়েরা তাহাদের রাজধানী মেকং নদীর তীরে প্নোমপেন নামক স্থানে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে, পেগু, ব্রহ্মদেশ এবং কম্বোজীয়দের সঙ্গে এ সময়ে প্রা নরেট বা (Phra-Naret) নামে একজন রাজের আবির্ভাব হয়, ইঁহার সময় শ্যাম দেশ ইন্দোচীন এবং মালয় উপদ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হইয়া উঠে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশের সহিত শ্যাম দেশের সংস্রব ঘটে। প্রথমে পর্ত্তুগীজদের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে পরিচিত হইবার পরে—(১৫১১ খৃঃ অঃ) একে একে অন্যান্য ইউরোপীয়েরা শ্যামদেশে আসিতে থাকেন। ইংরাজদের প্রথম জাহাজ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মেনাম নদীতে আসিয়া নোঙ্গর করে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য করিবার অনুমতিপ্রার্থী হইয়া ফরাসীরা আসিলেন। এই ভাবে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ইংরেজ সকলেই বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মেরা রাজধানী অযুথিয়া আক্রমণ করে এবং চারি শতের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রাজধানী অযুথিয়াকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। অযুথিয়ার পতনের পর চাওফায়া তাকলিন (Chaophaya Taklin) নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মদিগকে বিতাড়িত করিয়া **ব্যাঙ্ককে** রাজধানী স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় **টাকলিন** শেষটায় পাগল হইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। এ ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পরে চাওফায় চক্রী নামে আর একজন দক্ষ ব্যক্তি রাজা হইলেন। বর্ত্তমান শ্যামরাজ-বংশ তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কক সহরটিকে তিনিই নানা সুন্দর ও বৃহৎ অট্টালিকা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করিয়াছেন। ইঁহার বংশধরেরা সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্ব দ্বারা শ্যামদেশের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং দেশের উন্নতিও অনেক করিয়াছেন।
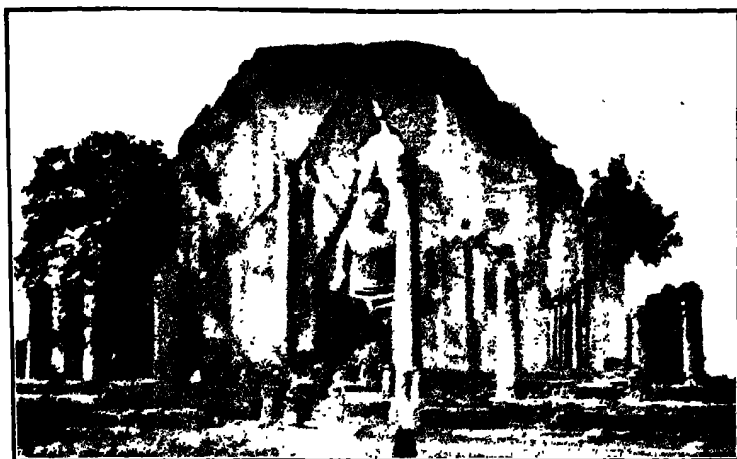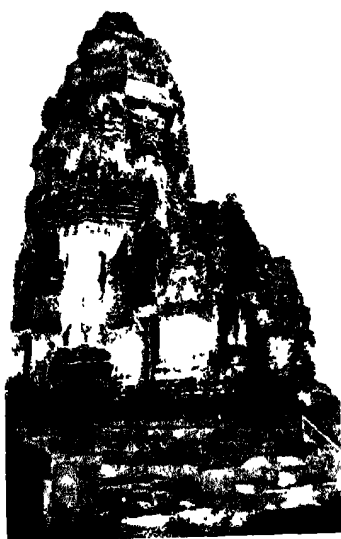
শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি পালি, সংস্কৃত, কম্বোজীয় এবং শ্যামদেশীয় ভাষায় লিখিত।

প্রা চেদি অযুধ্যার প্রাচীন রাজাদের সমাধি

ব্যাঙ্ককের একটি পথ—দূরে প্যাগোডা

অযুধ্যায় যাহা আছে, তাহা হইতে মধ্য যুগে শ্যামদেশের অবস্থা কেমন ছিল তাহার

অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাসীরা আগুন জ্বালাইয়া এই সহরটিকে কিরূপ ভাবে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর চারিদিকের
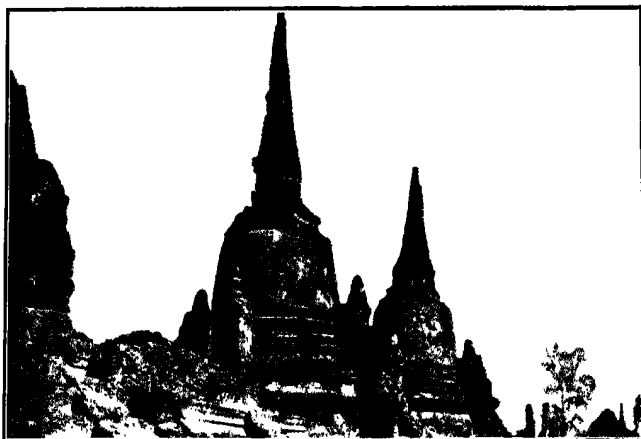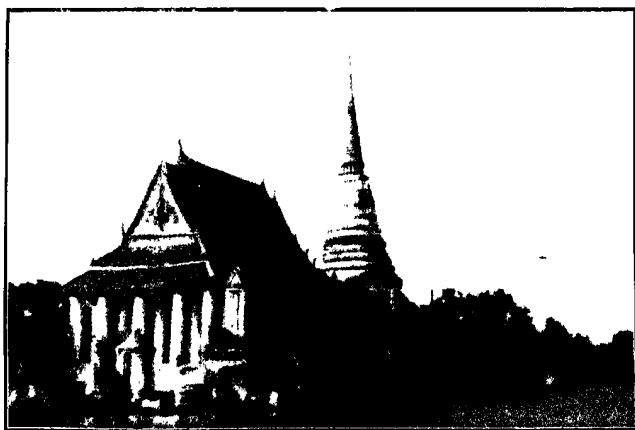
বাহিরের এবং ভিতরের প্রাচীরগুলি এখনও দাঁড়াইয়া আছে। রাজপ্রাসাদের ভিত্তির চিহ্ন এখনও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন অযুথ্যার জঙ্গল ইত্যাদি কাটিয়া পথঘাট পরিষ্কার

প্রাসাদের এক মণ্ডপ – অযুথ্যা

করা হইয়াছে। নানা দেশের লোকেরা এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে আসেন।

ঐতিহাসিকেরা বলেন,— ব্রহ্ম হইতে হিন্দুগণ শ্যামরাষ্ট্র, ইন্দোচীন বা নব কম্বোজে, আনাম বা নব কম্প বা কাম্পিনাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। শ্যামদেশের রাজধানীর নাম 'অযোধ্যা,' অযুথ্যা বা 'আয়ুত্থেয়া' ছিল। শ্যামে নব কোশল প্রদেশ ছিল। কৌণ্ডিলা বা কৌণ্ডিণ্য ঋষি বা ব্রাহ্মণ কম্বোজ বা ক্যাম্বোডিয়া দেশে গিয়াছিলেন। সেখানে যে সকল মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ আছে তাহা হিন্দুগণের স্থাপত্যবিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ এখনও বিদ্যমান আছে সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শ্যামদেশের প্রাচীন রাজধানী অযুথ্যার বনে জঙ্গলে ও ভগ্ন মন্দিরের আশেপাশে অনেক হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। ব্রহ্মা শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি অসংখ্য। অনেক স্থানে হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি বুদ্ধ মূর্ত্তি অপেক্ষাও বেশী দেখা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সংখ্যা কেবলি বাড়িয়া চলিয়াছিল। অযুথ্যার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইটের তৈরী পাথরের তৈরী এবং ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অযুথ্যার ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তিটিকে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মীরা প্রায় নষ্ট করিয়া গিয়াছে, মূর্ত্তিটি প্রায় চল্লিশ ফিট উচ্চ ছিল।

শ্যামদেশের কোথাও বর্ত্তমান যুগের নির্ম্মিত কোনও ভাস্কর্য কীর্ত্তি বিদ্যমান নাই। যাহা আছে তাহা সবই প্রাচীন নগরীগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখা যায়। সেখানে যে সকল মন্দির আছে, দেব দেবীর মূর্ত্তি, অপ্সর অপ্সরা, মানুষ, সাপ, পাখী, হাতী, এবং অন্যান্য জীবজন্তুর, ফুল ফলের যে কত খোদিত চিত্র আছে তাহা দেখিলে সেকালের শ্যামদেশে ভাস্কর শিল্প বা প্রস্তরের খোদাইয়ের যে কত বড় উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল চিত্রাদি মন্দিরের গায়ে, প্রাচীরের গায়ে খোদিত ছিল। কোন কোন স্থানে লাল রঙে পাথরের উপরের অঙ্কিত চিত্রগুলি আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে। এখন সেই সব শিল্পীরা কোথায়? শ্যামের অতীত ঐশ্বর্য্য যে কত বড় সম্পদশালী ছিল, তাহা সেকালের ধ্বংস-চিহ্ন না দেখিলে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সেজন্যই শ্যামদেশে ভ্রমণ করিতে গেলে অযুথ্যা দেখা আবশ্যক।

শ্যামের বর্ত্তমান রাজধানী ব্যাঙ্কক বহির্ভারতের বৃহত্তম নগর। কি লোক সংখ্যায়, কি ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক দিয়া, কি শিক্ষার দিক দিয়া সব দিক দিয়াই ব্যাঙ্কক আজ এসিয়ার একটি শ্রেষ্ঠতম নগরে উন্নীত হইয়াছে। এখানকার রাজপথে ট্রাম চলে, পথে ঘাটে বিজলীর বাতি জ্বলে, নানা দেশ-বিদেশের লোকের কল-কোলাহলে এখানকার রাজপথ নিত্য মুখরিত হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ককের সব বাড়ী ঘরগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ম্মিত।

রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস

পুষ্পজাত রংয়ের ব্যবহার

১৩৩৭ পৃষ্ঠার পর
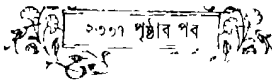
আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ইউরোপীয় শিল্পিগণ অতি অল্পসংখ্যক রঞ্জন উপকরণের ব্যবহার মাত্র জ্ঞাত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই রঞ্জন কার্য্যের জন্য বহুপ্রকার প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য শিল্পিগণ ভারত-জাত কুমকুম এবং কুসুম ফুল ব্যতিরেকে পুষ্পজাত অন্য কোনও রঞ্জন উপকরণের ব্যবহার জানিতেন না। অথচ পুষ্পবহুল ভারতবর্ষে বহুকালাবধি পলাশ ফুল, গেন্দা ফুল, শেফালিকা, কুমকুম, শিমুল ফুল, মান্দার ফুল, জবা ফুল, কুসুম ফুল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ফুল বস্ত্রাদি রং করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রথম কৃত্রিম রং

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে **পার্কিন,** (W H Perkin) মভিন (mauvine) নামক প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুতের পর হইতে রঞ্জনশিল্পে এক অভিনব নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং উক্ত শিল্প অতি দ্রুতভাবে আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট মভিনের প্রস্তুত প্রণালী পার্কিন পেটেন্ট (Patent) করেন, কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়িগণ কেহই আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হওয়াতে, পার্কিন-প্রস্তুত প্রথম কৃত্রিম রং ঐ সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। অবসর পাইয়া **ভারগুই** (Verguin) নামক জনৈক ফরাসি রাসায়নিক ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মেজেণ্টা প্রস্তুত করেন এবং লায়নস (Lyons) নগরস্থ রেণার্ড ফ্রাইরেসের (Renerd Frires) ব্যবসায়ের অংশিদাররূপে ব্যবসায়ে প্রচলিত করিবার জন্য মেজেণ্টা প্রস্তুত করিতে থাকেন। পার্কিন-প্রস্তুত মভ (mouve) বা মভিন এবং মেজেণ্টা একই জিনিষ, উহাদের রাসায়নিক স্বরূপ বা প্রকৃতিতে কোনও প্রভেদ নাই। মেজেণ্টা নামের ইতিহাসটা কৌতূহলপ্রদ। যে দিবস ভারগুই মেজেণ্টা প্রথম প্রস্তুত করেন, ঐ দিন মেজেণ্টা (Magenta) নামক ভূক্ষেত্রে ফরাসি এবং অষ্ট্রীয়দের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের নামানুসারেই নূতন রংএর নাম মেজেণ্টা রাখা হয়। ১৮৫৬

প্রাপ্ত বেনজিন (Bengene) নামক উদ্বায়ী তৈল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেকিউল (Kekule) বেনজিন পরমাণুর অন্তর্গঠন এবং রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বীয়মত প্রকাশ করেন। কেকিউলের মত (Benzene Theory) প্রবর্ত্তনের পর প্রত্যেকটি পূর্ব্বাবিষ্কৃত কৃত্রিম রংএর রাসায়নিক প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং কৃত্রিমরং প্রস্তুতকারকগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবদ্ধ প্রণালী অনুসরণে নির্দ্ধারিত রাসায়নিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ইচ্ছানুরূপ রং প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্রাবে (Graebe) ও লিবারমেন (Liebermann) কৃত্রিম উপায়ে এলিজেরিন (Alizarin) প্রস্তুত করেন। এলিজেরিন মঞ্জিষ্ঠামূলজাত প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণ। পর বৎসর উক্ত রাসায়নিকদ্বয় ও পার্কিন সমবেত হইয়া কৃত্রিম এলিজেরিনের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

১৮৮০-৯০ মধ্যে রঞ্জনশিল্পের অবস্থা

রঞ্জনশিল্পের ইতিহাসে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ চিরস্মরণীয়। উক্ত বর্ষে বায়ার (Bayer) কৃত্রিম উপায়ে প্রথম নীল (Indigo) প্রস্তুত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বটিগার (Bottiger) কঙ্গো রেড (Congo Red) নামক নূতন একশ্রেণীর একটি রং প্রস্তুত করেন। উক্ত রং দ্বারা কোনও প্রকার রংবন্ধনীর সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্পাস অতি উজ্জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা যায়। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর মধ্যে কঙ্গো রেড শ্রেণীর শতাধিক রং প্রস্তুত হইয়াছে এবং সহজেও অল্প ব্যয়ে কার্পাস বস্ত্ররঞ্জনের পন্থা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ১৮৮৭ সনে গ্রিন (Green) প্রিমুলিন (Primuline) নামক একটি রং প্রস্তুত করেন। প্রিমুলিন প্রস্তুত প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। যে যে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে রংটি প্রস্তুত হইবে তাহাদিগকে বস্ত্রতন্তু মধ্যে একত্র করা হয়, অর্থাৎ বস্ত্রতন্তু মধ্যেই রংটি প্রস্তুত হয়। ঐরূপ ভাবে রংটি প্রস্তুত হওয়ায় উহা বস্ত্রতন্তু-মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকে এবং ধৌত করিলে বা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় অপসৃত হয় না; অর্থাৎ রংটি অত্যন্ত পাকা বা স্থায়ী হয়। পরে এই শ্রেণীর আরও বহু রং প্রস্তুত হইয়াছে।

কৃত্রিম নীল

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেণিতে "Badische Anilin and Soda Fabrik" কোম্পানী কৃত্রিম নীল ব্যবসায়ে প্রচলিত করেন এবং ঐ সময় হইতে কৃত্রিম নীল প্রাকৃতিক নীলের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ১৯০১ সন হইতে কৃত্রিম নীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাকৃতিক নীলকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়াছে। রঞ্জনব্যবসায়ীদের হিসাবে, বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে গন্ধকাম্ল সমন্বিত এক শ্রেণীর রংএর (Sulphur colours) আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উহাদের কোনটিরই রাসায়নিক স্বরূপ এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই, কাজেই বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহারা ততটা মূল্যবান নহে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি টাকার ও বেশী মূল্যের রং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। উহার ⅘ অংশই জার্ম্মেণিতে প্রস্তুত হইতেছে। বাকী ৭ কোটি টাকার কৃত্রিম রং ইংলণ্ড, ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রস্তুত হয়। ১৯১০ সনে জার্ম্মানি হইতে ১০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের কৃত্রিম রং বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। জার্ম্মেণির এক একটি কৃত্রিম রং প্রস্তুতের কারখানা এক একটি ক্ষুদ্র নগর বিশেষ। রং প্রস্তুতকারক বিখ্যাত বাডিস কোম্পানিতে (Badische Anilin and Soda fabrik) ১৯৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য রাসায়নিক, যন্ত্রাদি পরিচালনের জন্য ২৫ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৭০৯ জন কেরাণী এবং ৭০০০ সাধারণ শ্রমজীবী দৈনিক কাজ করিয়া থাকে। দিন দিনই ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের জন্য জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। ১৯০০ সনের ২০শে অক্টোবর জার্ম্মান রাসায়নিক সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নব-

নির্ম্মিত হফ্‌মেন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-দিবসে বৈজ্ঞানিকদিগের এক সভা হয়। সভায় কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারক অধ্যাপক বায়ার (Bayer) এবং বাডিস্ কোম্পানীর অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রাঙ্ক ও (Dr Brunch) উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তার ব্রাঙ্ক ঘোষণা করেন যে, ঐ পর্য্যন্ত বাডিশ্ কোম্পানি কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের চেষ্টায় ৯ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। কিন্তু এত টাকা উদ্যমেই ব্যয়িত হইলেও তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত ছিলেন না, কারণ তাঁহার ধ্রুব আশা ছিল যে, অচিরকাল মধ্যেই অতি সুলভে এবং সহজে কৃত্রিম নীল ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবেন। বৈজ্ঞানিক পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে ডাক্তার ব্রাঙ্কের আশা সম্পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হইয়াছে।

অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে, শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কখনও কোনও দেশের অর্থাগমের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না, বা কোনও শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ইংলণ্ডও এই সময় সত্য মত উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই রসায়নশিল্প আজ সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মানদের আয়ত্ত। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডেই প্রথম পার্কিন (Perkin) কর্ত্তৃক কৃত্রিম রং প্রস্তুত হয়; কিন্তু তৎকালে ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ পার্কিনকে কোনও প্রকার আর্থিক সাহায্য বা উৎসাহিত করেন নাই, কারণ কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাঁহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। উৎসাহ ও চেষ্টায় জার্ম্মান রাসায়নিকগণ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছেন, এবং এক্ষণে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের শিল্পকে তাঁহাদের জাতীয় শিল্প বলিয়া ঘোষণা করিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময় একমাত্র জার্ম্মানিতেই সহস্রাধিক রাসায়নিক কৃত্রিম রং সম্বন্ধে নানা প্রকার মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যবসায়ের কথা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আজ সেই ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে এবং কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জিত হইয়া দেশের অর্থাগম হইতেছে।

রঞ্জনশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

রঞ্জনব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য এবং যাহাতে উক্ত শিল্পসম্বন্ধীয় আবিষ্কারসমূহ সকলে জানিতে পারেন, তজ্জন্য রঞ্জনশিল্পসংবাদবাহক বহু পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণ সমূহ ও তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য গ্রন্থগুলির অধিকাংশই জার্ম্মান ভাষায় লিখিত— কিন্তু ক্রমশঃ অনেকগুলি ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত পুস্তক সাহায্যে অশিক্ষিত ব্যক্তিও অতি সহজেই সুচারুরূপে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে পারে। লিড্‌স নগরে (Leeds) বস্ত্রব্যবসায়ীগণ সুবৃহৎ রঞ্জনাগার স্থাপন পূর্ব্বক বিখ্যাত কয়েকজন রাসায়নিককে উচ্চ বেতনে রঞ্জনশিল্পের উন্নতিকল্পে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের আর কোনও কার্য্য নাই। জার্ম্মাণিতে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের অনেক কারখানায় অসংখ্য বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকগণ বহু শিষ্যসহ নিত্য নূতন রং আবিষ্কারের জন্য এবং প্রচলিত রঞ্জনপ্রণালী সমূহের উন্নতি চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে আধুনিক রঞ্জনশিল্পের উন্নতি-কল্পে কি প্রকার প্রবল চেষ্টা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে।

যাহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আধুনিক রঞ্জনশিল্প বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং উন্নতি হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পার্কিনের নামই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে যাইয়া ঘটনাক্রমে প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত করেন।

রঞ্জন শিল্পের উন্নতির জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক নানা দিক দিয়া নানা ভাবে কাজ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের বিষয়েও একটু আলোচনা করিব। তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে ইউরোপীয় মনীষিরা রঞ্জন-শিল্পের উন্নতির জন্য কিরূপ গুরুতর পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা বর্ত্তমানে উহার এতদূর উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

[ডাক্তার পঞ্চানন মিত্র ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কলিকাতার বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺মাব ত্রদয়েন্দ্রলাল মিত্র। ত্রদয়েন্দ্রলাল দেশবিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র ছিলেন, কাজেই ডাক্তার মিত্র রাজেন্দ্রলালের পৌত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পঞ্চানন মিত্র মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯১৪ সালে বি-এ পরীক্ষায় রিপন কলেজ হইতে তিনি ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে এম-এ পাশ করিবার পর বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এই কাজ তিনি চারি বৎসর কাল করেন।

অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র

সেই সময়ে ভারতীয় নৃতত্ত্ব (Indian Anthropology) সম্বন্ধে বাংলা পুস্তক প্রকাশিত ছিল না। এ সময়ে Prehistoric Arts and Crafts নামক মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরে উহা Prehistoric India নামে (১৯২৩ সালে) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশের পর পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ডাক্তার মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৩৬ সালে ২৫শে জুলাই কেবল মাত্র ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে মেনিনজাইটিস্ (Meningitis) রোগে ইঁহার মৃত্যু হওয়ায় দেশের একজন প্রকৃত জ্ঞানীর অভাব হইয়াছে।]

আফ্রিকার মানুষ

৫৮০ পৃষ্ঠার পর

চীনের অন্ধমানবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (শিশু-ভারতী ৫৭৭ পৃষ্ঠা)। এইবার আফ্রিকা মহাদেশের মানুষদের কথা শোন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দুই জাতীয় আদিমানবের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই দুইজাতীয় মানব রোডেশীয় (Rhodesian) এবং বোসকোপ (Boskop) নামে পরিচিত। এই দুইজাতির মানবেরই [illegible] আছে। প্রাচীনকালের রোডেশিয়ানদের [illegible]

জুলু যোদ্ধা

চল্লিশ হাজার বৎসর হইবে। পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান সময়ে আফ্রিকার মানুষদের সম্বন্ধে অনেক কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সব আবিষ্কার হইতে আমরা এখন বলিতে পারি যে আফ্রিকার মানুষদের বয়স নেহাৎ কম নয়, তাহারা ইউরোপের মানুষদের সমবয়স্ক। ঐ সময়ে কি ইউরোপ ও আফ্রিকা উভয়ে একই রকমের কুঠার, একই রকমের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিত। সভ্যতা বা সংস্কৃতির দিক দিয়াও উভয়ে ছিল সমান। তুমি বড় আমি ছোট এমন কথা কেহই কাহাকে বলিতে [illegible] একপাটা [illegible] বয়সের [illegible] পাথর, [illegible] হইতে [illegible]।
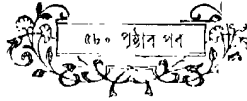
আফ্রিকার প্রধান মানুষদের মধ্যে **নিগ্রো,** (Negro), হোটেনটট (Hottentots), **বাণ্টু,** (Bantu) **বুশম্যান** (Bushmen) **কাফ্রি** বা **কাফির** (Kaffir) আরও নানা বামন-জাতি আছে। বাণ্টু জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতেছে জুলু এবং কাফি। এই দুইজাতি আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে বাস করে। হোটেনটটদের দেশ হইতেছে আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগ। বুশম্যানেরা বাস করিতেছে কালাহারি মরুভূমির পশ্চিমাংশের অন্তরীপের কাছাকাছি। মাদাগাসকার (Madagascar) দ্বীপে যে জাতীয় লোকের বাস তাহারা মালাগ্যাসি (Malagasy) নামে পরিচিত। ইহারা কিন্তু আফ্রিকার কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে—তাহারা মালয়বংশীয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় আজকাল যে নিগ্রোদের বাস করিতে দেখা যায়, তাহারা কিন্তু ঐদিকের পুরাণো অধিবাসী নহে। নিগ্রোরা ঐ অঞ্চলের লোকদিগকে পরাজিত করিয়া এদেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। যাযাবর হোটেনটোট্ এবং বুশম্যানেরা চারিদিকে শিকার করিয়া বেড়ায়। হোটেনটোটেরা মধ্যমাকারের আর বুশম্যানেরা বামনাকৃতি। এই দুইজাতির ভাষা প্রথম শুনিলে এক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা এক নহে অনেক তফাৎ আছে। আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির দিক দিয়াও এইরূপ তফাৎ দেখা যায়; তবু নৃতত্ত্বের বিচারে তাহারা যে একই

জাতি হইতে আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। তাহাদের মাথার গঠন, গায়ের

দুইজন জুলু সর্দার

রং ইত্যাদি হইতে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আফ্রিকার মধ্যদেশে আমরা বামন জাতির সাক্ষাৎ পাই। এই বামনেরা বনেজঙ্গলে বাস করিতেই বেশী ভালবাসে। এই বামন জাতীয় মানুষদের আবিষ্কার করেন প্রসিদ্ধ প্যাটিক ষ্ট্যান্‌লি।

বুশম্যান—আদিম
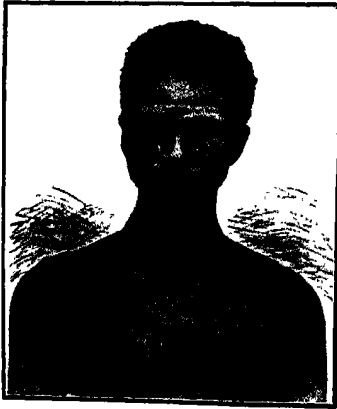
তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্য আফ্রিকার গভীর বনেজঙ্গলের মধ্যে ইহাদিগকে প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন। উবাদি নদীর উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি আরুউইমি (Aruwimi) নামক প্রসিদ্ধ অরণ্য প্রদেশে বামন-মানবেরা বাস করিয়া থাকে। বামনেরা আক্কা, (Akka), বাটোয়া (Batwa), ডোকো (Doko) এই কয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ডোকোরা কাফ্‌ফার দক্ষিণ দিকে বাস করে। আজকাল ডোকোদের বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায় আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে।

হোটেনটোটেরা কাপ (Cape) অঞ্চলে বাস করে। তাহারা কোয়োই-কোইন (Koi-Koin) বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। পূর্ব্বদিকে কাফ্রিদের দেশ বা কেই নদী হইতেছে তাহাদের এক সীমা। অরেঞ্জ নদীর তীরে তীরে যে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পশ্চিম দিকে হোটেনটোটেরা বাস করে। হোটেনটোটেরা

আক্কা জাতীয় বামনদের মেয়ে

গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি চরাইয়া বেড়ায়। তাহারা চাষ বাসও জানে না মাটির জিনিষপত্র

তৈয়ারী করিতেও শিখে নাই। কিন্তু লোহা গলাইবার কাজে কিন্তু ইহারা বেশ পটু।

বুশম্যানেরা সান্ (San) নামে পরিচিত। তাহাদের দেশও হোটেনটোটদের কাছাকাছি।

জুলুমেয়েরা জল নিতেছে

বুশম্যানেরা বড় একটা এক যায়গায় তাহাদিগকে যাযাবর জাতি বলে

কাফ্রি সর্দারের স্ত্রী

আজ এখানে কাল ওখানে এইভাবে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। বুশম্যানেরা এমনি নিরীহ হইলে কি হইবে? ইহাদের আফ্রিকার লোকেরা বড় ভাল চোখে দেখে না—'গরু-চোর' বলিয়া এই জাতীয় লোকের খুবই বড় রকমের একটা দুর্নাম আছে। বুশম্যানদের দেশ হইতেছে কালাহরি মরুভূমি হইতে নামি হ্রদ পর্যান্ত। এই দেশটাকে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে বুশম্যানদের দেশ। বুশম্যানেরা আজ পর্যান্তও বেশ স্থায়ীভাবে বাড়ী-ঘর তৈয়ারী করিয়া বাস করিতেছে না। তাহারা চলাপথে শিকার, চুরি প্রভৃতি করিয়া বেড়ায়। ইহাদের চুরি-বিদ্যা থাকিলেও লোকগুলি সরল ও কর্ম্মঠ।

আফ্রিকার উত্তরপ্রান্তে বুশম্যানদের মত আর এক জাতীয় মানুষের বাস। তাহারা (Mucasequere) নামে পরিচিত। বেনগেলা (Benguela) অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহারা খুব দক্ষ শিকারী। ইহারাও কৃষিকার্য্যের ধার ধারে না। শিকার করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। বুশম্যানদের সঙ্গে ইহাদের আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

দানারি যোদ্ধা

এই যে আফ্রিকার মানুষদের কথা বলিতেছি ইহাদের প্রত্যেক জাতির মধ্যে বরাবরই যুদ্ধ, মারামারি, কাটাকাটি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং লড়াই লাগিয়াই থাকে। তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে

যেমন আর্য্য ও অনার্য্যের কলহ ও যুদ্ধের কথা পড়িয়াছ, ইহাও তেমনি। কে কোন্ জাতিকে তাড়াইবে, কে কোন্ অঞ্চল দখল করিবে, অর্থাৎ জীবন-যুদ্ধ সেই আদিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। এসকল জাতির মধ্যে নিগ্রোরাই বরাবর প্রবল হইয়াছে। তাহারা বলবান্ হোটেনটোটদের তাড়াইয়া দিয়া উহাদের দেশগুলি অধিকার করিয়াছে। এইভাবে চাষের জমিগুলি তাহাদের অধিকারে আসায় নিগ্রোরা

নিগ্রোদের গ্রাম

বংশ বৃদ্ধি এবং বসবাসের সুযোগ সুবিধাতে এবং ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সেকালে আফ্রিকার একটি প্রধান জাতিতে উন্নীত হইয়াছিল।

এই যে কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহ আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে চলিয়াছিল, তোমরা ভুলেও মনে করিওনা যে তাহা নির্ব্বিবাদে ঘটিয়াছে। কে কোথায় আপনার অধিকার সহজে ছাড়িয়া দেয়? নীলনদের উপত্যকার জলা ভূমির অধিবাসী **সিল্লুক** (Shilluk) জাতির নাম। ফ্লামিঙ্গো পাখীর মত উহারা নিশ্চলভাবে এক পায়ের উপর বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। নার (Nuer), **ডিঙ্কা** (Dinka) বলবান সকলেই বাঁচিবার জন্য লড়াই করিয়াছে। তারপর যাহারা শক্তিমান্ তাহারা পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে।

নীলনদের উৎসের দিকে **নিয়াম-নিয়াম** (Niam-Niam)দের দেশ। উহারা বড় ভয়ানক জাতি। নিয়াম-নিয়ামেরা নরখাদক! তোমরা আফ্রিকার যে নরখাদক মানুষের কথা পড়িয়া থাক নিয়াম-নিয়ামরাই সেই নরখাদক মানুষ। (George) Schweinfurth নামে একজন ইউরোপীয় সর্ব্ব প্রথম এই নরখাদক দুর্দ্দান্ত নিয়াম-নিয়ামদের দেশে গিয়াছিলেন।

দানাক্লি (Danakli) বা আফারদিগকে আবিসিনিয়ার উচ্চ ভূ-ভাগ এবং মাসোয়া (Massowa) হইতে বাবেল-মান্দেব (Babel-Mandeb) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগে বাস করিতে দেখা যায়। দানাক্লি জাতীয় লোকেরা নৃতত্ত্ববিদদের মতে The only people of the four great Hamitic groups of North-east Africa who are unmixed অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব

আফ্রিকার দানাকিল জাতি চারিভাগে বিভক্ত হামিটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও মিশ্রণ দোষ দুষ্ট নহে।

আফ্রিকার এ সমুদয় প্রধান জাতি ব্যতীত আরও অনেক উপজাতি বাস করিয়া আসিতেছে। অন্ধকার আফ্রিকা মহাদেশের কোথায় কোন্ নিভৃত গিরিকন্দরে এবং বনানী প্রদেশে কত যে উপজাতি বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের সকলের ইতিহাস বলা বড় সহজ নহে। এখনও এমন অনেক দুর্গম বনপ্রদেশ আছে যেখানে আজ পর্য্যন্ত কোনও

নির্দ্দোষ নিগ্রো পুরুষ ও নারীদের বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে

সুসভ্য জাতি প্রবেশ করিতে পারে নাই। আশা করা যায় যে নৃতত্ত্বের দিক দিয়া আমরা আফ্রিকার মানুষদের সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন নূতন কথা ক্রমশঃ জানিতে পারিব।

তোমাদের কাছে যে নিগ্রো জাতির কথা বলিলাম, এক সময়ে এই নিগ্রোজাতির উপর যে কত অবিচার অত্যাচার চলিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে যে চিত্রটি প্রকাশ করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইবে যে তুরেগ্ জাতীয় ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা একটি নিগ্রো-পল্লী হইতে নিরীহ ও নির্দ্দোষ পুরুষ ও নারী নিগ্রো-দিগকে অমানুষিক অত্যাচার করিতে করিতে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে।

নিগ্রোরা বেশীর ভাগ সেনিগাল (senegal) গাম্বিয়া, গিনিকোষ্ট ও সুদানে বাস করে। আফ্রিকার এই সব মানুষদের ইতিহাস আলোচনা করিলে নৃতত্ত্বের দিক দিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারা যায়। এই সব জাতীয় লোকেরা কে কবে প্রথম কোথা হইতে আসিয়া এদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিল, তাহা বলা কঠিন। তবে এশিয়া হইতে হামিটিস, সেমেটিস্ এবং হিন্দরা আসিয়াছিল। তাহারা একে একে নিউবিয়া, লিবিয়া এবং সাহারা অঞ্চলের চারিদিকে বসতি বিস্তার করিয়াছে। সেমিটিসেরা এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া একে একে ভূমধ্যসাগরের তীরে, সাহারার পশ্চিমভাগে এবং সুদানে বাস করিতেছে। ইহাদের বংশধরেরা বর্ব্বর (Berber) নামে পরিচিত। তুয়েরগদের নিগ্রো ও বর্ব্বরদের মিশ্রণে উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা সাহারা অঞ্চলের আস্‌বেনের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। তবে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, নিগ্রো, হোটেনটোট, জুলু, বুশম্যান এবং অন্যান্য

কয়েকটি বামন জাতিই হইতেছে আফ্রিকার আদিম অধিবাসী।

বর্ব্বর জাতীয়দের মধ্যে আফ্রিকার **তুরগেরা প্রধান**। পূর্ব্বে ইহারা উত্তর আফ্রিকায় বাস

নরখাদক নিয়াম নিয়ামদের দেশ

করিত। কিন্তু আরবরা যখন উত্তর আফ্রিকার নানা দেশ অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তুরগেরা দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে সাহারা মরুভূমির নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

মধ্য সাহারার টিবু বা টেবা নামীয় একজাতীয় লোক বাস করে। তাহারা বেশীর ভাগ তিবেস্তি পাহাড়ের কাছাকাছি দেশে থাকে। কতকাল

জুলু পল্লী

হইতে যে তাহারা ঐস্থানে বাস করে তাহা বলা কঠিন। তাহারা নিজেদের ছাড়া অন্য কোন জাতীয় লোকদের সঙ্গে মিশিতে চায় না। ইহাদের সঙ্গে নিগ্রো রক্তের মিশালো রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহাদের গায়ের রং বর্ব্বরদের চেয়েও কালো। এরা বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং শ্রমদক্ষ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া ইহাদের মাথা বেশ খেলে, তবে চুরি ডাকাতি করিতেও ইহারা অসাধারণ। এই টিবু বা টেবাদের খুব প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় না। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই জাতীয় লোকেরা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে।

তোমাদের কাছে নিয়াম-নিয়ামদের কথা বলিয়াছি। ইহারা অত্যন্ত ভীষণ প্রকৃতির লোক। নিয়াম-নিয়াম শব্দের অর্থ হইতেছে রাক্ষস, অর্থাৎ যারা মানুষ খায়। এ সকল ছাড়া জুলু, কোঙ্গো, বেকান্দা, প্রভৃতি আরও যে কত জাতি আছে বলা যায় না। তাহাদের সম্বন্ধে সব কথা এখনও আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই।

ডেঙ্কা বা ডিঙ্কারা যেই কতদিন কতকাল হইতে যে আফ্রিকায় বাস করিতেছে তাহাও বলা কঠিন।

নাইজার নদীর উপর দিকের মানুষ

এ সমুদয় জাতির আবার নানা প্রকারের উপবিভাগ রহিয়াছে। ডিঙ্কাদের দেশের দক্ষিণ ভাগের কোন্ কোন্ জাতির বাস তাহার সম্বন্ধে কোনও সঠিক ধারণা আজ পর্য্যন্ত ও নৃতত্ত্ববিদেরা করিতে পারেন নাই। না পারিবার কারণ সেই সব দুর্গম প্রদেশে যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থা নাই। আফ্রিকার মহাদেশে এখনও যে অজানা জাতি ও অজানা দেশ আছে তাহার অনেকের সন্ধানই আমরা আজও পাই নাই, তাই এখনও সকলে আফ্রিকা মহাদেশকে যে অন্ধকার মহাদেশ বলেন তাহা অসত্য নয়।

হয় সেজন্য তিনি মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধেও পরিবর্তন ঘটাইয়া সর্বত্র একই প্রকারের সামঞ্জস্য বিধান করেন। সোলোন প্রকৃত পক্ষেই ছিলেন দেশপ্রেমিক। বিদেশী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে নিরাপদে এথেন্সে বাস করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে পারে, সেজন্য তাহাদের ধন-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও তাহাদের নিরাপদ-বাসের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রীসের প্রত্যেক ব্যক্তি রূপে নির্ভর করে একথাটা তিনি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহাদের আনন্দপূর্ণ ক্রীড়া-কৌতুক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতির দিকে যাহাতে মন আকৃষ্ট হয়, সেজন্য এই মহান্ সত্যটি তিনি অন্তর মধ্যে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া এইরূপ বিধি প্রচার করেন যে, এথেন্সের প্রত্যেক বালককে জিমনাষ্টিক (Gymnastics) ও সঙ্গীত শি[illegible] করিতে হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও

এ্যাক্রোপোলিসের সাধারণ দৃশ্য—ইহার চারিদিক ঘিরিয়াই এক সময়ে এথেনস নগরী গড়িয়া উঠিয়াছিল

যাহাতে বর্মী হয়, ব্যবসায়ী হয় ও দেশকে ভালবাসিতে শিখে সেজন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি এইরূপ একটি নিয়ম করেন যে পুত্র পিতাকে বৃদ্ধ বয়সে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবে না, যদি পিতা পুত্রকে বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে কোনরূপ জীবিকার্জনোপযোগী ব্যবসায় বা বাণিজ্য সম্বন্ধে বা কোনরূপ অর্থকর শ্রমশিল্পে শিক্ষা না দিয়া থাকেন। তাঁহার আর একটি বিধান বড় সুন্দর ছিল। শিশুরাই যে জাতীয় সম্পদ, ভবিষ্যত জাতির উন্নতির মূলে যে শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য তদনুরূপ গ্রন্থাদি পড়িবার ও ব্যবস্থা তিনি করেন।

সোলোন এইরূপ একটি অদ্ভুত প্রকারের আইনও প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও সামাজিক ব্যাপারে যোগদান করিতে হইবে, যদি কেহ নিরপেক্ষ থাকেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারেই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন না করেন তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই আইনের মধ্যে বেশ একটি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত

ছিল। দেশ-হিতৈষণার প্রতি অর্থাৎ জাতীয় কল্যাণের দিকে সকর্মভাবে একটা প্রেরণা জাগাইয়া দিবার জন্যই তিনি এই বিধির প্রবর্তন করেন। নিদ্রিত মানুষকে শুভ জাগরণের দিকে উদ্বোধিত করিতে হইলে এইরূপ প্রেরণা জাগাইয়া দেওয়ার আবশ্যক। সেই প্রেরণা জাগাইয়া দিয়া সোলোন এক নূতন জাতি গঠনের আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

সোলোন ছিলেন মাহর্ষী সংস্কারক। তিনি কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, কি সামাজিক সংস্কারের দিক, তাঁহার প্রত্যেকটি বিধান ও সংস্কার-নীতি তাঁহার দূরদৃষ্টি, মহত্ত্ব ও সাহসিকতারই পরিচায়ক। তিনি অনায়াসেই আপনাকে নানা দিক দিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র করিয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি তাহা করেন নাই। এইখানেই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব।

সোলোনের শেষ জীবন

সোলোন সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্র[illegible] তাহার মধ্যে একটি এই যে—শেষ জীবনে এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কথিত আছে যে তিনি যাইবার পূর্বে তাঁহার এথেন্সবাসীদিগকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন—অন্ততঃ পক্ষে দশবৎসর কাল যেন তাহারা তাঁহার বিধান মানিয়া চলে। এথেন্সবাসীদের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়া পরে তিনি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সোলোন এথেন্স পরিত্যাগ করিলে পর আবার পূর্বের মতবিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করিল। আবার বিবিধরূপ মতানৈক্য পরস্পরের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ঐক্যের পরিবর্তে বিদ্রোহ ও অনৈক্যের ভাবের সৃষ্টি করিল। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রথম ছিলেন লাইকারগাস্ (Licurgus), তাঁহার পরে মেগাক্লেস্ (Megacles) এবং তৃতীয় বারে **পিসিসট্রাটাস্** (Pisistratus)। পিসিস্ট্রাটাস্ ছিলেন সোলোনের আত্মীয়। ইঁহাদের মধ্যে পিসিস্ট্রাটাস্ ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং [illegible] জনসাধারণের চিত্তজয় করিবার জন্য তিনি এথেন্সের দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এথেন্সের অধিকার লাভ। সোলোন ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দেশ আবার খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মতের মধ্যে পড়িয়া ধ্বংসোন্মুখ। সকলেই চায় নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভ। মানুষ যেখানে আপনার স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে, সেখানে দেশের ও জনসমষ্টির কথা ভাবিবার অবসর তাহার মনে আসে না। পিসিস্ট্রাটাস্ চাহিতেছিলেন শুধু আপনার স্বার্থ, দেশের বা জাতির কল্যাণের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। শুধু জনসাধারণের চিত্তজয় করিবার জন্যই তাহাদিগকে হাতে রাখিয়া রাজনৈতিকের কূটবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোলোন দেশের শোচনীয় দুর্দশার কথা ভাবিয়া উহার প্রতিকারের জন্য যত্নবান হইলেন। একদিন দেশের লোক তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, তিনি সেই ভালবাসার অধিকারে দেশের লোককে ভুলপথ হইতে ফিরিবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন, অনেক রাজনীতি-সম্পর্কিত কবিতার অবতারণা করিলেন কিন্তু কেহই এই প্রবীণ রাজনীতিকের কথা শুনিল না।

পিসিসট্রাটাস্—একদিন পিসিস্ট্রাটাস্ রথ চালনা করিয়া বাজারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে শোণিত-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। তিনি সেই শকটের উপরে দাঁড়াইয়া নাগরিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শোন নাগরিকগণ, আমি তোমাদের অধিকারের দাবী সংরক্ষণ করিতে যাইয়া আজ মরণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। শত্রুপক্ষীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। তখনই তাঁহার জন্য পঞ্চাশজন শরীররক্ষী নিযুক্ত হইল। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু পিসিস্ট্রাটাস্ আহত হন নাই—কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই, নিজেই আপনার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া আপনার স্বার্থ সিদ্ধি করিলেন। এইভাবে দিনের পর দিন তাঁহার শরীররক্ষী সৈন্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, ক্রমশঃ যখন তাঁহার দলে অনেক লোক হইল, তখন এক শুভ সুযোগে তাঁহার মুখোস খসিয়া পড়িল—৫৬০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পিসিস্ট্রাটাস্ এ্যাক্রোপোলিস

অধিকার করিলেন। মেগাক্লেস ও তাঁহার দলের লোকেরা এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। একমাত্র সোলোন নির্ভীকভাবে নগরবাসীদের এইরূপ দীনতার জন্য অতি তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"তোমরা এই স্বেচ্ছাচারী সর্দারকে সহজেই বিনাশ করিতে পারিতে; তাহা করিলে না কেন? কিন্তু এখন তাঁহাকে বিনাশ করিতে হইলে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে চলিতে পারে না।" বৃদ্ধ সোলোন,

হইবে। সোলোন এই নবীন রাষ্ট্রীয় গঠনের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আর বেশী দিন বাঁচিয়াছিলেন না। তিনি সাইপ্রাসে (Cyprus) চলিয়া গেলেন এবং সেখানে যাইবার দুই বৎসর পরে আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভস্মরাশি স্যালামিস্ দ্বীপের চারিদিকে, সোলোনের ইচ্ছানুসারে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই স্যালামিস্ দ্বীপ তিনিই জয় করিয়া এথেন্সের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই দ্বীপটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

আক্রোপোলিস, এথেন্স। উপরে পার্থেনোনের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য স্থাপত্য চিহ্ন দেখা যাইতেছে

এথেন্স পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে পর তিনি বলিলেন যে আমি জীবনের ভয়ে নগর পরিত্যাগ করিব না। বন্ধুরা বলিলেন—"আপনার এইরূপ আত্মনির্ভরের ভাব কোথা হইতে আসিল?" সোলোন হাসিয়া বলিলেন—"আমার এই বৃদ্ধ বয়সই আমার নির্ভর।" পিসিস্ট্রাটাস কিন্তু সোলোনের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই—ইহা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়কই বলিতে

পিসিস্ট্রাটাসের প্রভুত্ব কিন্তু পাঁচ বৎসরের বেশীকাল স্থায়ী হয় নাই। ঐ সময়ে দুইটিদল একত্রিত হইয়া পিসিস্ট্রাটাসকে নির্বাসিত করিয়াছিল। পিসিস্ট্রাটাসের নির্বাসনের অল্পকাল পরেই মেগাক্লেস কেবল যে প্লেন (Plain) দের সহিত মতবিরোধিতা করিলেন তাহা নহে, তাঁহার নিজের দলের লোকের সহিতও কলহ হইল। ফলে আবার পিসিস্ট্রাটাসকে এথেন্সে আহ্বান করিয়া আনা হইল। ছয় বৎসর কাল নির্বিবাদে এথেন্সের

ভারতের পর্ব্বত ও নদী

২৩০৭ পৃষ্ঠার পর

ভারতের পর্ব্বত ও নদীর কথা বলিতে গিয়া তোমাদের কাছে এভারেষ্ট পর্ব্বতের আবিষ্কারক—রাধানাথ শিকদারের কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু শিশু-ভারতী'তে (২২৪৮ পৃষ্ঠা) তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি নাই এবং তাঁহার চিত্র প্রকাশ করিতে পারি নাই, এইবার ভারতের নদ-নদীর বিষয় বলিবার পূর্ব্বে রাধানাথের সম্বন্ধে কিছু বলিব। একজন বাঙ্গালী যে কত বড় একটা মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন, সে কথা জানিতে পারিলে তোমাদের মনে বেশ গৌরব ও আনন্দ হইবে।
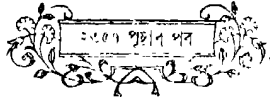
রাধানাথ শিকদার

রাধানাথ শিকদার ১২২০ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর, ১৮১৩) কলিকাতা জোড়াসাঁকোর অন্তঃপাতী শিকদার পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। রাধানাথ শৈশবে গুরু মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া ৪৮ নং চিৎপুর রোডে, ফিরিঙ্গি কমল বসুর স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, পরে ১৮২৪ সনে হিন্দু-কলেজে নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তী হন। রাধানাথ স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই (১৮২৭ সনে) চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নিকট ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষা রাধানাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের শেষ তিন বৎসর (১৮২৯-১৮৩১) রাধানাথ রস ও টাইটলার সাহেবের নিকট নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রথম ভাগ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। হিন্দুদের মধ্যে রাধানাথ এবং রাজনারায়ণ বসাকই সর্ব্বপ্রথম প্রিন্সিপিয়া অধ্যয়ন করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন-কালে রাধানাথ শিকদারের কৃতিত্বের কথা সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলেজ ছাড়িবার পর ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া আপিসে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে কম্পিউটার নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সংস্কৃত পাঠে ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু তিনি এখন হইতে গণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক অধ্যয়ন করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিলেন। ১৮৩২ সনের ৭ই অক্টোবর রাধানাথ তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—"আমি এক্ষণে সারভেয়র নিযুক্ত হইয়া সেরাংবেস লাইনে কার্য্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ই অক্টোবর যাত্রা করিব।"
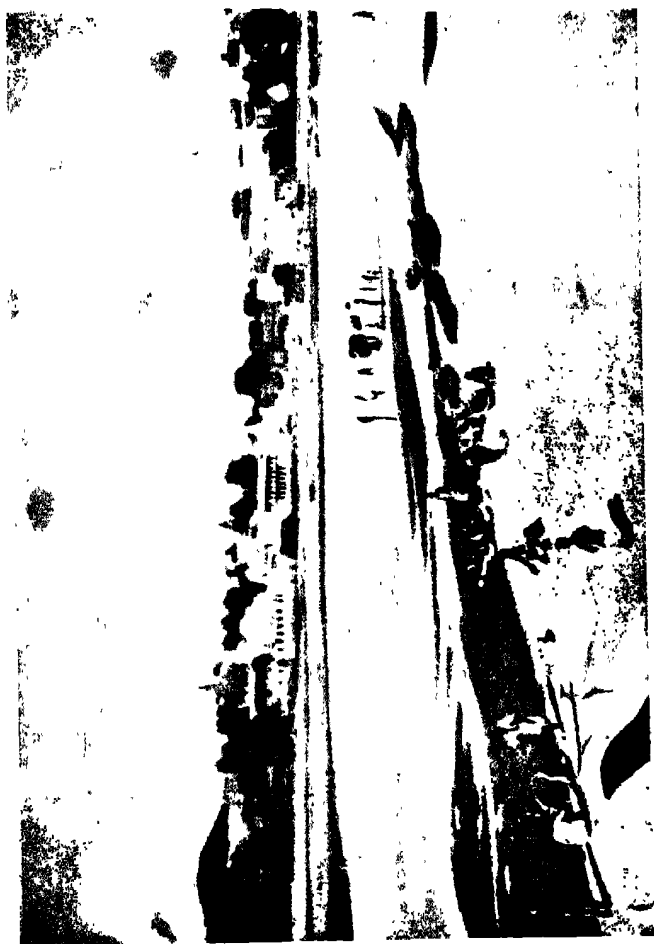
ভারতের পর্ব্বত ও নদী

রাধানাথ জরিপ-বিভাগে কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ণেল এভারেষ্টের নিকটও উচ্চ গণিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে এভারেষ্ট মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ ডেপুটি কালেক্টার নিয়োজিত হইবার অনুমতি পাইলেন, তখন অন্যান্য বন্ধুদের সহিত রাধানাথও এই পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি কর্ণেল এভারেষ্টের সুপারিশ-পত্র চাহিলে কর্ণেল তাহাতে অস্বীকৃত হন। কর্ণেল এভারেষ্ট সরকারকে লিখিলেন যে, সত্বর এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাহাতে রাধানাথ এই বিভাগের কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে রাজী হন। কারণ তাঁহার তুল্য লোক বিলাতে পাওয়াও কঠিন।

বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে রাধানাথ শিকদারই সর্ব্ব প্রথম জরিপ-বিভাগে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আর্কট-নিবাসী সৈয়দ মহম্মদও এই বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। এভারেষ্ট সাহেব ১৮৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কর্ণেল এণ্ড্রু ও অ-সারভেয়ার-জেনারেল নিযুক্ত হন। রাধানাথের কর্ম্মদক্ষতায় তিনিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫০ সনে কলিকাতায় দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ খালি হইলে রাধানাথ এই পদের জন্য পুনরায় দরখাস্ত করেন। তখন স্যার এণ্ড্রু ও অ-রাধানাথের গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব সহ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম দিতেছি,—

"আমি সসম্মানে জানাইতে চাই যে, ভারতবাসীদের মধ্যে সত্যকার জ্ঞানের প্রসার এবং বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির প্রচার সরকারের সাধারণ উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—বিজ্ঞান অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেই এই উদ্দেশ্য সুষ্ঠ রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। [রাধানাথ যে কৃতিত্ব দর্শাইয়াছেন] তাহা শুধু আপেক্ষিক গুণ বা স্কুল কলেজে ভাবী উন্নতি সূচক সাফল্যলাভের ব্যাপার নহে। * * * রাধানাথ 'ম্যানুয়েল অব সারভেয়িং' পুস্তকে যে সকল অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা কলিকাতা-রিভিউ-পত্রে সাগ্রহে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার লিখন রীতির সবিশেষ বিশুদ্ধতা এবং ভাষার কঠোর ত্রুটি শূন্যতা—যাহা প্রাচ্যদেশের সালঙ্কার ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশংসিত হইয়াছে।

জরিপ-বিভাগে কর্ম্মকালে রাধানাথের **সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব - এভারেষ্ট আবিষ্কার।** মেজর কেনেথ মেসনসাহেব 'Himalayan Romances' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান কালে বলেন,—It was during the computations of the north-eastern observations that a babu rushed on one morning in 1852 into the room of Sir Andrew Waugh, the successor of **Sir George Everest and exclaimed, Sir, I have discovered the highest mountain on the earth.**" He had been working out the observations taken to the distant hills. It was Sir Andrew Waugh who proposed the name Mount Everest, and no local name has ever been found for it either the Tibetan or the Nepalese Side. *The Englishman November 12, 1928* p17 অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিষয়গুলি গণনার সময় ১৮৫২ সনে একদিন প্রাতঃকালে স্যার জর্জ্জ এভারেষ্টের অনুবর্ত্তী স্যার এণ্ড্রু ও অ-র গৃহে গিয়া দৌড়াইয়া এক বাবু বলিলেন—"**মহাশয়, আমি জগতের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখর আবিষ্কার করিয়াছি।**" তিনি এই সময় দূরস্থ পাহাড় পর্য্যন্ত জরিপের ফলগুলি কষিতেছিলেন। স্যার এণ্ড্রু ও অই, "**এভারেষ্ট শৃঙ্গ**" এই নাম প্রস্তাব করেন। তিব্বতী বা নেপালী ভাষায় ইহার কোনও নাম পাওয়া যায় নাই।

রাধানাথ শিকদার ১৮৬২ সালের মার্চ্চ মাসে ত্রিকোণমিতি জরিপ-বিভাগে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাজ কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন সারভেয়ার জেনারেলের নিকট হইতে তিনি প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। রাধানাথ তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি এত অমায়িক

অথচ এরূপ প্রবল আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন যে দেশী বিদেশী সকলের নিকট হইতে তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। কি গণিতজ্ঞ হিসাবে, কি সাহিত্য-সাধনায়, কি জাতি-গঠনের কার্য্যে কি চরিত্রের বিশেষত্বে তিনি বাঙ্গালী জাতির আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

রাধানাথ ১৮৭০ সনের ১৭ই মে [illegible] অন্তর্গত গোন্দলপাড়ায় গঙ্গাতীরে আপনার বাগান বাটীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সেকালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৩শে মে, ১৮৭০) 'অমৃত বাজার' পত্রিকা প্রভৃতি দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—'আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু হইয়াছে। গণিতে ইঁহার যেরূপ মস্তিষ্ক ছিল, এরূপ বাঙ্গালীর মধ্যে খুব কম লোকের আছে। লাটিন গ্রীক ভাষাতেও ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।' [প্রবাসী ১৩৩৯ ভাদ্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল]

এখন তোমরা বেশ জানিতে পারিলে কি ভাবে কেমন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখর আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহার মূলে একজন ভারতবাসী ও একজন বাঙ্গালীর যে কত বড় কৃতিত্ব রহিয়াছে তাহাও জানিতে পারিলে। রাধানাথ শিকদারের চিত্র ও আমরা এইবার প্রদান করিলাম। এইবার নদীর কথা শোন।

গঙ্গা ও যমুনা

গঙ্গা ও যমুনার উৎসের কথা বলিয়াছি। গঙ্গা ক্রমশঃ নীচের দিকে বহিয়া চলিতে চলিতে কত নগর, বন্দর ও পল্লী-প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে আসিয়াছে তাহা তোমরা ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। গঙ্গার দ্বারা গঠিত সমতল ক্ষেত্র (Indo-Gangetic plain)—পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। এমন সুজলা ও সুফলা দেশ আর কোথাও খুব কমই আছে। কেননা গঙ্গা ও তাহার শাখানদীগুলি যুগযুগান্তর ধরিয়া পাহাড়ের বুক হইতে পলিমাটি বহিয়া আনিয়া এই বিরাট সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। সিন্ধু-গঠিত সমতল ক্ষেত্র হইতে গঙ্গার সমতল ক্ষেত্র অধিক উর্ব্বরা। সিন্ধুনদের সমতল ক্ষেত্রটি শুষ্ক ও কঠিন। কিন্তু গঙ্গার সমতল ক্ষেত্রে শুধু কানপুরের পশ্চিম দিকের কতকটা অংশ অনুর্ব্বর। ঐ জমিতে লবণের ভাগ বেশী। স্থানীয় লোকেরা বলে কালার (Kallar) বাবে। তা ছাড়া গঙ্গা তীরের অধিকাংশ স্থানই উর্ব্বর। এজন্যই গঙ্গা নদীর তীরে লোক সংখ্যা যত বেশী ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ নাই। প্রতি বৎসর বর্ষার প্লাবনকালে ৪০০ পাউণ্ড গঙ্গা জলের মধ্যে এক পাউণ্ড পলিমাটি পাবে। গঙ্গার সমতল ক্ষেত্রের

যমুনার পুল—এলাহাবাদ

এভারেষ্ট আবিষ্কারক **রাধানাথ শিকদার**.

[আমরা এই চিত্রখানার জন্য সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি। তাঁহার সৌজন্যে এই ফটোগ্রাফখানি পাইয়াছি।]

কোন স্থানই ৫৫০ ফিটের বেশী উচ্চ নয়। এই ভাগটি এত সমতল বলিয়াই নদীগুলির গতিও

[illegible]

ধীর। [illegible]

গঙ্গা ও যমুনা প্রয়াগে বা এলাহাবাদে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল দেখিতে অতি সুন্দর। তোমরা কবি কালিদাসের নাম শুনিয়াছ। তিনি শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর মধ্যেই একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার "রঘুবংশ" নামক কাব্যে এই সঙ্গম স্থানের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। গঙ্গা এখান হইতে প্রবাহিত হইয়া একটি বাঁকিয়া কাশী, গাজিপুর প্রভৃতি সহরের চরণ ধোয়াইয়া পাটনা যাইয়া পৌঁছিয়াছে—এই পথে চলিতে চলিতে গোমতি বা গুমতি, ঘাঘরা প্রভৃতি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। গোমতী লক্ষ্ণৌ সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। ঘাঘরা মানসসরোবরের কাছাকাছি উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। পাটনার নিকট গণ্ডক নদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। শোন ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানের নিম্ন ভাগে এই মিলন ঘটিয়াছে।

কাশীর একটি ঘাট

তারপর রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণীকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চন্দননগর ও অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ

F. 8—32

নগরের পথে—হুগলী বা ভাগীরথী নামক প্রসিদ্ধ শাখা-পথে আরও অনেক শাখা-প্রশাখার সহিত সুন্দরবনের কাছাকাছি সাগরের সহিত গঙ্গা সম্মিলিত হইয়াছে। আবার অন্য পথে আসাম যাইতে যাইতে ব্রহ্মপুত্র গারো পাহাড় ঘুরিয়া পূর্ববঙ্গের নানা প্রসিদ্ধ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে গঙ্গার ন্যায় ব্রহ্মপুত্রও সাগরের বুকে আসিয়া আপনার ধারা মিলাইয়া দিয়াছে।

কাজেই তোমরা জানিতে পারিলে যে, গঙ্গার সহিত যমুনা (Jumna), ঘাঘরা (Gogra), গণ্ডক (Gandak), কুশী প্রভৃতি নদী মিলিত হইয়াছে, আর দক্ষিণ দিক হইতেও দুইটি বড় নদী চম্বল (Chambal) ও শোন (Son) আসিয়া মিশিয়াছে। বিহারের ফল্গু বা নৈরঞ্জনাও একটী বিখ্যাত নদী। যে বুদ্ধগয়ার নাম তোমরা শুনিয়াছ, তাহা এই নৈরঞ্জনার তীরে অবস্থিত।

যমুনা

যমুনা গঙ্গার শাখা নদী হইলেও ভারতের বিখ্যাত নদী। ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে যমুনার সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠতর। গঙ্গাও যেমন কাব্য ও ইতিহাসের নদী, যমুনাও ঠিক তেমনি। এই যমুনার তীরে **মথুরা ও বৃন্দাবন**, শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। এই নদীর তীরেই আগ্রা ও দিল্লী। হিন্দুরাজা, পাঠান ও মোগলদের কত কীর্ত্তিচিহ্ন ইহার তীরে পড়িয়া আছে। এই যমুনার তীরেই বৃটিশ ভারতের রাজধানী—সেই প্রাচীন দিল্লীর ধ্বংসের মধ্যে নূতন **দিল্লী** (New-Delhi) নাম ধারণ করিয়াছে।

মথুরা—যমুনা

এই যে গঙ্গা যমুনার কথা বলিলাম, ইহাদের তীরে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি, ভারতের অনেক কিছু সমৃদ্ধির স্মৃতি বাঁচিয়া আছে। কানপুর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই সহরের বয়স বেশী নয়। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আসিবার পরে এই সহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। **কানপুর** বাণিজ্য প্রধান স্থান। এ সহরে চিনি, তেল, তুলা, পশম, কাপড় প্রভৃতির বড় বড় কারখানা আছে। এই সহরে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়কার অনেক কিছু স্মৃতি চিহ্ন রহিয়াছে। কানপুরের পরেই এলাহাবাদ বা প্রয়াগের নাম করিতে হয়। এই সহরটি হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

এই স্থানে প্রতি বৎসর মাঘ মেলা হইয়া থাকে। এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। কুম্ভমেলা, শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেলা। কুম্ভমেলার সময়ে বহু সন্ন্যাসী ও যাত্রী এখানে আসিয়া থাকে এবং লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে স্নান করে। প্রয়াগধামের এই কুম্ভমেলা জগদ্বিখ্যাত। এই মেলার প্রধান বিশেষত্ব এই যে এখানে যেমন নানা স্থান হইতে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া সমবেত হয়, তেমনি ভারতের নানা প্রদেশ হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিবিধ দ্রব্যাদির বিচিত্র সমাবেশ হয়। সে সময় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের দৃশ্য অতি মনোরম হইয়া থাকে।
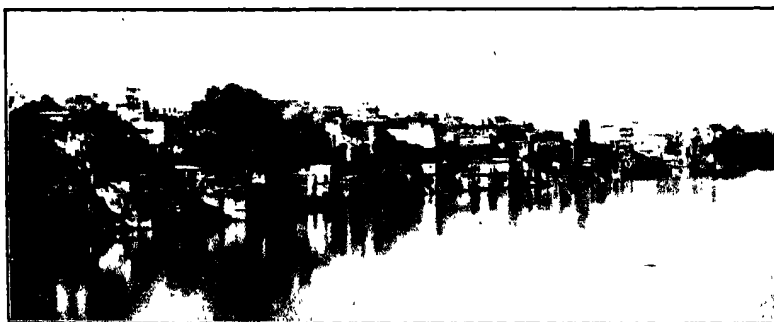
উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ

১২৪০ পৃষ্ঠার পর

গাছের গুঁড়ি, ডাল ও পাতার কথা তোমরা পড়িয়াছ ('শিশু-ভারতী'— ১২৩৬ পৃষ্ঠা)। এইবার তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শোন। প্রাণীদের যেমন হাত পা আছে, নড়া-চড়া করে, ফুসফুস্ আছে, শ্বাস লয় ও ত্যাগ করে, পাকযন্ত্র রহিয়াছে, খাদ্য দ্রব্যাদি পরিপাক করে, গাছেদেরও তেমনি খাওয়া, নাওয়া, শ্বাস লওয়া ও ত্যাগ করা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে; শুধু তাহাদের কতকগুলি পারে না একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে। উদ্ভিদের গঠনপ্রণালী ইত্যাদির মূলে যে কত রকমের যন্ত্রপাতি রহিয়াছে, তাহা তোমাদের পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।
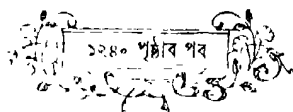
পণ্ডিতেরা উদ্ভিদের সম্বন্ধে যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, এখানে তাহার একটা পরিচয় দিলাম।

এখানে সংক্ষেপে উদ্ভিদ পরিবারের কথা বলিলাম, পৃথিবীর সকলজাতীয় তরু-লতা ও গুল্মের পরিচয় দেওয়া বড় সহজ নয়। এখন উদ্ভিদের সুখ-দুঃখের কথা শোন। তোমরা একথাটি বেশ জান যে, উদ্ভিদের জীবন আছে। যাহাদের জীবন আছে তাহাদের সুখ-দুঃখও থাকে। তুমি যদি সারাদিন ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াও, তাহা হইলে সন্ধ্যার পর আপনা হইতেই রাত্রিতে তোমার চোখ দু'টি ঢুলিয়া পড়িবে, আপনা হইতেই ঘুম আসিবে।

হাতের কাজ—কুটির-শিল্প

অবসর সময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রয়োজনীয় জিনিস ঘরে বসিয়া তৈয়ারী করিতে পারে। এ সকল কাজ করিতে যেমন আনন্দ, তেমনি একটা শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও লাভ হয়। তোমাদের কাগজ পত্র রাখিবার জন্য,

বাঁ হাত দিয়া বেত ধরিয়া ডান হাতে কাজ করা হইতেছে

ছোট ছোট মেয়েদের পুতুল রাখিবার জন্য, বাজার করিবার জন্য নানা রকমের বেতের বাক্স, পেটিরা, ঝুড়ি—এ সকলের দরকার হয়, তোমরা ঘরে বসিয়া কেন এ সব কর না? ছুটির দিনে, অন্য কোন অবসর সময়ে এ সব কাজ অনায়াসেই করিতে পার, তাহাতে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই লাভ হয়।

অনেক সময়ই দেখিতে পাইবে যে, পথে পথে ফেরিওয়ালারা বেতের তৈরী ও বাঁশের তৈরী নানা প্রকারের পেটারা, ঝাঁপি, ছেঁড়া কাগজ পত্র
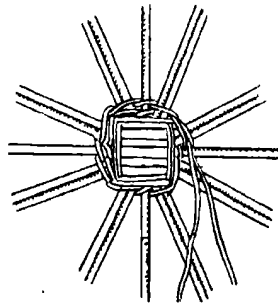
ঝুড়ির তলার দিক প্রথমে বোনা হইতেছে

ফেলার (Waste-Paper-Basket) সব বিক্রী করে, দামও কিন্তু নেহাৎ কম নয়। এবং তোমাদের যখন দরকার হয়, বেশ দাম দিয়াই কিনিয়া লও। না কিনিলে কাজই বা কিরূপে চলিবে?

এ কাজটা তোমরা ছেলেমেয়েরা শিখিয়া ফেল না কেন? বাবা, মাকে বলিয়া বাজার হইতে বাশ

বা হাতে বেত ধরিয়া বোনা হইতেছে

বেত এমন কিনিয়া আনিলে, আর একটুকু নজর দিলে সহজেই ও শিখিয়া ফেলিতে পার।

প্রথমে একটা ঝুড়ি কি ভাবে আরম্ভ করিতে হয়, তাহা দেখ। বাজার হইতে বেশ ভাল বেত আনিলে, তারপর যে ঝুড়িটা তৈরী করিবে সেটি

ঝুড়ির তলার দিক

কত বড় হইবে, কি মাপের হইবে তাহা স্থির করিয়া ফেল।

প্রথমে তলার দিক হইতে আরম্ভ কর। তলাটা তৈরী করিয়া ফেলিয়া ক্রমে ক্রমে ছবিতে যেমন ভাবে বুননি আরম্ভ হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর। বা হাতে বেত ধরিয়া ডান হাত দিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিলেই কাজের সুবিধা হইবে। তলাটা বেশ শক্ত ও মজবুত ভাবে তৈরী করিয়া ক্রমশঃ

এইভাবে বাটি ইত্যাদি বোনা হয়

সবগুলি শেষ হইলে তোমরা নিজেরা বেত তৈরী করিতে পার। এই ভাবে বেতের কাজ করিতেই তোমরা অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর ঝুড়ি বা Basket তৈরী করিয়া ফেলিতে পারিবে। এখানে

একটি তৈরী সুন্দর ঝুড়ি

একটা কথা তোমাদের বলিবার আছে। তোমরা প্রথম শিখিবার সময় যদি কোনও দক্ষ শিল্পীর নিকট হইতে একটু শিখিয়া লও, তাহা হইলে কাজ করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে, এবং অনেক

বা শুইবার পাটি বাজারে বেশ দরে বিক্রয়

তোমরা যদি একবার এই কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে দেখিবে যে, এই বেতের বুনানি, বাঁশের বুনানি কাজ কেমন চিত্তাকর্ষক। সৃষ্টির মধ্যে একটা আনন্দ আছে। কোন জিনিষ যদি নিজের হাতে কষ্ট করিয়া তৈরী করা যায়, তাহাতে যে আনন্দ

হাতের কাজের সক ক্রুস

হইবে তাহা ত স্বাভাবিক। নিজের তৈয়ারী ঝুড়ি বা ঝাঁপিতে করিয়া যদি জিনিষপত্র রাখ, বাবা মা'কে উপহার দেও, তাহা হইলে তাঁহারা কত খুসী হন বল ত।

তোমাদের প্রায় সকলের বাড়ীতেই [illegible]
[illegible]

উহা সহজেই ছিঁড়িয়া যায়, তখন কোন মেরামত-দারীকে না ডাকিলে আর উপায় থাকে না। সেজন্য খরচও বড় কম পড়ে না। কিন্তু যদি তুমি উহা শিখিয়া ফেল, তাহা হইলে আর কতক্ষণ। যেমনি নিজে বেত লইয়া কাজ সুরু করিয়া দিলে, অমনি কাজটি সম্পন্ন হইয়া গেল। তোমাদের প্রত্যেকের এরকমের ছোট ছোট শিল্পের কাজ শিক্ষা করা উচিত। তাহা হইলে যেমন একটা বিষয় শিখিতে পারিলে, তেমনি সখের হিসাবে বেশ দু' পয়সা রোজগারও করিতে পার। আপনার নিজের উপার্জ্জিত অর্থের মূল্য যে অনেক বেশী, সে কথা তোমাদের বলিয়া না দিলেও তোমরা অনুভব করিতে পার যে, উহাতে কত বড় তৃপ্তি ও আনন্দ রহিয়াছে।
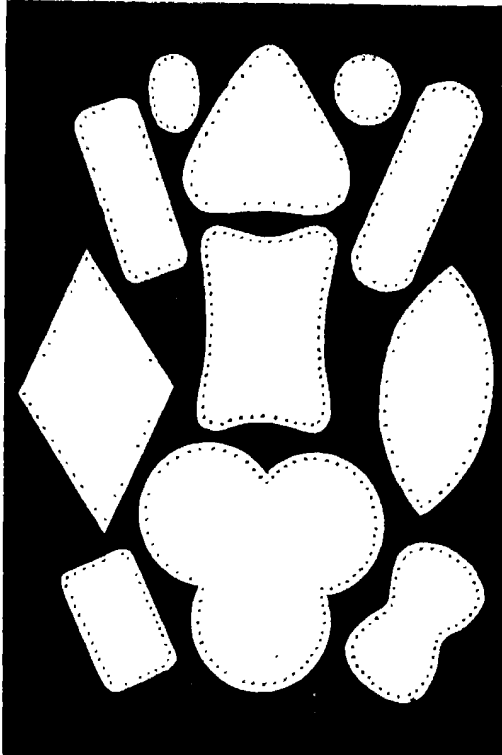
ইউরোপের স্কুলগুলিতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নানা রকমের হাতের কাজ শিখে। তাহারা এক মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করে না। তাহাদের নিজ হাতের তৈয়ারী শিল্প দ্রব্যাদি দেশের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কিনিয়া থাকেন। কুটির-শিল্প এবং পণ্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিবার জন্য আমাদের দেশেও বেশ মনোযোগ দেখা যাইতেছে। বেতের ন্যায় বাঁশ দিয়াও নানা প্রকারের জিনিষ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তারপর পাটের সূতা কাটা, বয়নকরা ও রং করা, গালিচা, আসন, সতরঞ্চী, বিছানা ঢাকা, পর্দা ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে শিক্ষা করা এমন কঠিন কাজও নয়।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের এক কথা বলিয়া
[illegible]

F. 9—32

বেতের চেয়ারের ছাউনি

কিভাবে ছাউনি দিতে হয়

এখানে কয়েকটি সৌখীন জিনিষের ছবি দেওয়া হইল

কুটির শিল্পজাত জিনিষ বিদেশে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে পার, তাহা হইলে ইহা দ্বারা যে ধন্য হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আমাদের দেশের কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব নাই। বিদেশীরা আমাদের দেশে নানা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেছে, আর আমরা দরিদ্রই রহিয়া যাইতেছি। একদিন আমাদের দেশ কুটির-শিল্পে অগ্রণী হইয়াছিল, তারপর কবে যে ধীরে ধীরে এই স্থান হইতে আমরা পিছাইয়া পড়িলাম, তাহার কোন সঠিক ইতিহাস নাই। কিন্তু একথা আমরা জানি আজ আমাদের কুটির-শিল্পের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। তোমরা যখন বড় হইবে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, তখন এই ছোট ছোট শিল্প সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়া জাতি, সমাজ ও দেশকে অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া লাভবান্ করিবে—বিশ্ব মুগ্ধ চিত্তে তোমাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে।

অদৃশ্য আলোক

আলো যে ইথার তরঙ্গমাত্র এ কথা তোমরা পাঠ্যপুস্তকের লেখা হইতে শিখিয়াছ। এই তরঙ্গ নানা প্রকারের হইতে পারে। মনে কর একটা তরঙ্গ অপর একটা তরঙ্গের তুলনায় বেশী উঁচু। তরঙ্গ উঁচু হইলে তাহার ধাক্কা দেওয়ার শক্তি বা জোর বেশী হয় ইহা তোমরা জান। আবার তরঙ্গের শক্তিভেদে তরঙ্গ বিভিন্ন হইতে পারে। তরঙ্গ উঁচু নীচু না হইয়া একটা অপরটার তুলনায় বড় বা ছোট হওয়া সম্ভব। তরঙ্গ বড় বা ছোট হওয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পায় বড় বিচিত্র ভাবে। যদি ইহা শব্দ-তরঙ্গ হয়, তবে বড় তরঙ্গের বেলায় আমরা মোটা শব্দ শুনি ও ছোট তরঙ্গের বেলায় সরু শব্দ শুনিয়া থাকি। হারমোনিয়মের বাঁ-দিকের চাবি টিপিয়া শব্দ করিলে তাহাতে মোটা আওয়াজ বাহির হয়, আর ডান দিকের চাবি টিপিলে সরু আওয়াজ বাহির হয়। ইহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। তরঙ্গ দিয়া বিচার করিলে ইহাকে বলিতে হয় যে বাঁ-দিক দিয়া যে শব্দ উত্থিত হয় তাহার ঢেউ বড় এবং ডানদিকের শব্দের ঢেউ ছোট। একথাগুলি বেশ মনে রাখিও।

আলোর বেলাতেও আলোর ঢেউ বড় কিম্বা ছোট হইতে পারে। আলোর ঢেউএর এইরূপ বড় বা ছোট হওয়া কিন্তু অন্য আর এক ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা দেয়। আমরা নানা রকমের রঙের আলো দেখি। আমাদের নিকট কোনও আলো লাল, কোনটা পীত, কোনটা সবুজ বা কোনটা নীল ইত্যাদি। রঙের দিক দিয়া আলোর এই যে বিভিন্নতা আমরা চোখ দিয়া বুঝিয়া থাকি তাহার কারণ আলোর তরঙ্গের বড় বা ছোট হওয়া। তরঙ্গের একটা মাথা হইতে ঠিক পরের মাথার ব্যবধানকে আমরা তরঙ্গান্তর নাম দিয়াছি। বৈজ্ঞানিকেরা আলোর ঢেউএর তরঙ্গান্তর মাপিতে পারেন। এই মাপজোক করিবার পর ইহা জানা গিয়াছে যে লাল রঙের আলোর ঢেউ পীত রঙের আলোর ঢেউএর তুলনায় বড়, পীত রঙের আলোর ঢেউ আবার সবুজ রঙের আলোর ঢেউএর চেয়ে বড়, এবং সবুজ আলোর ঢেউ নীল আলোর ঢেউএর চেয়ে বড়, নীল আবার বেগুনী রঙের ঢেউএর চেয়ে বড়। তোমরা জান যে সাদা আলোর বর্ণালীর (spectrum) এক প্রান্তে লাল রঙের আলো পাওয়া যায় এবং অন্য প্রান্তে পাওয়া যায় বেগুনে রঙের।

তোমাদের একটা ছবি দিলাম। বর্ণচ্ছত্রের প্রধান প্রধান রংগুলির ... তা এই ছবিটিতে পাওয়া যাইবে।

দেওয়া হইয়াছে তাহা রংগুলির তরঙ্গান্তরের মাপ। দৃশ্য আলোর তরঙ্গ আকারে খুব ছোট হয়। এই জন্য যে গজকাঠি দিয়া সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরা সব কিছু মাপজোক করিয়া থাকেন, তাহাতে উহার পরিমাপ করা সুবিধা হয় না। তাই বৈজ্ঞানিকেরা আলোর ঢেউ মাপিবার সময় একটা ছোট গজকাঠি ঠিক করিয়া লইয়াছেন। সাধারণতঃ যে গজকাঠি দিয়া বিজ্ঞানের সব মাপজোক হইয়া থাকে তাহার নাম সেন্টিমীটার। আলোর গজকাঠি এই সেন্টিমীটারের এক কোটি অংশের এক অংশ। ইহার নাম আংষ্ট্রম (Angstrom) উপরের ছবি দেখিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারা যাইবে যে লাল আলোর ঢেউ ৭৮০০ আংষ্ট্রম লম্বা, পীত ৬০০ , সবুজ ৫০০০ এবং বেগুনী ৪০০০ আংষ্ট্রম লম্বা। আমরা যে সব আলো চোখে দেখি তাহারা বর্ণচ্ছত্রের লাল ও সবুজ এই দুই সীমা দিয়া আবদ্ধ। লাল হইতে বৃহত্তর তরঙ্গ এবং বেগুনী হইতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ আমাদের চোখ ধরিতে পারেনা।

প্রথমতঃ আমাদের এই কথা স্বভাবতঃই মনে হয় যে, যে-ব্যাপারকে আমরা আলোর ঢেউ নাম দিতেছি তাহা কেন কেবলমাত্র ওই কয়টী তরঙ্গান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমরা অনায়াসেই এইরূপ কল্পনা করিতে পারি যে আলোর বিভিন্নতার সংখ্যা বা সীমা নাই। তবে যে আমরা মাত্র ওই কয়টা রঙের আলোই দেখি তাহার কারণ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ আমাদের চোখ দিয়া তাহাদের সবগুলিকে দেখা যায় না। এই আলো যদি সত্যই আমাদের দেখিতে হয়, তবে আমাদের নূতন চোখ তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে।

এখানে তোমাদের একটা কথা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। যাহাকে আমরা দেখিতে পাইনা, শুনিতে পাইনা, ধরিতে ছুঁইতে পারি না, এরূপ কোনও কিছুকে জানিতে হইলে আমরা কি উপায় অবলম্বন করি। এমন অবস্থায় আমরা এমন একটা জিনিষকে খুঁজিয়া বাহির করি যাহার উপর সেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়টি নিজের ছাপ রাখিয়া যায়। আমরা তখন এই ছাপকে বিশ্লেষণ করিয়া অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জন করিবার চেষ্টা করি। মনে কর, রাত্রে শুইবার ঘরে অন্ধকারে কোনও জন্তু আসিয়াছে। আলো জ্বালিলেই সে তৎক্ষণাৎ কোথায় লুকাইয়া পড়ে, আর কিছুতেই তখন তাহাকে পাওয়া যায় না। তুমি খুব বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কাজ করিলে। শুইতে যাইবার আগে ঘরের নানা স্থানে ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া রাখিলে। জন্তুটা রাত্রে চলিয়া বেড়াইবার সময় সেই ময়দার গুঁড়ার উপর পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। সকালে তুমি তাহার পায়ের ছাপ ময়দার গুঁড়ার উপর দেখিতে পাইলে। এইবার ছাপটিকে লইয়া নানারূপ গবেষণা চলিল। অবশেষে তুমি তাহাকে ইঁদুরের পায়ের ছাপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে। আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের অগোচরে যাহা সব সময় থাকে তাহার জ্ঞান পাইতে ... এইরূপ কোনও পরোক্ষ উপায় অবলম্বন ... ছাড়া অন্য পথ নাই।

অতএব অদৃশ্য আলোর অস্তিত্ব ধরিবার জন্যও আমাদের এইরূপই কোনও একটা পরোক্ষ উপায় বাহির করিতে হইবে। এ ... বাহির করিতে যাওয়ার আগে একটা বিষয় বিচার করিয়া লইতে হইবে। তুমি ময়দার গুঁড়া না ছড়াইলে কেন, তাহার পরিবর্তে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা অনবরত বাজাইতে পারিতে। এই দ্বিতীয়টা ছাড়িয়া তুমি প্রথম কাজটি করিলে এই মনে করিয়া যে জন্তুরা ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া ভয়ে পলাইয়া যায় আর অপর পক্ষে প্রথমটির বেলা তাহার পায়ের ছাপ তাহাতে পড়ে। অর্থাৎ ময়দার গুঁড়ার উপর জন্তুটা নিজের পায়ের ছাপ ফেলিয়া যাইতে পারে এই কথা তুমি জানিতে বলিয়াই ওই উপায়টি অবলম্বন করিয়াছিলে। এখন আলো কোথায় কোথায় নিজের ছাপ ফেলিয়া যাইতে

হইবে

চোখ ছাড়াও এমন কয়েকটা জিনিষের বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যেখানে আলো নিজের

অস্তিত্ব গোপন রাখিতে পারে না। এই যে কয়েকটি জিনিষের কথা বলিলাম ইহার মধ্যে প্রধান হইল ফোটোগ্রাফির প্লেট। ফোটোগ্রাফির প্লেটের এমন গুণ যে শুধু দৃশ্য আলোই নহে, বেগুনে রঙের চেয়ে যত রকমের ছোট তরঙ্গের আলো হওয়া সম্ভব সকলেই এই জিনিষটার সংস্পর্শে আসিয়া নিজের অস্তিত্ব গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। তাহাকে ধরা দিতেই হয়। আলোর আবার আর একটি গুণ আছে। যে সব জিনিষকে উত্তপ্ত করিয়াও তোলে। সিলিনিয়াম নামক একটা মৌলিক পদার্থ আছে। ইহার উপর আলো আসিয়া পড়িলে তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তবেই তোমরা গান শুনিতে পাও। এখন এই সব অদৃশ্য আলো লইয়া এত গবেষণা হইয়া গিয়াছে যে তাহার সংখ্যা হয় না, আর তাহার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা এই সব বিষয়ের জ্ঞানও অর্জ্জন করিয়াছেন সেই রকমেরই অদ্ভুত রকম। তোমাদের পক্ষে সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা এখন সম্ভব নয়। তাই তোমাদের এই চমৎকার বিষয়টি সম্বন্ধে একটুখানি আভাষ দিন মাত্র।

কাঁচের বা তিনকোণা কাচের মধ্য দিয়া আলো চলিয়া যাইলে তাহা নানা রঙে ভাঙিয়া যায় তাহা তোমরা পড়েছ শিখিয়াছ। সাদা আলো এইভাবে ভাঙিয়া যায় তাহা আমরা চোখেও দেখিতে পাই,
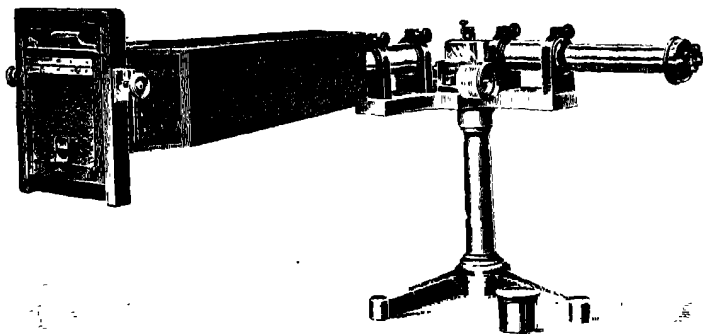
বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র — একটি যন্ত্র দ্বারা প্রথম ছবিটি তোলা হইয়াছিল

হয়। অবশ্য আলোর
তবে তাহারা আরোও বিচিত্র কাজ করে
তখন তাহার বিদ্যুৎ তৈয়ারী করিবার জন্য সিলিনিয়ামের প্রয়োজন হয় না—যে কোনও ধাতব পদার্থের উপর পড়িলেই তাহাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করে। তোমাদের কাহারও বাহারও বাড়ীতে রেডিও আছে। রেডিওতে গান বা কথা শুনিতে হইলে ছাদের ওপরের একটা তামার তারের সঙ্গে যন্ত্রটিকে জুড়িয়া দিতে হয়। ছাদের ওপরের এই তারটির নাম এরিয়াল। এই এরিয়ালের উপর অদৃশ্য আলোর (Ultra-violet rays) ঢেউ আসিয়া পড়িলে তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সঞ্চারিত তাহার ছবিও তুলিতে পারি। ছবিতে অবশ্য আর রং থাকে না কিন্তু Plate-এর গায়ে আলো আসিয়া লাগিয়াছে তাহার সাক্ষ্য বর্ত্তমান থাকে। এখানে তোমাদের একটা ছবি দিতেছি। ছবির প্রথমটি হইল সাদা আলো ভাঙিয়া যখন নানা রঙের আলো হয় তখন আমরা চোখে তাহাকে কি ভাবে দেখিতে পাই। তাহার নীচে ছবিতে চোখের পরিবর্ত্তে ফোটোগ্রাফির প্লেট দিলে প্লেটের গায়ে কি চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা দেখান হইয়াছে। এই দুইটি ছবি তুলনা করিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে রঙ ফুটাইয়া তোলা ছাড়া আলোর তরঙ্গের সবই ফোটোগ্রাফির প্লেট

সুন্দরভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছে। অতএব চোখের পরিবর্ত্তে আমরা ফোটোগ্রাফের প্লেট দিয়া আলোর অস্তিত্ব ধরিতে পারি।

এইটুকু শিখিবার পর আমরা আমাদের চোখের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন আনিয়া দিই। আমরা যেখানে ত্রিকোণা কাচের প্রিজ্‌ম ব্যবহার করিতে-ছিলাম সেইখানে কাচের পরিবর্ত্তে অন্য আর একটি পদার্থের প্রিজ্‌ম লাগাইয়া দিই। এই কাচটি দিয়াও সাদা আলো ভাঙিয়া নানা বর্ণের আলো হইয়া যায়। কিন্তু যখন এই আলোর ছবি তুলিবার

চেষ্টা করি তখন একটা অদ্ভুত জিনিষ ফোটো-গ্রাফের প্লেটের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণচ্ছত্রের যেখানে বেগুনে রঙের আলো আমরা চোখে দেখিয়াছি plateএর উপর আলোর ছাপ সেখানেই শেষ হয় নাই—তাহা হইতে আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহা চলিয়া গিয়াছে। চোখে যে আলো দেখিতে পাই এই ছাপও অবিকল সেই জাতীয়, তাহাতে কোনও ভুল নাই। অতএব

দুইটি কারবন দণ্ডের মাঝে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পরিচালনা করিলে প্রচুর Ultra Violet রশ্মি পাওয়া যায়

ইহাও আলো—ইহাকে চোখে দেখি বা না দেখি তাহাতে কিছুই আসে যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দিয়াছেন Ultra-violet-light।

তোমরা একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। আমরা এইবারে ত্রিশির কাচের (Prism) স্থানে কাচমণি বা স্ফটিক প্রস্তরের (Quartz) Prism ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাহার কারণ (Ultra-violet) অতি বেগুনী রশ্মি কাচের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। অস্বচ্ছ কাচ তাহার **কাছে অঙ্গারের মত কালো।** অথচ কাচমণির ভিতর দিয়া সে অনায়াসে গলিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এখন এমন জিনিষ বাহির করিয়াছেন,

যাহা সাদা আলোর কাছে একেবারে অস্বচ্ছ অথচ যাহার ভিতর দিয়া এই ultra-violet আলো গলিয়া যাইতে অসুবিধা বোধ করে না।

আমাদের বায়ুমণ্ডল কেমন স্বচ্ছ তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। কিন্তু এমন রশ্মি আছে যাহার কাছে এই বায়ুমণ্ডল কয়লার মত অস্বচ্ছ। কাচমণির Prism লইয়া যে ছবিটি তুলিয়া তুমি ultra-violet আলোর অস্তিত্ব ধরিয়াছিলে সেই ছবিটি একটু নূতনভাবে করিবার চেষ্টা কর। এইবার Quartz এর পরিবর্তে আর একটি পদার্থের Prism ব্যবহার করিতে হইবে। এই পদার্থটির নাম Calcium fluorite বলে। Prismটি বসাইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আরও একটি কাজ করিতে হইবে। আলো হইতে আরম্ভ করিয়া ফটোগ্রাফের plate পর্যন্ত সব স্থানটি বায়ুশূন্য করিতে হইবে। এই করিলে তুমি যে আলোর ছাপ দেখিবে তাহা বাতাসের আলোর ছাপের চাইতে বড়। এই নূতন আলোর কাছে বাতাস কালো বটেই, Quartzও কালো। একটি বায়ুর মত স্বচ্ছ পদার্থও ইহার নিকট কয়লার মত কালো। এ আলোকচিত্র হইয়াও বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান, দৃষ্টির বাহিরে হইলেও হার মানিতে হইয়াছে।

Ultraviolet আলো যাহা Quartz ভেদ করিয়া যায় তাহার তরঙ্গ বেগুনী আলোর তরঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র। যে আলো fluorite ভেদ করিয়া যাইতে পারে অথচ Quartz এবং বায়ুমণ্ডল যাহার কাছে অস্বচ্ছ তাহার তরঙ্গ ultraviolet তরঙ্গ হইতেও ক্ষুদ্র। ইহাদের হইতেও ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলো আছে। তাহাকে ধরা আরও কঠিন। কারণ তাহার নিকট সব পদার্থই একেবারে অস্বচ্ছ। অর্থাৎ এমন কোনও পদার্থ বৈজ্ঞানিকদের এখনও জানা নাই যাহার Prismএর ভিতর দিয়া এই আলো গলিয়া গিয়া বর্ণালী তৈয়ার করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু ইহাতেও হার মানিলেন না। তিনি Prismকে বাতিল করিয়া দিলেন এবং অন্য উপায়ে বর্ণচ্ছত্র তৈয়ার করিলেন। এইবার এই অতিশয় ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলো বশ মানিতে বাধ্য হইল।

আংষ্ট্রম কি তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বেগুনী রঙের আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হইল ৪০০০ আংষ্ট্রম। Quartzএর ভিতর দিয়া ১৬০০০ আংষ্ট্রম এর তরঙ্গ অনায়াসে ভেদ করিয়া যায়। fluorite এর ভিতর দিয়া ইহা হইতেও ছোট তরঙ্গ চলিয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে ১২৫০ আংষ্ট্রমের তরঙ্গ পর্যন্ত fluorite এর ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। ইহা হইতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গের নিকট fluorite একেবারে অস্বচ্ছ। ১২৫০ হইতে প্রায় ১ আংষ্ট্রম পর্যন্ত যে আলোর তরঙ্গ তাহাকে ধরিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের অনেক মাথা ঘামাইতে
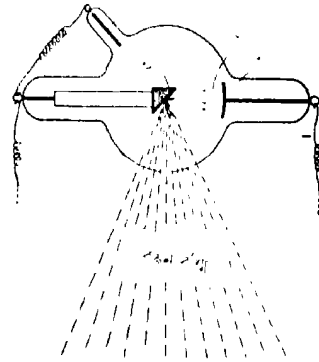
১। কঠিন ধাতব পদার্থের বাধা
২। দ্রুতগতি ইলেক্ট্রনের রশ্মি
৩। ইলেক্ট্রন বাহির হইবার দ্বার

রঞ্জনরশ্মি কিরূপে উৎপন্ন হয়

হইয়াছে এবং পর প্রায় কিছুদিন হইল তাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছেন।

ইহা হইতেও যে ছোট তরঙ্গ আছে তাহাকে Rontgen নামে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম রঞ্জন-রশ্মি। ইহার অপর নাম এক্স রে (X-rays)। ইহা আবিষ্কার হইয়াছিল অকস্মাৎ। বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমতঃ ইহা যে কি সে সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এই জন্যই ইহার নাম তাঁহারা X-অর্থাৎ অনামা রশ্মি দিয়াছিলেন। সে নামেই ইহা পরিচিত।

রঞ্জন রশ্মির একটি গুণ এই যে তাহা প্রায় সব জিনিসের ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কয়লা, ও aluminium ধাতু তাহার কাছে স্বচ্ছ। তবে সব জিনিসই যে উহা ভেদ করিয়া যায় তাহা নহে—সীসার নিকট এই রশ্মি পরাজিত হয়। তাহাকে ভিতরে যাইতে দিতে নারাজ হয়। রঞ্জন রশ্মির বস্তুমাত্রকে ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার সম্পর্কে একটি নিয়ম বৈজ্ঞানিকেরা বাহির করিয়াছেন।

রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গায়ন মাপিবার যন্ত্র। যন্ত্রটি কিরূপ জটিল তাহা বুঝাইবার জন্য ইহা এখানে দেওয়া হইল

তাহা এই। যে বস্তু যত হালকা হইবে রঞ্জন-রশ্মি তাহাকে তত শীঘ্র ভেদ করিতে পারিবে। তাই অঙ্গার বা aluminium সাধারণ আলোর কাছে একেবারে অস্বচ্ছ হইলেও রঞ্জন-রশ্মির কাছে কাচের মত স্বচ্ছ। কাঠের উপাদানে আছে প্রধানতঃ অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। ইহারা সকলেই হালকা তাই কাঠকে ভেদ করিতে তাহাকে বেগ পাইতে হয় না। aluminium অতিশয় হালকা ধাতু। তাই X-rays ইহাকে ভেদ করিয়া যায়। কিন্তু ভারী জিনিষ সীসা ভেদ করিতে পারে না।

রেডিয়ামের নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছ। এই রেডিয়াম হইতেও একপ্রকার রশ্মি নির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দিয়াছেন গামা-রশ্মি (γ-radiation)। গামা-রশ্মির বস্তুকে ভেদ করিয়া করিয়া যাওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ। রঞ্জন রশ্মি সীসাকে ভেদ করিবার সময় মাথা হেঁট করে, কিন্তু এই γ-রশ্মি সীসার পাত পাতলা হইলে তাহাকেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে এই γ-রশ্মি আবার রঞ্জনরশ্মি হইতেও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ বিশিষ্ট।

তোমরা মনে করিতেছ বোধহয় বেগুনী রঙের আলোর তরঙ্গ হইতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ এইবার শেষ হইল। কিন্তু তাহা নহে। ইহা হইতেও ক্ষুদ্রতর রশ্মি বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে রশ্মির শেষ নাই। বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি যত নূতন নূতন উপায় বাহির করিবে ততই আরও নূতন রশ্মির সন্ধান মিলিবে। পূর্বকার বৈজ্ঞানিকেরা কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ের অবধি নাই। অনাগত কালের বৈজ্ঞানিক মানুষকে আরও অদ্ভুততর বিস্ময়ের বার্তা শুনাইবে। হয়ত তোমাদের মধ্যেই কেহ অচির ভবিষ্যতে সেই অনাগত কালের বিস্ময়ের বার্তা নিয়া মানুষের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে—কে জানে?—

বিজ্ঞান আমাদিগকে দিন দিনই নূতনের দিকে টানিয়া নিতেছে। একদিন যাহা অসম্ভব ছিল, এখন তাহা সম্ভব হইতেছে। এমন দিন আসিবে, যখন আজকালকার যে সব নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে, তাহাই হয়ত অনাগত ভবিষ্যৎ যুগের লোকের কাছে মনে হইবে চির পুরাতন। তোমরা হয়ত সেই যুগের এক একজন আবিষ্কর্তা হইয়া এই মৃত্যুশীল জগতের মাঝে অমরতা লাভ করিবে।

অন্ধকারে আমাদের ভাল ঘুম হয় কেন?

১৯১৯ পৃষ্ঠার পর

আমরা নিদ্রা যাইবার সময় অন্ধকার ঘরে ঘুমাইতে ভালবাসি। তাহার কারণ এই যে, আলোতে আমাদের স্নায়ু ও পেশীগুলি বেশী সতর্ক থাকে। আলো দেখিলে তাহারা সঙ্কোচিত হইয়া থাকিতে পারে না, তাহারা চায় কাজ করিতে। এজন্যই রাত্রির অন্ধকারে ঘুম ভাল হয়। দিনের বেলা যদি ঘুমাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘুমাইলে ঘুম ভাল হইবে।

ঘুমের মধ্যে কি আমরা কোনও শব্দ শুনিতে পাই?
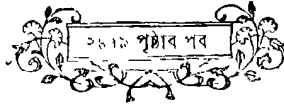
আমরা খুব জোরে না চেঁচাইলে ঘুমের মধ্যে কোনও শব্দ শুনিতে পাই না। কেন ঘুমের মধ্যে কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাই না, তাহার কারণ এই যে, ঘুমে আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশ শুনিবার কাজ করে তাহা নিষ্ক্রিয় থাকে, সেই জন্য ছোট ছোট শব্দ কানে শুনিলেও নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কে তাহার কোনও অনুভূতি জাগে না। এ জন্যই খুব জোরে না চেঁচাইলে আমরা ঘুমের মধ্যে কোনও শব্দ শুনিতে পাই না। তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই জানিতে পারিবে যে, রাত্রির প্রথম ভাগে কোনও নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইতে হইলে খুব জোরে ডাকিতে হয়, কিন্তু ভোরের দিকে ততটা জোরে ডাকিতে হয় না। কেন জান? রাত্রির প্রথম ভাগে আমাদের গাঢ় নিদ্রা হইয়া থাকে। এজন্যই এ সময়টাকে সুখের নিদ্রা বলা হয়। সময় সময় আমরা ঘুমের মধ্যে কথা-বার্ত্তাও শুনিতে পাই। যে সময় সমগ্র মস্তিষ্ক (brain) সক্রিয় হয় না, আংশিক পরিমাণে হইয়া থাকে, ঐ সময়ে আমরা নানারূপ স্বপ্নও দেখিয়া থাকি। তোমরা যদি কোনও ঘুমন্ত ব্যক্তির কানে কানে আস্তে আস্তে কথা বল, তাহা হইলে তাহার স্বপ্ন বলিয়া ভুল হইবে। সাবধান। তা বলিয়া ঘুমের মধ্যে কাহারও কানে কানে কথা বলিতে যাইও না। ইহাতে অনেক সময় গুরুতর ক্ষতি হয়।

'সপ্ত-সিন্ধু' বা 'Seven Seas' বলে কেন?

'সপ্ত-সিন্ধু' কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যেই যে আছে তাহা নহে। সব দেশের সাহিত্যেই 'সপ্ত-সিন্ধুর'

উল্লেখ রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের **উত্তর** ও **দক্ষিণ ভাগ,** আটলান্টিক মহাসাগরের **উত্তর** ও **দক্ষিণাংশ,** উত্তর সমুদ্র ও দক্ষিণ সমুদ্র। ভারত-মহাসাগর এই সাতটি মহাসাগরই সপ্ত-সিন্ধু নামে পরিচিত। ইংরাজ কবি কিপলিঙ্গের (Rudyard Kipling) একখানা বইয়ের নাম আছে 'The Seven Seas'। পারস্যের বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের একটি চতুষ্পদী কবিতায় আছে—এই পৃথিবীতে কেউ বা আমাদের জীবন মরণের খবর রাখে? যেমন সপ্ত-সিন্ধু কোথায় তার একটি নুড়ি আছে তার খবর জানে না।

কোনও গভীর গর্ত্তের দিকে চাহিলে আমাদের মাথা ঘুরায় কেন?

আমরা সাধারণতঃ সোজাসুজি চাহিয়া থাকি। এবং আকাশের দিকে, উচ্চ বাড়ী-ঘরের দিকে, উঁচো পাহাড়ের দিকে, গাছ-পালার দিকে চাহিতে অভ্যস্ত। কাজেই আমাদের আকাশের দিকে তাকাইতে, গাছ-পালার দিকে তাকাইতে কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু নীচের দিকে তাকাইবার অভ্যাস আমাদের নাই। নীচের দিকে আমরা সচরাচর আমাদের পায়ের তলার মাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি, কাজেই গভীর খাতের দিকে তাকাইতে আমাদের চক্ষু অভ্যস্ত নহে। এজন্যই পর্ব্বতশিখর হইতে যখন নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের ভয় হয় এবং মাথা ঘুরায়। কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া গেলে এই ভীতি ভাবটা সহজেই দূর হইতে পারে।

কোন্ প্রাণী কতদিন বাঁচে?

মানুষ গড়ে ৩৩ বৎসর বাঁচে। ভল্লুক ২০ বৎসর। কচ্ছপ ৩৫০-৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। কুকুর ২০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর। নেকড়ে বাঘ ২০ বৎসর। শেয়াল ১৪ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। বিড়াল ১৩ বৎসরের বেশী বাঁচে না। হাতীর পরমায়ু ৪০০ বৎসর। ভেড়া ১২ বৎসর। গরু ২৫ বৎসর। উট সময় সময় ১০০ বৎসরও বাঁচে। ঘোড়া ৫০-৬২ বৎসর, ছাগল বাঁচে ১৫ বৎসর, শূকর ১০ বৎসর, সিংহ ৪০ বৎসর, কুমীর ৩০০ বৎসর, খরগোশ ও কাঠ-বিড়ালী ৭-৮ বৎসর। মৎস্য কখনও কখনও বৎসরও বাঁচিয়া থাকে।

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গর্ত্ত কোন্‌টি?

ক্যালিফোর্ণিয়ার (California) একটি তৈল কূপের গভীরতা ৭,১৫৬ ; এবং ৮,২০১ ফিট। প্রায় ১½ মাইল হইবে। আফ্রিকার সোনার সন্ধানে যে গর্ত্ত করা হইয়াছিল, যদিও তাহার বেড় মাত্র এক ইঞ্চি—উহার গভীরতা ছিল ৫,২০০ ফিট।

মানুষের সব চেয়ে উচু বাড়ী কোথায়?

ভারত ও তিব্বতের সীমান্তে হানলে (Hanle) নামক পর্ব্বতশৃঙ্গে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে। এই মঠটি সমতল ভূমি হইতে প্রায় তিন মাইল উচ্চে অবস্থিত। এখানে বার মাস এক শত জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন।

আমরা নাসিকা দিয়া শ্বাস গ্রহণ করি কেন?

আমরা অনেক বিষয় জানিনা। জানিতেও ইচ্ছা করি না। ধর এই যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি ও ত্যাগ করি, তোমরা হয়ত মনে করিবে, এ বিষয়ে জানিবার কি কোন দরকার আছে?—আমরা বলিব নিশ্চয় আছে এবং তাহা জানাও প্রয়োজন। এমন অনেক প্রাণী দেখিতে পাইবে, যাহাদের নাক ও মুখ দুই-ই আছে, কিন্তু তাহারা শ্বাস লইবার সময় নাক দিয়াই লইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ নাক দিয়াই শ্বাস লই। কখন কখন মুখ দিয়া লই। কিন্তু একটা কথা এই যে, যে ভাবেই শ্বাস লই না কেন, শ্বাস বায়ুশ্বাস নালী দিয়াই যাইবে। ধর, যদি তোমাকে একদল নেকড়ে বাঘ আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তুমি প্রাণের ভয়ে দৌড়াদৌড়ি কর এবং সে সময়টা খুব বেশী ক্লান্ত হইয়া পড় বলিয়া মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ কর। মুখ হইতেছে আমাদের পাকস্থলীর পথ। সেই পথে আমরা আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করি। মুখ দিয়া শ্বাস ফেলিলে, মুখের চেহারা বিশ্রী হইয়া যায়। **কাজেই তোমরা নাসিকা দিয়াই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে ও ত্যাগ করিবে।**

চোখের ধাঁধা

[২৪৮০ পৃষ্ঠার পর]

তোমরা যাহা চোখে দেখ, তাহা কখনই অবিশ্বাস কর না, আর ইহাকে কেহ অবিশ্বাস করিতে বলেও না। কিন্তু "মরীচিকা"র কথা তোমরা শুনিয়াছ কি? এই "মরীচিকা" চোখের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাকে চোখের ভ্রম বা চোখের ধাঁধা বলা হইয়া থাকে। চোখের ধাঁধার দৃষ্টান্ত তোমরা "শিশু-ভারতী"তে পূর্ব্বে পাইয়াছ, আবারও তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল:—
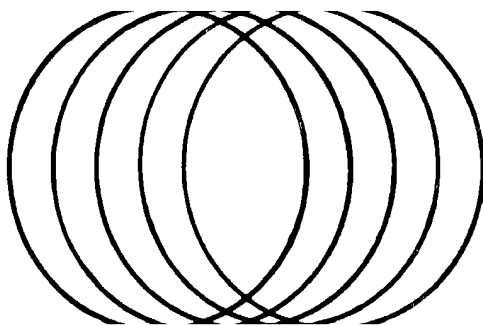
(১) **চোঙ্গার মুখ**—ঠিক যেন একটি চোঙ্গা: গায়ে কয়েকটি বৃত্তাকার টান দেওয়া আছে। চোঙ্গাটি মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে:—কিন্তু, ইহার মুখ কোন্‌দিকে?—ডান দিকে কি? ভাল করিয়া দেখ এবার—বাঁ দিকে নয় কি? চোখকে যেমন দেখাও তেমন দেখে।

(২) **চৌখোপীর মাপ**--কালো চৌখোপীর মাঝের সরু সাদা লাইনগুলি দেখ আর সাদা চৌখোপীর মাঝের কালো মোটা লাইনগুলি দেখ। এবার মাপিয়া দেখ—দুই-ই সমান চৌড়া।
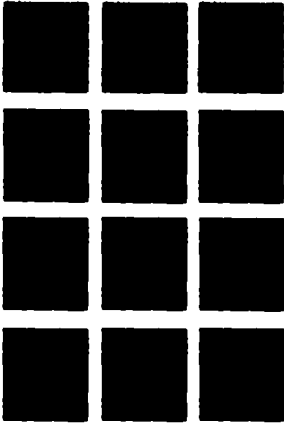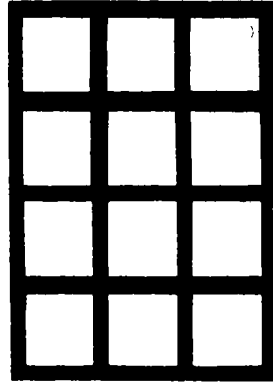
আরেকটি মজা—কালো চৌখোপীর দিকে চাহিলে, মাঝের কোণাগুলিতে কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়—আসলে সেগুলিকে চোখের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।
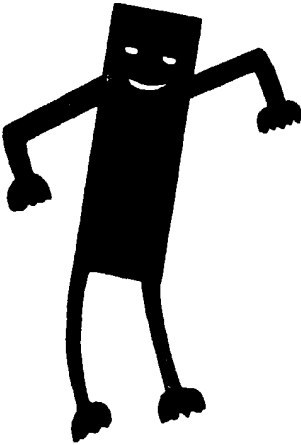
(৩) **নাচের বাহার**—নাচনদারকে দেখ একবার! উহার ডান হাতের নীচের লাইনটির সহিত বা হাতের উপরের লাইনটি একই লাইনে আছে বলিয়া মনে হয়। একবার মাপিয়া দেখ তো!

(৪) **মৌমাছির মধুর লোভ**—বাঁয়ে মৌমাছি, ডাইনে ফুল, মাঝে একটি সোজা রেখা। এই রেখাটির উপর খাড়াভাবে একটি কার্ড রাখিয়া, একটু দূর হইতে ছবিটিকে দেখ। তাহার পর, আস্তে আস্তে মাথা কাছে আন। দেখিবে, মৌমাছি ফুলের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে।
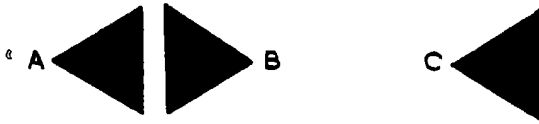
(৫) **দূরত্বের গোল**—এই ছবিখানিতে A হইতে Bএর দূরত্ব অপেক্ষা B হইতে Cএর দূরত্ব বেশী একবার দেখ। কিন্তু, মাপিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, উভয়ের দূরত্ব সমান!

(৬) **কোণার মাপ**—এই ছবিতে উপরের কোণাটি নীচের কোণা অপেক্ষা কত বড় একবার দেখ। এইবার মাপিয়া দেখ :—দুটি কোণারই মাপ এক। এখানে তোমাদের কাছে এইরূপ হইবার আর কোন কারণ নাই, কেবল চোখের ধাঁধা। এই ভুলের জন্যই তোমাদের কাছে এইরূপ মনে হইতেছে। কার্যতঃ উপরের কোণাটি নীচের কোণা হইতে বড় নয়, পরস্পর সমান। যখন মাপিয়া দেখিলে যে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য, এখন নিশ্চয়ই তোমরাও চোখের ধাঁধাকে মানিয়া লইলে।

(৭) **মজার দৃশ্য**- প্রথমে দুইটি কালো গোল বড় দাগ (ক) দেখিতে পাইতেছ, উহার মধ্য স্থানে একটি রেখা ও রহিয়াছে। এইবার এই দাগ হইতে ঠিক এক ইঞ্চি দূরে তোমাদের নাক ও চোখ স্থাপন কর। তারপর ধীরে ধীরে চোখ স্থির রাখিয়া ঐ দাগের দিকে একটু একটু করিয়া আগাইতে থাক, এখন কি
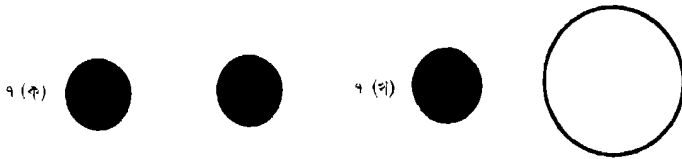
দেখিতে পাইতেছ ? একটি কালো দাগ অপরটির সহিত মিলাইয়া যাইতেছে না! এবার সম্পূর্ণ ভাবে দুইটি দাগই এক হইয়া গিয়াছে। এই যে দাগ দুইটি এক হইয়া গেল, ইহাও তোমাদের চোখের ধাঁধা, কারণ বাস্তবিক ওখানে দুইটি দাগই রহিয়াছে। এমনি ভাবে অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়াও তোমরা দেখিতে পার। একটি কালো দাগ অপরটি সাদা বৃত্ত (খ)। পূর্ব্বে যেমন করিলে, এবারেও তোমাদের চোখ দিয়া তেমনি ঐ কালো দাগ ও বৃত্তটিকে দেখিতে থাক, দেখিবে কালো দাগটি সাদা বৃত্তটির মধ্যে যেন প্রবেশ করিয়াছে, কার্য্যতঃ উহার অর্থাৎ কাল দাগটির হাত-পা নাই যে, চলিতে চলিতে বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এবার বুঝিলে তো, তোমাদের চোখের ধাঁধা কি ভাবে তোমাদের ঠকাইতে পারে ?

নায়েগ্রা জলপ্রপাত

২২২৩ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাতগুলির মধ্যে নায়েগ্রা জলপ্রপাত বিশেষ বিখ্যাত। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত সম্বন্ধে ('শিশু-ভারতী' ১৩২৯ পৃষ্ঠা) বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। নায়েগ্রা জলপ্রপাত ক্যানেডা এবং আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকায় যেখানে হ্রদের সংখ্যা খুব বেশী সেখানে নায়েগ্রা জলপ্রপাত বিদ্যমান রহিয়াছে। নায়েগ্রা নদীর জল উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে নিম্নে পতিত হইতেছে।
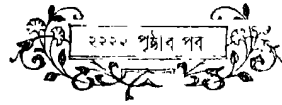
শীত ঋতুতে—নায়েগ্রা প্রপাত

শীতের দৃশ্য—নায়েগ্রা প্রপাত

নায়েগ্রা প্রপাতের অপরূপ সৌন্দর্য্য চিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট হইতে পারে না। ছবি দেখিয়া তোমরা প্রপাত সম্বন্ধে যে ধারণা করিতেছ, যদি কখনও প্রপাতের কাছে যাইয়া দেখিতে পার,

তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, ছবিতে উহার সৌন্দর্য্যের এক কণাও ফুটিয়া উঠে নাই। উচ্চ পাহাড়ের বুক হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে নায়েগ্রার জলরাশি যখন সশব্দে

নায়েগ্রা প্রপাত

নিম্নে পতিত হয়, তখন সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া তাহার উপর শত শত ইন্দ্র-ধনু ফুটিয়া উঠে।

কয়েক বৎসর যাবৎ নায়েগ্রার এই বিশাল জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদন করিয়া আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অনেক কল-কারখানা পরিচালিত হইতেছে।

নায়েগ্রা প্রপাতের কাছে যাইবার জন্য অনেক দুঃসাহসিক ব্যক্তি জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে গিয়া অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছেন। একবার মাত্র এক ব্যক্তি নায়েগ্রা প্রপাতের কাছে যাইতে পারিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন ওয়েব (Captain Webb) যিনি সকলের আগে ইংলিশ চ্যানেল (English-Channel) সাঁতরাইয়া পার হইয়াছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন ওয়েব নায়েগ্রার জল প্রপাতের স্রোতোধারার মধ্য দিয়া সাঁতরাইয়া প্রপাতের কাছে যাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের শব্দ বহু ক্রোশ দূর হইতেই স্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। নায়েগ্রা দেখিবার জন্য যে সকল পথিক সেখানে যান, তাহারা বলেন যে, প্রপাতের ভীষণ শব্দে রাত্রিতে তাহাদের ঘুম হয় না। আবার প্রপাতের কাছাকাছি যাহাদের বাড়ী-ঘর—নায়েগ্রা সহরের অধিবাসীরা বলেন যে, প্রপাতের শব্দ না শুনিলে রাত্রিতে তাহাদের ঘুম হয় না।

পৃথিবীর নানা-স্থানে যে সকল দেখিবার মত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি আছে, তাহাদের মধ্যে নায়েগ্রাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া

নায়েগ্রার জলধারা

যাইতে পারে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর, তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতির স্বভাবিক সৌন্দর্য্য যাহাতে হ্রাস না পায়, সেজন্য আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে যত্ন লইয়া থাকেন।

এই জল প্রপাতের উচ্চতা হইতেছে ৫৭০ ফিট এবং প্রশস্ততা হইতেছে ২৪৫ ফিট। কোন কোন

স্থানে ৩০০ ফিট উচ্চতাও দেখা যায়। নায়েগ্রা প্রপাতের জলধারা দিবারাত্র ঝর ঝর, ঝম্ ঝম্ শব্দে নীচে পড়িতেছে। সে শব্দ শুনিয়া মনে হয় যেন দিন রাত্রি এক ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে। রাত্রিবেলা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছে যখন শত শত প্রদীপ জ্বলিতে থাকে তখন, তাহার

নায়েগ্রা প্রপাত

যে অপরূপ শোভা হয়, তাহা না দেখিলে বলিয়া বুঝান যায় না। তখন হাজার হাজার ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ রশ্মি নাচিতে খেলিতে থাকে, সে যেন রঙের বিচিত্র লীলার এক স্বপ্ন-পুরী। সূর্য্যের কিরণেও অমনি শত শত ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হয়।

এই প্রপাতের জলধারা ঋতুভেদে আবার নানা পরিমাণ হয়। শীতের সময় জল জমিয়া যায়। তখন মনে হয় কে যেন একজন বলিতেছে—কেমন স্পর্দ্ধা! এইবার একবার ছুটিয়া বেড়াও দেখি!

পৃথিবীর মধ্যে ভিক্টোরিয়া জল প্রপাত এবং নায়েগ্রা জল প্রপাতই হইতেছে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু নিউ জিল্যাণ্ডের South Island ও কাই-টিয়ারের (Kaietaur) জল প্রপাত হইতেছে পৃথিবীর সব চেয়ে উচ্চ। নায়েগ্রা জলপ্রপাত ভূ-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতদের নিকট বিশেষ আদরণীয়। নায়েগ্রা নদীর জলধারা ভীষণ বেগে পতিত হইয়া নীচে যে বিরাট হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ৯,৫০০০

নায়েগ্রা প্রপাত

বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং সেখান হইতে দিকে দিকে সলিল-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া প্রায় ২৯০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণ ভূমিকে উর্ব্বর এবং শস্য-শ্যামল করিয়া আসিতেছে। এই প্রপাতের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ হইতে প্রতিবৎসর বহু ভ্রমণকারী আগমন করেন। তাঁহারা বলেন—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া নায়েগ্রা জলপ্রপাত অপেক্ষা ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাতের সৌন্দর্য্য অনেক বেশী।

বরফের দেশে—শ্বেত ভল্লুক

ভারতচন্দ্র

আমরা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের পুরাতন কথা আলোচনা করিয়াছি। হাজার বছরের পুরাণো বৌদ্ধ গান, তাহার পরে ময়নামতীর গান ও মহীপালের গান প্রভৃতি আমাদের সাহিত্য যে কত পুরাতন, তাহার সাক্ষী হইয়া আছে। পুরাতন সাহিত্যের আলোচনাকরিতে করিতে বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা বলিয়াছি; এই বৈষ্ণব সাহিত্য আমাদের গৌরবের সামগ্রী। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আমাদের কম গৌরবের নহে, এবং তখনকার অবস্থার কথা বলিতে গেলে ভারতচন্দ্রের নাম করিতে হয়। সাহিত্যের ভাব ও ভাষা ঘষিয়া মাজিয়া যেরূপে লোকের সামনে ধরিতে হয়, যে ভাবে ধরিলে লোকের ভাল লাগে, ভারতচন্দ্র তাহা ভালই জানিতেন; তাই তাঁহার লেখা শিক্ষিত বাঙ্গালীর জানা যে দরকার, সে বিষয়ে দুই মত নাই, হইতেও পারে না।

ভুরসুট পরগণা তখন বাঙ্গলা দেশের সুপরিচিত স্থান ছিল, তাহার রাজা নরেন্দ্র রায় জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভারতচন্দ্র রায় এই নরেন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র। তিনি নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন; সে সকল বিদ্যার একটা তালিকাও তাঁহার বইয়ের মধ্যে দিয়াছেন।

"ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগম বেত্তা নাগরী পারসী॥"

ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার, সঙ্গীত-শাস্ত্র, পুরাণ, আগম—এ সব শাস্ত্র তিনি ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, এমন শিখিয়াছিলেন যে পড়াইতেও পারিতেন,—তাই নিজের কাব্যে নিজের

পরিচয় দিতে গিয়া সংক্ষেপে "অধ্যাপক" বলিয়া শেষ করিয়াছেন। আর শুধু বাঙ্গলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষাই তিনি জানিতেন, এমনও নহে; নাগরী বা হিন্দি, ও পারসী ভাষাও তিনি ভালো করিয়া জানিতেন, তাঁহার কাব্যে আমরা সে বিষয়ে জানিতে পারি। নাগরীতে তিনি ছোটখাট কবিতা তাঁহার কাব্যের মধ্যে ভরিয়া দিয়াছেন, আর পারসী কথা তাঁহার লেখার অনেক চরণে দেখিতে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত হইলে কি হইবে? মানুষ মাত্রেই কষ্টে পড়িতে পারে। রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য কখন কাহাকে আক্রমণ করে বলা যায় না। ভারতচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন, নানা শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তো মানুষ; সুতরাং তাঁহাকে এ সকল দায়ে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল, শেষে বাধ্য হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কবিত্বে এতই সন্তুষ্ট হন যে কবিগুণাকার উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখান। কবিগুণাকর, অর্থাৎ যাঁহাতে কবিদের সমস্ত গুণ আছে। কবিকঙ্কণ বলিলে যেমন মুকুন্দরামকে বুঝাইত, কবিগুণাকর বলিলেও তেমনি লোকে ভারতচন্দ্রকে মনে করিত। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" কাব্য রচনা করেন, একথা কবি বারবার বলিয়া গিয়াছেন,—

ভুরসিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

আর শেষ করিবার সময় বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

এই সুপণ্ডিত কবি কোন্ কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন? অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ—এই তিনটি কাব্য একেবারে স্বতন্ত্র নহে, পরস্পরে যে যোগ আছে তাহাতে বলা যায় যে একটিই কাব্য, তাহার তিনটি ভাগ। সকল শুভ কার্য্যের গোড়ায় বিঘ্ন-বিনাশন গণেশের নাম করিতে হয়; তাহার পরে শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ইত্যাদি দেব-দেবীর বন্দনা। তখন কবি প্রশ্ন করিলেন, অন্নপূর্ণা-পূজা কেন এ দেশে আসিল? উত্তর, অন্নপূর্ণা জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করিতে চাহিলেন বলিয়া। অর্থাৎ পুরাতন মঙ্গল-গানের কথা; আগে যেমন দুর্গা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্ম্ম-মঙ্গল চলিত, ইহাও সেই ধরণের। আলিবর্দ্দী খাঁ ছিলেন বাঙ্গলার নবাব; তিনি উড়িষ্যায় গিয়া সেখানকার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে তাড়াইয়া নিজের ভাইপোকে নবাব করেন। কিন্তু এই ভাইপোকে বিনা উপদ্রবে তাঁহার শত্রুরা থাকিতে দেয় নাই,—বিদ্রোহ করিয়াছিল; প্রতিশোধ লইবার জন্য আলিবর্দ্দী যে অত্যাচার করেন তাহা ভয়ানক। হিন্দু-মুসলমান না মানিয়া দেশের সকলের উপরই অত্যাচার চলিতে লাগিল, ভুবনেশ্বর মন্দির লুটতরাজ হইল; কৈলাসে পর্য্যন্ত হুলস্থূল। শিবের ভক্ত নন্দী, তাঁহার উপর মন্দির রক্ষার ভার; মন্দিরের উপর এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া তিনি চটিয়া আগুন, শূল দিয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিয়া ফেলেন আর কি! তাঁহাকে বহু কষ্টে থামান হইল, আর স্বপ্নে মারাঠা-রাজ সাতারায় শুনিলেন যে. বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করা ভগবানের আদেশ। বর্গি সৈন্য আসিয়া বাঙ্গলা দেশ এমন করিয়া লুঠিয়া লইল যে খাজনা দিবার জন্য কিছুই রহিল না। "বর্গি দেশে আসিয়াছে, কি

করিয়া খাজনা দিব, ঘরে যে কিছুই নাই,"—এই ভাব লইয়া যে কত ঘুমপাড়ানি ও অন্য গীত গান রচিত হইল তাহা আর কি বলিব! শুধু গরীব নহে, বড়লোকেরাও, ধনীরাও, কষ্টে পড়িল, কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বার লাখ টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আটক করিয়া রাখা হইল। এই কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র দেবীর পূজা করিলেন, স্বপ্নে দেবী আদেশ দিলেন এবং ভারতচন্দ্রকে দিয়া গান রচনা করিবার কথা বলিলেন,—অন্নপূর্ণার পূজার কথা যেন এই মঙ্গল গানে থাকে এবং 'অষ্টাহ গীত' চাই, অর্থাৎ আটদিনে যেন গানটি শেষ হয়। এই প্রস্তাবে কৃষ্ণচন্দ্র সম্মত হইলেন। সুতরাং মুক্তিও তিনি পাইলেন ; ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনা করিবার কৈফিয়ৎ ইহাই।

সংসারের সৃষ্টি কি করিয়া হইল, প্রত্যেক পুরাণে এই কথার বর্ণনা আছে ; অন্নদা-মঙ্গলেরও আরম্ভ তাহা লইয়া। তাহার পর দক্ষের যজ্ঞকথা। শিবজায়া সতী দক্ষেরই কন্যা। দক্ষ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞের ভাগ দেবতারা আসিয়া গ্রহণ করেন, এবং দেবতাদের মধ্যে শিব হইলেন 'মহাদেব' বা 'দেবদেব' বা 'দেবাদিদেব' ; সুতরাং শিবের নিমন্ত্রণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দক্ষ নিমন্ত্রণ করিলেন না, শিবকে তাঁহার এমনই অপছন্দ হয় যে শিবহীন যজ্ঞ করাই স্থির করিলেন। পিতা যজ্ঞ করিতেছেন, সতী তো তাহা দেখিতে যাইবেন, স্বামীকে নাই বা নিমন্ত্রণ করা হইল ; সতী তাই বিনা নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ী গেলেন, স্বামীকে অনেক কষ্টে রাজী করাইয়া নিজেই গেলেন। কিন্তু মেয়েকে দেখিয়া বাপ, জামাইয়ের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না,—মেয়ে আবার স্বামীর নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলেন। এ সকলই নিয়তির বিধান,—কাটাইবার উপায় নাই।

......তাঁহার সঙ্গে যত ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী ছিল তাহারা গিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিয়া ফেলিল

শিবের কানে যখন সতীর দেহত্যাগের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গে যত ভৈরব ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গী ছিল তাহারা গিয়া

যজ্ঞ নষ্ট করিয়া ফেলিল। অনেক মুনি ঋষি যজ্ঞ করিতে বা করাইতে আসিয়াছিলেন, কাহারও ভাঙ্গিল দাঁত, কাহারও ছিঁড়িল দাড়ি। সে এক প্রলয় কাণ্ড। দক্ষেরও মাথা কে যেন কাটিয়া ফেলিল; কিন্তু দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি ছিলেন বাঁচিয়া; সম্পর্কে তিনি শিবের শাশুরী; শিবকে বলিয়া কহিয়া স্বামীকে বাঁচাইলেন, কিন্তু দক্ষের মুণ্ডটা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, অগত্যা একটা ছাগলের মাথা কাটিয়া তাঁহার ধড়ে জোড়া দেওয়া হইল।

এদিকে সতীর প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে লইয়া শিব অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুতেই তিনি থামিলেন না। ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু পরামর্শ করিলেন; বিষ্ণু চক্র ছুঁড়িয়া মারিলেন, দেহ একান্ন টুক্‌রা হইয়া একান্নটি স্থানে পড়িল, সেই একান্নটি স্থানকে পীঠস্থান বলে,—পীঠস্থান মাত্রেই হিন্দুর পরমতীর্থ। কালীঘাট ও এই একান্নপীঠের একটি পীঠ,—সেখানে পড়িয়াছিল,

"কালীঘাটে চারি অঙ্গুলি ডানি পায়।"

শিব তখন হিমালয়ে ধ্যান করিতে বসিলেন। শিব শক্তিহীন, সৃষ্টি চলিবে কি করিয়া? তাই বিষ্ণু নারদকে ঘটকালী করিবার জন্য হিমালয়েই পাঠাইলেন, হিমালয়ের কন্যা উমা, উমার মাতা মেনকা; নারদের পরামর্শে শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল; মন্মথদেব বাণ ছুঁড়িয়া তপস্যা ভঙ্গ করিলেন। শিব চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার কপালে যে নেত্র আছে তাহা হইতে আগুন ছুটিয়া গিয়া মন্মথকে পোড়াইয়া মারিল। মদনের স্ত্রী রতি, স্বামীর মৃত্যুতে কাঁদিয়া অস্থির; আকাশবাণী শুনিয়া মন্মথের দ্বারকায় পুনর্জ্জন্ম হইবে জানিয়া তবে তিনি শান্ত হইয়া দ্বারকায় যান।

এদিকে শিবের বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল, নাচ-গানে তাঁহার সঙ্গীরা অস্থির ;—

"ভভম্ ভভম্ ববম্ ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া।"

সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া শিব ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন

বিবাহ তো হইয়া গেল; কিন্তু শিবের রুদ্র-ও সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সঙ্গী দেখিয়া মেনকা কাঁদিয়া অস্থির; তখন শিব তাঁহাকে শান্তসুন্দর মূর্ত্তি দেখাইলেন। পরণে দিব্য বস্ত্র, গায়ে দিব্য পৈতা, দিব্য চন্দন, মাথায় মুকুট, মুখে কোটী চাঁদের শোভা। ভারতচন্দ্র হরগৌরীর মিলনের কথা বড় যত্নে বড় সাবধানে লিখিয়াছেন। কৈলাস এমন

ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় ইহার তুলনাতে স্বর্গসুখও ছার।

মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল ভয়াল
কেশরী হস্তী রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥

লটপট জটা লপটে পায়

সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই
কেবল সুখের মূল॥

কিন্তু হইলে কি হয়? দেবতাদের মহিমা প্রচারের জন্য ঝগড়া যে করাইতেই হইবে। সুতরাং হর গৌরীর কোন্দল বাধিল। ঘরে কিছু নাই; তাহাতে ভবানীর কড়া কথা। একে তো শিবের রাগ হইলে রক্ষা নাই। আবার বুড়া বয়সে ক্ষুধার বেগও বেশী। শিব ষাঁড়ে চড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। গৌরী দুই ছেলে লইয়া অভিমানে বাপের বাড়ী যাইবেন, এমন সময়ে গৌরীর সখী জয়া বলিলেন, কেন এমন ছেলে-খেলা কর! ত্রিভুবনের অন্ন হরণ করিয়া আন, শিব তখন আর কোথাও অন্ন পাইবেন না, তোমার কাছেই তাঁহাকে আসিতে হইবে। অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোকের দুঃখ কষ্ট দূর কর। জয়ার এই পরামর্শ গৌরীর মনে ধরিল। শিব কোথাও অন্ন না পাইয়া বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর নিকটে গেলেন,—কিন্তু মহামায়ার মায়ায় লক্ষ্মীও যে লক্ষ্মী-ছাড়া। শিবের আর কষ্টের অবধি রহিল না, কিন্তু লক্ষ্মীর কথায় তিনি কৈলাসে ফিরিলেন, সেখানে অন্নপূর্ণা শিবকে অন্নদান করিলেন। মহাদেব মহানন্দে পঞ্চমুখে ভোজন করিতে লাগিলেন, কত খাইবেন! ভারতচন্দ্র এই খাওয়ার কথা বলিতে গিয়া কম খুসী নহেন। আজকালকার অনেক কবি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা তেমন ভালবাসেন না, কেহ বেশী খাইতেছে দেখিলে তাঁহাদের হাসিও পায় না, ঘৃণা হয়। ভারতচন্দ্র তাঁহাদের দলের নহেন, খাওয়ার কথা এমন ভাবে বলিয়াছেন যে পড়িলে

মনে হয়, খাইতে তিনি নিজেও বেশ ভালবাসিতেন।

পয়াস পয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥

শিব খাইয়া এত খুসী যে নাচিতে আরম্ভ করিলেন,—

লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দল-মল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাথিয়া তাথিয়া বাজায়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম্ ববম্ বাজায়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥

শিব কাশীতে অন্নপূর্ণার পুরী করাইলেন, সবচেয়ে ভাল কারিগর বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া; অন্নপূর্ণার পূজা দেবলোকে প্রচলিত হইল। কিন্তু পূজা নরলোকে কি করিয়া চলিবে? কুবেরের অনুচর বসুন্ধর, তাহার স্ত্রীর নাম বসুন্ধরা; কুবের বসুন্ধরাকে ফুল তুলিয়া আনিতে বলেন অন্নপূর্ণা পূজার জন্য; কিন্তু তাহারা ফুল দেখিয়া ভুলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা পূজার জন্য ফুল তুলিবার কথা তাহাদের মনেই ছিল না। এই পাপে তাহাদের প্রতি দেবী শাপ দিলেন,—তাহারা মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিবে। বসুন্ধর হরিহোড় নামে পৃথিবীতে পরিচিত হইলেন। হরিহোড় দুঃখিনীর ঘরে জন্মিয়াছেন, কাঠ কুড়াইয়া দিন চলে, হঠাৎ একদিন জঙ্গলের মধ্যে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা হইল,—তাহার কাছে ঝুড়ি-ভরা ঘুটে, বোঝা-বান্ধা কাঠ, সেদিন হরি নিজে কিছুই করিতে পারেন নাই,—একবার মনে হইল কাড়িয়া লই, কিন্তু তাহাতে পাপ হইবে এই বুদ্ধি আসিয়া নিবৃত্ত করিল। হরি এক-মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন,—এমন সময়ে বুড়ী বলিল—বাছা, আমার বোঝা বহিয়া দাও, ঘুটেগুলি বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলে অর্দ্ধেক তোমাকে দিব। একটু দূরে যাইতেই হরির বাড়ী, বুড়ী আর চলিতে চাহিল না; সন্ধ্যা হইয়াছে—সে দিন অতিথি। কিন্তু হরি ও হরির মা উভয়েরই আপত্তি,—"ভাঙ্গা কুড়ে ছাওয়া পাতে," তাহাতে আবার ঘরে ভাত নাই; বুড়ী বলিল, এত অভাব গৃহিণীরই দোষে হইয়া থাকে; গৃহিণী যদি অন্নপূর্ণার নাম করেন, তাহা হইলে হাঁড়ি খালি থাকে না; হয় না হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখ। দেবীর নাম করিয়া দেখা গেল,—বাস্তবিক হাঁড়ির মধ্যে অন্নব্যঞ্জন আছে। হরি অবাক হইল, বুড়ীর পরিচয় চাহিল, বুড়ী একখানি ঘুটে চাহিলেন, তাঁহার ছোঁয়া লাগিয়া তাহা সোণা হইয়া গেল। তখন অন্নপূর্ণা আত্মপ্রকাশ করিলেন। হরিকে বর দিলেন, তিনি নিজে বিদায় না দিলে দেবী তাঁহার ঘর ছাড়িবেন না। হরিহোড়ের আর দুঃখ রহিল না, তাঁহার তিনটী বিবাহ হইল, কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র কুলীন, প্রত্যেক বংশের একটী কন্যা সে বিবাহ করিল। এদিকে বসুন্ধরা ভাঁড়ু দত্তের বংশে জন্ম লইয়াছেন, তাহার মায়ের নাম ধূমী, বসুন্ধরার নামকরণ হইয়াছে সোহাগী; এই সোহাগীর সঙ্গে হরিহোড়ের বিবাহ হইল। সোহাগী বড় কুঁদুলে, চার সতীনের

ঝগড়ায় বাড়ী একেবারে অস্থির, সুতরাং অন্নপূর্ণার যাওয়ার সময় হইয়া আসিল।

"সেখানে দেবীর দয়া পিরীত যেখানে।
যেখানে কোন্দল দেবী না রয় সেখানে॥"

একদিন পূজায় হরিহোড় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মেয়ের বেশে আসিয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া যাইতে চাহিলেন,—হরিহোড় বিরক্ত হইয়া 'যাও', 'যাও' বলিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বদিন জামাই আসিয়াছিল, মেয়ে-জামাইয়ের যাওয়ার কথা তো ছিলই। কিন্তু খানিক পরে বাহিরের শব্দ শুনিয়া বুঝা গেল মেয়েরা যায় নাই,—তবে হরিহোড় কাহাকে যাইতে বলিলেন ? তখন হরির হুঁস্ হইল—মেয়ে বলিয়া যাহাকে বিদায় করিয়াছেন সে মেয়ে নয়, স্বয়ং মাতা অন্নপূর্ণা! হায় হায়, কি হইল, নিমিষের ভুলে কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! অন্নপূর্ণা তো বলিয়াছিলেন যে তুমি আমাকে না ছাড়িলে, আমাকে যাইবার অনুমতি না দিলে, আমি যাইব না, ছেলেকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন, এ দুঃখের সান্ত্বনা কোথায় ?

মাতা অন্নপূর্ণাকে তো যাইতেই হইবে, কারণ নানা যায়গায় তাঁহার পূজা চালান দরকার; আর তিনি এক জনাকে কথাও দিয়াছেন। কুবেরের ছেলে নলকুবেরকে তিনি শাপ দিয়াছিলেন, যে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে। নলকুবের তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। নলকুবের যখন মানুষ হইয়া জন্মিল, তখন তাহার নাম হইল ভবানন্দ মজুমদার। হরিহোড়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা গেলেন ভবানন্দের বাড়ী। বাড়ী যাইতে নদী পার হইতে হয়, ঈশ্বরী পাটনী পার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু যুবতী রমণী, কুলের বৌ, পরিচয় না লইয়া কি করিয়া পার করে ? সে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, অন্নপূর্ণা ছেঁদো কথায় নিজের পরিচয় দিলেন—

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পাত তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরা আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥

পাটনী ভাবিল, কুলীনের ঘরের বৌ, কুলীনেরা একসঙ্গে দুই কি তারও বেশী বিবাহ করে, তাই বুঝি এত কষ্ট! যাহা হোক, সে পার করিয়া দিতে রাজী হইল, অন্নপূর্ণা নৌকায় বসিলেন, কিন্তু পা ঝুলাইয়া জলের উপর রাখিলেন, প্রতি পদক্ষেপে পদ্মফুল ফুটিতে লাগিল! পাটনী সাদাসিধা মানুষ, অত বুঝে নাই, দেখেও নাই, সে বলিল, মাগো, পায়ে ধরিয়া কুমীর টানিয়া লইয়া যাইবে, পা উঠাইয়া রাখ,—অন্নপূর্ণা বলিলেন, না বাছা, তোর নৌকায় জল উঠিয়াছে, পায়ের আলতা ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। তাহার কথায় সেঁউতির উপর পা রাখিলেন, সেঁউতি সোনার হইয়া গেল। পাটনীর মনে ভয় হইল,—"এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।" পার হইয়া অন্নপূর্ণা, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহার ছেলেপেলেরা দুধে ভাতে থাকিবে,—আর ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ীতে গিয়া কোথায় মিলাইয়া গেলেন কেহ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পাটনী আসিয়া মজুম-

দারকে সব কথা বলিল, সোনার সেঁউতি দেখাইল,—আর মজুমদার ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন, মেঝেতে এক সুন্দর ঝাঁপি পড়িয়া আছে, চারিদিক সুগন্ধে ভরা, কাণে সুস্বর নাচ গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। কে যেন তাঁহাকে বলিল, ইহাই অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কখনও খুলিতে নাই—তোমার বংশে অন্নপূর্ণার দয়া। দেবীর পূজায় ও প্রসাদে ভবানন্দ মজুদারের নানা দিকে সুখ বাড়িতে লাগিল।

এদিকে বাঙ্গলা দেশে মহা গোলমাল; প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজা, তাঁহার বায়ান্ন হাজার ঢালী; দশ হাজার ঘোড়সওয়ার। তিনি খুড়া বসন্ত রায়কে সংবংশে কাটিয়া ফেলিলেন, বসন্ত রায়ের ছেলে কচুরায় কোন রকমে পলাইয়া গেল, গিয়া জাহাঙ্গীরের কাছে নালিশ করিল। জাহাঙ্গীর সসৈন্য মানসিংহকে সঙ্গে দিয়া কচুরায়কে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইলেন। সৈন্যেরা দিল্লী হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিল; ভবানন্দ মজুমদার সেখানে কর্ম্ম করিতেন, ভবানন্দের নিকট মানসিংহ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী শুনিলেন।

বর্দ্ধমানে এক রাজা ছিলেন তাঁহার নাম বীরসিংহ। বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা,—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাহার প্রতিজ্ঞা, যে তাহাকে বিচারে হারাইবে তাহাকেই বিবাহ করিবে। কেহই বিচারে বিদ্যাকে আঁটিয়া উঠেনা, তখন বীরসিংহ, বর্দ্ধমান হইতে কাঞ্চী ছয় মাসের পথ, সেই কাঞ্চীর রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দরের নিকট ঘটক পাঠাইলেন। তাহার কাছে বিদ্যার রূপ-গুণের কথা শুনিয়া সুন্দর বর্দ্ধমানে আসিলেন, এবং পড়ুয়া সাজিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। হীরা মালিনী রাজবাড়ীতে নিত্য ফুল যোগাইত, সুন্দর আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলেন এবং কৌশলে বিদ্যাকে বিবাহ করিলেন, বীরসিংহ বা তাঁহার রাণী এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলেন না। যখন একথা রাজার কাণে পৌঁছিল, তখনই কোটালকে দিয়া সুন্দরকে ধরা হইল এবং তাঁহাকে মশানে পাঠান হইল—রাজবাড়ীতে গোপনে গিয়া যে রাজকন্যাকে চুরি করে তাহার শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু সুন্দরের কবিত্বশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির জোড়া নাই। রাজার প্রশ্নের তিনি সমানে উত্তর করিয়াছেন, —কারণ তিনি "কালিকার কিঙ্কর—কিঞ্চিৎ নাহি ডর।" বিপদে পড়িয়া তিনি পঞ্চাশটি শ্লোক পড়িলেন, তাহাদের দুই অর্থ,—

মশানে গিয়া সুন্দর......কালীর স্তব করিলেন...

একদিক দিয়া দেখিলে বিদ্যার রূপবর্ণনা, অন্যদিকে কালিকার স্তব। রাজা ভাবিলেন, তাঁহার মেয়ে স্তব করিতেছে, আর দেবী বুঝিলেন সুন্দর বিপদে পড়িয়া তাঁহাকেই স্মরণ করিতেছে। মশানে গিয়া সুন্দর অকারাদি বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষর আদিতে করিয়া এক একটী শ্লোকে কালীর স্তব করিলেন। তাহার পূর্ব্বে কবি ভারতচন্দ্র নিজে কালীর যে প্রণতি জানাইয়াছেন, তাহাই বা কি সুন্দর!

থর্ব্ব গর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্ব থর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপাল পালিকে॥
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমস্তিকে॥

স্তবে খুসী হইয়া দেবী ডাকিনী যোগিনী হাকিনী শাঁখিনী পেতিনী ভৈরব পিশাচ যক্ষ রক্ষ পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা কোটালের সৈন্যদিগকে এমন কি কোটালকে পর্য্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিল,—এ দিকে রাজাও ততক্ষণ ভাটের মুখে সুন্দরের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন। তখন আর তাঁহার রাগ থাকিল না, সমাদরে সুন্দরকে গ্রহণ করিলেন এবং দেবীর কৃপায় বিদ্যা ও সুন্দর স্বর্গে গেল, কারণ পৃথিবীতে তাহাদের দেবীর শাপে জন্ম হইয়াছিল, দেবীর মহিমা প্রচার করিয়াই পৃথিবীর কাজ শেষ হইল, এখন শাপ ফুরাইলে স্বর্গেই যাওয়ার কথা। তাহাদের কাহিনী কিন্তু দেশের মধ্যে বহুদিন লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে,—কত কবি তাহাদের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন।

ভবানন্দের নিকট বিদ্যাসুন্দরের গল্প শুনিয়া মানসিংহ খুসী হইলেন, তাহার পর মানসিংহ ভবানন্দকে লইয়া যাত্রা করিলেন, পথে জল ঝড় এমন হইল যে তাঁবু বানে ভাসিয়া গেল, ঘোড়া সাঁতার কাটিতে লাগিল হাতি ডুবিয়া মরিল, উট-গাড়ী পাঁকে আট্‌কাইয়া গেল, চলিতে পারিল না। এমন দুর্য্যোগে ভবানন্দ সপ্তাহ ধরিয়া রসদপত্র না যোগাইলে মোগল সৈন্যের বিপদের আর অন্ত থাকিত না। অন্নপূর্ণার দয়ায় ভবানন্দের কোনও কিছুরই অভাব নাই। অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য দেখিয়া মানসিংহও তাঁহার পূজা করিলেন,—দুর্য্যোগ কাটিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল। যশোহর যাত্রার আর কোনও বাধা রহিল না। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে হারিয়া গেলেন, তাঁহাকে খাঁচায় ভরিয়া মানসিংহ দিল্লী ফিরিলেন, মানসিংহের কথামত ভবানন্দ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন, সঙ্গে দুই দাস, তাহাদের নাম দাসু ও বাসু। বাদশাহের নিকট মানসিংহ প্রার্থনা জানাইলেন, ভবানন্দ মজুমদারের আশ্রয়ে এক সপ্তাহ সৈন্য সমেত ছিলাম, সে খাবার না যোগাইলে কেহ বাঁচিত না,—অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা করিয়া ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছি। ভবানন্দকে তাহার দেশে রাজত্ব দিব কথা দিয়াছি, তাহাকে অনুগ্রহ করুন। বাদসাহ তো চটিয়া আগুন,—হিন্দুর ভূতে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং কথায় কথায় ভবানন্দকে বন্দী করিলেন। ভবানন্দ এক-মনে কালীর ধ্যান করিলেন, অন্নদার স্তব করিলেন,—অন্নদার বরে তাঁহাকে প্রহরীরা কেহ ছুঁইতে পারিল না, ডাকিনী যোগিনী শাঁকিনী পেতিনী দানব দানার অত্যাচারে দিল্লীতে মহা সোরগোল,—উজীর নাজীর গিয়া বাদশাহকে অনুরোধ করিল,—জাহাঙ্গীর নিজেও মহামায়ার মায়ার পরিচয় পাইয়া ভবানন্দকে মুক্তি দিলেন, আর সঙ্গে দিলেন পুরস্কার তাঁহার দেশের রাজগী। ভবানন্দ প্রয়াগ অযোধ্যা কাশী হইয়া দেশে ফিরিলেন, তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইল। চৈত্র মাসে অন্নদার যথারীতি পূজা করিলেন, পূজায় খুসী হইয়া অন্নপূর্ণা তাঁহাকে বর দিলেন,—যতদিন তাঁহার ঝাঁপী রক্ষা করা যাইবে, মজুমদারবংশ যতদিন তাহা রক্ষা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের সৌভাগ্য। আর এই বংশেই একজন তাহা অবজ্ঞা করিবে। ভবিষ্যতে কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের বিরাগে পড়িয়া কাতরে অন্নদার শরণ লইলে দেবীর বরে ভারতচন্দ্র কাব্য রচনা করিবেন।

অন্নপূর্ণার দর্শন পাইয়া ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার দুই স্ত্রী লইয়া দেহত্যাগ করিলেন এবং মৃত্যুর পর কুবেরপুরীতে পূর্ব্বের মত বাস করিতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্র যে কি কি বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা হইল। ইহা ছাড়া আরও কিছু কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন, এবং মহিষাসুর বধ লইয়া চণ্ডী নামে এক নাটকও আরম্ভ করিয়া যান। নানারূপ ছন্দে এবং কথার বাঁধুনীতে তাঁহার যে নৈপুণ্য ছিল তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার লেখা হইতে পাই। এক শব্দের একাধিক অর্থ লইয়া তিনি দুই চারি চরণ যাহা লিখিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটি কথাই যত্ন করিয়া মনে রাখিবার মত। হীরা মালিনীকে সুন্দর বাজার করিতে পাঠাইয়াছেন, হীরা বাজার হইতে ফিরিয়া হিসাব দিতেছে :—

লেখা করি বুঝ বাছা ভুমে খড়ী পাতি।
পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ী পাতি॥

'খড়ী পাতি' ও 'কড়ী-পাতি' উচ্চারণ করিলে একরূপই ; শোনায় কিন্তু প্রথমটির মানে খড়ী পাতিয়া, অর্থাৎ খড়ীর দাগ কাটিয়া, দ্বিতীয়টির মানে, কড়ীগুলি বা পয়সাগুলি, টাকাকড়ি। তেমনই, হীরার হিসাবে আর এক জায়গায়,—

আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আঁটি।
নষ্ঠ লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥

এখানে আট পণ, আর আট আঁটি ; নষ্ট লোক, কাষ্ঠ বেচা ; আঁটি অর্থে বোঝা, পরের আঁটি অর্থে পারিয়া উঠা। তাঁহার অনেক কথা প্রবাদ-বাক্যের মত হইয়া গিয়াছে, লোকে তাঁহার বই না পড়িয়াও সেই সব কথা শুনিয়াছে ও তাহাদের অর্থ বুঝিয়াছে, যেমন,—

"ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান্"
"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"

অথবা

"বুঝ লোক যে জান সন্ধান"
"মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়"

আর কত বলিব। মিষ্ট কথা বলিতে, মিষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,

কল কোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিয়া অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবন ঢল ঢল উছলে কূলে॥

আবার মহাদেবের রুদ্র গুণের কথাও কেমন গম্ভীরভাবে কবি বলিয়াছেন তাহা পড়ি :

তরঙ্গভঙ্গিত ভুজঙ্গরঙ্গিত কপর্দ্দিমর্দ্দিত জটাধর।
গণেশশৈশব বিভূতিভৈরব ভবেশভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল মহাকুতূহল মহেশ্বর।
রজঃপ্রভারত পদাম্বুজানত সুদিনভারত শুভঙ্কর॥

ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিবের জটার ছবি, সাপের কিলিবিলি, জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার, গঙ্গার তরঙ্গ সব মিলিয়া যেন কি এক গম্ভীরভাব মনে উঠে, তাহা কথায় কহিয়া বুঝাইবার নহে। কাব্যের প্রতি ছেদে তাই কবি সকলের কুশল চাহিয়াছেন, সকলের যাহাতে ভাল হয় তাহার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন,

রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল॥

ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বকালের কবিদের মতই মঙ্গল কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে ভাষার উপর ও শব্দের উপর যে প্রভুত্ব দেখিতে পাই তাহা আর কোনও মঙ্গলকাব্য রচয়িতার মধ্যে দুর্ল্লভ।

পরবর্ত্তী গুপ্তরাজবংশ

তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উত্তরকালীন গুপ্তরাজগণ ও মৌখরী বংশীয় রাজগণের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ হইত। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—এই উত্তরকালীন গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ কাহারা ছিলেন? এবং তাঁহারা কোথায় শাসন করিতেন? হূণ-বিজেতা ভানুগুপ্ত-বালাদিত্যের বিষয় আগেই বলা হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজাদের বংশ পরম্পরার বিষয় আমরা অবগত নহি। ৫০৬ খৃষ্টাব্দে বৈন্য গুপ্ত নামক একজন রাজা বঙ্গদেশের কোনও স্থানে রাজ্য করিতেন। ৫৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ পৃথিবীতে অজ্ঞাতনামা গুপ্ত সম্রাটের প্রতিনিধি পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে শাসন করিতেছিলেন। ইহা ব্যতীত আদিত্য সেনের অফসড়ের লিপিতে একটী গুপ্ত রাজবংশের বিষয় জানা যায়। ঐতিহাসিকেরা এই বংশটিকে উত্তর কালীন গুপ্ত বংশের নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই বংশের প্রথম রাজার নাম কৃষ্ণগুপ্ত। ইঁহারা মগধে শাসন করিতেন বলিয়া কখনও কখনও ইহাদিগকে মগধের গুপ্ত-বংশ বলা হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত এই উত্তর কালীন গুপ্ত রাজাদের ও মৌখরি বংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতা জন্মিয়াছিল।

কৃষ্ণগুপ্তের বংশের প্রথম তিনজন রাজার নাম মাত্র আমাদের জানা আছে। চতুর্থ রাজার নাম ছিল কুমারগুপ্ত (তৃতীয়) ইনি মৌখরি রাজ ঈশানবর্ম্মার সমকালীন ছিলেন। হরাহার লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে ঈশানবর্ম্মা ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব তাঁহার সমসাময়িক তৃতীয় কুমারগুপ্ত ও ঐ সময়ে নিশ্চয় জীবিত ছিলেন। ঈশানবর্ম্মার সহিত কুমারগুপ্তের ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল এই যুদ্ধে কুমারগুপ্ত বিজয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় কিন্তু কোনও কারণবশতঃ তিনি তীর্থরাজ প্রয়াগে আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

তৃতীয় কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদরগুপ্ত পিতার পর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারও মৌখরি রাজ্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আদিত্যসেনের অফসড় লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি সম্মুখ সমরে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

দামোদর গুপ্তের পর তাঁহার পুত্র মহাসেনগুপ্ত সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সর্ব্ববর্ম্মা ও অবন্তিবর্ম্মার সময়ে মৌখরি সাম্রাজ্য শোণনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্তরাজ মগধ দেশ হইতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাকবি বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতে মালব রাজের মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে স্থানেশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহচররূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। আবার অফসড়ের লিপিতে মহাসেন গুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের সাহচর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। "হর্ষচরিতের" মাধবগুপ্ত ও অফসড়ের লিপিতে মাধবগুপ্ত যে অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব মহাসেনগুপ্ত যে মালবের রাজা ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যায়। মৌখরি সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের রাজ্য মালব দেশে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। মহাসেন গুপ্তের রাজত্ব কালের একটি প্রধান ঘটনা, আসামরাজ সুস্থিতবর্ম্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ। ইহার প্রমাণ অফসড়ের লিপিতে পাওয়া যায়। এই লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "সুস্থিতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে প্রাপ্ত বিজয়ের সম্মান দ্বারা চিহ্নিত মহাসেন গুপ্তের মহান যশঃ অদ্যাবধি লোহিত্য নদীর তটে অবিরাম গীত হইয়া থাকে।"

মহাসেনগুপ্ত স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠে (স্থানেশ্বরে) একটী শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্র হর্ষবর্দ্ধন পরে উত্তর ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মহাসেন গুপ্তের পর দেবগুপ্ত নামক একজন দুষ্ট মালবরাজের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার বিষয় তোমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে, শ্রীহর্ষের ইতিহাসের সহিত জানিতে পারিবে। শ্রীহর্ষের রাজ্যকালে স্বাধীন গুপ্ত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর হর্ষ-সহচর মাধবগুপ্তের বংশধরেরা মগধ দেশে পুনরায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এইবার তোমাদিগকে উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির বিষয় সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে বলভীর মৈত্রকদের রাজ্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বলভী—আধুনিক গুজরাট প্রদেশের প্রাচীন নাম। এই রাজ্যের স্থাপনা সেনাপতি ভটার্ক ৪৮৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ভটার্ক গুপ্ত নৃপতির সামন্তবিশেষ ছিলেন। পরবর্ত্তী দুইজন রাজা, ধরসেন ও দ্রোণসিংহ স্বাধীন ছিলেন না। হয়ত তাঁহারা গুপ্ত রাজার সেনাপতিরূপে হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বলভীরাজ শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে গুপ্ত-সম্রাট নিজ সাম্রাজ্যের এই দূরস্থ ভাগে প্রভুত্ব বেশীদিন স্থায়ী রাখিতে পারিবেন না। তিনি হূণ সাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ও অল্পকাল পরেই স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষিত করিয়াছিলেন।

মৈত্রক বংশের একটী শাখা পশ্চিম-মালবে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। বলভী রাজ ধরসেন দ্বিতীয়ের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম শিলাদিত্য (প্রথম) ধর্ম্মাদিত্য। অপরের নাম খরগ্রহ (প্রথম)। শিলাদিত্য (প্রথম) ধর্ম্মাদিত্য পশ্চিম-মালবের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ৫৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শিলাদিত্য অতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার মত জ্ঞানী, পরোপকারী ও বিদ্বান রাজা সচারচর দেখা যাইত না। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও অহিংসা কে পরম ধর্ম্ম মনে করিতেন। তিনি প্রাণী মাত্রের জীবন রক্ষার জন্য এতদূর সতর্ক ছিলেন যে, অশ্ব ও হস্তীর জন্য নির্দ্দিষ্ট পানীয় জলকেও ছাঁকিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে জলের ভিতরকার কীটাদি ক্ষুদ্র জীবেরও দৈবাৎ কোনও প্রকার অনিষ্ট না হয়। নিজের প্রাসাদের নিকটেই তিনি একটি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তরে সপ্তবুদ্ধের মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক বৎসর "মোক্ষ-পরিষদ" নামক একটি বিরাট সভা আহূত করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে শাস্ত্রানুযায়ী দান করিতেন।

শিলাদিত্যের বিষয় এই সকল বৃত্তান্ত চীন দেশীয় পর্য্যটক ইউয়ান্ চাঙের যাত্রা-বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। এই প্রসিদ্ধ চীন-যাত্রী বলিয়াছেন যে

শিলাদিত্য মো-লা-পো, অর্থাৎ মালবক দেশের রাজা ছিলেন। মো-লা-পা রাজ্যের অধীনে আরও তিনটী করদরাজ্য ছিল। এইগুলির নাম—আনন্দপুর, কচ্ছ, ও সুরাষ্ট্র।

শিলাদিত্য ধর্ম্মাদিত্যের বংশধরেরা পশ্চিম মালবে রাজ্য করিতে থাকিলেন। বলভী দেশে ধরগ্রহের উত্তরাধিকারীদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিল। শিলাদিত্যের পুত্র দেরভট সহ্য ও বিন্ধ্যগিরির অভিমুখে, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কখনও কখনও, বলভী-রাজ্য ও মালবক রাজ্য একই রাজার অধীনতা স্বীকার করিত। ধরগ্রহের উত্তরাধিকারীর নাম ধরসেন (তৃতীয়)—ধরসেনের পর ধ্রুবসেন (দ্বিতীয়), যাঁহার অন্য নাম ধ্রুবভট ছিল, বলভীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই ধ্রুবভট বিখ্যাত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জামাতা ছিলেন। ইহার বিষয় ইউয়ান চাঙ্ অনেক কথা বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে সকল কথা তোমরা জানিতে পারিবে। ধ্রুবসেনের পুত্র ধরসেন (চতুর্থ) (৬৪৫-৬৪৯) খৃষ্টাব্দে পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তী—এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ধরগ্রহের বংশ লোপ পাইয়াছিল। মৈত্রক রাজ্য পুনরায় একই শাসকের অধীনে সংযুক্ত হইয়াছিল।

উত্তর ভারতের পশ্চিম ভাগে আরও দুইটী রাজ্য ছিল—ইহাদের নাম ভৃগুকচ্ছ বা **বরোচ** (Baroach) ও ভীনমল। এই দুইটী রাজ্যই গুর্জ্জর জাতির দুই পৃথক শাখার রাজাদের অধীনে ছিল। ভৃগুকচ্ছের গুর্জ্জর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম দদ্দ (প্রথম)। এই বংশের তৃতীয় রাজার নাম ও দদ্দ (দ্বিতীয়)। সম্রাট হর্ষের দ্বারা পরাজিত হইয়া বলভী-নরেশ ধ্রুবভট রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া দ্বিতীয় দদ্দের শরণাগত হইয়াছিলেন। সেই সময় গুর্জ্জররাজ তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া ধর্ম্মের মহিমা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ভীনমলের গুর্জ্জরেরা এক্ষণে অধিক শক্তিশালী ছিল না—কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহারা লাটদেশ বিজয় করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ও নবম শতাব্দীর প্রারম্ভিক ভাগে কনৌজ অধিকার করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে সিন্ধুদেশে একটী শক্তিশালী রাজ্য স্থাপিত ছিল। সিন্ধুরাজ এতই বলবান ছিলেন যে হর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষ স্বয়ং কোনও সিন্ধুরাজ্যের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় যাত্রী ইউয়ান্ চাঙ্ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে শূদ্র জাতির কোনও এক রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। ইনি বৌদ্ধ ছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে **কাশ্মীর দেশ** সিন্ধুদেশের ন্যায় ভারতীয় ইতিহাসের মুখ্য প্রবাহের বহির্ভূত ছিল। এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস কর্কট বংশ হইতে প্রারম্ভ হয়। দুর্লভবর্দ্ধন নামক জনৈক রাজা এই বংশের স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি ৬১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে কাশ্মীর উত্তরাপথের রাজাদের মধ্যে একটী প্রধান রাজ্য ছিল। কাশ্মীরের অধীনে তক্ষশিলা, সিংহপুর উরস (আধুনিক হজারা জেলা) ইত্যাদি কতকগুলি করদ রাজ্য ছিল।

এইবার **গৌড়দেশের** কথা তোমাদিগকে বলিব। বঙ্গদেশের নিবাসীদিগকে প্রাচীন কালে 'গৌড়' বলা হইত। আবার 'গৌড়' শব্দ জনপদ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে যথা, মৎস্য, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, বায়ু, আদিপুরাণে, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে,' ও বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' গৌড় নামটী পাওয়া গিয়াছে। গৌড়দের আদিম নিবাস সম্বন্ধে মতভেদ আছে কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'গৌড়' নামের দ্বারা ভাগলপুরের পূর্ব্বস্থিত রাজমহল পর্ব্বতমালার অপর পারের দেশকে বুঝাইত। এই দেশটী অনেকগুলি অংশে বিভক্ত ছিল—যথা পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তরবঙ্গ কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা,) সমতট। আধুনিক ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা জেলা), তথা তাম্রলিপ্তি (আধুনিক তমলুক) তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মৌখরিরাজ ঈশানবর্ম্মার হরাহা লিপিতে গৌড়দিগকে 'সমুদ্রাশ্রয়' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সমুদ্র তাহাদের আশ্রয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাহারা সামুদ্রিক জাতি ছিল। মহাকবি

কালিদাস ও বাঙ্গালীদিগকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ রণতরী ছিল তাহাদের যুদ্ধের সাধন। তাহারা জলপথে রণ-পোতের সাহায্যে যুদ্ধ করিত। সে কালে বাঙ্গালীরা জাহাজে করিয়া জলপথে অনেক দূরদেশে বাণিজ্যের নিমিত্ত যাওয়া আসা করিত। আবার তাহারা সমুদ্রপারে উপনিবেশ স্থাপনও করিয়াছিল।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়-দেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়াছিল—ফরিদপুরে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে তিন জন স্বাধীন রাজার কথা অবগত হওয়া যায়। ইঁহাদের নাম ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব। এই তিনজন রাজার রাজ্যসীমার বিষয় কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—সম্ভবতঃ তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া উত্তর ও মধ্য বঙ্গেও শাসন করিতেন। গোপচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্যের পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোনও উপায় নাই যে সমাচারদেব ধর্ম্মাদিত্যের পূর্ব্বে অথবা গোপা-চন্দ্রের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এই তিনজন রাজা ছাড়া জয়নাগ নামক আর একজন গৌড়াধিপের বিষয় লিপি-প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। জয়নাগ মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ছিল। আর্য্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে একজন জয়নাগ নামক রাজার উল্লেখ আছে। মনে হয় লিপির জয়নাগ ও গ্রন্থোক্ত জয়নাগ অভিন্ন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশ অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াছিল। এবং এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশটী প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছিল।

গৌড়দেশের পূর্ব্বে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত ছিল। কামরূপের আর একটি নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ ছিল। আধুনিক আসাম প্রান্তের এই দুইটি প্রাচীন নাম ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুচবিহার রাজ্য ও উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কামরূপের উল্লেখ পুরাণে, রামায়ণ ও মহাভারতে এবং কালিদাসের রঘুবংশ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কামরূপের ইতিহাস অস্পষ্ট। কিন্তু তাহার পরেই এই রাজ্যের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেকটা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার বিধানপুর তাম্রশাসন ও নালন্দার মুদ্রা হইতে এই রাজ্যের রাজাবলির বংশ-তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্বগামী অনেকগুলি রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম মহাভূতিবর্ম্মা, চন্দ্রমুখবর্ম্মা, স্থিতিবর্ম্মা ও সুস্থিত-বর্ম্মা। গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুস্থিতবর্ম্মার পুত্রের নাম ভাস্করবর্ম্মা। ইনি হর্ষের সমসাময়িক ও তাঁহার সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

কামরূপরাজ্য উত্তরভারতের পূর্ব্বতম সীমা ছিল। কাশ্মীর, সিন্ধু ও নেপালের ন্যায় এই রাজ্যটীও ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান প্রবাহ হইতে পৃথক ছিল। কখনও কখনও এই পার্থক্য নষ্টপ্রায় হইত। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কামরূপ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক উদ্যোগে সহযোগী হইয়াছিল। তোমরা মনে রাখিও যে মালব ও গৌড়দেশে তখনও গুপ্ত রাজশক্তি অবশিষ্ট ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মালব ও গৌড় দেশের গুপ্তরাজা তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা পুনরায় ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হইবার উচ্চাশা পোষণ করিতেছিলেন। এই উচ্চাশা পূর্ণের প্রধান প্রতিবন্ধক, থানেশ্বর ও কান্যকুব্জের মিত্রশক্তি। থানেশ্বরের বর্দ্ধনরাজ ও কান্যকুব্জের মৌখরিরাজ—উভয়েই গুপ্তরাজ্যের চক্ষুঃশূল ছিলেন। প্রভাকর-বর্দ্ধনের মৃত্যুর পরেই গুপ্তেরা মৌখরি ও পুষ্যভূতি দিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় কামরূপ রাজ ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাদের পরাজিত করিয়া প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতেন এবং এইজন্যই থানেশ্বর রাজের জন্য কামরূপ রাজ্যের মিত্রতা এত বেশী মূল্যবান ছিল।

উত্তর ভারতের আর একটী প্রধান রাজ্য উড়িষ্যার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

উড়িষ্যা অতি প্রাচীন রাজ্য। অশোকের সময় হইতে আকবরের সময় পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের অনেক

সম্রাট এই রাজ্যকে আক্রমণ করিয়া তাহার উপর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কামরূপের স্থায় উড়িষ্যার রাজা বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রবল প্রতিরোধ করিয়াছিল।

উড়িষ্যার প্রাচীন নাম ছিল কলিঙ্গ। কলিঙ্গ দেশে উড্র, কোঙ্গদ, (আধুনিক গঞ্জাম) মুখ্য কলিঙ্গ ইত্যাদি ভাগ সম্মিলিত ছিল। মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে এই দেশ দুইটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি মহানদী ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী অংশ ও অপরটি মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভাগ।

অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের কথা তোমরা নিশ্চয়ই ইতিহাসে পড়িয়াছ। "ভারতীয় নেপোলিয়ান" সমুদ্রগুপ্ত অন্ততঃ এমন পাঁচটি রাজাকে জয় করিয়াছিলেন যাঁহাদের রাজ্য প্রাচীন কলিঙ্গের সীমার অন্তর্গত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে 'শৈলোদ্ভব' নামক একটি রাজবংশ কলিঙ্গদেশে শক্তিশালী হইতেছিল। এই বংশের প্রথম তিনজন রাজার নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই নামগুলি পর্য্যায়ক্রমে সৈন্যভীত (প্রথম, অযশোভীত (প্রথম) ও সৈন্যভীত (দ্বিতীয়)। তৃতীয় রাজা হর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়াধিপ মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। তিনি ৬১৯-৬২০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কলিঙ্গদেশে সম্রাট হর্ষের আধিপত্য কিছুদিনের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে দক্ষিণ কোশলের হৈহয় ও ত্রিপুরের কলচুরি রাজ্য ও স্বাধীন ছিল। আধুনিক মধ্যদেশের রায়পুর, বিলাসপুর এবং জব্বলপুর জেলার কিয়দংশ দক্ষিণ কোশলের অন্তর্গত ছিল। দক্ষিণ কোশলের রাজধানী রত্নপুর নামক স্থানে ছিল। ত্রিপুরের কলচুরিরা প্রবল পরাক্রান্ত ছিল—উহাদের রাজা শঙ্করগণ ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে নাসিক অবধি রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বুদ্ধরাজের অধিকার বিদিশা (Bhidsa) নগরে ছিল—সুদূর গুজরাটের আনন্দপুরনগরও তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়াছিল।

উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির কথা তোমাদিগকে বলা হইল। ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র হর্ষবর্দ্ধন উত্তরাপথের কনিষ্ক ও সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় পুনরায় বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাঁহাকে এক বিরাট রাষ্ট্র বিপ্লবের গতিরোধ করিতে হইয়াছিল।

এই যে গুপ্ত রাজাদের কথা বলিলাম। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা তেমন বেশী কিছু জানিতে পারি নাই। কিন্তু দিন দিন নূতন নূতন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের সহিত পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজাদের বিষয় আমরা অনেক কথাই জানিতে পারিতেছি।

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধে দিন দিন যতই আমরা অনুসন্ধান করিতেছি, ততই বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের এই দেশের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা এবং রাষ্ট্রশক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে ভারতের নানাদেশে বিস্তৃত ছিল। কোথায় কোন্ পর্ব্বতের আড়ালে একটি রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, কোথায় কোন্ বঙ্গ প্রদেশে একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, কত কীর্ত্তি-চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এ সকলের আবিষ্কারের সহিত আমরা আমাদের প্রাচীন গৌরবের সহিত পরিচিত হইতেছি।

মূর্ত্তি ও মন্দির, সাহিত্য ও ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদের লুপ্ত-প্রায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইতেছে। সেই সকল মূর্ত্তি হইতে আমরা সেকালের নৃপতিরা এবং সম্রান্ত বংশীয়গণ কে কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায়, আর জানিতে পারি সেকালে কত নিপুণ-শিল্পী জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত-বর্ষের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। সেকালের স্থাপত্য গৌরবও বড় কম ছিল না। যদিও উত্তর ভারতের নানা স্থানে একেবারে অভগ্ন অবস্থায়, তাঁহার কিছুই বাঁচিয়া নাই, তবু সেকালে কিরূপভাবে মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইত, কিরূপ শিল্প-প্রতিভা বিদ্যমান ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায় এমন অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

[এই গল্পের লেখক ক্যাপ্টেন ফ্রেডারিক ম্যারিয়াট (Captain Marryat) ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট নরফোক (Norfolk) সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ম্যারিয়েট্ নৌ-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সামুদ্রিক জীবনের গল্প লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। এই সব গল্পগুলির মধ্যে (Masterman Ready) 'Peter Simple,' 'Jacob Faithful' বিশেষ বিখ্যাত। গল্প আছে যে ম্যারিয়েট তাঁহার নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই বইখানা লিখিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যে মাস্টারম্যান্ রেডি অনায়াসেই রবিন্সন ক্রুশোর পাশে দাঁড়াইতে পারে।]

মাস্টারম্যান্ রেডি

জাহাজে কাজ করিতে করিতে মাস্টারম্যান্ রেডি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে ইনি জাহাজের কাজে ভর্ত্তি হন। তারপর কত জাহাজে যে তিনি কাজ করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রে কতবার যে কত ভীষণ ভীষণ ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়িয়াছিলেন তাহার আর সংখ্যা নাই। রেডি শুধু যে যাত্রীবাহী জাহাজে কাজ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া একখানি প্রকাণ্ড যুদ্ধের জাহাজেও ছিলেন। সুতরাং সমুদ্র জীবনের সম্বন্ধে ও জাহাজ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বড় কম ছিল না এবং সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। তাঁহার মত সদা প্রফুল্ল মিশুক লোক বড় একটা দেখা যায় না।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন মাস্টারম্যান্ রেডি "প্যাসিফিক্" নামে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজের একজন প্রধান নাবিক। সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ করিয়া তিনি চুল পাকাইয়াছিলেন, তাই জাহাজের প্রত্যেকটি ব্যাপারে রেডির মতামত না হইলে সেই জাহাজের কাপ্তেন চলিত না। কাজে কাজেই সকলের কাছে তাঁহার সম্মান ছিল খুবই।

সেবারে "প্যাসিফিক" জাহাজখানা অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে পাড়ি দিতেছিল। প্রকাণ্ড জাহাজ। কোটি কোটি টাকার কাচ ও চীনামাটির বাসন নানা রকমের ছুরি, কাটাচামচ প্রভৃতিতে জাহাজখানি একেবারে ভর্ত্তি ছিল। জাহাজখানিতে লোকজনের মধ্যে ছিল জাহাজ-চালক নাবিকেরা

প্রচ্ছায়া
পৃথিবী বা চন্দ্রের যে ছায়াংশে
সূর্য সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে

সূর্যের কৃষ্ণ চিহ্ন
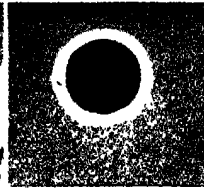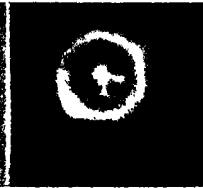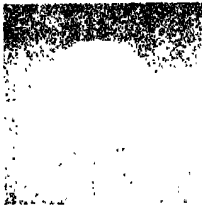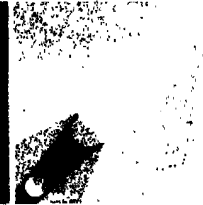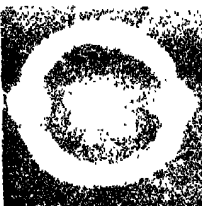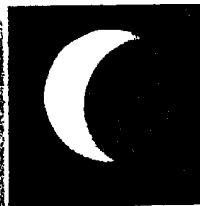
খস্বস্তিক
দ্রষ্টার মস্তকের ঠিক ঊর্দ্ধে
আকাশের বিন্দুর নাভি-মধ্য
শিরোবিন্দু

জ্যোতিষ্ময় ত্রিকোণাকার
নভোমণ্ডল

আকাশ গোলক
এই গোলকটিতে গ্রহ নক্ষত্রাদির
চিত্র দেখান হইয়াছে

ধূমকেতু

নক্ষত্রপুঞ্জ

বর্ণবলয়
সূর্যের চারিদিকে
বিচিত্র বর্ণবলয়

সাদা নক্ষত্র
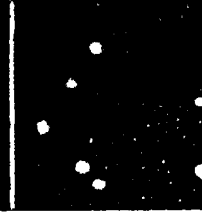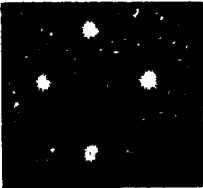
চন্দ্ররেখা

বিচ্ছেদক বা সেক্টার
(Sector) যন্ত্র

আলো বিকিরণ

ধূমকেতুর শীর্ষ

কমলালেবুর ন্যায়
অবনমিত গোলকাভাস

গ্রহপথ বা কক্ষ
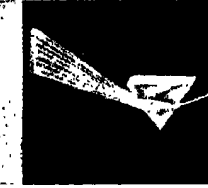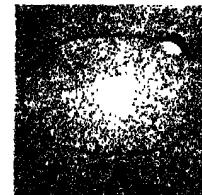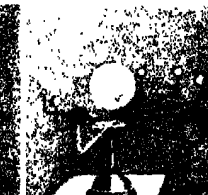
গ্রহগতিসূচক যন্ত্র
গ্রহের গতি, অবস্থান ও আবর্তন
প্রদর্শনের জন্য যন্ত্রবিশেষ

এবং সিগ্রেভ-পরিবার। সিগ্রেভ-পরিবার ছাড়া ঐ জাহাজে আর কোনও যাত্রীই ছিল না।

সিগ্রেভ-পরিবারে সবশুদ্ধ সাতজন লোক—সিগ্রেভ, সিগ্রেভের স্ত্রী, তাঁহাদের চারটি ছেলেমেয়ে এবং একজন ঝি। সিগ্রেভ লোকটি খুব চালাক-চতুর। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি শহরে অনেক দিন ধরিয়া এক গভর্ণমেণ্ট অফিসে কাজ করিতে-ছিলেন। ঐ কাজ করিয়া প্রচুর টাকাকড়ি জমাইয়া তখন তিনি মস্ত বড়লোক। অষ্ট্রেলিয়াতে তাঁহার তখন প্রকাণ্ড এক জমিদারী ও মস্ত এক ব্যবসা। সেই জমিদারী ও ব্যবসার উন্নতির জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে বহু জিনিসপত্র কিনিয়া ফিরিতেছিলেন। মিসেস্ সিগ্রেভ্ ছিলেন বড় অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির। আর সিগ্রেভ্ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। বেজায় বকিতে পারিতেন তিনি। তাঁহাদের সব চেয়ে বড় ছেলে ছিল উইলিয়াম্—সে বেশ চালাক আর বুদ্ধিমান। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সহিত মাস্‌টারম্যান্ রেডির খুব ভাব হইয়া গিয়াছিল। মাসটারম্যান্ রেডি তাঁহার সমুদ্র-জীবনের কত গল্প তাহাকে শুনাইতেন। কবে কোথায় তিনি ঝড়ে পড়িয়াছিলেন এবং কিভাবে সেই ঝড় হইতে জাহাজশুদ্ধ তিনি উদ্ধার পাইলেন, উইলিয়াম এই সব গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত। আবার উইলিয়ামও রেডিকে রবিন্‌সন ক্রুশো প্রভৃতি নাবিকদের গল্প শুনাইত। রেডি ঐ-সব আগে কখনও শোনেন নাই। কাজেই সেগুলি শুনিতে তাঁহার খুবই ভাল লাগিত।

উইলিয়ামের ছোট ভাই টমাসের বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। কিন্তু সে ভারী দুষ্টু। তাহার মাথার মধ্যে সর্ব্বদা দুষ্টামি বুদ্ধিই খেলিয়া বেড়াইত। একবার সে তাহার এয়ার গান্ দিয়া দেয়ালের টিকটিকি শিকার করিতে গিয়া এক বিষম কাণ্ডই বাধাইয়া বসিয়াছিল। বন্দুকের ছর্‌রাগুলো সেবারে টিকটিকির গায়ে না লাগিয়া তাহার বাবার চশমার একখানা কাচ একেবারে গুঁড়া করিয়া দিয়াছিল। সে যাত্রায় গুণধর ছেলে টমাসের বন্দুকের গুলিতে মিষ্টার সিগ্রেভের চোখ নষ্ট হইতে বসিয়াছিল আর কি। এইভাবে কত রকমে সে যে দুষ্টামি করিয়া বেড়াইত তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

টমাসের পরে সিগ্রেভের এক মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েটির বয়স পাঁচ আর ছেলেটির বয়স তখন মাত্র একবৎসর—কি তাহারও কম। জুনো বলিয়া একটি নিগ্রো মেয়ে ঐ শিশুটীর দেখাশোনা করিত। সেও ঐ জাহাজে সিগ্রেভ্-পরিবারের সঙ্গেই যাইতেছিল।

সিগ্রেভ্-পরিবারের সঙ্গে তাঁহাদের দুইটি কুকুরও ছিল। কুকুর দুইটির নাম রমুলাস ও রেমাস। জাহাজের কাপ্তেনেরও একটী অতিশয় প্রিয় কুকুর ছিল। তাহার সহিত সিগ্রেভের কুকুর দুটী খুব আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল। দেখা হইলেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিত না।

দিন যায়। বেশ কয়েকদিন ধরিয়া "প্যাসিফিক জাহাজখানা পরিষ্কার নীল আকাশের তলে কত দেশ-দেশান্তর পার হইয়া অসীম সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ সমস্ত আকাশ মেঘে ভরিয়া গেল—চারিদিক অন্ধকার করিয়া আসিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীষণ ঝড় উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল মুষলধারে। ঝড় বৃষ্টি ও বাজ পড়ার অন্ত নাই। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও ভীষণ মাতামাতি সুরু করিয়া দিয়াছিল। বড় বড় ঢেউগুলি ক্রমাগত জাহাজের গায়ে আসিয়া প্রবলবেগে আঘাত করিতেছিল, কোনও কোনটা আবার জাহাজের উপর দিয়া হুস করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সমুদ্রের সে কি গর্জ্জন আর ঝড়ের সে কি প্রবল বেগ! মনে হইতেছিল যেন প্রলয় কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। একদিন দু'দিন তিন দিন যায়—ঝড়ের বেগ আর থামে না—সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়েরও আর বিশ্রাম নাই। ঝড় ও সমুদ্রের সঙ্গে যুঝিতে গিয়া কত নাবিক যে তাহাদের প্রাণ হারাইল তাহার ঠিক নাই। শেষকালে জাহাজের কাপ্তেন অসবোর্ণও একদিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং জাহাজখানার একজায়গায় ফুটো হইয়া গিয়া ক্রমাগত জাহাজের ভিতরে একটু একটু করিয়া জল ঢুকিতে লাগিল। সকলে ভাবিল "আর বুঝি জাহাজখানাকে রক্ষা করা গেল না!"

কাপ্তেনের ঐ অবস্থা দেখিয়া জাহাজের নাবিকেরা বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেল। তাহারা ভাবিল এই বিপদে তাহাদের চালাইবে কে?

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নাবিকেরা সবাই ঠিক করিয়া ফেলিল যে তাহারা ঐ জাহাজখানাকে ছাড়িয়া পালাইবে। সেই ভীষণ ঝড়ে একখানা মাত্র নৌকা ভাল ছিল, আর সবই ঝড় বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাজেই উহারা সেইখানা লইয়া সিগ্রেভ্-পরিবারের কাহাকেও কিছু না জানাইয়া পলাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু রেডি কিছুতেই সিগ্রেভ-পরিবারকে ছাড়িয়া সেই সব নাবিকদের সঙ্গে যাইতে রাজী হইলেন না। অন্যান্য সব নাবিকেরা তাঁহাকে কত বুঝাইল। তবু রেডি সিগ্রেভ্‌দের সঙ্গে ঐ জাহাজে রহিয়া গেলেন। শেষকালে অন্যান্য সব নাবিকেরা সমুদ্রে নৌকা ভাসাইয়া পালাইয়া গেল।

নাবিকগুলো পালাইবার ঠিক পর হইতে আকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিল। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছিল এবং নিকটেই একটা ছোট দ্বীপ দেখা গেল। মাসটারম্যান্ রেডি জাহাজখানাকে তাড়াতাড়ি সেইদিকে চালাইয়া লইয়া গেলেন। তারপরে দ্বীপটির খুব নিকটে গিয়া উহাকে নোঙর করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ডাঙায় যাইতে হইলে নৌকার দরকার। অথচ সব নৌকাই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার। কাজে কাজেই রেডি তখন একখানি নৌকা মেরামত করিতে বসিলেন।

ইতিমধ্যে মিষ্টার সিগ্রেভ্ আসিয়া রেডির পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা আমরা না হয় ঐ জনশূন্য দ্বীপটায় গেলাম। কিন্তু আমাদের দিন চল্‌বে কি ক'রে?' রেডি উত্তর দিলেন, "কেন, আপনি খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবছেন তো? কোন ভাবনা নেই। জাহাজে প্রচুর খাবার আছে তা নিয়ে গেলেই হবে—আর তা ছাড়া দেখেছেন তো যে ঐ দ্বীপে কত নারকেল গাছ! সুতরাং না খেতে পেয়ে আমরা মরবো না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে হ্যাঁ। দ্বীপটা বড্ড ছোট ও নীচু! কাজেই ভাল জল পেতে আমাদের একটু বেগ পেতে হবে। তবে জানেন তো, ভগবান সব সুখ একসঙ্গে মানুষকে দেন না।"

নৌকা মেরামত হইবার পরে মাসটারম্যান্ রেডি ও সিগ্রেভ্-পরিবারের সবাই সেই জনশূন্য দ্বীপটিতে গিয়া পৌঁছিলেন। মিষ্টার সিগ্রেভ্ কিন্তু ঐরূপ একটি জনশূন্য দ্বীপে গিয়া পড়াতে মোটেই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বড় বিমর্ষ হইয়া রেডিকে বলিলেন, "দেখুন, এখানে এসে আমরা প্রাণে বেঁচেছি একথা ঠিক। এবং সেজন্য আমি ভগবানকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জনোচ্ছি। কিন্তু এমন একটা দ্বীপে এসে পড়েছি যে কোন দিনও যে এখান থেকে উদ্ধার পেয়ে স্বদেশের মুখ দেখবো এমন ভরসা তো হয় না। কারণ এই অজানা দ্বীপের কাছ দিয়ে কোনও জাহাজ যে কোনদিন যাবে তা তো আমার মনে হয় না! কাজে কাজেই আমাদের সবাইকে এখানেই থাক্‌তে হবে—কতদিন কে জানে-হয়ত মৃত্যু পর্য্যন্ত! এতে আমার এবং আমার ছেলে-মেয়েদের জীবনের সব ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। তা ছাড়া আমার জমিদারীর সব উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে ধূলিসাৎ হ'ল। এই কথা বলিয়া মিষ্টার সিগ্রেভ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সিগ্রেভের কথা শুনিয়া রেডি কিন্তু একটুও দমিলেন না। তিনি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "ভগবান তো কোনদিন কাউকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে দেন না তিনি মানুষকে দুঃখ দিয়েও পরীক্ষা ক'রে থাকেন। যে মানুষ সেই দুঃখকে হাসিমুখে সহ্য করে নিতে পারে সেই তো জয়ী হয়—শেষ পর্য্যন্ত সেই তো সুখের ও ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখে। আর তা ছাড়া, আমরা হয়ত এই অবস্থায় পড়েছি আমাদের ভালর জন্যই। জানেনতো কথায় বলে 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।'

রেডির এই উপদেশ শুনিয়া মিষ্টার সিগ্রেভ্ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। তবুও রেডি সিগ্রেভ্‌কে আবার উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন,—"মিষ্টার সিগ্রেভ! ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে থাকুন। আপনি আবার আপনার জমিদারীতে ফিরে যাবেন আর তখন আপনার জমিদারীর খুব বাড়-বাড়ন্ত হবে।" মিষ্টার সিগ্রেভ্ মনে মনে রেডিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।'

এইবার রেডি এবং সিগ্রেভ্ তাঁহাদের একটা আস্তানা পাতিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের তীর হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে বালির

উপরে বড় সুন্দর একটা জায়গা ছিল। সেই জায়গাটা তাঁহাদের সকলের খুব পছন্দ হইয়াছিল। তাই সেখানেই তাঁহারা একটা প্রকাণ্ড তাঁবু খাটাইলেন। জাহাজে কতকগুলি পশু-পক্ষী ছিল। যেমন, দুইটি ছাগল, একটি গরু, একটি ভেড়া ও চারটি পায়রা। তা' ছাড়া কুকুর তিনটী তো ছিলই। ঐ সব পশু-পাখীগুলিকেও তাঁহারা ঐ দ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন। কারণ সময়ে অসময়ে উহাদের কাছ হইতে অশেষ উপকার পাওয়া যাইবে।

সিগ্রেভ্ এবং রেডি যখন খুব তাড়াতাড়ি করিয়া তাঁহাদের নূতন সংসার পাতিতে ও গোছগাছ করিতে ব্যস্ত তখন টমাস এক অনর্থ বাধাইয়া বসিল।

জাহাজের মধ্যে দরকারী জিনিসপত্র যা কিছু ছিল, সে সবই রেডি একে একে ডাঙায় আনিয়া ফেলিতেছিলেন। একবার একটা গুলিভরা বন্দুক প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস নৌকায় করিয়া আনিয়া ডাঙায় রাখিয়া তিনি আবার জাহাজে গিয়াছিলেন আরও কতকগুলি জিনিসপত্র আনিতে। ওদিকে জুনো এবং সিগ্রেভ তখন তাঁবুর মধ্যে জিনিসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত। রেডি সেই ভরা বন্দুকটা একটা নারিকেল গাছের গায়ে ঠেস্ দিয়া খাড়া ভাবে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দুষ্টু টমাস কোথা হইতে গুটি গুটি আসিয়া বন্দুকটার ঘোড়া চাপিয়া দিয়াছিল। আর যায় কোথা! গুড়ুম্ করিয়া একটা আওয়াজ হইয়া একটা গুলি শূন্যে উঠিয়া গিয়া নারিকেল গাছের মাথায় লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা নারিকেল আর ডাব হুড়্মুড় করিয়া মাটিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভাগ্যিস্ একটাও নারিকেল তাঁহার মাথায় পড়ে নাই। তাহা হইলে টমিকে আর সে যাত্রায় বাঁচিতে হইত না।

রেডি জাহাজে ছিলেন। কাজেই ডাঙ্গাতে ঐরকম বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া তিনি একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিয়া ভাবিলেন যে "হয়ত অসভ্য-জাতির ডাকাতেরা মানুষের সন্ধান পেয়ে এসে পড়েছে।" ভয়ে ও আতঙ্কে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তবু তিনি জাহাজ হইতে আর একটি বন্দুক লইয়া তাড়াতাড়ি ডাঙায় গিয়া নামিলেন। ডাঙায় নামিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার তো চক্ষু চড়কগাছ। তিনি দেখিলেন যে সিগ্রেভ্‌ও সেই আওয়াজ পাইয়া নারিকেল গাছ তলায় গিয়া তাঁহার ছেলের কীর্ত্তি দেখিয়া আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়া ধমকাইয়া ধমকাইয়া বলিতেছেন, "আরে পাজি ছেলে। ঐ নারকেলের একটা যদি তোর মাথায় পড়তো তো তুই বাঁচতিস্ কি ক'রে? মাথাটা যে তা'হ'লে গুঁড়ো হ'য়ে ছাতু হ'য়ে যেতো।" টমাস ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছিল আর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিতেছিল যে আর কখনও অমন কাজ করিবে না। ব্যাপার দেখিয়া রেডি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি ভাবিলেন, "যাক্ যা ভয় করেছিলাম তা নয়। আর ছেলেটাও যে ভালয় ভালয় রক্ষা পেয়েছে এ আমাদের পরম ভাগ্য।"

সিগ্রেভ্ পরিবারের সকলে এবং মাসটারম্যান্ রেডি সেই দ্বীপে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই রহিলেন। কেবল তাঁহাদের জলকষ্টই তাঁহাদিগকেই মাঝে মাঝে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলিত। শেষকালে শীঘ্রই একদিন জলের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছিল। রেডি এবং উইলিয়াম তাঁহাদের কুকুরগুলির সাহায্যে সেই দ্বীপটির আর একদিকে এক জায়গায় বালির অল্প নীচেই জলের সন্ধান পাইলেন। তখন তাঁহারা ঠিক করিলেন যে তাঁহারা সেই জায়গার কাছাকাছি কোথাও তাঁহাদের তাঁবু ফেলিবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহাদের আস্তানা গুটাইয়া নিয়া সেই দিকে উঠিয়া গেলেন এবং বালি খুঁড়িয়া সেখানটায় একটা কুয়ার মত করিয়া রাখিলেন। কুয়াটা তাঁহাদের তাঁবু হইতে একটু দূরে ছিল—তবে বেশী দূরে নয়।

সকল অভাব দূর হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের দিনগুলি বেশ আরামে কাটিতে লাগিল। কিন্তু একদিন দুইটি অসভ্য জাতীয় স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিল। মেয়ে দুটিকে অত্যন্ত মলিন, ক্লান্ত ও কাতর দেখিয়া সকলের খুব দয়া হইয়াছিল। কাজেই তাহারা সিগ্রেভ্-পরিবারেই আশ্রয় পাইল। কিন্তু কিছুদিন

পরেই তাহারা কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। অসভ্য স্ত্রীলোক দুইটীর ঐ রকম হঠাৎ নিরুদ্দেশে সিগ্রেভ্, রেডি প্রভৃতি ভয়ানক ভয় পাইলেন। দিনরাত তাঁহাদের দুশ্চিন্তার আর শেষ ছিল না। তাঁহারা ভাবিতেন, "কি জানি! মেয়ে দুটা হয়ত তাদের অসভ্য জাতির মধ্যে এই কথাটা রটাবে! কিন্তু তাহলে তো রক্ষা থাকবে না। এ-খবর পেলে অসভ্যেরা এসে নিশ্চয় আমাদের খুন ক'রে সব লুটপাট ক'রে নিয়ে যাবে।"

ভয় পাইয়া তাঁহারা সেদিন হইতে খুব সতর্ক ও সাবধানে রহিলেন। তাঁহাদের তাঁবুর আশেপাশে অনেকদূর পর্য্যন্ত ঘিরিয়া খুব শক্ত করিয়া উচু বেড়া দেওয়া হইল। বেড়ার গায়ে গায়ে কাঁটা গাছ ও দেওয়া হইয়া গেল। ইতিমধ্যে তাঁহারা দেখিলেন যে দূরে সমুদ্রের উপর দিয়া একখানা জাহাজ যাইতেছে। ইহা দেখিয়া মুক্তির আনন্দে তাঁহাদের মন নাচিয়া উঠিল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি "প্যাসিফিক" জাহাজখানার পতাকাখানি তাঁবু হইতে বাহির করিয়া আনিয়া ক্রমাগত নাড়িয়া নাড়িয়া সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই জাহাজের কেহই বোধ হয় তাহা দেখিতে পায় নাই। তাই জাহাজ খানা ক্রমশঃ দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল—অসহায় সিগ্রেভ্-পরিবারকে উদ্ধার করিবার জন্য সে জাহাজ খানা দ্বীপের দিকে ভিড়িলই না।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা যে বিপদের ভয় করিতেছিলেন তাহা ঘটিল। একদিন সমুদ্রের উপরে অসংখ্য ডিঙি-নৌকা দেখা যাইতে লাগিল। সবগুলিই অসভ্য জাতির লোকে একেবারে ভর্ত্তি। সকলের হাতেই অস্ত্র-শস্ত্র। ডিঙি নৌকাগুলি সেই দ্বীপের দিকেই ভাসিয়া ভাসিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

বেড়ার ঠিক পিছনেই সিগ্রেভ্, উইলিয়াম ও রেডি ওৎ পাতিয়া বন্দুক হাতে লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন। অসভ্য লোকগুলা ডিঙি হইতে ডাঙায় নামিবামাত্র তাঁহারা উহাদের দিকে অনবরত বন্দুকের গুলি ছুঁড়িতে লাগিলেন। জুনো এ-সময়ে তাঁহাদের অশেষ সাহায্য করিয়াছিল। বন্দুকের গুলি ফুরাইয়া যাইবা মাত্র সে এক একটি করিয়া গুলি ভরা বন্দুক তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছিল এবং তাঁহাদের হাতের খালি বন্দুক লইয়া আবার তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাতে গুলি ভরিয়া ফেলিতে-ছিল। প্রায় একঘণ্টা এইরকম যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এইভাবে অনবরত গুলি বর্ষণ হওয়াতে অসভ্যেরা সুবিধা করিতে পারিল না। তাহারা ক্রমশঃ পিছু হটিয়া হটিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে টমাস আবার এক কু-কাজ করিয়া বসিয়াছিল। অসভ্যেরা যখন আক্রমণ করিতে আসে তখন বেলা প্রায় বারোটা। ঠিক তাহার পূর্ব্বেই সিগ্রেভ্ পরিবারের সবাই তাঁবুর বাহিরে

অসভ্যদের সহিত যুদ্ধ হইবার একটি দৃশ্য

গিয়া তাঁহাদেরই খোঁড়া সেই কূয়া হইতে স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্নান সারিয়া আসিয়া দেখিলেন যে টমাস তখনও স্নান করে নাই। কাজেই সিগ্রেভ্ তাহাকে তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে টমাস তাহার স্নান সারিয়া আসিল যে সবাই তাহাকে আদর করিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিল, "এই দেখ, টমাস আমাদের কেমন ভাল ছেলে হয়ে উঠছে। ও আর দুষ্টুমি করে না।"

আসলে টমাস কিন্তু কুয়ায় যায়ই নাই। বিশেষ দরকারে ব্যবহার করিবার জন্য এক টব জল রোজই তাঁহাদের একটি তাঁবুতে রাখা থাকিত। টমাস গিয়া সেই জলে আচ্ছা করিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছিল।

ওদিকে যুদ্ধ শেষ হইবার পরে যখন জলের খোঁজ পড়িল, তখন সিগ্রেভ, রেডি আর উইলিয়াম একফোঁটা জল পান না। তাঁবুর মধ্যে খাবার বা হাত-পা ধুইবার জন্য একফোঁটা জলও রাখে নাই। সব সে তাহার স্নান করিবার সময়ে খরচ করিয়াছিল।

ব্যাপার দেখিয়া সকলের তো একেবারে চক্ষু স্থির! ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের এবং বড়দেরও জল তৃষ্ণা পাইলে তখন উপায়! রান্নাবান্না ও হাত মুখ ধুইবারই বা কি বন্দোবস্ত হইবে? তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন যে এখন তো বাইরে গিয়ে জল আনা বড় নিরাপদ নয়। কোথায় কোন্ অসভ্য শত্রু লুকিয়ে আছে, দেখা পেলেই সাবাড় করে দেবে।

তাঁহারা সকলে প্রমাদ গণিলেন। ভাবিলেন যে সে দিন তাঁহাদিগকে জলের অভাবে প্রাণ হারাইতে হইবে।—শুধু সে দিন কেন? কতদিনে যে বেড়ার বাহিরে যাওয়া নিরাপদ হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

কিন্তু সিগ্রেভ ও তাঁহার স্ত্রী অথবা তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যে জলের অভাবে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মারা যাইবে ইহা রেডির পক্ষে অসহ্য। তিনি সিগ্রেভ পরিবারের সবাইকে বড় স্নেহ করিতেন—বড় ভালবাসিতেন। কাজে কাজেই সেই বৃদ্ধ ঠিক করিলেন যে তিনিই বাহিরে গিয়া কুয়া হইতে জল আনিবেন। তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা ভয়ানক—এমন কি তাহাতে অসভ্যদের হাতে তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সিগ্রেভ্-পরিবারের জন্য তিনি সকল বিপদ হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। এবং ঐ টমাসের জন্যই তিনি উহার আগে আর একবার সত্য সত্যই ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেবারে বড্ড বাঁচিয়া ফিরিয়াছিলেন।

সেবারে ব্যাপারটা হইয়াছিল এই যে বার বার বারণ করা সত্ত্বেও টমাস একদিন লুকাইয়া সমুদ্রের ধারে গিয়াছিল। তারপর নৌকায় উঠিয়া সে একা একাই হাওয়া খাইবার জন্য সমুদ্রে নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছিল। ওদিকে বাড়ীতে খোঁজাখুজি পড়িয়া গিয়াছিল। টমাসকে কোথাও পাওয়া যাইতেছিল না। শেষে দেখা গেল যে সে সমুদ্রে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নৌকায় বসিয়া। নৌকাখানা ডাঙা হইতে বেশ খানিক দূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। এত প্রবল স্রোত যে তাহাতে নৌকাখানা ক্রমাগত কেবল দূরে সরিয়া যাইতেছিল। কখনও যে ডাঙায় ভিড়িবে সে সম্ভাবনা ছিলই না। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মাস্টারম্যান রেডি তাঁহার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সাঁতরাইয়া গিয়া নৌকাখানাকে ডাঙায় আনেন। সমুদ্রের সেই জায়গাটায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঙ্গরে একেবারে ভর্ত্তি ছিল। সাঁতরাইয়া গিয়া নৌকাখানায় উঠিবার ঠিক আগে এক ঝাঁক হাঙ্গর তাঁহার পিছনে ভয়ানক তাড়া করিয়াছিল। তবে খুব অল্পের জন্য তিনি সে-যাত্রায় নিজের প্রাণ লইয়া এবং টমাসকে উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। নহিলে সেবারে তাঁহার প্রাণ তো হাঙ্গরের মুখে যাইতই—টমাসকেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইত কি না কে জানে?

সুতরাং এবারেও টমাসের দুষ্কর্মের প্রতীকার করিবার জন্য তিনি কোমর বাঁধিয়া জল আনিতে বাহির হইলেন।

বেশ নিরাপদেই তিনি কুয়া হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিলেন। কিন্তু এমনি বরাত যে ঠিক তাঁহাদের বেড়ার কাছাকাছি আসিতেই অসভ্যদলের একটা লোকের বন্দুকের গুলিতে তিনি ভয়ানকভাবে আহত হইয়া মাটীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। নিকটেই একটা ঝোপের আড়ালে সেই অসভ্য লোকটা লুকাইয়াছিল। সে সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে গুলি করিয়াই পালাইতেছিল। কিন্তু সিগ্রেভ্ এবং উইলিয়াম সেই লোকটাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি গুলি করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলেন এবং তারপর সকলে ধরাধরি করিয়া রেডিকে তাঁহাদের তাঁবুর মধ্যে

আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে শীঘ্রই আবার ঘোর বিপদ দেখা দিল। অসভ্যগুলা আবার দলবল জুটাইয়া তাঁহাদের আক্রমণ করিবার জন্য ডিঙি ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছিল। রেডি অজ্ঞান ও আহত—একা সিগ্রেভ ও উইলিয়াম কি করিয়া ঐ অত অসভ্যদের সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারিবেন তাহা ভাবিয়া একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু অসভ্যগুলা তাহাদের নৌকা ডাঙায় ভিড়াইবার পূর্ব্বেই উহাদের পিছন দিক হইতে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। পিছন দিক হইতে ঐভাবে অনবরত গুলি বর্ষণ হওয়াতে কত অসভ্য বর্ব্বর যে পটাপট মরিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। ইহাতে বাকী অসভ্যগুলা ভয়ানক ঘাবড়াইয়া গিয়া তাহাদের ডিঙির মুখ ঘুরাইয়া তাহাদের প্রাণ লইয়া পলাইয়া বাঁচিল।

উইলিয়াম ও সিগ্রেভ্ ভাবিলেন যে কাহাদের গুলিতে অসভ্যগুলা ঐভাবে ছত্রাকার হইয়া পলাইল। উইলিয়াম তখন একটা উচু জায়গায় উঠিয়া দেখিলেন যে নিকটেই সমুদ্রের উপরে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছে, আর একদল সশস্ত্র লোক নৌকায় করিয়া ডাঙার দিকে আগাইতেছে। লোকগুলি ডাঙায় নামিয়া মিষ্টার সিগ্রেভের তাঁবুর দিকেই আসিতে লাগিল। সেই সশস্ত্র লোকদের মধ্যে অন্য কাহাকেও চিনিতে না পারিলেও তাঁহারা দূর হইতে পূর্ব্বেকার জাহাজের সেই কাপ্তেন অস্‌বোর্ণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা দৌড়াইয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গিয়া অস্‌বোর্ণকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। উইলিয়াম ও সিগ্রেভ্ অস্‌বোর্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এখন অসবোর্ণ কি করিয়া খবর পাইয়া ঐ দ্বীপে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক। ব্যাপারটা হইয়াছিল এই—সেবারে ঝড়ের সময় মূর্চ্ছিত অস্‌বোর্ণকে লইয়া জাহাজের নাবিকেরা জাহাজ হইতে চলিয়া যায়। তারপর তাহারা গিয়া অষ্ট্রেলিয়াতে উঠে। অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া অস্‌বোর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন এবং তিনি হারাইয়া যাওয়া সিগ্রেভ্-পরিবার ও রেডির খোঁজ করিতে আরম্ভ করেন। একদিন একখানা জাহাজ অষ্ট্রেলিয়াতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে খবর দিয়াছিল যে উহা যখন একটা অজানা দ্বীপের কাছ দিয়া আসিতেছিল তখন সেখান হইতে কাহারা যেন "প্যাসিফিক্" জাহাজের পতাকা উড়াইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন সেই জায়গায় সমুদ্রে এত ভীষণ স্রোত ছিল যে সেদিকে জাহাজ চালান বা নৌকা নামাইয়া দ্বীপে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কাজেই তাঁহারা সুবিধা করিতে পারেন নাই।

ঐ জাহাজের কাপ্তেনের কাছ হইতে এই শুনিয়াই অস্‌বোর্ণ বুঝিয়াছিলেন যে উহারা সিগ্রেভ পরিবার না হইয়া যায় না। কারণ ঐরকম একটা জায়গার কাছাকাছিই তাঁহাদের জাহাজ ঝড়ে পড়িয়াছিল। ঐ খবর পাইয়াই অস্‌বোর্ণ একখানি জাহাজ লইয়া তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বহুদিন পরে তাঁহাদের দেখা হওয়াতে অসবোর্ণ এবং সিগ্রেভ্ পরিবারের সবাই খুব আনন্দিত হইলেন। তা ছাড়া ঐ রকম একটা জনশূন্য দ্বীপে হইতে উদ্ধার পাইয়া লোকালয়ে ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনাতে সিগ্রেভ্ এবং তাঁহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা খুব খুশী হইলেন। রেডিও ভাবেন নাই যে আর কখনও অসবোর্ণের সহিত তাঁহার দেখা হইবে কাজেই তিনিও খুব আনন্দিত হইলেন। কিন্তু অত আনন্দের মধ্যেও রেডির আঘাত সককে বড় বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। অত আনন্দেও তাঁহাদের কাহারও মনে শান্তি ছিল না, কারণ রেডি শয্যাশায়ী—তিনি আর বাঁচেন কি না সন্দেহ। সত্যই রেডি আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন না—এমন ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছিলেন যে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

রেডির ইচ্ছা অনুসারে রেডির মৃতদেহ ঐ দ্বীপেই কবর দেওয়া হইয়াছিল। তারপর সকলে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে অসবোর্ণের সহিত অষ্ট্রেলিয়ায় যাইবার জন্য দ্বীপ ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিলেন।

বাঙ্গলার রূপকথা

[২৪৩৯ পৃষ্ঠার পর]

শেয়াল বর

এক শেয়াল নদী থেকে বড় বড় তিনটে ইলিশ মাছ ধরে শ্বশুর বাড়ী চলেছে। ভাল করে' নদীতে নেয়ে গায়ের কাদা ধুয়ে বেশ করে' গোঁফ পাকিয়েচে, পাকিয়ে কিছুদূর গিয়ে এক গাছের তলায় বসে ভাবচে না জানি আজ আমাকে কেমন দেখ্‌তে হয়েচে। এখন সেইখান দিয়ে এক বক উড়ে যাচ্চে। শেয়াল তাকে দেখে বল্‌লে—বক ভাই, বক ভাই আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে ?

বক বল্‌লে—কেন ?

শেয়াল বল্‌লে—

গা ধুয়েচি নদীর জলে গোঁফে দিয়েছি চাড়া
শ্বশুরবাড়ী যাচ্চি আমি তাই তো এত তাড়া।

তাই শুনে বক বল্‌লে—বাঃ তোমাকে তো বেশ দেখ্‌তে হয়েছে ভাই, ঠিক যেন—

হীরের আঁচিল হীরের পাচিল
হীরের তিন পা দেয়াল
আর হীরে কানে দিয়ে বসে
রয়েচেন জয় জগন্নাথ শেয়াল ॥

বল্‌তেই শেয়াল খুসী হয়ে তিন্‌টে মাছ থেকে একটা তাকে দিয়ে দিলে।

আবার কিছু দূরে গিয়ে শেয়াল এক গাছ-তলায় এসে বসেছে—দেখে এক মাছরাঙা উড়ে যচ্চে। শেয়াল তাকে ডেকে বল্‌ল, ও ভাই মাছরাঙা আমাকে কেমন দেখ্‌তে হয়েচে ভাই, ঠিক যেন—

সোণার আচিল সোণার পাঁচিল
সোণার তিন পা দেয়াল
আর সোণা কানে দিয়ে বসে
রয়েচেন রাজা মহাশয় শেয়াল।

বল্‌তেই শেয়াল খুসী হয়ে দুটো মাছ থেকে একটা তাকে দিয়ে দিলে।

আবার কিছুদূর যায়, এমন সময় একটা কাকের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। শেয়াল তাকে ডেকে বল্‌ল—ও ভাই কাক, আমাকে কেমন দেখ্‌তে হয়েচে ভাই ?

কাক বল্‌লে কেন ?

শেয়াল বল্‌লে—

গা ধুয়েছি নদীর জলে গোঁফে দিয়েছি চাড়া
শ্বশুর বাড়ী যাচ্চি আমি তাই তো এত তাড়া

কাক মাছটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে আমাকে মাছটা দিবি বল?

শেয়াল বল্‌লে—না ভাই, সবে একটি মাছ এসে ঠেকেচে, এটা আমি কাউকে দিতে পারবোনা। শ্বশুরবাড়ী কি খালি হাতে যাব?

তাই শুনে কাক বল্‌লে—বাঃ তোমাকে ত বেশ দেখ্‌তে হয়েচে, ঠিক যেন—

ছাইয়ের আঁচিল ছাইয়ের পাঁচিল
ছাইয়ের তিন পা দেয়াল
আর ছাতা পড়া দাঁতে বসে
রয়েছেন মড়াখেগো বেটা শেয়াল

এই শুনেই শেয়াল লাফিয়ে উঠে কাককে ধরতে তার পিছু পিছু ছুট্‌লো। আর কোথা থেকে হতভাগা একটা চিল এসে শেয়ালের শেষ মাছটীও ছো মেরে নিয়ে উড়ে পালাল। বেচারা শেয়ালের মুখের গ্রাস এমনি করে নষ্ট হয়ে গেল। সে যদি আগে জানত যে ব্যাপারটা এমনি ঘটবে তাহলে কখনো কাকের পেছনে ছুটত না।

এক সওদাগর ছিল। তার একটি ছেলে একটি মেয়ে। এখন কিছুদিন পরে সওদাগর মরে গেল আর তার বউ ও মরে গেল। মরে গেতে সেই ছেলেটি আর মেয়েটি বল্‌লে, দেখ ভাই এ বাড়ী আর আমাদের ভাল লাগে না। আমরা ভাই বোন বনে যাই চল। এই বলে ভাইটি আর বোনটি বনে গেল। বনে দিব্যি ফুল ফুটেচে। বোনটি তাই দেখে খুসী হয়ে বল্‌লে, দাদা বেশ বন দেখে এসেচ। ভাই বল্‌লে, তুই এখানে থাক্‌ আমি চারিদিক বেড়িয়ে দেখে আসি। বোন বল্‌লে, আমি ও যাব। ভাই বল্‌লে, তুই কোথা যাবি? তুই এই গাছ-তলায় বসে থাক। এই বলে ভাইটি বেড়াতে চলে গেল।

বোন্‌টি আপনার মনে করেচে কি ভাল ভাল ফুল তুলে মালা গেঁথেচে। মালা গেঁথে বসে আছে আর ভাব্‌চে দাদা এলে পরে তার গলায় পরিয়ে দিব। তার পর ভাইটি বেরিয়ে এলো। আসতেই বোন্‌টি সেই ফুলের মালা আদর করে তার দাদার গলায় পড়িয়ে দিল। যেমন দেওয়া আর অমনি ভাইটি হরিণ হয়ে বনে দৌড়ে চলে গেল।

সেইখানে বসে মেয়েটি ভাইয়ের শোকে কাঁদতে লাগল। হায় হায় কি হল? ভাইটি হরিণ হয়ে গেল! আমি তো জানিনা কি করবো। এখন এক বাদশার পুত্তুর সেই বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। শিকার করতে করতে দেখলে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? মেয়েটি আর কথা কয় না। রাজপুত্তুর বল্লেন তোমার বিয়ে হয়েচে? মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বল্লে—না। বাদশার ছেলে ভাবলেন একে বাড়ী নিয়ে যাই, বলে তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। সকলেই বললে মেয়েটি পরমা সুন্দরী, কিন্তু কথা কয় না কেন?

কিছুদিন পরে বাদশার পুত্তুরের একটি ছেলে হল। ছেলের ভাতের সময় সকলে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ছেলের কি নাম রাখবে? মেয়েটি মাটিতে একটি ডোরা কেটে দিলে। সকলে ছেলেটার নাম রাখলে ডোরাই। আবার কিছুদিন পরে রাজপুত্তুরের আর একটি ছেলে হলো। ছেলের ভাতের সময় সকলে জিজ্ঞাসা করলে এর নাম কি হবে গো? মেয়েটি গলার হার দেখিয়ে দিলে। সকলে বললে তাহলে এর নাম থাক হারাই। এর পর তার একটি মেয়ে হলো। মেয়েটার ভাতের সময় সকলে জিজ্ঞাসা করলে এর নাম কি রাখবো গো? মেয়েটি একটি কুসুম ফুল এগিয়ে দিলে। সকলে তখন বললে, আচ্ছা, এর নাম থাক্‌ কুসুমবতী।

রাজার ছেলে অনেকগুলি পায়রা পুষেছেন। এখন রোজ তিনি তাদের মটর খেতে দেন। একদিন রাজপুত্তুর মাকে বললেন, মা বউকে এবার কথা কওয়াতেই হবে। মা বললেন, কি করে কওয়াবে বাবা? রাজার ছেলে বললেন, তুমি এইখানে পায়রা মটর ছড়িয়ে দাও আর আমি তার উপর দিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে যেতে যেতে ইচ্ছে করে পড়ে যাব। সেই সময় তোমরা ও খুব কান্না-কাটি করো। এই বলে রাজার ছেলে মটরের উপর দিয়ে খড়ম পায়ে যেতে যেতে ইচ্ছে করে পড়ে গেলেন। অমনি সকলে, হায় কি হলো গো, বলে কাঁদতে লাগলো। রাজার ছেলের আর জ্ঞান হয় না। হারাই ডোরাই কুসুমবতী সকলেই কাঁদচে। তাই দেখে মেয়েটা কাঁদতে কাদতে বললে—

হারাই কাঁদে, ডোরাই কাঁদে
কাঁদে আমার কুসুমবতী ঝি
ভাইয়ের শোকে জর জর
আমার আবার হল কি!

এই শুনেই রাজার ছেলে বলে উঠলেন, ওইতো কথা বলেচে। তা হলে বউ তো বোবা নয়। তিনি তখন মেয়েটির কাছে গিয়ে বল্লেন—বল, তোমার ভাইয়ের কি হয়েচে? কন্যা বললে, আমরা দুই ভাই বোনেতে বনে ছিলাম। বনে আলো করে ফুল ফুটেছিল, সেই ফুল তুলে মালা করে ভাইয়ের গলায় পরিয়ে দিতে সে হরিণ হয়ে চলে গেছে। রাজার ছেলে বললেন—তা এ-কথা তুমি আমাকে এতদিন বলনি কেন? আমি তোমার ভাইকে এনে দিচ্ছি।

এই কথা বলে তিনি শিকার করতে বনে চলে গেলেন। বনের পর বন পার হ'তে লাগলেন, কিন্তু কোথাও কোন হরিণ দেখা গেল না, যার গলায় রয়েছে পরানো ফুলের মালা!—রাজপুত্র কিন্তু কিছুতেই অধৈর্য্য হলেন না, চল্লেন তেপান্তরের সব মাঠ পেরিয়ে হরিণ শিকারে। একদিন এলেন একটা পাহাড়ের নীচে। সেই পাহাড়ের নীচে নিবিড় বন। সেই বনে অনেক হরিণ। এই বনে গিয়ে যত হরিণ দেখেন সব ধরতে লাগলেন। শেষে একটা হরিণের গলায় তিনি দেখেন শুক্‌নো একগাছি ফুলের মালা রয়েচে। সেই হরিণটি যেই বেরিয়ে এসেচে অমনি তিনি তাকে ধরে আদর করে তার গলা থেকে মালাটী খুলে নিলেন। নিতেই দেখেন হরিণটী দিব্যি একটী সুন্দর ছেলে হলো। তাকে নিয়ে রাজার ছেলে বাড়ী এলেন। এসে মেয়েটীকে বললেন, কেমন এই কি তোমার ভাই? মেয়েটী তখন খুসী হয়ে বল্লে, হাঁ। তারপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

সাঁতারে বিভিন্ন রীতি

মাথা বেড়া সাঁতার

মাথাবেড়া সাঁতার কতকটা কাৎ-সাঁতারের মত। কাৎ হইয়া কান ও চোখ ডুবাইয়া সাঁতার কাটিতে হয়। কাৎ হইয়া বিপরীত দিকের হাত মাথার উপরে জল ছড়াইয়া অল্প উচু করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পর হাত মাথার উপর দিকে আগাইয়া দিয়া জলে ডুবাইতে হইবে। হাতের তালু বাটীর মত হইয়া থাকিবে। এই পদ্ধতিতে কনুই বেশী বাঁকাইতে হয় না। হাত যখন উপর দিকে ছড়াইবে সেই সময়ে কনুই যেন মুখের সম্মুখে আইসে। হাত প্রয়োজনীয় স্থান পর্য্যন্ত আগাইয়া জলে ডুবাইতে হইবে। তাহার পর তালু খুলিয়া পায়ের দিকে (অর্থাৎ নীচের দিকে) ধাক্কা দিয়া লইয়া যাইতে হয়। হাত হাল্কা ভাবে উপরে উঠাইতে হয়। জলের সহিত ধাক্কা দিবার সময় যথাশক্তি জোরে ধাক্কা মারিতে হয়। হাত নীচের দিকে উরু পর্য্যন্ত পিছাইলে শরীর স্বচ্ছন্দে ঘুরাইয়া অপর হাত দিয়া পূর্ব্বের মত গতিভঙ্গী করিতে হইবে। হাতের গতি কিন্তু শরীরের পাশের দিকে হইবে।

পায়ের গতি জলের ভিতরে হাঁটু বাঁকাইয়া সহজ ভাবে করিতে হইবে। হাত মাথার উপর দিকে যাইবার সময় সেই দিকের কান ও চোখ জলে ডুবিবে কিন্তু মুখ ডুবিবে না।

হাত পাশ দিকে ঘুরাইয়া সাঁতার

এই প্রণালী মতে পায়ে করিয়া জলে ধাক্কা দিবার ভঙ্গী ঠিক কাৎ-সাঁতারের মত করিতে হয়।
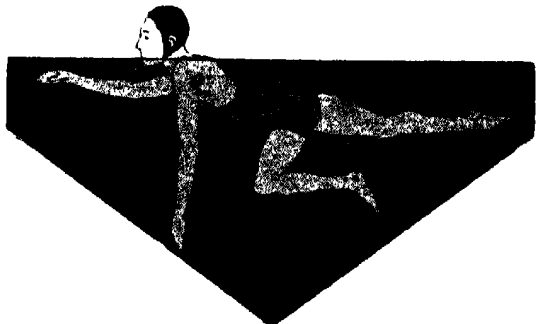
হাত পাশ দিকে ঘুরাইয়া সাঁতার

অর্থাৎ ডান পা বাম দিকে ও বাম পা ডান দিকে ধাক্কা মারিতে হয়। মাথা উচু হইয়া থাকিবে ও সম্মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। হাতের গতির

সময় প্রথমে মাথার উপর দিকে সোজা হইয়া আগাইয়া যাইবে। হাতের তালু এই সময় নীচের দিকে তাকাইতে হইবে। হাতের গতির সময় প্রথমে মাথার উপর দিকে সোজা হইয়া আগাইয়া যাইবে। হাতের তালু এই সময় নীচের দিকে থাকিবে। তারপর যে কোন একটা হাত শরীরের পাশের দিকে অপেক্ষাকৃত নিকট দিয়া চালনা করিতে হইবে। যখন বাম হাত পাশের দিকে আসিবে তখন ডাইন হাত সম্মুখ দিকে ঘুরিয়া আসিবে। আবার ডাইন হাত যখন পাশের দিকে যাইবে, তখন বাম হাত সম্মুখ দিকে আগাইয়া যাইবে। হাত যথাসম্ভব সোজা রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। হাত পাশের দিকে যাইবার সময় হাতের অঙ্গুলিগুলিকে মোচড়াইয়া পাশের দিকে ফিরাইতে হইবে।

দুই হাতের সাহায্যে—চিৎ-সাঁতার

উল্টা হামা টানিয়া চিৎ-সাঁতারের মত চিৎ-হইয়া ভাসিতে হয় এবং সাধারণ হামাটানা সাঁতারের মত পা দিয়া জলে ধাক্কা দিতে হয়। হাতের গতি পর পর করিয়া একই সময়ে দুই হাত সঞ্চালন

করিতে হইবে। হাত সোজা করিয়া মাথার দিকে যথাসম্ভব ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাহার পর, হাত মাথার উপর হইতে আনিয়া পায়ের দিকে জোরে ধাক্কা দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই সময় বুক জলে ডুবিয়া থাকিবে।

পাক মারিয়া সাঁতার

এই কৌশলে শরীরকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সাঁতার কাটিতে হয়। প্রথমে হামা টানা সাঁতারের মত বুকের উপরে আরম্ভ করিতে হয়। পা দিয়া ক্রমাগত জলে ধাক্কা মারিতে হয়। হাত সাধারণ ভাবে ঘুরাইতে হয়। বাম হাতে করিয়া বামদিকে ধাক্কা দিয়া শরীরকে ডাইন দিকে ঘুরাইতে হইবে। এই ভাবে শরীরকে পর পর একই দিকেই প্যাঁচ মারিয়া Cork Screwএর মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। শরীর ঘুরাইবার জন্য দুই হাত ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করিতে হইবে। একই দিক ঘুরিয়া কতক দূর অগ্রসর হইলে পর, বিপরীত দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বের মত অগ্রসর হইতে হইবে।

দাঁড়-টানার ভঙ্গীতে সাঁতার

এই কৌশলে সাঁতার কাটিতে গেলে দাঁড় টানার মত হাতের ভঙ্গী করিয়া কেবল হাতের সাহায্যেই সাঁতার কাটিতে হয়। প্রথমে শরীর সোজা করিয়া চিৎ হইয়া ভাসিতে হয়। ভাসিবার সময় শরীর শক্ত না করিয়া যথাসম্ভব শিথিল করিতে হইবে। হাত শরীরের পাশে থাকিবে। হাতের তালু ঠিক বাটির আকারের মত করিতে হইবে। হাতের গতি যথাক্রমে বাহিরের দিকে, নীচের দিকে ও সম্মুখের দিকে যাইবে। হাতের কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্ত অংশ, যত কম নড়ে ততই ভাল। কব্জি শরীর হইতে বেশী দূরে রহিবে না। এক হাত দিয়া এই প্রণালীতে সন্তরণ করিলে শরীর এক স্থানেই বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। এই প্রণালীতে সাঁতার কাটিবার সময় হাতের তালুটাই মাছের লেজের মত কেবল নড়িতে থাকে। সাঁতার কাটিবার সময় দিক্ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এই প্রণালী অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক। বলিতে কি, ইহা ব্যতীত দিক পরিবর্ত্তন করা এক প্রকার অসম্ভব।

প্রতিযোগিতায় সাঁতার

প্রতিযোগিতার সময় সাঁতার কাটিতে হইলে দ্রুত সাঁতার কাটার অভ্যাস বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণতঃ আজকাল প্রতিযোগিতার সময় নিম্ন-লিখিত তিন প্রকার কৌশলে সাঁতার কাটা হয়। যথা—

(ক) বুকে ভর দিয়া হামাটানার মত সাঁতার
(খ) উল্টা হামা টানিয়া চিৎ-সাঁতার।
(গ) বুকে ভর দিয়া প্রতিযোগিতায় সাঁতার।

বলিষ্ঠ ফুস্ ফুস এবং দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করিবার শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান না থাকিলে দ্রুত

এবং দীর্ঘ সাঁতার দেওয়া অসম্ভব। দীর্ঘ সাঁতার দিবার জন্ত দ্রুত সাঁতার অপেক্ষা কৌশল শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ কৌশলের সাহায্যে দীর্ঘ সাঁতার দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠে।

প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতায় নামিবার জন্ত সুবিধাজনক ভাবে "ষ্টার্ট" লওয়া বা আরম্ভ করিবার জন্ত প্রস্তুত অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ ইহার উপর হার-জিত অনেকটা নির্ভর করে। প্রতিযোগিতার সময় ষ্টার্ট লইবার স্থানে একেবারে শেষ প্রান্তে পায়ের অঙ্গুলি ও হাঁটু বাঁকাইয়া দাঁড়াইতে হয়। তাহার পর ষ্টার্ট লইবার সময়, কটিদেশ হইতে সমুখ ঝুঁকিয়া হাত পিছন দিকে লইয়া যাইতে হইবে। এইবার আরম্ভ করিবার সঙ্কেত পাইবামাত্র, হাত সমুখে আনিবার পর এবং শরীর সোজা রাখিয়া জলে ঝাঁপাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে ঝাঁপাইবার সময় জলের দুই তিন ফুটের বেশী নিয়ে যেন শরীর ডুবিয়া না যায়।
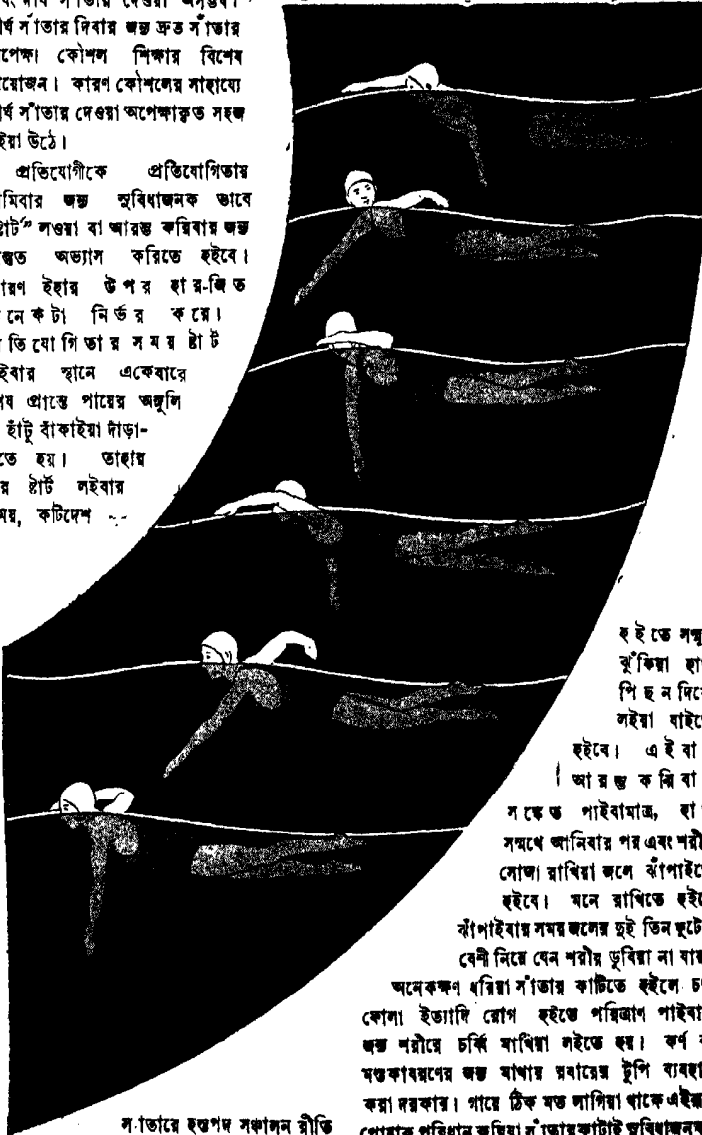
সাঁতারে হস্তপদ সঞ্চালন রীতি

অনেকক্ষণ ধরিয়া সাঁতার কাটিতে হইলে চক্ষু ফোলা ইত্যাদি রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত শরীরে চর্বি মাখিয়া লইতে হয়। কর্ণ বা মস্তকাবরণের জন্ত মাথায় রবারের টুপি ব্যবহার করা দরকার। গায়ে ঠিক মত লাগিয়া থাকে এইরূপ পোষাক পরিধান করিয়া সাঁতার কাটাই সুবিধাজনক।

বন্ধুবর্গ বা দর্শকবৃন্দ যদি সাঁতার কাটার সঙ্গে সঙ্গে গীতবাদ্য সহকারে নৌকা করিয়া সন্তরণকারীর অনুগমন করে তবে তাহার সাঁতার কাটার পরিশ্রম অনেকাংশে লাঘব হয়।

স্ত্রীলোকের সাঁতার

সাঁতারকে একপ্রকার আর্ট বা কলাবিদ্যা বলা যাইতে পারে এবং কি পুরুষ কি মহিলা সকলেই এই সুন্দর ও বিনা বা অল্প ব্যয়সাপেক্ষ ব্যায়াম করিতে পারেন। স্ত্রী, পুরুষ ভেদে সাঁতার শিক্ষার প্রণালীর কোন বিভিন্নতা নাই। এই স্থলে বালিকা বা মহিলা সন্তরণ-কারিণীদের জন্য কয়েকটী সাধারণ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইল।

সাঁতার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই শরীরের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য সমভাবেই সংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়। অধিক্ষণ সাঁতার কাটিলে মুখের রং একটু পরিবর্ত্তিত হয়। সন্তরণের পরই কোন ক্রিম মুখে ব্যবহার করিলে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়।

জল হইতে উঠিয়া আসার পর গায়ে রৌদ্র লাগাইলে রং ময়লা ও কর্কশ হইয়া যায়। সুতরাং জল হইতে উঠিয়া আসার পর গায়ের ও মাথার জল উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর কোন ক্রিম ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা শরীরের লাবণ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।
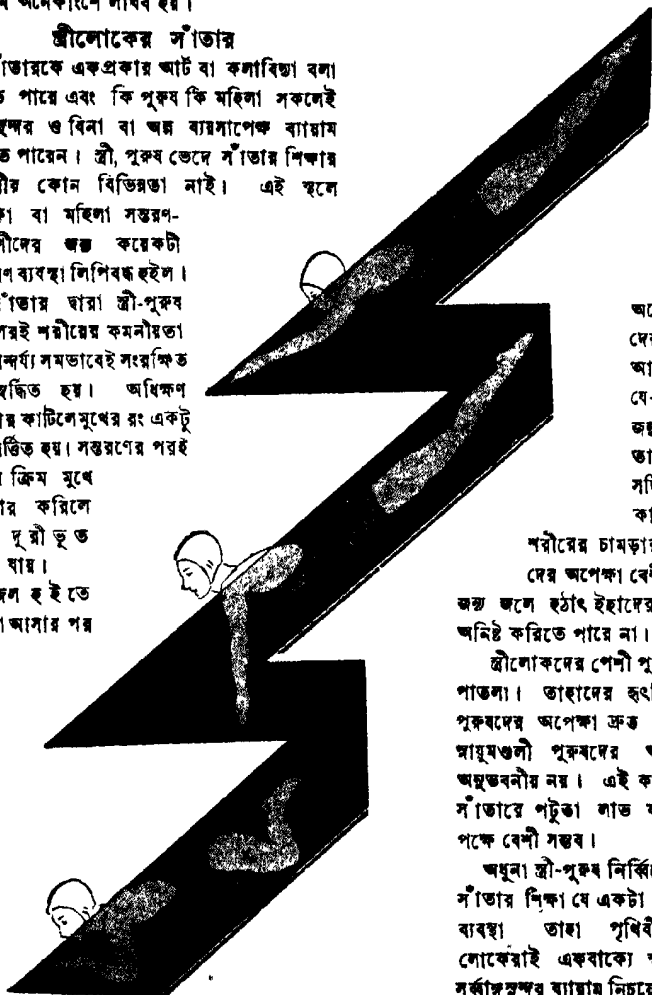
পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোক-দের সাঁতার কাটা আরও সুবিধা এই যে—জলে থাকার জন্য পুরুষদের মত তাহাদের শীঘ্র সর্দ্দি লাগে না। কারণ তাহাদের শরীরের চামড়ার নীচে পুরুষ-দের অপেক্ষা বেশী চর্ব্বি থাকার জন্য জলে হঠাৎ ইহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

স্ত্রীলোকদের পেশী পুরুষদের অপেক্ষা পাতলা। তাহাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পুরুষদের অপেক্ষা দ্রুত এবং তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী পুরুষদের অপেক্ষা সহজ অনুভবনীয় নয়। এই কারণ বশতঃ দূর সাঁতারে পটুতা লাভ করা তাহাদের পক্ষে বেশী সম্ভব।

অধুনা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সাঁতার শিক্ষা যে একটা অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা তাহা পৃথিবীর সবদেশের লোকেরাই একবাক্যে স্বীকার করেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যায়াম নিচয়ের মধ্যে সাঁতার কাটা অন্যতম প্রকৃষ্ট ব্যায়াম এবং ইহার দ্বারা সন্তরণ কারীর আত্মরক্ষা ও মজ্জমান্ ব্যক্তির জীবন রক্ষা এই উভয় ব্যক্তিরই যুগপৎ উপকার সাধিত হয়।

ডুব সাঁতার

এই কৌশল ঠিক জন্তুদের মত সাঁতার কাটার অনুরূপ। তবে, জলের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া এই কৌশল অবলম্বনে সাঁতার কাটিতে হয়।

এই কৌশল অভ্যাসের ফলে, হাত ও পা স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করিবে। জলের ভিতর ডুবিয়া জন্তুদের চলার ভঙ্গীর মত সময়ানুযায়ী পর পর হাত ও পা নাড়াইতে হইবে। হাতের তালু কিন্তু সর্ব্বদাই নীচের দিকে থাকিবে এবং হাতের তালুর ভঙ্গী ঠিক জন্তুর থাবার মত হইবে। হাতের তালু বা পাতার দ্বারা সম্মুখ হইতে পিছন দিকে ও নীচের দিকে ধাক্কা দিতে হইবে। এক হাত যখন পিছন দিকে আসিবে অপর হাত তখন সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হাতের কৌশলের মতই এক পা যখন হাঁটু বাঁকাইয়া নীচের দিকে ও সম্মুখে আগাইবে। অপর পা তখন হাঁটুর সোজা করিয়া পিছন দিকে ধাক্কা দিতে হইবে।

এই কৌশল অবলম্বনে জলের ভিতর নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সাঁতার কাটিতে হয়। এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্য আবশ্যক মত সময় সময় জলের উপরে উঠিতে হয়।

নদীতে সাঁতার—অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতে

পূর্ব্ববর্ণিত যে কোন কৌশল অবলম্বনে অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতে সাঁতার কাটা যায়। প্রতিকূল চিৎ-সাঁতার কৌশল অবলম্বনে সাঁতার কাটা সহজ নয়। প্রতিকূল স্রোতে সাঁতার কাটা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অনুকূল স্রোতে সাঁতার কাটিবার সময় পরিশ্রম এক প্রকার হয় না বলিলেই চলে। কেবল দিক্ ঠিক্ রাখিয়া শরীরকে ভাসাইয়া রাখিতে পারিলেই সহজেই সাঁতার দিয়া অগ্রসর হওয়া যায়। ইহাতে পরিশ্রম একরূপ হয় না বলিলেই চলে।

সমুদ্র-তরঙ্গে সাঁতার

সমুদ্র-তরঙ্গে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত সহজ। কিন্তু তরঙ্গ-প্রবাহের সময় অন্যমনস্কতার সহিত সাঁতার কাটিলে বিপদের আর সীমা থাকে না। তরঙ্গ-মালা সন্তরণকারীকে পাক দিয়া আয়ত্বের বাহিরে কোথায় যে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহার ঠিকানা বা সন্ধান করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

পূর্ব্ব বর্ণিত যে কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া সমুদ্রে সাঁতার কাটা যায়। তবে, চিৎ-সাঁতার দেওয়া নিরাপদ নহে। তরঙ্গ অতিক্রম করিবার সময় প্রত্যেক বার তরঙ্গের উপর মাথা তুলিয়া কিংবা অনতি-গভীর স্থান হইলে, তরঙ্গ অতিক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১।২ সেকেণ্ড) ভূমি স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকা ভাল। তরঙ্গ স্রোতে টানিয়া লইয়া যায় বলিয়া সমুদ্রে অল্প সময়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

সমুদ্র, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং, সন্তরণকারীকে খুব সতর্কতার সহিত সাঁতার কাটিতে হইবে। সময় সময় সমুদ্র পৃষ্ঠের এক এক স্থানে বেশ সমতল বলিয়া মনে হয়। অনভিজ্ঞ সন্তরণকারী সমস্ত স্থান নিরাপদ ভাবিয়া তথায় সাঁতার কাটিতে যায়। কিন্তু ইহার নীচে নানারূপ প্রতিকূল জল-প্রবাহ থাকায় ইহা একেবারে নিরাপদ নহে।

সমুদ্র জলে চিৎ-ভাসা খুব আরামদায়ক ও সহজসাধ্য। কারণ, চিৎ হইয়া ভাসিবার সময় পদদ্বয়ের তলদেশ দিয়া তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া পদদ্বয়কে জলের উপরে উঠাইয়া রাখে।

সমুদ্রে সাঁতার কাটা শিক্ষা করিতে হইলে 'Lifebuoy' অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইহা ব্যবহার করিবার সময় ইহার সম্মুখে ধরিয়া এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া নিজের ভারটা ইহার উপর সম্মুখ দিকে আগাইয়া দিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া যাইতে হয়। আবার বুকের নীচে রাখিয়া অর্থাৎ ইহার উপরে শুইয়াও সহজে সাঁতার কাটা যায়।

চঞ্চল সমুদ্রে সময় সময় 'Lifebuoy'কে নিজ কায়দার মধ্যে রাখিতে পারা যায় না। এইরূপ অবস্থায় খুব জোরের সহিত বুকে ভর দিয়া ও হাত নীচের দিকে টানিয়া সাঁতার কাটিলে 'Lifebuoy' কে কতকটা নিজ আয়ত্বাধীনে রাখিতে পারা যায়।

রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস

রঞ্জনশিল্পে বৈজ্ঞানিক

২৫২১ পৃষ্ঠার পর

যাঁহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আধুনিক রঞ্জনশিল্প বর্ত্তমানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পার্কিনের নামই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে যাইয়া ঘটনাক্রমে প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ইংলণ্ডে হফ্‌মেন (Hoffmann) মেলডলা (Meldola), গ্রিন (Green), নেক্ট (Knechet) প্রমুখ রাসায়নিকগণ এবং জার্ম্মাণিতে লিবারমেন (Liebermann), নিট্‌জকি (Nietzki), বেয়ার (Bayer), বটিগার (Bottiger) স্নলট্‌জ্ (Schultz), গ্রিস (Griess), উইট (Witt), কেরো (Caro), কনিগ (Konig), লেভিনষ্টেইন (Levinstein), এনসাজ (Anochutz), ওলার (Oehler), কিরকফ (Kirchoff), লিমপেক (Limpach), গ্রাবা (Graebe), গোল্ড স্মিড্‌ট (Goldschmidt), ফিসার (Fischer), নেথেনসন (Nathenson), লাউথ (Lauth), হিউমেন (Heumann), সেণ্ডমায়ার (Sandmeyer), স্রবা (Schraube), প্রমুখ বহু রাসায়নিকের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক রঞ্জন-শিল্পে জার্ম্মেণির স্থান

যদিও ইংলণ্ডেই প্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত হয়, জার্ম্মেণগণ এ বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম মনোযোগ দেন, এবং বিগত ৬০।৭০ বৎসরের চেষ্টায় বর্ত্তমানে তাহারা রঞ্জন-শিল্পে এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, সুদূর ভবিষ্যতেও যে অন্য কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাদের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিবে, সেরূপ মনে হয় না। জার্ম্মাণ রাসায়নিকগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, হয়ত কৃত্রিম রং প্রস্তুতের শিল্পটা অনাদরে এবং উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে মাতৃক্রোড়েই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত এবং রসায়ন-ইতিহাসের কোনও কোণে উল্লিখিত থাকিয়া, "মধ্যযুগে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতের চেষ্টা"র ন্যায়, "প্রকৃতিকে জয়

করিবার পার্কিনের নিষ্ফল প্রয়াস" নামে. ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকগণের পরিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইত।

ইউরোপে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, জার্ম্মাণ রাসায়নিকগণ প্রতিদিন একটি নূতন রং প্রস্তুত না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। প্রবাদের মূলে অনেকটা সত্য নিহিত আছে। বিগত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৯০ হাজার কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবশ্য সকলগুলিই যে পরীক্ষায় খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষণে সমর্থ হইবে—এরূপ আশা করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে দুই সহস্রাধিক কৃত্রিম রং রঞ্জনশিল্পে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য ইহাদের অধিকাংশই জার্ম্মেণিতে প্রস্তুত। জার্ম্মাণ শিল্পীগণ কামধেনুর মত যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কৃত্রিম রং অনায়াসে প্রস্তুত করিতেছেন।

রঞ্জনশিল্পে যন্ত্রাদির প্রচলন

পূর্ব্বে শিল্পীগণ হাতে হাতে রঞ্জনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন-কার্য্যের জন্ত নানা প্রকার কল ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ে রঞ্জন সংশ্লিষ্ট প্রায় সমস্ত কার্য্যই যন্ত্রাদি সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত যন্ত্রাদির প্রচলনই আধুনিক পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের দ্রুত উন্নতির একটি প্রধান কারণ। যন্ত্রাদির প্রচলনে শিল্পীগণের সুবিধা হইয়াছে। প্রথমতঃ, উহাতে সময় ও ব্যয় সংক্ষেপ হয়, অথচ একটি কারখানায় বহুলোকের দরকার হয় না। দ্বিতীয়তঃ, রঞ্জনকার্য্যও অধিকতর সুচারু রূপে সাধিত হয়। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে কোনও রঞ্জনব্যবসায় চালাইতে হইলে হাতে রঞ্জন করিয়া প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে আধুনিক রঞ্জনপ্রণালীসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের ইতিহাসের অভাব

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে সামান্ত উল্লেখ ব্যতিরেকে রঞ্জনশিল্পের জন্মভূমি ভারতবর্ষে—উক্ত শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে অত্যল্পই বলা হইয়াছে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রঞ্জনশিল্প বা দেশীয় রংসমূহ দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থাদিতে কিছুই বিবরণ পাওয়া যায় না। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নানাদেশীয় বৈদেশিক পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তাদি হইতে মধ্যে মধ্যে দেশীয় রঞ্জনশিল্প এবং তৎকালে প্রচলিত রঞ্জন প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্তরূপ বিবরণী হইতে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে নানা প্রকার দেশীয় রংএর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের অবস্থা

এদেশে পূর্ব্বে রঞ্জনবিদ্যাটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বংশানুক্রমে "রংরাজ" নামক এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বস্ত্রাদি রঞ্জন করাই "রংরাজ"দের ব্যবসায় ছিল। "রংরাজ" নামে আর এক শ্রেণীর লোক নৌকা, পালকি প্রভৃতি কার্য্যের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি রঞ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। যাহারা নীল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিত, তাহারা ""নীলাগার" নামে পরিচিত ছিল।

এই শ্রেণীসমূহের লোক ছাড়া অন্য কেহ রংএর কাজ করা হেয় এবং অপমানসূচক মনে করিত। উহারাও নিজেদের অধীত বিদ্যা সম্বন্ধে অন্ত কাহারও নিকট প্রাণান্তেও কিছু ব্যক্ত করিত না। শিল্প ও ব্যবসায়ে সাম্প্রদায়িকতা চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে—ঢাকা নগরেই যাহারা মহিষশৃঙ্গের ও হস্তিদন্তের শিল্পে ব্যাপৃত, তাহারা বংশানুক্রমে উক্ত কাজেই লিপ্ত আছে এবং 'খান্দকার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে যাহারা হুকার নল প্রস্তুতের ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহারা "নইচাবন্দ", এবং যাহারা শাল 'রিপু' এবং পরিষ্কার করে তাহারা বংশানুক্রমে "শালকর" নামে পরিচিত। অথচ "খান্দেকার," "নইচাবন্দ" বা "শালকর" নামে কোনও জাতি নাই। উহারা ব্যবসায়িক সম্প্রদায় মাত্র। ঐরূপ প্রকৃত পক্ষে রংরাজ নামে কোনও
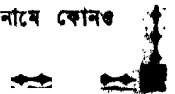
জাতি ছিল না। রঞ্জনশিল্পটা অশিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় উহাদের নিকট হইতে কোনও রূপ বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যাইত না।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের অবনতির প্রথম কারণ

আজকাল পাশ্চাত্যদেশসমূহে যেরূপ এক একটি রঞ্জন শালায় শত শত লোক নিযুক্ত থাকিয়া কল ও যন্ত্রাদি সাহায্যে রঞ্জন কার্য্য সম্পাদিত করিতেছে, সেরূপ ভাবে পরিচালিত শিল্প এ দেশে কখনও ছিল না। প্রত্যেক নগরে ও বড় বড় গ্রামে "রঙ্গ-রাজেরা" স্থানীয় ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি রঞ্জন করিত। প্রয়োজনাতিরিক্ত রঞ্জিত বস্ত্রাদি স্থানান্তরে প্রেরিত বা পাইকারগণ কর্তৃক রপ্তানি হইত। এই সমস্ত কারণে দেশীয় রঞ্জন প্রণালী সমূহের কোনও উন্নতি হয় নাই। কিছুদিন বা কয়েক কাল পূর্ব্বেও যে প্রণালীতে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত বর্ত্তমান সময়েও অনেকটা সেই সেই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, কৃত্রিম রংসমূহের আবিষ্কারের পর ক্রমে তাহাও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের ধ্বংস

তাহার কারণ দেশীয় রংসমূহ অপেক্ষা কৃত্রিম রংসমূহ সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং তাহাদের মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম। দেশীয় রংসমূহের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও পুস্তকাদি নাই। পক্ষান্তরে পুস্তকাদি সাহায্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কৃত্রিম রংসমূহের সাহায্যে রঞ্জনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। অনেক সময় কৃত্রিম রংসমূহের টিন বা বাক্সের সঙ্গেই উহা দ্বারা কিরূপে বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে হয় তাহার বিশদ উপদেশ দেওয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে প্রয়োজন বোধ করিলে রংপ্রস্তুতকারকগণ ক্রেতৃগণের কারখানায় বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া রঞ্জন-প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য বণিকগণ দেশীয় রঞ্জন- ধ্বংসকল্পে যত প্রকারে হয় সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা কৃত্রিম নীল (Artificial Indigo) এবং এলিজেরিন (Alizarin) প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেশীয় রংসমূহের অনুকরণে কৃত্রিম রং প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। এমন কি, অনেক স্থলে নামটি পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে গাভীকে আম্রপত্র খাওয়াইয়া পরে ঐ গাভীর মূত্র হইতে এক প্রকার পীত বর্ণের রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা "পিউরি" নামে প্রচলিত। সম্প্রতি উক্ত "পিউরির" অনুকরণে "Peori dye" নাম এক প্রকার কৃত্রিম রং বাজারে প্রচলিত হইয়াছে।

নীল এবং মঞ্জিষ্ঠা (Alizarin) ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক রংগুলা কৃত্রিম রংসমূহ অপেক্ষা স্থায়িত্ব অনেক নিকৃষ্ট এবং ভাল বর্ণের দেশীয় রংগুলি অত্যন্ত অস্থায়ী। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক (Dr. Watson) বিবয়ের অবস্থান কালে কয়েকটি আদর্শ কৃত্রিম রং এবং প্রচলিত দেশীয় রংসমূহের স্থায়িত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশীয় রংগুলি স্থায়িত্ব হিসাবে কৃত্রিম রংসমূহ অপেক্ষা নিম্নস্তরের।

কৃত্রিম রংএর প্রচলন হেতু দেশীয় রংসমূহের অধঃপতন

কৃত্রিম রং প্রচলনে দেশীয় রংসমূহের কি ভীষণ অবনতি হইয়াছে, দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

১। নীল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক রঞ্জন উপকরণ। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নীলের চাষ মোটেই হয় না। পূর্ব্বে ঢাকা জেলায় ফুলবেরিয়া, লক্ষ্মীপুর, আটিগাম, মনোহরপুর প্রভৃতি বহুস্থানে নীল কুঠি ছিল। ঢাকা জেলার ন্যায় বাঙ্গলার অন্যান্য জেলায়ও অনেক নীলের কুঠি ছিল। এখন তাহার কিছুই নাই। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে ৪,৭৪,৫২,১৫৩ টাকার এবং ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে ৫,৩৫,৪৫,১১২ টাকা মূল্যের নীল ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। কৃত্রিম নীল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নীলের ব্যবসায়ের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৫,১৪,১৫৪ টাকা মূল্যের নীল ভারতবর্ষ হইতে অন্যদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

দেশীয় নীলের ব্যবসায়ের উন্নতি

দশ-বার বৎসরের মধ্যে নীলের রপ্তানি ষোড়শাংশের একাংশে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে বোধ হয় নীলের চাষ এক প্রকার উঠিয়া যাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ১৯০৫-৬ সনে ১,১২,২৪৩ টাকার কৃত্রিম নীল জার্ম্মাণি হইতে এদেশে আমদানি হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় ৩৩টি নীলকুঠি ছিল ও একলক্ষ বিঘা জমিতে নিয়মিত নীলের চাষ হইত এবং প্রতি বৎসর অন্ততঃ ২৫০০ মণ নীল উৎপন্ন হইত।

কুসুমফুলের ব্যবসায়ের অবনতি

নীলের ন্যায় পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে কুসুমফুলও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইত। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬,৫০,৮২৭ টাকা মূল্যের কুসুমফুল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশ হইতে ফুলের ব্যবসায় এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর হংকং ও জাপানে অতি অল্প পরিমাণ ফুল প্রেরিত হইয়া থাকে মাত্র। পূর্ব্বে ঢাকা জেলা কুসুমফুলের চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বুড়িগঙ্গা এবং ধলেশ্বরী নদীর উভয় কূলস্থিত ভূখণ্ডে প্রচুর পরিমাণ কুসুমফুল উৎপন্ন হইত। বিলাসপুর পাটের গোটা এবং কুসুমফুলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ২,৯০,৬৫৬॥ ১০ মূল্যের ৮৪৪৮ মণ কুসুমফুল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল,—উক্ত পরিমাণের ⅚ অংশ ঢাকা জেলায় উৎপন্ন। ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বেও ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় কূলে অসংখ্য কুসুমফুলের ক্ষেত্র দৃষ্ট হইত। বর্ত্তমান সময়ে সে নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য আর দেখা যায় না।

পরিবর্ত্তনশীল জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে রঞ্জন-শিল্পের জন্মস্থান প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ রংএর পরিবর্ত্তে বহু টাকা মূল্যের কৃত্রিম রং অধুনা প্রতি বৎসর আমদানি হইতেছে।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের রক্ষাকল্পে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা

ধ্বংসোন্মুখ দেশীয় রঞ্জনশিল্পের রক্ষাকল্পে গভর্ণমেণ্টও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশ প্রচলিত দেশীয় রং ও রঞ্জনপ্রণালীসমূহের বিবরণ সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় রঞ্জন উপকরণ, রঞ্জনশিল্প, রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে পুস্তকাদির অভাব নাই।

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভাবনা

দেশীয় রঞ্জনশিল্পের পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নোক্ত দুই প্রকার পন্থার একটি অবলম্বন করিতে হইবে।

(১) দেশীয় রং দ্বারা রঞ্জনপ্রণালীসমূহের উন্নতি সাধিত করিয়া উহাদিগকে প্রচলিত করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশীয় রংগুলি প্রাকৃতিক রংসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রাকৃতিক রংসমূহের মধ্যে এ যাবৎ নীল এবং এলিজেরিন মাত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের রাসায়নিক গঠন, প্রকৃতি এবং উহাদের দ্বারা প্রকৃত রঞ্জন-প্রণালীও নির্দ্ধারিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রংএর সমবেত তালিকায় স্থায়িত্ব হিসাবে নীল ও এলিজেরিন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, যদি অন্যান্য দেশীয় রংগুলির রাসায়নিক গঠনপ্রকৃতি নির্দ্ধারিত এবং তাহাদের দ্বারা প্রকৃত রঞ্জনপ্রণালী আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহারাও স্থায়িত্ব হিসাবে কৃত্রিম রংসমূহের উচ্চে স্থান পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত দেশীয় রংগুলির অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় উদ্ভিজ্জ রংসমূহ সংগ্রহ করিয়া জার্ম্মেণিতে কসটেনেষকি (Kostenscki) ও ইংলণ্ডে এ, জি, পারকিন (A. G. Perkin) প্রমুখ রাসায়নিক প্রকৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন।

(২) রঞ্জন কার্য্যের জন্য কৃত্রিম রং ব্যবহার করিতে হইবে। এদেশে কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুতের কোনও কারখানা নাই। কাজেই য়ুরোপ হইতে কৃত্রিম রং আনাইয়া ব্যবসায়ে চালাইতে হইবে। দেশে একটি রঞ্জনশালা স্থাপন পূর্ব্বক কৃত্রিম রং দ্বারা সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিয়া ব্যবসায় চালাইলে, কিরূপ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা, সেকথা পরে বলিব।

ডাকঘরের ইতিহাস

আজকাল সহরের রাস্তায় রাস্তায় এবং গ্রামে গ্রামে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে কোন অংশে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে নিকটবর্ত্তী ডাকঘর হইতে একখানা পোষ্টকার্ড কিংবা খাম কিনিয়া সংবাদ ও ঠিকানা লিখিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই তাহা যথা সময়ে ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে, ইহা আজ পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর সামান্য চাষাও জানে। কত অসংখ্য নরনারীই না প্রত্যহ প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে দেশ দেশান্তরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত প্রত্যেকখানা চিঠি তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতেছে! ইহার পশ্চাতে কত বিরাট আয়োজন, কত পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থার আবশ্যক তাহা আমরা আজ আর ভাবিয়া দেখি না। এই বিরাট বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান একদিনে গড়িয়া উঠে নাই, ইহার পশ্চাতে অনেকখানি চিন্তা ও চেষ্টা এবং একটা ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা রহিয়াছে। সেই ইতিহাসই তোমাদের কাছে এখানে আলোচনা করিব।

ইউরোপে ডাক বিভাগ

তোমরা তোমাদের বাবা ও মাকে কিংবা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে একখানা পোষ্টকার্ড বা খামে চিঠি লিখিয়া মনে কর যে উহা নিশ্চিতই যাহাদের নিকট লিখিয়াছ তাহাদের নিকট পৌঁছিবে। 'শিশু-ভারতী'র দরকার অমনি ডাকবাক্সে চিঠি দিলে, পিয়ন তোমার বাড়ী আসিয়া বই পৌঁছাইয়া দিল, কিন্তু পূর্ব্বে এমন সুব্যবস্থা ত ছিল না। কেমন করিয়া এমন একটা সুব্যবস্থা হইল সে কথাই তোমাদের বলিতেছি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী ও অষ্ট্রিয়া দেশেই ডাকবিভাগের প্রবর্ত্তন হয়। ডাকটিকিট, মনিঅর্ডার, রেজিষ্ট্রেশন, পার্শেল ইত্যাদির প্রচলন ফরাসী দেশেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ইংল্যাণ্ডে ডাকবিভাগ ভালরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্ব্বে ইহা পৃথিবীময় বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক ডাক-ব্যবস্থার সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে য়ুরোপ ও এসিয়ার বিভিন্ন দেশ মধ্যে লোক মারফৎ সংবাদ আদান প্রদান চলিত। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের অধিকতর সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের ডাক-বিভাগের উন্নতির ইতিহাস আমাদের সর্ব্বপ্রথম জানা আবশ্যক।

প্রথম জনের রাজত্বকালে (১১৯৯-১২১৬ খৃঃ) সরকারী সংবাদ প্রেরণ সম্পর্কীয় বিবরণ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সে বিবরণ অতি সামান্য

সরকারী-দপ্তরে সংবাদ প্রেরণের খরচের উল্লেখ যায়। এইরূপ খরচের উল্লেখ পরবর্তী রাজাদের সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে ডাক প্রেরণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় **মহম্মদ তোগলকের** রাজত্বকালীন (১৩২৫-১৩৫১ খৃঃ) সরকারী কাগজপত্রে। এই বিবরণ শুধু খরচ সম্পর্কীয় নহে; ইহাতে রাজকীয় সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থার কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, তোগলকের পূর্ববর্তী রাজাদের সময় হইতেই ভারতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এই বিবরণের জন্য আমরা বিদেশী পর্যটক ইবন-বাতুতার নিকট ঋণী। কিন্তু ইংলণ্ডে সেই সময় হইতে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থার যেমন ক্রমোন্নতি হইতে থাকে ভারতবর্ষে সেইরূপ হয় নাই। ক্রমাগত রাজশক্তির পরিবর্তনই বোধ হয় ইহার কারণ। **শের খাঁ বা আকবরের** রাজত্বকালে তাঁহাদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের সর্বত্র ডাক প্রেরণের যেরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা সম-সাময়িক অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না। ইহা সত্ত্বেও ইংরেজগণ যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন তাঁহারা এদেশে ডাক চলাচলের কোন সুবন্দোবস্ত দেখিতে পান নাই। এদিকে ইংলণ্ডে যদিও জনের রাজত্বকাল হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পর্যন্ত ডাকব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নাই, তথাপি ইহার পরিবর্তনও হয় নাই। সেই সময় ডাকবাহকগণ সাধারণতঃ অশ্বারোহণে যাতায়াত করিত এবং তাহাদিগকে ডাকবহনের জন্য নিজেদের অশ্ব সংগ্রহ করিতে হইত। ক্রমে ঘোড়া বদলি করিবার স্থান বা ঘাঁটি নির্দিষ্ট হইলে সেই সব স্থানে ডাকের জন্য ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যাইত। প্রথমতঃ এই সব ঘাঁটি বা আড্ডায় যাহারা ডাকের জন্য ঘোড়া ভাড়া দিত তাহাদের সহিত গভর্নমেণ্টের কোনরূপ সংস্রব ছিল না। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল ইহাদের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব না থাকিলে নানারূপ অসুবিধার কারণ ঘটে। তখন ইহাদিগকে আস্তে আস্তে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। সেই সময়ে দেশে ঘোড়া ভিন্ন চলাচলের অন্য উপায় না থাকায় লোকেরা এই সব আড্ডা হইতে ঘোড়া ভাড়া করিয়া লইয়া যাইত। ফলে অনেক সময় ঘোড়ার অভাবে

সেকালের ডাকের গাড়ী ডাকঘর ইংলণ্ড

সরকারী ডাক পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিত। এতদ্ভিন্ন পথে চলাচল সেই সময়ে বিপদসঙ্কুল ছিল। সেইজন্যও এই সব আড্ডার উপর সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এখানে "পোষ্ট" এবং "পোষ্টমাষ্টার" এই দুইটি শব্দের ইতিহাস উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাদের কোনটিই বর্ত্তমানে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি সেই অর্থে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হইত না। পোষ্ট অর্থে ঘোড়া বদলাইবার ঘাঁটি বা আড্ডা; এবং পোষ্টমাষ্টার অর্থে সেই সব আড্ডার মালিকদের বুঝাইত। পরে এই সব আড্ডার ঘোড়া প্রধানতঃ সরকারী ডাক বহন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, এই দুই শব্দ বর্ত্তমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালেও (১২৮৪ - ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে) ঘোড়া ভাড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ইংল্যাণ্ডের রাজা **চতুর্থ এডওয়ার্ড** বিশ মাইল অন্তর অন্তর ঘোড়া পরিবর্তনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ২০০ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ঘাঁটির মালিকদিগকে সরকারী ডাকের জন্য ঘোড়া না রাখিয়া অপর লোকদিগকে ঘোড়া ভাড়া দিতে বারণ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর মাইল পিছু ঘোড়ার ভাড়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে এই সব মালিক কতক পরিমাণে আয়ত্তাধীনে আসিলে ডাক নিবার জন্য ঘোড়া যোগাইবার ভার ইহাদিগের মধ্যে ইজারা করিয়া দেওয়া সুরু হয়।

ডাকঘরের নিয়ম

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক বেসরকারী চিঠির প্রেরকের নাম, ইজারাদারদিগের নিকট দিবার সময় একখানা রেজেষ্টারি বহিতে লিখিয়া রাখিবার নিয়ম প্রচলিত হয়। ইহা কতক পরিমাণে বর্ত্তমান রেজেষ্টারি প্রথার অনুরূপ ছিল। কিছুদিন পরে এই নিয়ম উঠিয়া যায়; কবে ও কি কারণে উহা উঠিয়া যায় তাহা ঠিক জানা যায় না। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের রাজা **জেমস্** উভয় দেশের রাজা হইলে এই দুই দেশের মধ্যে রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য রীতিমত ডাক চলাচলের বন্দোবস্তের আবশ্যক হয়। ইংল্যাণ্ডের ডাকবিভাগের উন্নতির ইহা একটি অন্যতম কারণ। সেই সময় হইতেই ঘোড়ার ঘাঁটিদারদিগকে বিশেষভাবে রাজার আদেশানুবর্ত্তী করা হয়। জেমসের রাজত্বকালে রাজকীয় সংবাদবাহীদের জন্য মাইল প্রতি ২॥০ পেনি করিয়া ঘোড়ার ভাড়া ধার্য্য করা হয়। ১৬০৩ সালে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী হয় যে সরকারী ডাক বহন করিবার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে দুটি ঘোড়া সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে এবং ডাক পাঠাইবার ১৫ মিনিট মধ্যে তাহা রওনা করিয়া দিতে হইবে। ডাকবহনকারী ঘোড়া শীতকালে ৫ মাইল ও গ্রীষ্মকালে ৭ মাইল করিয়া চলিবে এবং রাজার ভারপ্রাপ্ত অমাত্যের স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ দেখাইতে না পারিলে [illegible] সব [illegible] কাহাকেও ঘোড়া ভাড়া দেওয়া হইবে না। জেমস্‌এর রাজত্বকালে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের গতিবিধি যথাসাধ্য রোধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সব কড়াকড়ি নিয়ম করা হয়। ডাক বহন করিবার ঘোড়া ভাড়া দিবার একাধিপত্য ১৬০৩ হইতে ১৭৭৯ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লণ্ডন সহর হইতে ডাক পাঠাইবার চারিটি প্রধান রাস্তা ছিল। **স্কট্‌ল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, প্লাইমাউথ** ও **ডোভার** পর্য্যন্ত এই চারিটি রাস্তা বিস্তৃত ছিল। এই শেষোক্ত রাস্তায় য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ডাক যাইত বলিয়া ইহাই ক্রমে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই সব প্রধান রাস্তা হইতে দূরে অবস্থিত সহরে বা গ্রামে সরকারী ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল না। এই সব দূরবর্ত্তী স্থানে একাধিক সমৃদ্ধিশালী সহর বা বন্দর থাকিলে এই সব স্থানের অধিবাসিগণ সরকারী সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্র চলাচলের ব্যবস্থা নিজেরাই করিত এবং খরচ সঙ্কুলানের জন্য চিঠির উপর একটা মাশুল আদায় হইত।

তদানিন্তন ডাকবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর নাম মাষ্টার অব দি পোষ্টস্ ছিল। এই পদ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সৃষ্ট হয়। ইহার নাম ক্রমে পরিবর্ত্তিত

হইয়া 'পোষ্ট মাষ্টার জেনারল' হইয়াছে। ঐ সময় মাষ্টার অব্ দি পোষ্টের বেতন ছিল ৬৬ পাউণ্ড ১৩ শিলিং ৪ পেনি। ইহা ব্যতীত ইংল্যাণ্ড হইতে যে চিঠি বিদেশে যাইত এবং বিদেশ হইতে যে সব চিঠি ইংল্যাণ্ডে আসিত তাহার উপর চিঠি প্রতি তিনি ৮ পেনি করিয়া পাইতেন। **প্রথম জেম্‌স্**এর রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত (১৬০৩-২৫ খৃঃ) সরকারী ডাক বিভাগের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের চিঠিপত্র পাঠাইবার নিষেধ না থাকিলেও সরকারী চিঠি-ভিন্ন অন্য চিঠি পত্র পাঠান অসুবিধা-জনক ছিল। জনসাধারণের চিঠিপত্রের জন্য তখন মাশুল আদায় হইত বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় না। তাহার পরবর্ত্তী রাজা **প্রথম চার্লস্**এর রাজত্বকালে (১৬২৫-৪৬ খৃষ্টাব্দ) জনসাধারণ রাজকীয় ডাকবিভাগের সাহায্যে রীতিমত চিঠি পাঠাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই অধিকারের জন্য ইংরেজগণ সেই সময়কার 'মাষ্টার অব্ দি পোষ্টস্'—**উইদারিঙ্গস্** সাহেবের নিকট ঋণী। ইঁহার নাম ডাকবিভাগের সংস্কারক ও 'পেনি পোষ্টেজের' প্রবর্ত্তক **রাওল্যাণ্ড হিল** (Rowland Hill) সাহেবের নামের সঙ্গে, ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তিনি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে এই পদে নিযুক্ত হন। তখন এই বিভাগের কাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ডাকের যে চারিটি প্রধান রাস্তার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এক

রাওল্যাণ্ড হিল

ডোভারের রাস্তা ভিন্ন অপর তিনটি রাস্তায় রীতিমত ডাক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আয় না থাকায় অনেক আড্ডা উঠিয়া যায়। আয়রলাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড হইতে লণ্ডনে চিঠির উত্তর পাইতে দুই মাস লাগিত। এই সব কারণে গবর্ণমেণ্টের ডাক-বিভাগের ক্ষতি হইতে থাকে। ১৬৩২ অব্দে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৪০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়।

[স্যার রাউলাণ্ড হিলের ডাকঘরের সংস্কার সম্বন্ধে লিখিত পুস্তিকার পাণ্ডু-লিপির কিয়দংশের প্রতিলিপি—]

উইদারিঙ্গস্ সাহেব এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে থাকেন। আয় বাড়াইতে না পারিলে উন্নতির কোন আশা নাই দেখিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের চিঠির উপর যথারীতি মাশুল আদায়ের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ইহাতে একদিকে গবর্ণমেণ্টের যেমন আয় বাড়িবে অন্য দিকে জনসাধারণও স্বল্পব্যয়ে ডাকে চিঠি পাঠাইবার সুযোগ ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। মাশুল ধার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক চলাচলের ব্যবস্থারও উন্নতিবিধান করিতে হইবে, ইহাও তিনি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাও করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব মত ১৬৩৫ সাল হইতে নিম্নলিখিতরূপ ডাকমাশুল ধার্য্য হয়

১ মাইল হইতে ১৫ মাইল পর্যন্ত ২ পেনি
৪
তদূর্দ্ধে ৬
স্কটল্যাণ্ডে ৮ ,,
আয়রল্যাণ্ডে ৯ ,,

সব স্থানের দূরত্বই লণ্ডন সহর হইতে গণনা করা হইত। তখন পর্য্যন্ত টিকিটের প্রচলন না হওয়ায় চিঠির প্রাপকের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হইত। এই সময় হইতে সরকারী ডাকে সর্ব্বসাধারণের চিঠিপত্র পাঠাইবার পথ সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। এতদিন রাজকীয় চিঠি ভিন্ন অন্য চিঠি আড্ডাধারীদের সুবিধামত পাঠান হইত। কিন্তু রীতিমত মাশুল আদায় করিবার পর আর ঐরূপ করিবার উপায় রহিল না।

আয়রলাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাস্তা পুনঃ পূর্ব্ববৎ খোলা হইল। যেখানে গড়ে দিনে মাত্র ১৬।১৭ মাইল করিয়া ডাক চলিত, সেখানে দিন রাত্রি ডাক বহন করিবার ব্যবস্থা করিয়া ২৪ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পথ যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। ইহার ফলে দুই মাসের পরিবর্ত্তে আয়রলাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড হইতে ছয় দিনে লণ্ডন সহরে চিঠির জবাব পাইবার উপায় হইল। **উইদারিঙ্গস** সাহেব স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরাতে জাহাজ যোগে ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থাও করিলেন। ইহাকে **'প্যাকেট পোষ্ট'** বলা হইত। **উইদারিঙ্গস** সাহেবের কার্য্যকালে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আর একটা বিশেষ জরুরী আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন ডাকবিভাগে যুগান্তর আনয়ন করে। এতদিন পর্য্যন্ত যে কেহ ডাক প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতে পারিত। কিন্তু এই নূতন আইন দ্বারা ডাক বহন করিবার অধিকার সরকারের একচেটিয়া করা হয় এবং তাহাই আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ইহার পর ক্রমে অন্যান্য দেশেও এই নীতি অনুসৃত হয়। টেলিগ্রাফ ও প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে ছিল না; ইহার কাজও

প্রথম দিকে বেসরকারী ভাবে চলিত। কিন্তু কালক্রমে ইহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন। প্রধান চারিটি রাস্তা হইতে দূরে অবস্থিত স্থান সমূহে সরকারী ডাক সাহায্যে চিঠিপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা তখনও হয় নাই। আমরা চেষ্টা করিয়াও উইদারিঙ্গস সাহেবের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে **এলেন্** নামক জনৈক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম প্রধান রাস্তা হইতে চারিদিকে ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন এবং তিনি ইহার ভার গ্রহণ করেন। ইহা হইতে তাঁহার বেশ আয় হয়। এই ব্যবস্থার নাম ছিল **'ক্রস পোষ্ট'** এবং ইহা গবর্ণমেণ্টের ঠিক প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে ছিল না। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে অনেক ফ্লেমিংস্ দেশীয় লোক পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইংল্যাণ্ডে আসিয়া বাস করিতে থাকে। তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী এবং য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত [illegible]দের কারবার। তাহারা নিজেদের ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা নিজেরাই করিত। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ শিক্ষাকেন্দ্রের অধীনে এইরূপ স্বাধীন ভাবে ডাকচলাচলের পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। প্রথমতঃ এইসব স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গুলিকে নূতন আইনের আমলে আনা হয় নাই। কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে ইহাদের ডাক প্রেরণের স্বাধীন অধিকার বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হয়। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে নূতন পোষ্টাফিস গৃহ নির্ম্মিত হয়।

১৬৪৬ সাল পর্য্যন্ত ডাক পাঠাইবার নির্দ্দিষ্ট কোন দিন ছিল না। সেই বৎসর হইতে সপ্তাহে একবার ডাক প্রেরণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৬৩৫ সালে চিঠির জন্য মাশুল ধার্য্য হইলেও এই বিভাগ হইতে কোন লাভ গবর্ণমেণ্টের ছিল না। ১৭ বৎসর এইভাবে চলিবার পর ১৬৫০ সাল হইতে ডাক পাঠাইবার ভার ইজারা দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরে ইজারাদার মাত্র ৫০০ পাউণ্ড দিতে রাজী হয়; [illegible] বৎসরে উহা ২১৫০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। এইরূপে আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছিল ১০৬৬০০০ পাউণ্ড।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ডাকবিভাগ সংক্রান্ত যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার ফলে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ফ্লেমিঙ্গস্‌দের প্রতিষ্ঠিত ডাক ব্যতীত অন্য সব বেসরকারী ডাক বন্ধ হইয়া যায়। এই আইন দ্বারা নিম্নলিখিত হারে ডাক মাশুল ধার্য্য করা হয়।

দূরত্ব	একফর্দ্দ কাগজ	দুইফর্দ্দ কাগজ	আউন্স প্রতি
লণ্ডন হইতে			
৮০ মাইল পর্য্যন্ত	২ পেনি	৪ পেনি	৮ পেনি
তদূর্দ্ধে	৩ ,,	৬ ,,	১ শিলিং
লণ্ডন হইতে স্কটল্যাণ্ড	৫ ,,	৮ ,,	শিঃ ৬ পেনি
লণ্ডন হইতে আয়র্ল্যাণ্ড	৬ ,,	১ শিলিং	২ শিলিং

অতিরিক্ত মাশুলের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সময় সময় দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তি একখণ্ড কাগজে চিঠি লিখিত। এই ফাঁকি বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে এই নিয়ম করা হয় যে ছোট কাগজে চিঠি লেখা হইলেও যদি একাধিক ব্যক্তি একখণ্ড কাগজে লেখেন তাহা হইলে ঐ চিঠি ডবল বা দুই ফর্দ্দ বলিয়া গণ্য হইবে। চিঠি খোলা ভিন্ন উহা ধরিবার অন্য উপায় না থাকায় পোষ্টাফিসে চিঠি খোলা আরম্ভ হয়। সেই সময় ইংল্যাণ্ডে কোন গৃহ হইতে একটি রুমাল চুরি করিলে, সেই অপরাধে ফাঁসি পর্য্যন্ত হইতে পারিত কিন্তু অন্যায় ভাবে চিঠি-পত্র খুলিলে অথবা চিঠি চুরি করিলে শাস্তি ছিল কুড়ি পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা। তখনও য়ুরোপের বাহিরে চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের ডাকবিভাগ করিত না। কাজেই ভারতবর্ষ বা আমেরিকা হইতে চিঠিপত্র আসিলে ইংল্যাণ্ডের ডাকবিভাগ তাহার জন্য কোন মাশুল পাইত না। তবে ইংল্যাণ্ডে পৌছিবার পর, সে সব চিঠি ডাকযোগে এক সহর হইতে অন্য সহরে পাঠান হইলে নির্দ্ধারিত মাশুল দিতে হইত। এই দুই দেশ হইতে জাহাজে চিঠি আনিবার ভার কোন দেশের ডাকবিভাগই গ্রহণ করিত না। যে জাহাজে চিঠি আসিত তাহার মালিক বা কাপ্তেন এইজন্য একটি মাশুল আদায় করিয়া লইত। ভারতবর্ষ হইতে চিঠিপত্র নিবার ভার ক্রমে **ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** গ্রহণ করে। এইসব চিঠি তাহাদের লণ্ডন আফিসে জমা হইত। লণ্ডন সহরের চিঠি পোষ্ট অফিস মারফতে বিলি না হইয়া কোম্পানীর লোক দ্বারাই বিলি হইত। এইজন্য কোম্পানীর

লোকেরা পারিশ্রমিক বাবদ কিছু আদায় করিত। লণ্ডন সহরের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠান অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। এক সহর হইতে অন্য সহরে ডাকযোগে চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা থাকিলেও একই সহরের ভিতর একপাড়া হইতে অন্য পাড়ায় ডাকে চিঠি পাঠাইবার কোন বন্দোবস্ত তখন পর্য্যন্ত ছিল না। প্রয়োজন হইলে নিজের লোক দ্বারা পাঠাইতে হইত। কিন্তু তাহা তেমন সহজসাধ্য ছিল না। কারণ সেই সময়ে এখনকার মত প্রত্যেক বাড়ীতে নম্বর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয় আফিস খোলা হয়। ইহা হইতে সেই সময়কার লণ্ডন সহরের আয়তন কতকটা অনুমান করা পারা যায়। প্রতি ঘণ্টায় ব্রাঞ্চ অফিস হইতে চিঠি সকল প্রধান আফিসে জড় করা হইত এবং সেখান হইতে বাছাই হইয়া বিলি হইত। কোথাও কোথাও ভ্রাম্যমাণ ডাকঘরের ব্যবস্থাও ছিল। সরকারী আফিসে ও ব্যবসায়ীদের পাড়ায় দিনে ১০।১২ বার চিঠি বিলি হইত; অন্যান্য স্থানে দূরত্ব অনুসারে চারিবার হইতে আটবার বিলি হইত। চিঠি প্রতি ১ পেনি মাশুল অগ্রিম দিতে হইত। এখন কলিকাতায় মাত্র চারিবার চিঠিপত্র বিলি হয়।
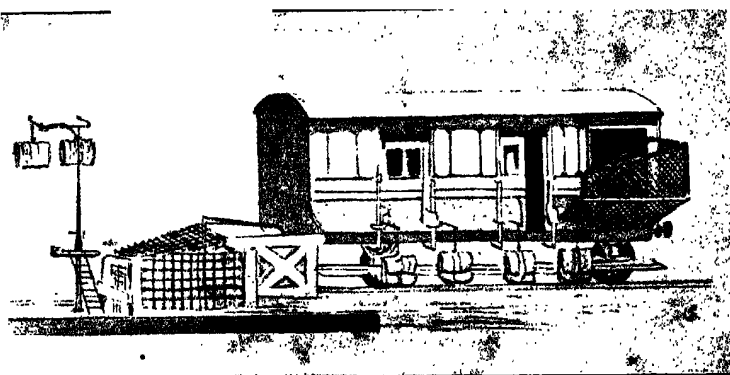
ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর

নাই; তবে রাস্তার নাম কতকটা ছিল বলিয়া মনে হয়। ছোট সহরে ইহাতে অসুবিধা হইতে না পারে, কিন্তু বড় সহরে শুধু মানুষের নামের সাহায্যে কাহারও বাড়ী বাহির করা কঠিন। যাহার নামে চিঠি তাহার বাড়ী সেই পাড়ার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান হইতে কোন্ দিকে ও কতদূরে তাহা তখন বলিয়া দিতে হইত; কিংবা বাড়ীর সম্মুখের বিশেষ কোনচিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য **ডকওয়ারা** নামক জনৈক ব্যক্তি লণ্ডন সহরের বিভিন্ন পাড়া মধ্যে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ডাকে চিঠি দিবার জন্য লণ্ডন সহরে ৩০০।৪০০ শত **লর্ড কার্জ্জনের** সময় কিছুদিন ১৬ বার বিলির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। একই ব্যক্তি এক পাড়ায় প্রত্যহ চিঠি বিলি করিত বলিয়া তাহার বাড়ী চিনিতে কষ্ট হইত না। এই ব্যবস্থার সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং এই ব্যবস্থা শুধু লণ্ডন নগরে সীমাবদ্ধ ছিল। ডকওয়ারার পরিচালিত কোন আফিসে লণ্ডনের বাহিরের চিঠি দিলে তাহারা উহা জেনারেল পোষ্ট আফিসে পাঠাইয়া দিত। এই সব চিঠির উপর তাহাদের নির্দ্দিষ্ট এক পেনি মাশুলের উপর লণ্ডন হইতে চিঠির গন্তব্য স্থলের দূরত্ব অনুসারে সরকারী ডাক-বিভাগের মাশুল দিতে হইত। সেই মাশুল চিঠি

বিলি হইবার সময় প্রাপকের নিকট হইতে আদায় হইত। লণ্ডন সহরে জেনারেল পোষ্ট আফিস ভিন্ন অন্যত্র চিঠি ডাকে দিবার ব্যবস্থা না থাকায় এবং সহরের আয়তন অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় লোকদের চিঠি ডাকে দিতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সেইজন্য দূরের অধিবাসিগণ অতিরিক্ত এক পেনি খরচ করিয়া লণ্ডনের বাহিরের চিঠিও বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ডকওয়ারার আফিসে দিত।

ডকওয়ারার ডাকবিভাগ কেবল চিঠির কাজ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল না। ইহাদের মারফতে সাধারণ ও ইনসিওর পার্শ্বেল পাঠান যাইত। অবশ্য এই ব্যবস্থা কেবল লণ্ডন সহরে আবদ্ধ ছিল। পার্শ্বেলের ওজন আধ সেরের উর্দ্ধে কিংবা তাহার মূল্য দশ টাকার অধিক হইলে, উহা গ্রহণ করা হইত না। জিনিষের মূল্য পার্শ্বেলের উপরে লিখিয়া দিতে হইত এবং ভালরূপ প্যাক করিয়া শিলমোহর করিয়া দিতে হইত। পার্শ্বেল খোয়া গেলে তাহার ক্ষতিপূরণ করা হইত। এইভাবে **ইন্‌সিওয়েন্স** প্রথার প্রথম উদ্ভব হয়। ইহা পরে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু কখন এবং কি কারণে ঠিক জানা যায় না। তবে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই নিয়ম রহিত করা হয় তাহা ঠিক। এখন চিঠির উপর ও তারিখ স্থানের নামাঙ্কিত যে শিল দেওয়া হয়, ডকওয়ারাই তাহা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। কোন চিঠি বিলি হইতে বিলম্ব হইল কি না তাহা ঠিক করিবার জন্য সে আফিসের নাম ও সময়ের ছাপ চিঠিতে দেওয়া হইত। অবশ্য তখনও আধুনিক শিলের প্রচলন হয় নাই। এক শিলে (Seal) আফিসের নাম এবং অপর শিলে ডাকে দিবার সময় লেখা থাকিত। দিনের চিঠি দিনেই বিলি হইত বলিয়া তারিখ দিবার দরকার হইত না।

ডাকবিভাগের আয় সেই সময়ে **ডিউক অব ইয়র্ক**-এর প্রাপ্য ছিল। ডকওয়ারার প্রবর্ত্তিত ডাক চলিলে তাঁহার আয় কমিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পরে এই ডাক চালাইবার ভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ইহাতে ডকওয়ারার প্রতি অবিচার করা হইল মনে করিয়া পার্লামেণ্ট তাঁহার জন্য বাৎসরিক ৫০০ শত পাউণ্ড পেন্‌সন্ মঞ্জুর করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়রল্যাণ্ডের ডাকবিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৪ জন কর্ম্মচারী ছিল। কিন্তু সেই সময় এক ডকওয়ারার অধীনে লণ্ডন সহরেই ইহা অপেক্ষা অধিক লোক কাজ করিত বলিয়া জানা যায়। তৎকালে বড়দিন উপলক্ষে ৩ দিন, ইষ্টার উপলক্ষে ২ দিন, Suntide উপলক্ষে ২ দিন ও প্রতি রবিবারে ডাকবিভাগের ছুটি থাকিত। এই কয়দিন চিঠি বিলি, এমন কি একস্থান হইতে অন্যস্থানে ডাক চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিত।

ডকওয়ারার অনুকরণে আর এক ব্যক্তি ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে আধপেনি মাশুলে ডাকবিলির ব্যবস্থা করেন। লণ্ডনের যে সব পাড়ায় চিঠিপত্র বেশী হইত, সেই সব স্থানে শুধু ইহা আবদ্ধ ছিল। ১৭১০ সালে গভর্ণমেণ্ট ইহা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহার প্রবর্ত্তিত একটি নিয়ম সরকারী ডাক-বিভাগ গ্রহণ করে। ইহার লোকেরা চিঠি সংগ্রহ করিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিত। ঘণ্টার শব্দ শুনিলেই যাহাদের চিঠি দিবার প্রয়োজন হইত, তাহারা মাশুল সহ তাহাদের হাতে চিঠি দিয়া যাইত। এই ব্যবস্থায় এক প্রকার বাড়ীতে বসিয়াই চিঠি ডাকে দেওয়া চলিত। আধ পেনি ডাক বন্ধ হইবার পর সরকারী ডাক এই উপায়ে চিঠি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই প্রথা লণ্ডন সহরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এবং ডাবলিন সহরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে **দ্বিতীয় চার্লস্**-এর রাজত্বকালে যে মাশুল নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা ১৭১০ সালের আইনে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে দুই পেনি স্থলে ৩ পেনি, ৩ পেনি স্থলে ৪ পেনি, এই ভাবে এক পেনি করিয়া সব চিঠির মাশুল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়াতেই এই সময় মাশুল বাড়ান হয়। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ হইতে ১১১৪৬১ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল এবং এই বর্দ্ধিত হারে আরও ৩৬৪০০ পাউণ্ড আয় বেশী হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আবার মাশুল পরিবর্ত্তন হয়। এক সহর হইতে অন্য সহরে ডাক পাঠাইবার নির্দ্দিষ্ট

কোন দিন ছিল না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চিঠির মাশুল ধার্য্য করিবার কয়েক বৎসর পরে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে সপ্তাহে একদিন মাত্র ডাক পাঠান হইত। ক্রমে উন্নতি হইয়া মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার, এই তিন দিন ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা ১৭৪১ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সেই বৎসর হইতে এক রবিবার ভিন্ন ছ'দিনই লণ্ডন হইতে চতুর্দ্দিকে ডাক পাঠাইবার বন্দোবস্ত হয়। এখন রবিবারে ডাক পাঠান বন্ধ থাকা দূরের কথা, লণ্ডন এবং স্কটল্যাণ্ডের কোন কোন যায়গা ভিন্ন অন্য সব যায়গায় চিঠিপত্র বিলিও বন্ধ থাকে না। লণ্ডনে সাধারণ ডাকবিলি রবিবারে বন্ধ থাকিলেও এক্সপ্রেস ডেলিভারির সাহায্যে খবরের কাগজ, ডাক্তার, ব্যাঙ্কার, সলিসিটার প্রভৃতির চিঠি বিলি করা হয়।

১৭৪১ সাল হইতে রবিবার ভিন্ন অন্য ছ'দিনই ডাক বাহিরে পাঠান হইলেও, লণ্ডন সহরে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেনারেল পোষ্ট আফিস ভিন্ন চিঠি দিবার অন্য স্থানসমূহ সপ্তাহে শুধু তিন দিন খোলা থাকিত। ঘণ্টাধারী লোকেরাও ঐ তিনদিনই চিঠি সংগ্রহ করিত। অন্য তিন দিন জেনারেল পোষ্টাফিস ভিন্ন অন্য কোথাও, একআনা অতিরিক্ত মাশুল ভিন্ন চিঠি দেওয়া যাইত না। এই অতিরিক্ত মাশুল, যাহার হাতে চিঠি দেওয়া হইত, তাহারই প্রাপ্য ছিল। ১৭৬৯ সাল হইতে ঘণ্টাবাদকগণ ছ'দিনই চিঠি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে এবং চিঠি দিবার শাখা আফিসগুলিতে ও ছ'দিনই চিঠি লইবার বব্যাস্থা হয়।

প্রায় এই সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম চিঠি দিবার জন্য **চিঠির বাক্সের** প্রচলন হয়। ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বত্র হাতে হাতে চিঠি দিতে হইত। প্রথম প্রথম এই বাক্সগুলি খোলা ও আলগা থাকিত এবং আফিস বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ঘরে তুলিয়া রাখা হইত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তালাচাবি বন্ধ করা স্থিতিবান ডাকবাক্সের প্রচলন হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক পোষ্ট আফিস হইতে অন্য পোষ্ট আফিসে ডাক পৌছাইয়া দেওয়া মাত্রেই ডাকবিভাগের কাজ ছিল; চিঠি বিলি করিবার নিয়ম ছিল না। লণ্ডন, এডিনবরা ও ডাবলিন্ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পোষ্টমাষ্টার ভিন্ন দ্বিতীয় কর্ম্মচারী ও ছি' না। এই তিন সহরে অবশ্য চিঠি বিলির বন্দোবস্ত [illegible] হইয়াছিল; অন্য সব যায়গায় আমাদের দেশের গ্রামের ডাকঘরের মত পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীতেই আফিস ছিল। সর্ব্ব-সাধারণকে পোষ্ট মাষ্টারের বাড়ী যাইয়া, তাহাদের নামে চিঠি আছে কি না সংবাদ লইতে হইত এবং থাকিলে মাশুল দিয়া চিঠি গ্রহণ করিতে হইত। পোষ্ট-মাষ্টার কাহারও বাড়ী যাইয়া চিঠি বিলি করিয়া আসিলে তাহার জন্য অতিরিক্ত ফি আদায় করিতে ছাড়িত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বহুস্থানের লোক 'পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেলের' নিকট আবেদন করে। কিন্তু অতিরিক্ত ফি ব্যতীত চিঠি বিলি করিবার ভার লইতে গভর্ণমেণ্ট অস্বীকার করেন। জনসাধারণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া এই দাবী উপস্থিত করে যে, চিঠির জন্য যে মাশুল দেওয়া হয় তাহাতেই ডাকবিভাগ চিঠি বিলি করিতে বাধ্য গভর্ণমেণ্ট এই দাবী উপেক্ষা করিলে বিভিন্ন সহর হইতে অনেকেই ডাকবিভাগের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে বিচারফল সাধারণের মতের অনুকূল হওয়ায়, ডাকবিভাগ অতিরিক্ত মাশুল না লইয়াই চিঠিপত্র বিলি করিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। পার্লামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সংবাদ এবং ফাঁসীর হুকুম রদ হওয়ার সংবাদ পোষ্টমাষ্টারকে নিজে যাইয়া বিলি করিতে হইত। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের পর পোষ্টমাষ্টার ভিন্ন কাহারও নিকট হইতে ডাকবহনের জন্য ঘোড়া ভাড়া করা যাইত না। পোষ্টমাষ্টারের বেতন তখন অতি সামান্যই ছিল। কিন্তু ঘোড়া ভাড়া দিয়া তাহাদের বেশ দু'পয়সা আয় হইত। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের এই অধিকার রহিত করিয়া দেওয়া হয়।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরের রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বর দিবার জন্য এক আইন জারি হয়। ডাকবিভাগের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক না থাকিলেও ইহাতে ডাকবিভাগের কাজের বিশেষ সুবিধা হইয়া যায়। ইহা হইতেই ষ্ট্রীট ডিরেক্টরিরও সূত্রপাত। এই আইনের মুখবন্ধ Preamble হইতে সেই সময়কার লণ্ডন সহরের

...শ বুঝিতে পারা যাইবে। তাই এখানে ...ত করিয়া দেওয়া হইল :—

"যেহেতু লণ্ডন সহরের রাস্তা, গলি ও অন্যান্য স্থান ভাল করিয়া বাঁধান নহে, উপরন্তু অপরিষ্কার ও তাহাতে রাত্রে আলোর ব্যবস্থা নাই ; যে হেতু রাস্তায় খুঁটি পুতিয়া আবর্জ্জনা ফেলিয়া, গর্ত্ত করিয়া এবং বাড়ী চিনাইবার জন্য নানারূপ চিহ্ন লট্‌কাইয়া এই সব রাস্তা দিয়া চলাফিরা অসুবিধাজনক ও বিপজ্জনক করা হইয়াছে, সেই হেতু এই আইন প্রণয়ন করা যাইতেছে।"

আইনসে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ডাকপিয়নদের জন্য প্রথম স্বতন্ত্র পোষাকের ব্যবস্থা হয়। পিয়নদের বেতন নিতান্ত কম ছিল ; সেইজন্য তাহাদের অনেকেই উৎকোচ গ্রহণ করিত। রবিবার ভিন্ন অন্য কোনও ছুটীও তাহাদের ছিল না। প্রয়োজন হইলে চাহিয়াও ছুটী পাইত না। তাই ইহারা বিনা অনুমতিতেই অনেক সময় কাজে অনুপস্থিত হইত এবং অন্য লোক দ্বারা কাজ চালাইয়া দিত। এইসব গলদ নিবারণ করিবার জন্যই 'ইউনিফরম' বা পোষাকের প্রচলন করা হয়।

সেকালের পার্শ্বেল গাড়ী
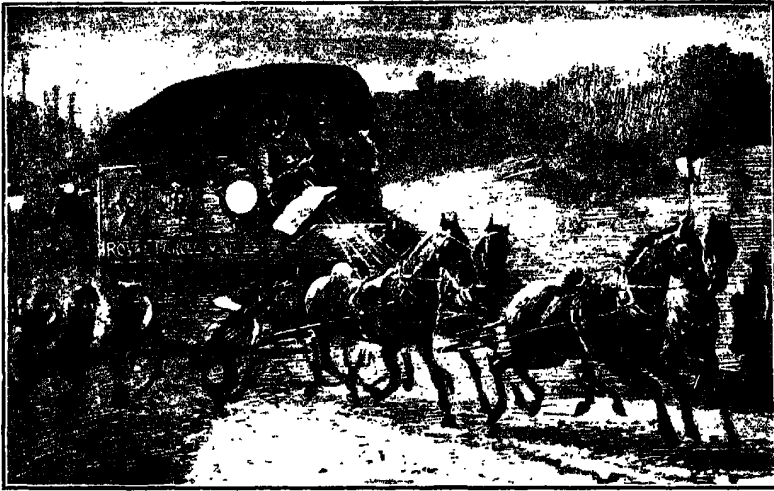
যে চিঠি ঠিকানার গোলমালে বা অন্য কোন কারণে বিলি করা যাইত না, তাহার গতি করিবার জন্য ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ডেড্‌লেটার অফিসের সৃষ্টি হয়। সৈনিকদিগের বাড়ীতে টাকা পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ১৭৯২ অব্দে ইংল্যাণ্ডের **প্রথম মণি-অর্ডার** প্রথার উদ্ভব হয়। ক্রমে এই অধিকার সর্ব্বসাধারণকে দেওয়া হয়। যদিও মণি-অর্ডারযোগে প্রেরিত টাকা ডাকবিভাগের মারফৎ একস্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠান হইত, তথাপি প্রথম অবস্থায় ইহা ডাকবিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল না। ১৮৩৮ সালে ইহা ডাকবিভাগের অধীনে

ডাকবিভাগের সৃষ্টি হইতেই অশ্বারোহীগণ ডাক বহন করিত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ডাকের উপর দস্যুদের দৃষ্টি পতিত হয়। তাহাদের উপদ্রব এত প্রবল হইয়া উঠে যে ডাক-বিভাগের আয় অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া যায়। অনেকদিন পর্য্যন্ত এই উপদ্রব নিবারণের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। ডাক-বহনকারী অশ্বারোহী অস্ত্রশস্ত্র দিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেষে ১৭৮৪ সালে জন পামার নামক এক ব্যক্তি এই উপদ্রব নিবারণকল্পে নিজ পরিবর্ত্তিত একপ্রকার গাড়ীর প্রবর্ত্তন করেন।

রূপকথা

এত রূপকথা রোজ শুনি, তবু যখনি আকাশে চাই—
মনে হয়, ওই উহাদের কথা কেহ কি জানে না, ভাই ?
দলে-দলে ওরা কোথা হ'তে আসে,
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে যবে হেথা চারিপাশে,
ফুলের গন্ধ বেড়ায় বাতাসে—
দেখিতে কিছু না পাই,
শুধু যে ওরাই চোখে-চোখে ডাকে, আকাশে যে-দিকে চাই।

আছে কি হোথায়—পৃথিবীর সাথে আকাশ যেথায় মেশে
সারি-সারি গাছ সব দিক পানে শাখায় শাখায় ঘেসে' ?
গোড়াটি তাদের দেখা নাহি যায়,
ঘন-পল্লবে আঁধার ঘনায়,
শুধু কুঁড়িগুলি সাঁঝের হাওয়ায়
পাতার বাহিরে এসে
এক সাথে সব ফুটি-ফুটি করে পাশাপাশি ঘেসে ঘেসে !

কি ফুল উহারা ?—আধ-ফুটন্ত বকুলের মত নয় ?
সোণার বরণ জুঁই বলি যদি, মন্দ সে পরিচয় ?
কেহ বা রূপালি চামেলির মত
শিশিরের ভারে কাঁপে অবিরত,
একটু সে লাল ওই আরো যত—
জানো কি উহারে কয় ?
ওরা বুঝি কুঁড়ি ?—মুখগুলি কই পাঁপড়ি-কাটা ত নয় !
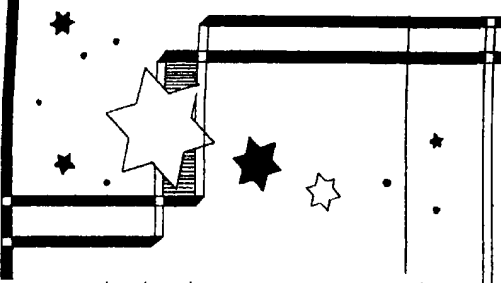
মুখ ?—তাই বটে, সেই রূপকথা ভুল করে' ভুলে যাই—
ফুল নয় ওরা, আধেক স্বপনে ওদের চিনি যে ভাই !
যেন চেনা মুখ—কোথা কবেকার !—
বলে, বল দেখি কে হই তোমার ?
আকুল পরাণে চাই বারে বার-
প্রাণে চিনি, মনে নাই !
ঠিক্ কোন্ জনা কোন্‌টি—সে কথা বারে বারে ভুলে যাই !

ওই যে ওখানে মুখখানি দেখি সব চেয়ে সুন্দর—
মুখের হাসি ও চোখের চাহনি নহে যে স্বতন্তর !
কোন্ জনমের কোন্ মা'র মুখ,
কোন্ অতীতের কোন্ সুখ দুখ
নূতন করিয়া ভরি' তোলে বুক—
আপন হয়েছে পর !
তাই ভাবি, আর দেখি মুখখানি বড় বেশি সুন্দর !

কারো পানে চেয়ে মনে হয় যেন, যে জন গিয়েছে চলে'
সে-দিনের খেলা সাঙ্গ না করি', কাহারে কিছু না বলে'—
সেই যেন হোথা উঁকি দিয়ে চায়,
যেন মৃদু-মৃদু হাসে ইসারায়,
তবু সে আঁখিটি জলে ভরে' যায়—
কাঁদে যেন দেখা হ'লে;
অত দূরে থেকে সুখ হয় কারো ?—কেন গেলি ভাই চলে' ?
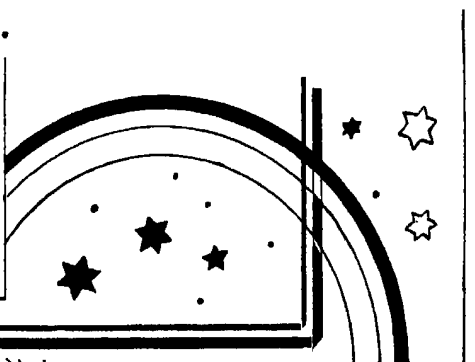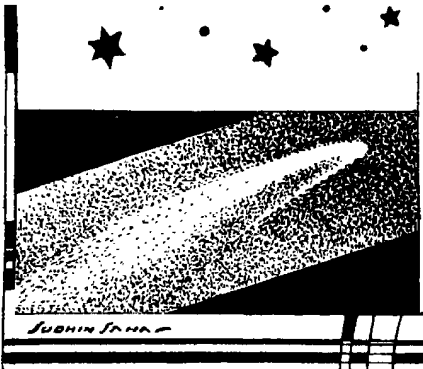
তাঁতির সাজা

তাঁতির বাড়ী বেঙের বাসা—কোলা-বেঙের ছাঁ,
খায়-দায়, গান গায়—তাইরে—না রে না।

সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল,
আকড়া বাড়ী নিয়ে তাঁতি বেঙের ছাঁ মারিল।

একটা ছিল কোলা-বেঙ বড্ড সেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।

আক্কিডাঙ্গা কাক্কিডাঙ্গা মধ্যে দনেখালি,
সেখান থেকে এল বেঙ—চৌদ্দ হাজার ঢালী
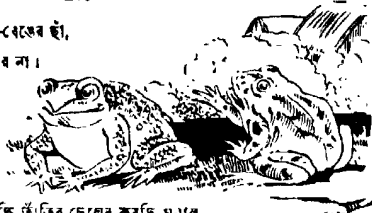
হুগলীর সহরে ভাই, বেঙের অভাব নাই,
সেখান থেকে এল বেঙ—সনাতন সেপাই
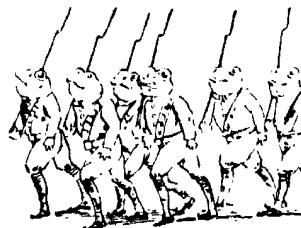
সুতানতা নিয়ে তাঁতি যায় মণিরহাটে,
একটা ছিল কোলা-বেঙ আগুলিল পথে।

সুতানাতা নিয়ে তাঁতি উঠলো গিয়ে ডালে,
একটা ছিল কোলা-বেঙ থাপ্পড় দিল গালে।

সুতানাতা নিয়ে তাঁতি নাব্‌লো গিয়ে ভুঁয়ে,
একটা ছিল কোলা-বেঙ মার্‌লো লাথি মুয়ে।

বকমামা, বকমামা,
ফুল দিয়ে যা,
নারকেল গাছে কড়ি আছে,
গুণে নিয়ে যা।
হাটিমা টিম্ টিম
হাটিমা টিম্ টিম্,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হাটিমা টিম্ টিম্।
বলরাম
এক হাত লম্বা বলরাম,
দুইহাত লম্বা শিং;
নাচেরে বলরাম,
তা ধিন্ তা ধিন্!
কটকটেটা বলে আমি
এই গাছে আছি,
যে ছেলেটা কাঁদে
জুলপি ধরে নাচি।
তোতাপাখী
আতা গাছে তোতাপাখী,
ডালিম গাছে মৌ,
কথা কওনা কেন বৌ?
কথা কব কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে!

স্যামুয়েল দে শ্যাপলোন্

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে স্যামুয়েল দে শ্যাপলোন্ পানামা যোজক দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—"যদি এই সামান্য জমিটুকু কাটিয়া খাল করা যায় তাহা হইলে যাতায়াতের পথ অনেক সহজ হয়।"

এই প্রস্তাবটী করা হয় ১৬০২ খৃঃ অব্দে কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হয় ১৯১৪ খৃঃ অব্দে। সেই সময় হইতেই এই পথটী প্রস্তুত হইয়া যাতায়াতের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে।

এই জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রশংসা যাঁহার প্রাপ্য তিনি হইতেছেন তীক্ষ্ণধী ফরাসীবীর স্যামুয়েল দে শ্যাপলোন্।

ফ্রান্সের ব্রুয়ে (Brouage) নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের সন তারিখ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে আবার কেহ কেহ বলেন ১৫৭০ খৃঃ অব্দে। তাঁহার পিতা ছিলেন নাবিক। যৌবনে শাঁপলোন্ নাবিক ও সৈনিক উভয়ই ছিলেন। তাঁহার নিজের লেখাগুলি পড়িলেই তাঁহার যে উচ্চ বংশে জন্ম হইয়াছিল এবং নানা বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল এ-কথা জানিতে পারা যায়। তখনকার দিনের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ শাঁপলোনকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

শাঁপলোনের নিজের লেখা হইতেই জানিতে পারা যায় যে তিনি চতুর্থ হেনরীর (Henry IV) সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি বলেন যে সৈন্যদল হইতে ছুটি লইয়া প্রথমতঃ স্পেনীয় নৌ-বিভাগে কোন কার্য্য গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এইরূপে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে (West-Indies) প্রতিবৎসর যাইতে পারিবেন এবং চতুর্থ হেনরীকে সে দেশের বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিবেন কারণ সেখানে অল্পসংখ্যক ফরাসী ভদ্রলোকই গিয়াছেন।

স্যামুয়েলের এক কাকা স্পেনের রাজার নৌ-বিভাগে বড় কাজ করিতেন (Pilot General of sea armies) তিনি নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন বলিলেই চলে। তিনি ভাইপো স্যামুয়েলকে "সেণ্ট জুলিয়ান" (Saint julian) নামক তাঁহার এক জাহাজে যাইবার অনুমতি দিলেন। সেই জাহাজের শীঘ্রই পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে যাইবার কথা ছিল।

কিন্তু হঠাৎ সেই পিতৃব্যের অন্যত্র যাইবার আদেশ হইল। তিনি ডন ক্যানসিসক কলম্ব (Admiral Don Francesque Colombe) নামক নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষকে বলিয়া স্যামুয়েলের হস্তে "সেণ্ট জুলিয়ানের" ভার দেওয়াইলেন। ইহাতে বোঝা যায় যে এ বিশেষ অভিজ্ঞতাও খ্যাতি স্যামুয়েল পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন কারণ "সেণ্ট জুলিয়ানের" মতন জাহাজের পরিচালনা ভার নিতান্ত আনাড়ির হাতে অর্পণ করা যাইতনা।

শাঁ্যাপলোন্ হ্রদের তীরে—শাঁ্যাপলোন্

নূতন অভিজ্ঞতার আশায় ও আনন্দে স্যামুয়েল উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নাবিকের জীবন না হইলে আবার একটা জীবন! এইটা ত চাই। ভীরু আর অস্থিরমতি হইলে প্রকৃত নাবিক হওয়া যায় না।

১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে রওনা হইয়া জাহাজে চড়িয়া পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিতে প্রায় তিন মাস লাগিল। এখানে পৌঁছিয়া শাঁ্যাপলোন্ বিশেষ যত্নের সহিত এ-দেশের জীবজন্তু, গাছপালা, অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, বন্দর, অজানা উপকূল প্রভৃতি দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একখানা যথাসম্ভব সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত হইল। এদেশ সম্বন্ধে ইউরোপের কোনও নাবিক তাঁহার পূর্ব্বে কেহই অত কষ্ট স্বীকার করিয়া সযত্নে এমন কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লেখেন নাই।

আবিষ্কর্ত্তাদের ভিতর শাঁ্যাপলোন্ই প্রথম একটুও অত্যুক্তি না করিয়া যথাসাধ্য যথাযথ ভাবে সমস্ত বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম ভৌগোলিক বলিয়া অভিহিত করা যায়। তিনি নিজে অনেক সময় ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—আমার স্থির বিশ্বাস অনেকেই নিজে না দেখিয়া কোন বিষয় কাহারও নিকট শুনিয়া তাহা লিখিয়া থাকেন। শোনা কথা অধিকাংশ স্থলেই সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে।"

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শাঁ্যাপলোনের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। অনেক স্থলে যেখানে তিনি কোন নূতন জন্তু, ফুল অথবা গাছের নাম বলিতে পারেন নাই সেখানে সে সমুদয়ের এমন বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন যে তাহা হইতে সহজেই উহা বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক স্থানের মাপ তিনি যথারীতি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বন্দরের কথা লিখিতে গেলেই ইহার নিকটবর্ত্তী জলের গভীরতা, নিমজ্জমান পর্ব্বত বা পাহাড় বেলাভূমির উল্লেখ করিয়াছেন।

স্যামুয়েল শাঁ্যাপলোন্ অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ও অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। নানা ব্যাপারের তাঁহার সরস বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার স্পেনীয় নৌ-বাহিনীর নায়ক কতকগুলি ইংরাজ ফরাসীও ফ্লেমিশ জাহাজ আক্রমণ করিতে গিয়া যেমন বিপদে পড়িয়াছিলেন দীর্ঘ শব্দ সংযোগে তাহার যে একটা সরস বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা পড়িলেই শাঁ্যাপলোনের বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের ও রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পেনীয়দের সাহস সম্বন্ধে শাঁ্যাপলোনের কোন ধারণা ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি আরেকটী হাস্যোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই

আক্রমণের সময় একটা জাহাজের সমস্ত লোক মরিয়া যায়। পরাজিত শত্রু-জাহাজে একটী লোকও না দেখিয়া স্পেনিয়ার্ডরা ভাবিল এ জাহাজ বোধ হয় শয়তান পরিচালিত কাজেই কেহ সে জাহাজে নাবিতে চাহিল না। অনেক পীড়াপীড়িতে এবং অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহারা নাবিয়া দেখিল যে জীবিত শত্রু কেহই নাই।

তাঁহার এই সমুদ্র যাত্রাকাল প্রায় দুইবৎসর স্থায়ী ছিল। এই সময়ে শাঁপলোন মেক্সিকো সহরে গিয়াছিলেন। এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোকো গাছ হইতে অধিবাসীরা যে চকোলেট প্রস্তুত করিতে জানিত সে কথা শাঁপলোন উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে একজাতীয় ভীষণাকার কুমীর দেখিয়াছিলেন সে কথাও লিখিয়াছেন।

সেণ্ট লরেন্সের বুকে শাঁপলোন্

শ্যাঁপলোন তাঁহার এই সমুদ্র-যাত্রার এক বিশদ বিবরণ লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রায় ষাটটী মানচিত্র ও চিত্র ছিল। এই বিবরণটী ভাগ্যক্রমে পরে পাওয়া যায় এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হ্যাকলুইট সমিতি (Hakluyt Society) হইতে ইহা অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্যাঁপলোনের প্রধান খ্যাতির কারণ কিন্তু কেবলমাত্র ভৌগোলিক হিসাবে নহে তাহা হইতেছে ক্যানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করায় চেষ্টায় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে জেকস্ কার্টিয়ার ক্যানাডার গ্যাসপে (Gaspe) নামক স্থানে গমন করেন এবং তাহা ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত করেন। তাহার পরের বৎসর কুইবেক ও মনট্রিল পর্য্যন্ত গিয়া একটা উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন; কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়। শাঁপলোনের পূর্ব্বে ধরিতে গেলে ফরাসীদের এ বিরাট প্রদেশে কোনই উপনিবেশ ছিল না।

১৬০৩ খৃঃ অব্দে মনটস্ (Siews monts) একজন ফরাসী ধনী ভদ্রলোক ফ্রান্সের তৎকালীন রাজা চতুর্থ হেনরীর নিকট হইতে নূতন ফ্রান্সে (তখন ক্যানাডাকে এ-নামে অভিহিত করা হইত)। কিছুদিনের জন্য একচেটিয়া পশম ব্যবসায় করিবার অনুমতি লাভ করেন। তিনি স্থির করিলেন উপকূল আবিষ্কার করিবেন এবং ক্যানাডায় এক ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করিবেন। শ্যাঁপলোন মনটসের সহিত যোগ দিয়া ১৬০৩ খৃঃ অব্দে প্রথমবার এবং ১৬০৪ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয়বার নব ফ্রান্সে (New-France) যাত্রা করেন। ইহার পরে তাঁহাকে আবার ১৬০৮ খৃঃ অব্দে সেখানে যাইতে হয়। তাহার পর হইতে এই ফরাসীবীরের সময় বেশীর ভাগই কাটিত ক্যানাডায় ফরাসী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টায়।

এ সময়ে অনেকেই উত্তর আমেরিকার উপকূলে মৎস্য-শিকার ও পশমের ব্যবসায় করিতে যাইত কিন্তু সেখানে কোন ইউরোপীয় উপনিবেশ ছিল না এবং ঐ প্রদেশের অধিবাসীরা সকলেই দেশী ইণ্ডিয়ান ছিল। শ্যাঁপলোন বর্ত্তমান প্লিমাথ বন্দরের (Plymouth Harbour) নাম দিয়াছিলেন—পর দু ক্যাপ স্যাঁ লুই (Port du cap St. Louis)। এখনও ঐ নামই চলিতেছে।

কার্টিয়ারের সময় ক্যানাডা বলিতে একটী ছোট ইণ্ডিয়ান পল্লীসংলগ্ন ভূ-ভাগ মাত্র বুঝাইত। শাঁপলোন ও প্রথমে তাহাই বুঝিতেন। কুইবেক ফরাসী অধিকারে আসিবার পর বর্ত্তমান বৃহৎ প্রদেশকে **ক্যানাডা** বলা সুরু হয়।

শ্যাঁপলোন্ তাঁহার প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন নভাস্কসিয়ার পোর্ট রয়ালে (New Annapolic) মন্টস দেশে ফিরিয়া গেলে শ্যাঁপলোন্ মাত্র চল্লিশ জন ফরাসী সহ ক্যানাডায় থাকেন। তিনি প্রথমেই নিজের জন্য একটী বাগান তৈরী আরম্ভ করেন এবং একটী পুকুরে মৎস্য-বিশেষ করিয়া ট্রাউট মাছ রাখিতে আরম্ভ করেন এবং উদ্যানবাটিকায় নানা গাছপালা লাগান। তাহার পরে বহু শস্য রোপিত হয় একটী কল স্থাপিত হয় এবং এইরূপে ধীরে ধীরে একটা উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে থাকে।

দারুণ শীতে সকলের মনের আনন্দ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্যাঁপলোন্ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন করিয়া প্রত্যেককে শিকারে যাইতে হইবে এবং শিকার দ্বারা আনীত মাংসই সেদিনকার প্রধান খাদ্য হইবে। ইহাতে খুবই আমোদ হইত আবার স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও শ্যাঁপলোন্ বলিতেন "ইহাতে অসাধারণ শারীরিক উন্নতি হইত।"

প্রথমটায় ক্যানাডায় বাস করিতে গিয়া নূতন আবহাওয়ার মধ্যে শ্যাঁপলোনকে বহু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ সেণ্ট ক্রইক্স দ্বীপ যেখানে তাঁহারা প্রথমে বাস করিতে আরম্ভ করেন তাহা অপেক্ষা বসবাসের উপযোগী আরও অনেক জায়গা ছিল।

এখানে ক্রমাগতঃ শুকনো মাংস খাওয়াতে দলে স্কার্ভি রোগ দেখা দিল। শ্যাঁপলোন্ জানিতেন না যে বরফে মাছ রাখিয়া দিলে তাহা বহুদিন টাট্‌কা থাকে। তা ছাড়া তাহারা বরফ গলান জল খাইতেন; কারণ তাহারা জানিতেন না যে হ্রদের উপরে যে বরফ জমিয়াছিল তাহা সরাইলে অনায়াসেই পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া যাইত। তাছাড়া বাড়ী-ঘরের যাবতীয় দ্রব্যই তাহাদের জমিয়া যাইত কারণ রান্নাঘরের মেজ খুঁড়িয়া বরফের হাত হইতে জিনিষ বাঁচানর মত কুঠরী যে তৈরী করা যায় এ-কথা তাহারা জানিতেন না। এমনকি দারুণ শীতের সময় যেখানে জ্বালানী কাঠ জাতীয় কিছুই নাই সেখানেও তাহারা অনেক সময় তাঁবু খাটাইয়াছেন অথচ সমস্ত দেশটায় বনের অভাব ছিল না।

দেশীয় লোকদের নিকট হইতে কিছুদিনের মধ্যেই শ্যাঁপলোন্ এ-সব তথ্যগুলি শিখিয়া লইলেন। St. Croixএ তিনি দেখিলেন যে ইহারা এক জাতীয় জুতা ব্যবহার করে যাহা পরিলে বরফে পা ডুবিয়া যায় না। দেশীয় লোকেরা সহজে মিত্রতা করিতে চাহিত না কিন্তু শ্যাঁপলোন্ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অমায়িক ব্যবহার দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। নতুবা সে দেশে ফরাসী উপনিবেশ কখনই স্থাপিত হইতে পারিত না।

ইণ্ডিয়ানেরা যে অসভ্য বুনোজাতি ইহার বহু পরিচয় শ্যাঁপলোন্ পাইয়াছিলেন। একবার তাঁহার জাহাজের কয়েকজন নাবিক রাত্রিতে তীরে শুইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ানদের বালা, আংটি, কুড়োল, ছুরি ইত্যাদি বহু উপহার দেওয়া হইয়াছিল কাজেই তাহাদের নিকট হইতে শত্রুতার কোন আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু ভোর না হইতেই প্রায় চারশত জন ইণ্ডিয়ান আসিয়া তাঁবু আক্রমণ করিয়া কয়েকজন ফরাসীকে মারিয়া ফেলে পরে জাহাজ হইতে বহু লোককে আসিতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে। তখন শ্যাঁপলোনের লোকেরা মৃতদেহগুলিকে ক্রুসের সম্মুখে কবর দিয়া রাখে কিন্তু তাহারা চলিয়া যাওয়া মাত্র ইণ্ডিয়ানেরা আসিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেহগুলি বাহির করিয়া পোড়াইবার ব্যবস্থা করিতে থাকে তখন ফরাসীরা আবার আসিয়া সঙ্গীদের মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করে।

শ্যাঁপলোন্ বিপদে আপদে ইণ্ডিয়ানদের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক সময়ে তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্যাঁপলোনের নিকট খাদ্য চাহিতে আসিত তিনি তাহাদের আহার্য্য দিতেন, তাহারা যাহা পাইত তাহাই খাইত।

বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে ইণ্ডিয়ানদের চরিত্র শ্যাঁপলোন্ ভালই বুঝিতে পারিতেন।

তিনি বলিতেন—"ইহারা বন্য পশুর মত জীবন-যাপন করিত। ইহাদের নিকট প্রতিজ্ঞার কোন মূল্যই নাই কারণ তাহারা শপথ ভঙ্গ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ইহারা সর্ব্বদাই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে। ঈশ্বরকে ইহারা কেমন করিয়া উপাসনা করিতে হয় তাহা মোটেই জানেনা।" তথাপি শাঁ্যাপলোন্ ভাবিতেন যে চেষ্টা করিলে ইহাদের চরিত্র এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী উন্নততর করা যাইতে পারে। তিনি তাহাদের জমি চাষ করিতে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে শিখাইতে উদগ্রীব ছিলেন।

শাঁ্যাপলোন্ নিজে বীরপুরুষ ছিলেন কাজেই ইণ্ডিয়ানদের ভীরুতা দেখিয়া তিনি অনেক সময় আশ্চর্য্য হইতেন। যখন তাহারা কুইবেক দুর্গের আশ্রয়ের নিকটেই বাস করিত তখন হয়ত তাহাদের কেহ স্বপ্ন দেখিল শত্রুরা আসিতেছে; অমনি ভয়ে কাতর হইয়া তাহারা স্ত্রী-পুরুষদের দুর্গের ভিতরে পাঠাইয়া দিত।

শাঁ্যাপলোন্ ইণ্ডিয়ানদের ফরাসী দেশীয় যুদ্ধ-পদ্ধতি শিখাইতে চাহিতেন কিন্তু উহা তাহারা বুঝিত না।

প্রায় তিন বৎসর কানাডায় কাটাইয়া শাঁ্যাপলোন্ ফ্রান্সে ফিরিয়া যান। পর বৎসর নূতন দেশের মধ্যভাগ আবিষ্কার করিবার জন্য একটী বৃহৎ অভিযান লইয়া যাত্রা করেন।

সেণ্ট লরেন্স নদী ধরিয়া চলিয়া স্যাগুনে (Saguenery) নদীর কিয়দংশ আবিষ্কার করিয়া শাঁ্যাপলোন্ অরলিন্স দ্বীপে (Island of Orleans) পৌছেন। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কার্টিয়ার এস্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দের ৩রা জুলাই তারিখে শাঁ্যাপলোন্ কুইবেকে নামিয়া একটী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টায় রত হন। কিছুদিন পরে তিনি জানিতে পারেন যে দলের কতকগুলি লোক হিংসার বশে একটা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে সাধারণতঃ শাঁ্যাপলোনকে দলের লোকেরা এবং ইণ্ডিয়ানরা সকলেই ভালবাসিত।

এই বিপদ উত্তীর্ণ হইবার পর শাঁ্যাপলোন্ কুইবেকে একটা দুর্গ ও বাসগৃহ নিম্মাণ করেন। বর্ত্তমান কুইবেক সহর শাঁ্যাপলোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানেই অবস্থিত। এবং সেই সামান্য আরম্ভ হইতেই বর্ত্তমান বিশাল ফ্রান্স কানাডিয়ান প্রভিন্স বা ফরাসী অধিকৃত কানাডা প্রদেশের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে একদল আরেকদলের পরম-শত্রু থাকিত। ইহাদের কোন এক দলে যোগ দিতেন বলিয়া শাঁ্যাপলোনের অখ্যাতি আছে। কিন্তু এছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। কুইবেকে নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক ফরাসী বাস করিত কাজেই উপনিবেশ রক্ষার জন্য তাহাকে প্রতিবেশী ইণ্ডিয়ানদের সহিত মিত্রতা করিতে হইয়াছিল। এই মিত্রতার পরিবর্ত্তে ইণ্ডিয়ানরা বা তাহাদের ঘোর শত্রু ইরকুইদের (Iroquis) বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছিল।

শাঁ্যাপলোনের নেতৃত্বে ও সহায়তায় ইরকুয়াগণ (Iroquois) পরাজিত হইল। এই যুদ্ধ শাঁ্যাপলোন্ হ্রদের তীরে সংঘটিত হইয়াছিল। শাঁ্যাপলোন্ ফরাসীদের মধ্যে এই হ্রদ দেখিয়া নিজের নাম অনুসারে ইহার নাম শাঁ্যাপলোন্ হ্রদ রাখেন।

এই যুদ্ধের পর হইতে ইরকুয়াগণ ফরাসীদের ঘোর শত্রু মনে করিতে থাকে। শত বৎসর পরে ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ইংরেজদের সহিত যখন ফরাসীদের কানাডা লইয়া যুদ্ধ হয় তখন তাহারা ইংরেজপক্ষে আসিয়া যোগদান করে।

শাঁ্যাপলোনের সহিত প্রতিবেশী ইণ্ডিয়ানদের অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। কারণ ১৬০৯ খৃঃ অব্দে তিনি মাত্র ১৫জন ফরাসীকে এক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে রাখিয়া স্বদেশে বেড়াইতে আসেন। দেশে ফিরিলে রাজা তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। শাঁ্যাপলোন্ তাঁহার নিকট নব উপনিবেশের বিস্তৃত বিবরণ দেন। এসময় মনটস (De monts) ও অন্যান্য বণিকেরা বাণিজ্য লাভের আশায় সেখানে যাইতে চাহেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে শাঁ্যাপলোন্ পুনরায় কুইবেকে ফিরিয়া যান।

সেখানে ফিরিবা মাত্রই প্রতিবেশী ইণ্ডিয়ানেরা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁহার সাহায্য চাহিল শাঁ্যাপলোন্ কখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেন না তিনি রাজী হইলেন; কিন্তু এবারে কুইবেকে ফিরিয়া তাঁহার অত সাধের বাগান দ্রাক্ষাপুঞ্জ ও

অন্যান্য তরিতরকারীর গাছগুলি অযত্নে বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। শাঁ্যাপলোন্ জানিতেন কেবল যুদ্ধ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা যায় না। চাষ আবাদের উন্নতি ও সভ্যসমাজ গড়িয়া তোলাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১৬১৩ খৃঃ অব্দে শাঁ্যাপলোন্ অটোয়া নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে গিয়াছিলেন। তাঁহার একজন দলের লোক ইণ্ডিয়ানদের সহিত শীতকাল যাপন করিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলে যে মাত্র সতেরদিনে তাঁহাকে উত্তরসাগর দিয়া লইয়া যাইতে পারে। পরে দেখা যায় ইহা সম্পূর্ণ ভুল যাহা। হউক এ যাত্রায় ক্যানোতে (একরকম নৌকা) চড়িয়া শাঁ্যাপলোন্ বহুস্থান ভ্রমণ করেন। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রিডো (Rideau) ও সডেয়ার (Chaudiere) প্রপাত ও কানাডার বর্ত্তমান রাজধানী অটোয়া দেখিয়াছিলেন।

প্রায় ২৫৪ বৎসর পরে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে অনটারিওর একজন কৃষক শাঁপেলোন যে একটী যন্ত্র হারাইয়াছিলেন তাহা খুঁজিয়া পায়।

শাঁ্যাপলোন্ একজন গোঁড়া ক্যাথোলিক ছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল নূতন ফ্রান্সে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারসমিতি স্থাপন করিবেন। ১৬১৫ খৃঃ অব্দে কয়েকজন ধর্ম্মপ্রচারক কুইবেকে আসিয়া ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিতে থাকেন। এ কাজ বহুক্ষেত্রে বিপদসঙ্কুল হইলেও ইহার ফলেই এদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া কুইবেকের এই নূতন উপনিবেশের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে থাকে কেবল শাঁ্যাপলোনের অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে তাহা কোন রকমে টিকিয়াছিল। শাঁ্যাপলোন্ যথাশক্তি চাষ আবাদের উন্নতি করিয়া উপনিবেশটি বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন।

এমনকি তাঁহার দলের লোকেরা অনেকে তাঁহাকে অত্যন্ত হিংসা করিত। ১৬২১ খঃ অব্দে ফরাসী রাজ ডিউক অব মন্টমরেন্সিকে (Duke of montmorency) (প্রধান প্রতিনিধি) অর্থাৎ ভাইসরয় ও শাঁ্যাপলোনকে তাঁহার অধীনে সেনাধ্যক্ষ করিয়া পাঠান। শাঁ্যাপলোনকে বহু বাধাবিঘ্ন ও কষ্ট সহিতে হইত। আইনতঃ কাহাকেও না মানিয়া অনেক ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও স্পেনীয় জাহাজ দেশীয় ইণ্ডিয়ানদের সহিত আদানপ্রদান চালাইত। ফরাসী বণিকেরাই প্রথম এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে সুতরাং তাহারা যে আপত্তি করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত ইরোকোয়া (Iroquois) রা ও অত্যন্ত বিরক্ত করিত। ফরাসীদের এই নূতন উপনিবেশের অধিবাসীদের খাদ্যের জন্য ইউরোপীয় জাহাজের আসা যাওয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। খাদ্য সামগ্রী মোটেই পর্য্যাপ্ত ছিল না। ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে যখন আহার্য্যের

কুইবেকে শাঁ্যাপলোনের আত্মসমর্পণ

নিদারুণ অভাব—যুদ্ধের গোলা-বারুদ কিছুই ছিল না তখন কতকগুলি ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজ কুইবেকে আসিয়া উপস্থিত হয়। শাঁ্যাপলোন্ কুইবেক ছাড়িতে বাধ্য হন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া ইংলাণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়।

এই ব্যাপারে একটা মজার দিক ছিল। কারণ ইংল্যাণ্ডে পৌছিয়া ইংরাজ কাপ্তেন বলেন যে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রায় দুইমাস পরে কুইবেক আবিষ্কার হয়।

ইংরাজেরা ফরাসীদের ক্যানাডা ফিরাইয়া দিবেন ভরসা দেন। প্রায় তিনবৎসরকাল পরে সেণ্ট জারমেইন সন্ধিঅনুসারে ফরাসীরা সেখানে ফিরিয়া যাইবার অধিকার পায়।

এই সময় শাঁপলোন্ ফ্রান্সে নানা অশান্তির মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিলেন। রাজকীয় কর্ম্মচারীরা মিলিয়া তাহার চিরজীবনের কার্য্য নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

১৬৩৩ খৃঃ অব্দে নূতন ফ্রান্সের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া কুইবেকে ফিরিয়া যান। সেখানে তিনি ইণ্ডিয়ান, পুরোহিত ও কয়েকজন ফরাসীভদ্রলোক ছিল তাহাদের নিকট হইতে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেন। ইহার পর তিনি বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার পরিশ্রমের ফলে উপনিবেশ যে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। শাঁপলোন্ ক্যানাডার সকলের কাছে যে সম্মান ও ভালবাসা পাইয়াছিলেন, তেমন আদর ও যত্ন পাওয়া সকলের অদৃষ্টে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

ক্যানাডার ইতিহাস সম্পর্কে শাঁপলোনের নাম বিশেষ সম্মানের সহিত স্মরণীয় হইয়া আছে। কুইবেকের কাছের একটি গ্রামের নাম ছিল ক্যানাডা, পরে এই নাম কিন্তু সমগ্র দেশের নাম হইয়া উঠে। সেণ্ট লরেন্স নদীর স্রোতোধারার মধ্য দিয়া তরী ভাসাইয়া তিনি উহার দুই তীরে কোথায় কি আছে, কিরূপ সে সব স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য, কোন্ কোন্ জাতীয় লোকের বাস, কিরূপ তাহাদের জীবন-যাত্রার রীতি-নীতি এ সমুদয় বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া সে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এজন্য তাঁহার জীবন বহুবার বিপন্ন হইয়াছে, তথাপি তিনি কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই।

শাঁপলোনের জীবনে সবচেয়ে বেশী দুঃখের কারণ হইয়াছিল, তাঁহার দলের লোকদের হিংসা ও দ্বেষ এমন কি সময়ে সময়ে তাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। কিন্তু ফরাসী নৃপতি শাঁপলোনের প্রতি ছিলেন বরাবরই বেশ সহানুভূতিশীল, কাজেই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কেহই তাঁহাকে বড় একটা জব্দ করিতে পারে নাই। প্রত্যেক আবিষ্কারকদের যেমন হয়, তেমনি শাঁপলোনকেও স্বজাতি ফরাসী, ইংরাজ, ওলন্দাজ এবং স্পেনীয়দের কাছ হইতে নানা প্রকার বাধা পাইতে হইয়াছিল। ইহার মূলে ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য ঘটিত ব্যাপার মাত্র। সে সময়ে কি যে তাঁহাকে কষ্ট করিতে হইত, তাহা ঠিক বলিয়া বুঝান চলে না। খাবার মিলিত না—সুস্বাদু পানীয় মিলিত না, বাসের যোগ্য স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব ছিল। ফরাসীদের এই নূতন উপনিবেশ New Franceএর অধিবাসীদের নির্ভর করিতে হইত সম্পূর্ণভাবে অদৃষ্টের উপর। কেননা—ইউরোপ হইতে জাহাজে তাহাদের খাদ্যদ্রব্যাদি আসিত, যদি নিয়মিতভাবে জাহাজ না আসিত, তাহা হইলে এই হতভাগ্যদের যে কিরূপ দুরবস্থার মধ্য দিয়া জীবন কাটাইতে হইত, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সময়ে সময়ে সে দেশের মাটিতে খাদ্যোপযোগী যাহা কিছু উৎপন্ন হইত তাহা হইতেই জীবনধারণ করিত। এসব নানা কারণেই শাঁপলোনকে বন্দী অবস্থায় সদলবলে ইংলাণ্ড যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়া শাঁপলোন তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে আবিষ্কারক, একাধারে যোদ্ধা এবং একজন প্রসিদ্ধ নাবিকরূপে খ্যাতিমান্ হইয়া গিয়াছেন। শাঁপলোনকে নূতন ফরাসী-উপনিবেশ-স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া ধরা যায়। ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে ২৫ শে ডিসেম্বর শাঁপলোনের মৃত্যু হয়। তাহার প্রায় ১২৪ বৎসর পরে ইহা ইংরাজ অধিকারে আসিয়াছে।

বার বছরের সুশ্রী ছোট্ট মেয়ে হেলেন বুলকে (Heleni Boulle) শাঁপলোন্ বিবাহ করেন। বাইশ বৎসর বয়সে হেলেন ক্যানাডায় স্বামীর নিকট আসেন। তাঁহাদের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শাঁপলোনের মৃত্যুর পরে হেলেন এত শোক-কাতর হইয়াছিলেন যে তিনি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া মঠে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

গাছের আত্মরক্ষা

২৫৪১ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া যখন জীবের বাসের উপযুক্ত হইল তখন জলেই প্রথম জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল পৃথিবীতে কি করিয়া জীবের উদ্ভব হইয়াছিল সে প্রশ্নের মীমাংসা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আজও করিতে পারেন নাই।

বেলপাতা ও কাঁটা

ধরণীর প্রথম জীব না ছিল উদ্ভিদ, না ছিল প্রাণী। তাহাদের শারীরিক গঠন ছিল যেমন সাধারণ, জীবন যাত্রার প্রণালীও ছিল তেমনই সহজ। কিন্তু একটা বিষয়ে তাহাদের হইল বিপদ, সূর্য্যের প্রখর তেজে জল গরম হইয়া উঠিলে আত্মরক্ষা করা।

আমরা সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ হইতে চক্ষু রক্ষা করিতে অনেক সময় রঙ্গিন চশমা ব্যবহার করি। সবুজ কাচ সূর্য্যরশ্মির তেজ কমাইয়া দেয় ও চোখ
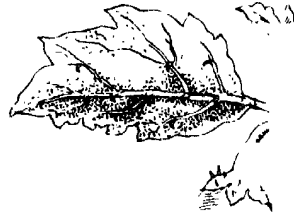
বেগুনের ডাঁটা, ফল ও পাতা

শীতল রাখে, এই রকমেই আত্মরক্ষার্থে পৃথিবীর আদিজীব নানা বর্ণের চর্ম্ম পরিধান করিল, ইহাতে সুবিধা হইল সকলেরই। সে কথা শোন।

যাহারা সবুজ বর্ণ পরিল তাহারা তাহাদের গায়ের সবুজ বর্ণের সাহায্যে সূর্য্যকিরণ ধরিয়া অজৈব পদার্থ (inorganic substance) হইতে সহজেই জৈব খাদ্য (organic food) প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল। সুতরাং খাদ্য সম্বন্ধে ইহারা হইল স্বাধীন। কিন্তু বিপদ হইল অন্য সকলকে লইয়া। তাহারা ইহাদিগকে ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল, কষ্ট করিয়া আবার কে খাবার তৈয়ারী করে! ফলে ক্রমে ক্রমে জীব জগৎ দুইটি বৃহৎ পরিবারে ভাগ হইয়া গেল। একটি হইল **উদ্ভিদ্**, অপরটি হইল **প্রাণী**। আর তাহাদের সম্বন্ধ হইল খাদ্য-খাদক। ইহাতে তাহাদের দেহের গঠনও হইল পৃথক। ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভিদের দেহ হইল ডালপালা শিকড় প্রভৃতিতে বিভক্ত, আর জীবের মাথা, হাত পা প্রভৃতিতে বিভক্ত। কিন্তু দেহের গঠন পৃথক হইলেও দুই জনের দেহের প্রাণবস্তুর (protoplasm) উপাদান আজও একই। সেই আদি না-প্রাণী-না-উদ্ভিদ জীব হইতে প্রাণিপরিবারের মানুষে ও উদ্ভিদ পরিবারের মহীরুহে আসিয়া পৌছিতে কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনায় ইহারা তো সে দিনের জীব!

কথায় বলে 'জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু'। গাছপালার প্রধান শত্রুও এই প্রাণী। সে ইহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে সৃষ্টির প্রায় আদি হইতেই। তাই উদ্ভিদকেও আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে বহুদিন হইতেই—নতুবা তৃণভোজী প্রাণীর কবল হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া বংশরক্ষা ও বিস্তার করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। শস্পভুক প্রাণীই বল আর মাংসাশী কিম্বা সর্ব্বভুক প্রাণীই বল ইহারা সকলেই খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। সমস্ত জীব জগতের জন্য খাদ্য প্রস্তুত একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই করিতে পারে। অন্য কাহারও এ ক্ষমতা নাই। গাছ তাহার সবুজ পাতায় সূর্য্যকিরণের সাহায্যে এই খাদ্য তৈয়ার করে। এই পাতা তোমরাই সর্ব্বদাই ছিঁড়িয়া থাক। আর গরু, ভেড়া ছাগল প্রভৃতির খাদ্যই হইতেছে গাছের কচি কচি পাতা ডালপালা। আমরা তো গাছের ভ্রূণ-হত্যা করিয়া তাহারই জন্য বীজে সঞ্চিত খাদ্য আহরণ করিয়া, আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করি। পশু, পক্ষী ফল ও শস্য খাইয়া, উই পোকামাকড় শিকড় প্রভৃতি কাটিয়া দিয়া গাছের উপর কতই না অত্যাচার করে!

প্রাণীরও আত্মরক্ষা করিতে হয়। গরু, ঘোড়ার কাছে যাও, শিং দিয়া গুতাইয়া দিবে, আর না হয়

বাবলা
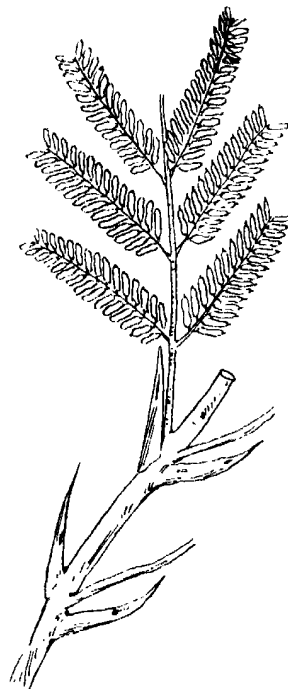
লাথি মারিবে। হরিণ দৌড়াইয়া পালাইবে। সাপের বিষ, কুমীর বাঘের হিংস্র স্বভাব, মৌমাছি, বোলতার হুল কত রকম বিভিন্ন উপায়েই না ইহারা আত্মরক্ষা করে। কিন্তু গাছ মাটিতে আবদ্ধ জীব। সে তো দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অথচ তাহাকেও জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার

F. 8—33

জন্য আত্মরক্ষা করিতে হয়। কেমন করিয়া সে তাহা করে সে কথা শুনিলে ও জানিলে তোমরা কম আশ্চর্য্য হইবে না।

কবি বলিয়াছেন—'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে' পদ্মের তো সামান্য কাঁটা কিন্তু এত

খেজুর পাতা

সাধের যে গোলাপ, কাঁটার ভয়ে তাহাকে না কত সন্তর্পণেই তুলিতে হয়? পায়ে বাবলার কাঁটা হাতে বেলের কাঁটা ফুটিয়া কত অঘটনই না ঘটিয়াছে। খেজুরের কাঁটার ভয়ে ছেলেরা তাহাকে দুর্জ্জনের মত ভয় করে। মফঃস্বলে তুমি সখের একটি বাগান করিয়াছ; কাঁটাতার কিংবা প্রাচীর দিয়া সেটাকে ঘিরিবার সঙ্গতি বা সুযোগ তোমার নাই। গরু-ভেড়ার বড়ই অত্যাচার। তাহাদের উপদ্রব হইতে বাগানের গাছ রক্ষা করিতে বাবলা ফণীমনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ দিয়া বেড়া দিলে।

প্রবাদ আছে 'ছাগলে কি না খায়?' কিন্তু এমন যে সর্ব্বভুক ছাগল সেও মাটিতে লুণ্ঠিত কাঁটানটে কিংবা কণ্টিকারীর গাছ ভয়ে স্পর্শও করে না। শিয়ালকাঁটার কাঁটার ভয়ে শিয়াল দূরের কথা মানুষও তাহার কাছে যায় না। বেতের কাঁটা

গোলাপ কাঁটা

তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। টুনটুনির নাকে বেগুন কাঁটা বিঁধিয়া সকলকে কত নাকালই না করিয়াছিল?

গাছের সর্ব্বত্রেই কাঁটা হইতে পারে। কাঁটার আকারও সকলের এক রকম না, গোলাপ ও বেতের কাঁটা হুকের মত, বেল, বাবলা প্রভৃতির কাঁটা যেমন শক্ত তেমনই তীক্ষ্ণ। গায়ের মাংসের মধ্যে বিঁধিয়া পড়ে। ফণীমনসার কাঁটা সূচের মত। খেজুরের কাঁটা যেমন শক্ত তেমনই লম্বা, কেয়া ও আনারস পাতার কিনারা পরীক্ষা করিও। আর লক্ষ্য করিও এই সমস্ত গাছ গরু বাছুর খায় কি না?

বিছুটির গাছ তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহার বিষাক্ত শুঁয়া একবার গায়ে লাগাইয়া দেখিও। ইহারা আক্রমণকারীকে কেমন করিয়া জব্দ করে তাহা জানিলে তোমাদের আশ্চর্য্য লাগিবে। বোলতা যেমন হুল ফুটাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে বিষ ঢালিয়া দেয় বিছুটিও তেমনই শত্রুপক্ষের শরীরে শুঁয়ার শক্ত আগা ঢুকাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিষ ঢালিয়া দেয়। তখন সে কি জ্বালা। বোলতার একটা হুল, বিছুটির পাতার গায়ে শত শত হুল, ছবিতে বিষাক্ত পদার্থপূর্ণ শুঁয়া গুলি দেখান হইয়াছে। কুমড়া গাছ প্রভৃতির গায়ে শক্ত শক্ত

বিছুটির শুঁয়া

শুঁয়া থাকার জন্য গরু বাছুর প্রভৃতির পক্ষে ইহারা তত সুখাদ্য নহে।

আবার ওল, কচু, মান প্রভৃতিও নিজকে নানা উপায়ে রক্ষা করে। প্রথমে ইহারা নিজেদের শরীর মাটির নীচে লুকাইয়া রাখে। খাদ্য প্রস্তুত ও ফুল ধারণ করিবার জন্য পাতা ও ডাঁটা দরকার মত মাটির উপর পাঠায়। এদের পাতা ডাঁটা প্রভৃতিতে এমন একপ্রকার পদার্থ থাকে যাহা মুখের মধ্যে লাগিলে মুখ চুলকায়। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে তেঁতুল ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। তাই কথায় বলে যেমন 'বুনো ওল তেমনই বাঘা তেঁতুল'। 'ওল খেয়ো না ধরবে গলা' তো তোমরা লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিয়াই শিখিয়াছ। ইহাদের শরীরে সূচের মত একপ্রকার অসংখ্য দানা থাকে যাহার ভয়েও প্রাণীরা ইহাদিগকে পছন্দ করে না। ওল চিবাইলেই এই দানাগুলি বাহির হইয়া মুখের নরম অংশে তীরের মত বিঁধিয়া একটা অস্বস্তি আনয়ন করে।

বিষাক্ত পদার্থ গাছের নানাস্থানে থাকিতে পারে,—কুচিলা, নকসভোমিকা, ডিজিটেলিস্, ধুতুরা, কলকে ফুল, করবী প্রভৃতি গাছের পাতায়, ডালে ফুলে, ফলে, নানাস্থানে বিষ থাকে, বেশী খাইলেই মৃত্যু অবধারিত। অনেক গাছ আছে যাহাদের পাতা ছিঁড়িলে কিংবা ডাল ভাঙ্গিলে দুধের মত শাদা রস বাহির হয়। অনেক সময় এই রসে বিষাক্ত পদার্থ থাকে। চোখে লাগিয়া চোখ কাণা হইবার অনেক খবর জানা গিয়াছে। আমরা একবার ছেলেদের লইয়া ক্যানিং গিয়াছিলাম। সেখানকার লোকেরা পূর্ব্বেই আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল যেন গেঁও গাছের দুধের মত রস চোখে

ফণামনসা

কিংবা গায়ে না লাগে। অনেক সময় রস লাগিয়া গায়ে ফোস্কা উঠিয়া বড়ই কষ্টদায়ক হয়।

বড় বড় গাছের একটা অবস্থার পর গরু, বাছুর ছাগল, ভেড়ার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার আর প্রয়োজন হয় না। তোমরা কলিকাতার, কিংবা অন্যান্য সহরের এমন কি গ্রাম্যপথের দুই ধারে বড় বড় গাছের সারি দেখিয়াছ। প্রথম যখন গাছ
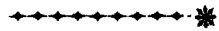
লাগান হয় তখন একটি খাচা দিয়া গাছটিকে ঘিরিয়া রাখে, গাছ বৃদ্ধি পাইয়া লম্বা হইয়া গেলে তখন আর খাঁচার দরকার থাকে না। গাছগুলির

আনারস

কাণ্ড হইতে প্রথম যে সমস্ত ডাল বাহির হইয়াছে তাহারা মাটি হইতে অত উপরে কেন? জেব্রা, ঘোড়া প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে নির্ভয়ে বিচরণ করে সেখানকার গাছের ডালগুলি গাছের অনেক উপরে থাকে। বরিশালের দিকে পায়লা বলিয়া একরকম জংলী গাছ দেখা যায় তাহার নীচের দিকের গুঁড়ি কাঁটাযুক্ত, উপরে শত্রুর নাগালের বাহিরের ডালও পাতাগুলি সাধারণ। শিমুল গাছেরও প্রায় এই রকম। পাশ্চাত্য দেশে The Common Holy এই রকমের গাছ। ইহাদের গায়ের ছালেও বিষ থাকে।

আত্মরক্ষার্থে গাছ প্রাণীর সাহায্যও বড় কম লয় না, মানুষ কত যত্ন করিয়া ফুলের, ফলের পাতাবাহারের গাছ রক্ষা করে। অবশ্য এই উপকারের প্রতিদান গাছ তাহার ফুলের সৌন্দর্য্য, সুমিষ্ট ফল, ঔষধ পত্রের উপাদান প্রভৃতি মানুষকে দেয়। সজিনা গাছে বর্ষাকালে শুঁয়া পোকা এমন বাসা বাধে যে কাহার সাধ্য সজিনা গাছে উঠে। পিপড়াকে আশ্রয় দিয়া কতগাছ আততায়ীর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করে।

মৃত্যুর ভাণ করিয়াও অনেক গাছ নিজেকে রক্ষা করে। এ সমস্ত গাছের আবার কাঁটাও থাকে। লজ্জাবতী গাছকে যখনই কেহ স্পর্শ করে তখনই পাতা সঙ্কুচিত করিয়া তাহার ডাঁটাগুলি ঝুলিয়া পড়ে, আর কাঁটাগুলি তখন স্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন উহাকে খাইবে কে? একে তো পাতা নাই তার উপর আবার কাঁটার খোঁচার ভয়!

বড় বড় গাছের উপর লতা দেখা যায়। মাটির কাছে, বড় গাছের নীচে তাহাদের একটি লম্বা
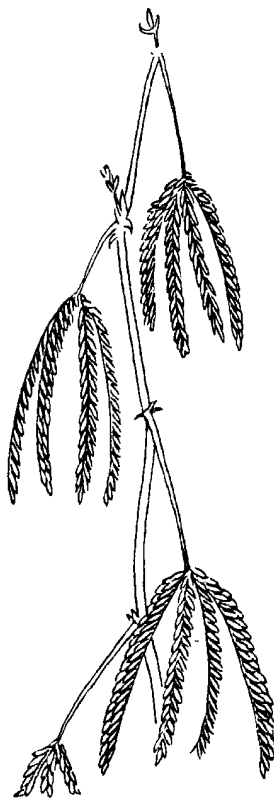
লজ্জাবতী

কাছির মত মোটা ডাল ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এ গুলি এত শক্ত ও দেখ্‌তে শুক্‌না যে তৃণ-ভোজী প্রাণী ইহাদের দিকে ফিরিয়াও দেখে না।

এই গাছগুলি একবার উপরে উঠিতে পারিলেই নির্ভয়। অনেক লতাগাছ এই রকমেই আত্মরক্ষা করে।

অনেক গাছ আছে যাহাদের পাতা, ফুলে এমন বিটকেল গন্ধ যে সে গন্ধ একবার যে শুঁকিয়াছে সে তাহার নিকট আর যাইতে চাহিবে না, গন্ধ-ভাদলের পাতার ও কচুর ফুলের গন্ধ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

লজ্জাবতী

মরুভূমিতে কিংবা বরফ ঢাকা পাহাড়ে মাটির নীচেই অনেক গাছ সারাজীবন কাটাইয়া দেয়। মরুভূমিতে এক পশলা বৃষ্টি হইল, কিংবা পাহাড়ের বরফ গলিয়া মাটি বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেখানটা সবুজ হইয়া গিয়াছে। ইহার দুই এক দিন পরেই দেখা গেল সবুজ গালিচার উপর নানা বর্ণের ফুলের কার্পেট বোনা হইয়াছে। তাহার পরের দিন দেখা গেল সেখানে কিছুই নাই, যে বালি সেই বালি, যে পাথর সেই পাথর। কোন্ যাদুকরের সোণার কাঠির স্পর্শে যেখানে নন্দন-কাননের সৃষ্টি হইয়াছিল ভোজবাজীর মত তাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই সকল গাছ তিন চার দিনের মধ্যেই তাহাদের জীবনযাত্রা শেষ করিয়া পুনরায় মাটির বা পাথরের নীচে সারাবছর লুকাইয়া থাকে।

আমরা যেমন ছদ্মবেশ ধরিয়া অনেক সময় শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাই, এমন অনেক গাছ আছে যাহারা যে সব গাছ গরু ছাগল প্রভৃতিতে খায় না তাহাদের আকৃতির অনুকরণ করিয়া শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পায়। আবার এমন গাছও আছে যার পাতা দেখিতে যেন ঠিক একটা সবুজ পোকা কি প্রজাপতির মত। পোকামাকড় ভাবিয়া অন্য জন্তু ইহাদের পাতা খায় না। কাজেই ইহারা তাহাদের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়।

এই তো গেল নানা উপায়ে আত্মরক্ষার কথা। ইহা ভিন্ন গাছের আর একটি সুবিধা হইতেছে যে একটি গাছ বহু সন্তান উৎপাদন করে। শত্রুরা কোন প্রকারেই ইহাদের বংশ নির্ম্মূল করিতে পারে না, এরা যেন রক্তবীজের ঝাড়! যত কাট যত মার কিছুতেই বংশ লোপ করিতে পারিবে না। কচুরীপানাকে আজ পর্যান্ত সারা পৃথিবীর লোক নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও শেষ করিতে পারিয়াছে কি? পারিবে কি? অথচ গরীব চাষীর এত বড় শত্রু আর কেহ নাই!

তোমরা হয়তো ভাবিতেছ তাই তো নিরীহ চলংশক্তিহীন গাছের এই প্রকারে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন আর উপায়ই বা কি আছে? আহা বেচারা! কিন্তু গাছ মাত্রকেই অত গো-বেচারা মনে করিও না, সুযোগ পাইলে ইহারাও পোকা মাকড় ধরিয়া খাইতে কসুর করে না, আর সে জন্য এমন সুন্দর ফাঁদ তৈয়ার করে যে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের কথা আর একদিন তোমাদিগকে বলিব।

প্রাণীর এত বড় শত্রুও আর কেহ নাই। সুযোগ বুঝিয়া ইহারা মানুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। কলেরা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি মহামারী ইহাদের আক্রমণেই প্রকাশ পায়। ইহারা নানা ভাবে প্রাণীর শত্রুতা সাধন করে। সব চাইতে মুস্কিল ইহারা অদৃশ্য শত্রু। একা মেঘনাদ রামের মত বীরকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, আর ইহারা অশেষ শক্তিসম্পন্ন কোটি কোটি অদৃশ্য মহাশত্রু। ইহাদের কথাও বারান্তরে বলিব। তোমাদের বেশ ভাল লাগিবে

সমুদ্র তল

২৪৪৮ পৃষ্ঠার পর

আগে তোমাদিগকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে সমুদ্রের জলের মধ্যে অন্য কত রকম বিভিন্ন পদার্থ মেশানো রয়েছে। সামুদ্রিক জীব ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ সেই সকল পদার্থ হতেই তাদের দেহ গঠনের ও দেহ রক্ষণের মালমসলা সংগ্রহ করে। এ কথাও তোমরা এখন শিখেছ যে মহাসাগরের জলরাশি দণ্ডমাত্রও স্থির থাকে না,—বায়ুর তাড়নে, চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে ও অপর নানা কারণে সেই জলরাশি সদাই চঞ্চল, ক্ষুব্ধ ও অশান্ত। সমুদ্র গর্ভের জীবজগতের গতিবিধি বুঝতে হলে কিন্তু আরও কয়েকটা কথা তোমাদের জানা দরকার। সে কথাগুলি মোটামুটি এই :—

(১) সমুদ্রে কত জল ? অর্থাৎ সমুদ্রের কোনখানটা কত গভীর ?

(২) সাগর জলের উত্তাপ কত ? কি কারণে সেই উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় ?

(৩) সাগরের তলদেশে, জলের নীচে আছে কি ? অর্থাৎ সাগরতল কি উপাদানে গঠিত ?

(১) ভূগোলে তোমরা পড়েছ যে পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগের কম বেশী তিন গুণ। ভূমণ্ডলকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই গোলার্দ্ধে ভাগ করলে দেখবে, যে উত্তর গোলার্দ্ধ স্থলপ্রধান ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ জলপ্রধান। জলস্থলের এই রকম ভাগ কেন হয়েছে তার কারণ পণ্ডিতেরা আজও নির্দ্দেশ করেন নাই। সে যাই হোক, জলভাগ যে পাঁচটা মহাসাগরে বিভক্ত, তার নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান : উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের মহাসমুদ্র, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া থাকলেও এই মহাসাগর গুলি পরস্পরের সঙ্গে জোড়া, অর্থাৎ পাঁচটা মিলে এক অখণ্ড বারিমণ্ডল। পৃথিবীর মানচিত্র দেখলেই এটা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এই যে বারিমণ্ডল, এ কি আমাদের ক্ষিতিমণ্ডল থেকে একটা কোন আলাদা জিনিস ? নিশ্চয় নয় ! মহাসাগর মানে জলে ঢাকা মহাদেশ মাত্র। জলে ঢাকা কেন ? না, ক্ষিতিমণ্ডলের ঐ ভাগ সবচেয়ে নীচু—নদীর জল, বৃষ্টির জল, সব গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে ঐ নীচু জায়গায় জমা হয়েছে ও হচ্ছে। তোমাদের গ্রামে যেমন নীচু জমীতে খাল-বিল, পুকুর, ডোবা হয়—ভূমণ্ডলে তেমনই মহাসমুদ্র হয়েছে।
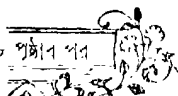
আচ্ছা, এই যে মহাসাগর, যাকে সেকালের লোকে অগাধ, অতল, অসীম ইত্যাদি নাম দিয়েছিল এ কত গভীর, এর গভীরতার কি সীমা নাই, মাপ হয় না ? হয় বৈ কি ! মানুষ যখন আজ অনন্ত আকাশের মাপজোখ করে ফেলছে, তখন সমুদ্রগর্ভ কি আর অজানা থাকতে পারে ! শতাধিক বছর ধরে পণ্ডিতমণ্ডলী নানা

যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমুদ্রের জল মাপছেন। পৃথিবীর উপরে, এমন কি সাগরগর্ভে, আজ খুব কম জায়গাই আছে, যা তাঁদের কাছে অজানা, অনাবিষ্কৃত। এইখানে পৃথিবীর একটা নক্‌সা দিচ্ছি, ভাল করে দেখ, এতে মহাসমুদ্রের কোনখানে কত জল, তা পরিষ্কার করে দেখান রয়েছে।

এ পর্য্যন্ত সবচেয়ে গভীর জল যা পাওয়া গেছে, তার মাপ ৫২৬৯ বাম। এক বাম, ধর, ছয় ফুট তাহলে ৫২৬৯ বাম হল তিন ক্রোশের কিছু কম। এই মাপ নেওয়া হয়েছিল মার্কিন জাহাজ "নেরো" হতে উত্তর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে। সে স্থানটার নাম দেওয়া হয়েছে "চেলেঞ্জার" ডীপ (Deep) বা গহ্বর। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অলড্রিচ গহ্বরও পাচ হাজার বামের চেয়ে বেশী গভীর অন্যূন চার হাজার বাম গভীর গহ্বর মোট দশটা এ পর্য্যন্ত জানতে পারা গেছে।

সারা ভূমণ্ডলকে যদি বেঁদা মেরে সমান করে নেওয়া যেত, আর বারিমণ্ডলের সব জল তার উপর চারিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে সে জল হত প্রায় ১৩০০ বাম গভীর। কিন্তু সমুদ্রের নীচেটা ত সমতল নয়, তাই তার জল কোথাও এক হাঁটু, কোথাও ছয় মাইল। একটা সরাসরি হিসাব নীচে দিচ্ছি। তার থেকে তোমরা বুঝবে যে মহাসাগরের অর্দ্ধেকের বেশী জায়গা দুই হতে তিন হাজার বাম গভীর। গভীরতার একটা হিসাব দিলাম।

সমুদ্রের তলদেশ

বেলাভূমি হতে	বাম পর্য্যন্ত		শতকরা
১০০০	২০০০	" "	১৯
২০০০	৩০০০	" "	৫৮
৩০০০ বামের চেয়ে বেশী		"	৭

সমুদ্রের এই যে একশো বাম অবধি অংশ, এটা প্রধানতঃ বেলাভূমির লাগা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাদেশগুলোকে ঘিরে এই রকম একটা Continental Shelf বা ধাপের মতন আছে। এই

ধাপ কোথাও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, কোথাও অল্প পরিসর, কিন্তু আছে সর্ব্বত্রই। একে তোমরা মহাদেশের ভিত বলতে পার। এ যেন মহাদেশেরই জলে ঢাকা অংশ। অনেক স্থলেই এর সীমারেখা সমুদ্রতটের সীমারেখার অনুগামী। অর্থাৎ বেলাভূমি যেখানে সোজা, এই তাকের সীমারেখাও সোজা। বেলাভূমিতে যেখানে বাঁক আছে, তাকের সীমা-রেখাতেও সেখানে সেই রকম বাঁক আছে। হয়ত অতীত যুগে এইখানটায় মোটে জল ছিল না, তাকের বর্ত্তমান সীমান্তরেখা পর্য্যন্ত মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। সাগর তটের এই তাকের উপর কখন কখন গভীর খদ বা ফাটল দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো, বোধ হয়, পুরাকালের নদীগর্ভের ধ্বংসাবশেষ। ইউরোপের রাইন, আফ্রিকার কঙ্গো, ও আমেরিকার হডসন ইত্যাদি নদীর মোহনাতে সমুদ্রের তাকের উপর এই রকম দীর্ঘ, গভীর, অল্পপরিসর খদ দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গোপ-সাগরের যে কল্পিত চিত্রটী পরে দিয়েছি তাতেও এই রকম এক খদ দেখতে পাবে, তবে একটু নীচের দিকে। উপরের অংশটা পলিমাটি পড়ে পড়ে বুজে গেছে।

মহাদেশের ভিত যাকে বলছি, সেটা ঈষৎ গড়ানে জমী। কিন্তু তার পরে সমুদ্রতল খুব দ্রুত নেমে গেছে একশো হতে হাজার বাম পর্য্যন্ত। এই খাড়া মতন অংশটাকে আগে Continental-Slope বা মহাদেশের পাড় বলত। এখন পণ্ডি-তেরা সমুদ্র কিনারের shelf ও slope দুটোর একত্র এক নূতন নাম দিয়াছেন Epicontinental বা উপমহাদেশীয় Zone। হাজার বাম পর্য্যন্ত গভীর এই Zone পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশের কিনারা বরাবর বেশ স্পষ্ট করে দেখান রয়েছে।

এই পাড় যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে সুরু হল যথার্থ সমুদ্র গর্ভ। এখন, এই যথার্থ সমুদ্র গর্ভ সম্বন্ধে তোমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। মানচিত্রখানা যত্ন করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখানেও সমুদ্রতল সমভূমি নয়, বন্ধুর প্রদেশ। কিন্তু এর বন্ধুরতা ও ক্ষিতিমণ্ডলের বন্ধুরতায় প্রভেদও যথেষ্ট। আজ যদি আটলাণ্টিক মহাসাগর শুকিয়ে যায়, আর সমুদ্রতলে রেলের লাইন পাততে হয় ত খুব বেশী স্থপতি বিদ্যার প্রয়োজন হবে না। পুল বাধা, পাহাড় কাটা, সুড়ঙ্গ করা, যা নইলে ডাঙ্গার উপরে পাঁচশো মাইল রেলও পাতা যায় না, তার খুব কম দরকার হবে সমুদ্রতলে রেলপথ করতে। পাহাড় পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, সবই সেথায় আছে। কিন্তু তারা অধিকাংশ গোলগাল মোলায়েম রকমের। কেন, তা তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার। আমাদের ডাঙ্গার উপর যে পর্ব্বত, মালভূমি, উপ-ত্যকা আছে, সে গুলো জল ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে ক্রমা-গত যুদ্ধ করছে, আর সেই যুদ্ধের ফলে তাদের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আমাদের পাহাড় পর্ব্বত দুর্গম, দরী, উপত্যকা গভীর ও বন্ধুর। সাগর গর্ভে ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ নেই, বরং সামুদ্রিক স্রোতের দ্বারা বাহিত বালি কাদা মাটি পড়ে পড়ে ছোট খাটো খানা খোন্দল ভরে যায়। তাই জলের মধ্যের পাহাড় পর্ব্বত বেশীর ভাগ গোলগাল গড়নের। তবে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। বাহির সমুদ্রে খাড়া পাহাড় গভীর উপত্যকা যে একেবারে নেই, তাও নয়।

তারপর, কি জান, ভূগর্ভের আগুনের ঠেলা ডাঙ্গাতেও যেমন আছে, সমুদ্রেও তেমনই আছে। তাই সাগর গর্ভে আগ্নেয়গিরির অপ্রতুল নেই, আগ্নেয় ক্রিয়া জনিত গভীর ফাটলেরও অভাব নেই। এই আগ্নেয় পর্ব্বত গুলোর কোনটার বা চূড়া জলের বাহিরে জেগে রয়েছে, কোনটা বা সম্পূর্ণ জলমগ্ন। সমুদ্রে অজস্র দ্বীপ আছে, এ কথা তোমরা ভূগোলে পড়েছ। এই দ্বীপগুলিকে সাধা-রণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলি মহাদেশের অবশিষ্ট খণ্ডমাত্র, অর্থাৎ আগে মহা-দেশের সামিল ছিল, এখন আগ্নেয় ক্রিয়ার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কতকগুলি আগ্নেয় দ্বীপ অর্থাৎ ভূগর্ভের আগুনের ধাক্কায় সমুদ্রতল হতে উঠে পড়েছে। আবার কতকগুলি প্রবালদ্বীপ, অপরিমেয় প্রবাল কীটের পঞ্জর দিয়ে গঠিত। পণ্ডিতেরা যে কোনও দ্বীপের মাটি পাথর পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারেন কোন দ্বীপ কোন শ্রেণীভুক্ত।

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের কাল্পনিক চিত্র

পুরাকালে চা-খড়ির যুগে, অষ্ট্রেলিয়া হতে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ হতে আফ্রিকা, আফ্রিকা হতে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যান্ত বিস্তৃত এক অখণ্ড মহাদেশ ছিল। মাদাগাসকার, লঙ্কা, সুমাত্রা, পাপুয়া, অষ্ট্রেলিয়া, সব সে যুগে সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল। তাই এই দ্বীপগুলিকে মহাদেশীয় দ্বীপ বলে।

আগ্নেয়দ্বীপের উদাহরণ স্বরূপ প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই, সামোয়া, টাহিটি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু সব সময় ত ঠিক বলা যায় না! ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নানা রকম ব্যাপার ঘটেছে। সেখানকার জমীতে আগ্নেয় শিলাও দেখা যায়, জলজ পাথরও পাওয়া যায়, আবার প্রবাল প্রস্তরেরও অভাব নেই। দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে যেখানে জলের উপরের স্তরের তাপ ৭০ ডিগ্রীর চেয়ে কম হয় না, সেখানে অসংখ্য প্রবালদ্বীপ আছে। কি করে ধীরে ধীরে এই দ্বীপগুলি প্রবাল কীটের পঞ্জর স্তূপ হতে গড়ে ওঠে, তা তোমরা নিশ্চয় সকলেই জান।

একটা কথা মনে রাখবে যে এই তিন জাতীয় দ্বীপ পাশাপাশি একই সমুদ্রে থাকতে পারে। ফিজি পুঞ্জে আছে। একটা মজার গল্প বলি শোন। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের কাছে ক্রাকাটোয়া নামে এক ছোট দ্বীপ ছিল। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একদিন হঠাৎ ভূগর্ভের অগ্নি উৎপাতে এক মুহূর্তে সেই দ্বীপ লুপ্ত হয়ে গেল, তার ধূলো বালি আকাশে দু বছর ধরে উড়ে বেড়াতে লাগল। এখন শোনা যাচ্ছে যে সেই স্থানে এক নূতন দ্বীপ গড়ে উঠছে। আগেকার ক্রাকাটোয়া ছিল জলজ পাথরে গঠিত ভূখণ্ড। নূতন দ্বীপ হয়ত আগ্নেয় পাথরের হবে, কেউ ঠিক বলতে পারে না।

সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে আর বেশী বলব না। আগামী বারে সাগর জলের মাপ কি করে কি যন্ত্র সাহায্যে নেওয়া হয়, সে কথা অল্প কিছু বলব। এই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের একখানা কাল্পনিক চিত্র দিচ্ছি, যত্ন করে দেখো। অনেক কথা যা উপরে বলেছি তা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হবে। সমুদ্রের প্রায় পচিশ হাজার ফুট উপরে উত্তর মুখো দাঁড়িয়ে (যদি জলের ভিতর দিয়ে নজর চলে তাহলে) সমুদ্রতল যে রকম দেখাবে এটা তারই চিত্র। নক্সা নয়, ছবি। দূরে কাছে বোঝা যায় এই রকম করে (perspective-এ) আঁকা হয়েছে। ভারত ও ব্রহ্মদেশের উপকূলের লাগা একশো বাম অবধি গভীর যে তাক আছে তা চিত্রিত হয়েছে। এই তাক, দেখ, কোথাও সরু, কোথাও বেশী চওড়া। তারপর দেখ, লঙ্কাদ্বীপ ও আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এই রকম তাকের উপর অগভীর জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকের পর আর একটু ঘন রঙ্গে দেখান হয়েছে হাজার বাম অবধি গভীর ঢালে Continental-Slope। এই Slope যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকে আরম্ভ দু'হাজার বাম অবধি গভীর সাগর গর্ভ। এই অংশটা চিত্রকর আরও ঘন রঙ্গ ফলিয়ে দেখিয়েছেন। কিন্তু ছবির রঙ্গ বিন্যাস থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সাগরতল সমভূমি নয়, বন্ধুর প্রদেশ। নীচে বাঁয়ের দিকে দেখ একটা মস্ত বড় খদ। এই খদ বহু দূর পর্যান্ত ভারত সমুদ্রে চলে গেছে। উপরে ব্রহ্মপুত্রের মোহানার কাছে তাকের উপর একটা কালো বাঁকা দাগ দেখতে পাচ্ছ? ঐ দাগ হচ্ছে পুরাকালের নদীগর্ভের চিহ্ন। ওর উপর ভাগটা পলিমাটি পড়ে বুজে গেছে।

(২) সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের উত্তাপ এক নয় হতেও পারে না, এ কথা তোমরা সহজেই আন্দাজ করতে পার। তবে ডাঙ্গার বিভিন্ন ভাগের উত্তাপের যত তফাৎ হয়ে থাকে, সমুদ্রের উত্তাপ ভেদ তার চেয়ে ঢের কম। এক দিকে সমুদ্রে মেরু সব চেয়ে কম উত্তাপ যা দেখা গেছে, তা ২৬°, ছাব্বিশ ডিগ্রী। অপর দিকে উষ্ণ প্রদেশে সব চেয়ে বেশী তাপ যা পাওয়া গেছে, তা পারস্য সাগরে ৯৬°। অর্থাৎ দুটোর মধ্যে তফাৎ সবে ৭০°। ক্ষিতি মণ্ডলের বিভিন্ন অংশের উত্তাপের প্রভেদ ২০০°-র চেয়েও বেশী। এর দুই কারণ। প্রথম, মাটি-পাথরের চেয়ে জল তাতে ও জুড়ায় অনেক দেরীতে। দ্বিতীয়, সমুদ্রে নানা প্রকার জলপ্রবাহ থাকার দরুন ঠাণ্ডা জল ও গরম জল ক্রমাগত মিশে যাচ্ছে।

জলের তাপের হ্রাস বৃদ্ধির মোটামুটি চারটী কারণ তোমরা জেনে রেখো। প্রথম, কোনও স্থান

নিরক্ষরেখা বা মেরু হ'তে কত দূরে অবস্থিত তার উপর সেই স্থানের জলের উত্তাপ অনেকাংশে নির্ভর করছে। এজন্য যে কত প্রকার হয় তা উপরেই বলেছি। তার পর, বৎসরের ঋতুভেদে বা দিবসের বেলা ভেদে জলের তাপ ক্রমাগত কমবেশী হচ্ছে। অর্থাৎ পৌষমাসে জল যত গরম বৈশাখ মাসে তারচেয়ে ঢের বেশী গরম হয়ে যায়, ভোর বেলায় যত গরম থাকে দুপুর বেলায় তার চেয়ে ঢের বেশী গরম হয়। এ সব কিন্তু হল জলের উপরের স্তরের কথা। যত নীচে নেমে যাবে উত্তাপ আপনা হ'তে তত কমে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা সাঁতার জান তারা পুকুরে ডুব দিয়ে এই ব্যাপার কতকটা দেখে থাকবে। মাঝ পুকুরে ভরা কলসেও তলার জল যেন কনকন করে। উষ্ণ প্রদেশে সমুদ্রের উপরের জল সরাসরি ৮০° থাকে, কিন্তু তলার জলের উত্তাপ ৩৫° র বেশী হয় না। গভীর জলের উত্তাপ দেখবার জন্য যে সব যন্ত্র ব্যবহার হয় সেগুলো এত জটিল যে তার বর্ণনা এখানে আর করব না। তবে মোটামুটি জেনে রাখ যে একটা বোতলের মত পাত্রের মধ্যে পারার থার্মমিটার বসিয়ে সেই পাত্রটাকে গভীর জলে নামিয়ে দেওয়া হয়। এমন ব্যবস্থা আছে যে পাত্রটা উপর হ'তে খোলা ও বন্ধ করা যায়। তলায় নামিয়ে দিয়ে পাত্রের মুখ খুলে দিলেই সেটা জলে ভরে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে থার্মমিটার তার উত্তাপ নির্দেশ করে। তখন বোতলের মুখ আবার বন্ধ করে তাকে টেনে উপরে বার করে আনা হয়। বোতলটা এমন উপাদানে তৈরী যে তার গায়ের মধ্য দিয়ে তাপ চলাচল প্রায় হয় না। এই রকম যন্ত্রের সাহায্যে আজ উপর নীচে সকল সমুদ্রের তাপের হিসাব হয়ে গেছে।

এখন তোমরা বেশ বুঝতে পারলে যে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ উহার অন্যান্য অংশ অপেক্ষা উষ্ণ। যেখান হ'তে যে অংশ যত গভীর, তাহার জলও ক্রমশঃ অধিক শীতল হ'তে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডল ও উভয় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অভ্যন্তরেই এই নিয়মের প্রকৃতরূপ উপযোগিতা দেখা যায়। কিন্তু হিম-মণ্ডলে এর সম্পূর্ণ বিপর্যয় হয়ে থাকে। সেখান-কার সাগরজলের উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ বেশী গরম, এবং গভীরতা অনুসারে সেই উষ্ণতার কম বেশ দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, সুমেরু ও কুমেরু সাগরে শীতের সর্বাপেক্ষা প্রাদুর্ভাব বলে বৎসরের অধিকাংশ সময় সেখানকার উপরিভাগ বরফে ঢাকা থাকে। সুতরাং সাগরের উপরিভাগে বরফ ও সঞ্চিত হয়। বরফ জল অপেক্ষা লঘু এই জন্য উহা জলের উপর ভাসতে থাকে এবং বরফ বা বায়ুর মধ্য দিয়ে শীত প্রবেশ করতে পারে না। এ জন্যই কিয়ৎ পরিমাণে বরফ জমলে এই উপরের বরফ স্তূপ নিম্নস্থ জলকে শীত হ'তে রক্ষা করে থাকে। সুতরাং নীচের জল উপরের চেয়ে তরল ও উষ্ণ থাকে এবং সমুদ্রের তল পর্যন্ত বরফ হ'তে পারে না। কিন্তু বরফ যদি জল হ'তে ভারি হ'ত, তাহলে উহা কঠিন হওয়া মাত্র গুরুত্বের জন্য সমুদ্রজলের ভিতর ডুবে যেত আর উপরের জল জমে বরফ হ'ত। এই ভাবে ক্রমশঃ শীত প্রধান সমুদ্রের সমস্ত জলরাশি জমে বরফ হয়ে যেত, সমুদ্রস্থ জলজন্তুর মৃত্যু হ'ত ও জাহাজের গতিবিধি বন্ধ হয়ে যেত।

তা ছাড়া মেরুর কাছাকাছি সাগরের জলও শীতকালে বহুদূর পর্যন্ত বরফে ঢাকা থাকে বলে স্থলভাগের ন্যায় কঠিন হ'য়ে পড়ে। সে সময়ে অনায়াসে তার উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ান যায়। গ্রীষ্মকালে এই সকল বহুদূর ব্যাপ্ত বরফ আবার গলে জল হয়ে যায়। সমুদ্রের জল জমে বরফ হলে, সে জলে আর লবণ থাকে না। সেই জলের লবণাংশ বরফরাশি হ'তে পৃথক হয়ে নীচের জলের সঙ্গে মিশে যায়।

শ্যামদেশ

২৫১ পৃষ্ঠার পর

শ্যামদেশের সম্বন্ধে অন্যান্য যাহা কিছু জানিবার আছে, এইবার তাহা বলিতেছি। এদেশের প্রাকৃতিক শোভার বৈচিত্র্য আছে। নদী ও জল এবং বন বন, কড়ে ঘর গুলির গড়নের নকশার সহজেই চোখে পড়ে। ছোট ছোট খালের উপর যে সাঁকো বা পুল দেখা যায় তাহাও অনেকটা বাঙ্গলাদেশের মত। এদেশের খাল ও ছোট ছোট নদীর নীচু পাড়গুলি বাঁশবন, তাল গাছ এবং নানা জাতীয় ছোট বড় গাছপালায় ঢাকা। এই সব গাছ-পালার আড়ালে, দূরে দূরে এক একটি গ্রাম দেখা যায়। ঐ ছবিতে যে খালটি দেখিতে পাইতেছ, তাহার উপরের কাঠের পুলটি ঠিক যেন আমাদের বাঙ্গলা দেশের একটা গ্রামের খালের উপর পুল। এখানকার বাড়ী ঘর গুলি কাঠের উঁচু মাচানের উপর তৈরী। নদীর জল ঠিক নিম্ন বঙ্গের বর্ষার প্লাবনের মত বাড়ী ঘরের নীচ দিয়া বহিয়া যায়।—এখানকার নৌকার গড়নের সঙ্গে যে বাঙ্গলা দেশের নৌকার গড়নের অনেকখানি তফাৎ তাহা ত চোখেই বেশ দেখিতে পাইতেছ। শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক যে কেবল শ্যামদেশের বৃহত্তম নগরী তাহা নহে বহির্ভারতের অন্য সব দেশের সহর হইতেই ইহা বৃহৎ। এই সহরের মধ্য দিয়াও বড় বড় জলপ্রণালী বহিয়া গিয়াছে। সে কালের রাজধানী অযোধ্যার কথা তোমাদের কাছে বলিয়াছি। অন্যান্যকে য়োরোপের ভেনিস সহরের ন্যায় ভাসমান নগরী বলিলেই ঠিক হয়। তোমরা যদি পদ্মা পাড়ের কোন গ্রামে বর্ষাকালে বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাই মিলিয়াছে,—কিন্তু
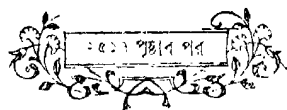
নদী ও পল্লী

ব্যাঙ্ককের খাল

অয়্যাথ্যার সাধারণ দৃশ্য

হাটের ভিতরে জল আর সারি সারি নৌকাতে জিনিষ পত্রাদির কেনা বেচা হইতেছে। অয়ুথ্যার ছবিটি একবার দেখ দেখি! দেখিতে পাইবে ঠিক সেরূপ ভাবেই কেনা বেচা চলিতেছে। সারি সারি নৌকা। নৌকাগুলি আসিতেছে যাইতেছে। কোনটিতে ছই আছে, কোনটিতে নাই। নদীর পাড়ের ঘরগুলি ও জলের উপর ভাসিতেছে।—ব্যাঙ্কক ত মেনাম নদীর ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত।

শ্যামের অধিবাসী—সে কবে কোন্ যুগে শ্যামদেশের সব চেয়ে প্রাচীন অধিবাসী কে বা কাহারা বাস করিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা ভাবে নানা কথা বলেন। একথা সত্য যে খুব সত্যি-কালের লোকদের সম্বন্ধে সব দেশেই অনুমান করা

লাওয়াদের মেয়ে

ছাড়া জানিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে শ্যামদেশে মানুষের বাস ছিল, সে বিষয়ে অনেক কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল আদিকালের জাতির পরিচয় পাই তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ জাতি বিভাগ করা যাইতে পারে।

নেগ্রিটা — সেমাঙ্গ, খামের, উযান্ (আনামী)

মোন-আনাম্ — ওয়া, কাচে, চোঙ্গ, মলয়দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মোন্আনামদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

তিব্বত-বর্ম্মা — মিও বা মিয়াও, লাহু, কাই, আকা, নিশা, ইয়াও

লাওতাই — থাই (শ্যামদেশী), লাও, শান্, সাম্সাম্

অজ্ঞাত জাতি — কারেন্, সাকাই

লাওয়ারা পাহাড়ে থাকে। ইহারা পার্ব্বত্য জাতি। পাহাড়ের উপর এক প্রকার পার্ব্বত্য ধানের চাষ করে। ইহাদের জনসংখ্যা দিন দিনই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। লাওয়া জাতি ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানায় বিশ্বাস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৌদ্ধ পুরোহিতদেরও আধিপত্য যে বড় কম তাহা নহে। তাহারাও সময় সময় এ সব পূজা অর্চ্চনার সাহায্য করিয়া থাকে। মিয়াওদের সঙ্গে কিন্তু শ্যামদেশের অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতির সহিত অনেকটা তফাৎ আছে। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিরা অনেক সময় কাপড় ইত্যাদি পরে না, কিন্তু মিয়াও-

দের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সকলেই সুন্দর পোষাক পরে। পুরুষেরা নীল রঙের ঢিলা পা জামা, কোট পরে, আর মেয়েরা লম্বা জামা, জ্যাকেট ইত্যাদি পরিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের মাথার পোষাক। অতি

মিয়াও স্ত্রীলোক

অদ্ভুত রকমের। ছবিতে তাহার অনেকটা আভাস পাইবে।

মিয়াওদের সংখ্যা শ্যামদেশে খুব বেশী নাই। ইহারা কাঠের তৈরী কিংবা মাটির পুরু দেওয়াল দেওয়া মজবুত ঘরে থাকে। সাধারণতঃ ইহারা উঁচু পাহাড়ে বাস করিতেই ভালবাসে। গৃহস্থালীর সরঞ্জামের মধ্যে তক্তপোষ, টেবিল, টুল ইত্যাদি থাকে। পাহাড়ের কিনারার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ইহারা চাষবাস করে। ভুট্টা, তামাক, শণ পাট, শাক সব্জী ও আফিং ইত্যাদি হইতেছে—প্রধান। মিয়াওরা ছাগল, গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুও পুষিয়া থাকে।

মিয়াও মেয়েরা তাঁত বুনিতে বেশ দক্ষ। সূচী-কার্যেও ইহারা সুনিপুণা। ধর্মের দিক দিয়া ইহারাও উন্নত নহে। প্রেতপূজা ইহাদের প্রধান ধর্ম। পূজাতে নানা প্রকার পশু-পক্ষী বলি দেওয়া হয়। তখন ইহারা নানারূপ হল্লা করে। মিয়াওরা শব দেহ কবর দেয়। কিন্তু কবরের ধারে একটা সাদা মুর্গী বাঁধিয়া রাখে। ইহাদের বিশ্বাস যে অন্য কোন জীবজন্তু আসিয়া যদি স্বর্গে যাইতে বাধা দেয় তাহা হইলে এই মুর্গী তাহাকে বাধা দিবে। এই রকম রীতি পশ্চিম ব্রহ্মদেশের চিন্‌বোক (Chinbok) জাতির মধ্যে ও প্রচলিত আছে। মিয়াওরা বলে যে এক সময়ে তাহাদের লিখিবার এক প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, কিন্তু

মিয়াও তরুণী

তাহা আর তাহাদের নাই। এখন তাহারা চীনা হরফ্ ব্যবহার করে। চীনা পঞ্জিকা অনুসারে ইহারা দিন ক্ষণ বিচার করিয়া চলে। চীনা হরফ্ হইলেও ইহাদের মধ্যে অল্প লোকই লিখন-পঠন-ক্ষম। এখন ক্রমশঃ শিখিতেছে।

মিয়াও স্ত্রীলোক তাঁত বুনিতেছে

কারেন্ বালক-বালিকা

ইয়াও পুরুষ ও স্ত্রী (দোইসাওয়া)

এইবার **ইয়াও ও কেরিয়েনদের** কথা বলিতেছি। ইয়াওদের উপর চীনা সভ্যতার ছাপ পড়ায়, তাহারা অনেক বিষয়ে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এজন্য তাহারা অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াই চলে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মোটামুটি ভাবে চীনা পুঁথি পত্র পড়িতে পারে। যারা একেবারেই নিরক্ষর তারাও বইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এমন ইয়াও পরিবার দেখা যায় না যেখানে দুই একখানা বই নাই।

কারেন—এইজাতি ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশের সীমান্ত প্রদেশে বাস করে। ইহাদের এমন কোন কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস নাই যাহা হইতে জানা যাইতে পারে, তাহারা কবে কোথা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বোধ হয় ইহারা নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মে ও শ্যামে আসিয়া বাস করিতেছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইহারা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে শ্যামের অধিবাসী। শ্যামে আরও যে অনেক আর

শ্যামের বিস্তৃত ধান চাষের জমি

ইয়াওরা তাহাদের বাড়ী কাঠ দিয়া তৈরী করে, মেজ মাটী দিয়া গড়ে। ঘরের ভিতরটা ভয়ানক অন্ধকার থাকে। অনবরত চুল্লির ধোঁয়ায় ঘরের ভিতরটা ভয়ানক অন্ধকার হইয়া যায়।

ইয়াওরাও ধান, তুলা, আফিং, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ করে। ইহাদের গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গোরু ছাগল, মুর্গী ও শূকর। ধর্ম্ম সেই প্রেতপূজা। ইহারা মৃতদেহ দাহ করিয়া চিতাভস্ম কবর দেয়। ইয়াওদের কোন কোন শাখা মৃতের কবর দিয়া থাকে। মৃতের সমাধি কালে শূকরবলি দেওয়ার প্রথা আছে।

সকলের কথা নাই বা বলিলাম। প্রায় প্রত্যেক জাতিরই রীতি নীতি এবং কাহারও ভাষার বেশ ঐক্য রহিয়াছে।

কৃষি ও শিল্প—কৃষি ও মৎস্য ব্যবসায় এদেশের প্রধান উপজীবিকা। এ দেশের অধিকাংশ লোকই চাষবাস করিয়া ও মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করে। ছবিতে দেখ কৃষকেরা ক্ষেতে বোরো ধান রোপণ করিতেছে আবার ঐ দেখ শ্যামদেশীয় জেলে মাছ ধরিতে জাল ফেলিয়াছে। শ্যাম উপসাগরের কাছাকাছি একটি ধীবর-পল্লীর চিত্র দিলাম। এই চিত্রে
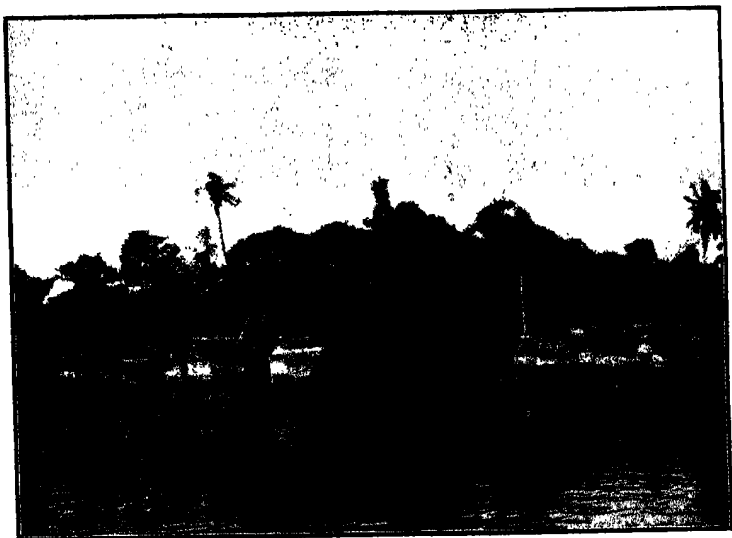
শ্যাম উপসাগরের তীরে ধীবর-পল্লী
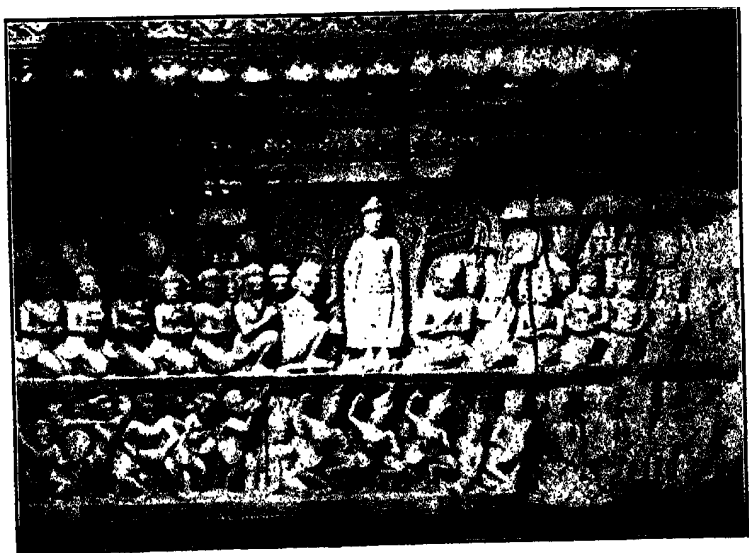
প্রাচীন কালের ভাস্কর শিল্প—পিমাই নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে গৃহীত

দেখিতে পাইতেছ মাছ ধরিবার যন্ত্র পাতি সব চেয়ে বড় জাল ফেলিবার বাঁশ ইত্যাদি সুস্পষ্ট ভাবে দেখা

জেলে জাল ফেলিতেছে

যাইতেছে। শ্যামদেশের বড় লোকদের যাহা কিছু আয় তাহা এই ধানী জমির ও মাছের ব্যবসায়

কৃষকেরা ক্ষেতে বোরো ধান রোপন করিতেছে

হইতে। শ্যামে এমন গ্রাম নাই যেখানে মাছের ব্যবসায় ও ধানের বড় বড় গোলা ও কেনা বেচা নাই।

শ্যামদেশের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কাঠের খোদাই কাজের খ্যাতি খুব বেশী। সেগুণ গাছ ও শ্যামদেশের বনে প্রচুর জন্মে। সেই সব সেগুণ গাছ দেশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে একটি সেগুন কাঠের তৈরী দরজার কারু-কার্য্যের চিত্র দিলাম। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে—শ্যামদেশের কাষ্ঠশিল্পীরা কাঠের খোদাই কার্য্যে কিরূপ সুনিপুণ। এখানকার তৈরী নানা সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি দেশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

সেগুন কাঠের তৈরী দরজার কারুকার্য্য

শ্যামদেশের লোকেরা যেন জন্মগত শিল্পী। কি প্রস্তরের কাজ, কি কাঠের কাজ সব দিকেই তাহারা বিশেষ কলা কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্থাপত্যের দিক্ দিয়া ও ইহাদের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। সে বিষয়ে তোমরা পূর্ব্বেও জানিতে পারিয়াছ। আমাদের বাঙ্গলা দেশের মন্দিরের মত কিন্তু শ্যামদেশের মন্দির নহে। উহাদের গঠন-প্রণালী অন্যরূপ। ফ্রাপাতুমের যে মন্দিরটির ছবি এখানে দিলাম এই মন্দিরের অনুরূপ মন্দির শ্যামের নানা স্থানেই রহিয়াছে

ভল্লুক

পথে ঘাটে প্রায়ই একদল লোককে ভালুক নাচাইয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কাজেই তোমরা প্রায় সকলেই ভালুক দেখিয়াছ, এমন কথা বলা হইতে পারে। ভালুকের নাচের কাছে ত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা জড় হইয়া আনন্দ বোধ করে। এই নাচিয়ে ভালুক ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক জাতীয় ভালুক আছে। সিংহ ও ব্যাঘ্রের পরই ভালুকের নাম করা যাইতে পারে, আকারে বৃহৎ এবং হিংস্রস্বভাবাপন্ন—এই জন্তু বাস্তবিকই ভীতিপ্রদ।

পৃথিবীর অনেক দেশেই ভালুক বাস করে। কি উষ্ণপ্রধান, কি শীতপ্রধান, উভয় প্রদেশেই ভালুক দেখা যায়। মালয়দ্বীপে এবং ভারতবর্ষেও একজাতীয় ভালুক আছে। আফ্রিকা মহাদেশে ভালুক আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকিত তাহা হইলে আফ্রিকার অভিযানকারীরা সেকথা লিখিয়া যাইতেন। এই সব ভালুকেরা গাছের শিকড়, ফল, পোকামাকড় এমন কি ঘোড়া মহিষ এই সমুদয় প্রাণী পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। আবার এক জাতীয় এমন ভীষণাকার ভালুক আছে যে তাহারা মানুষকেও পাইলে খাইতে ছাড়ে না। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে ভালুক বড় মধু খাইতে ভালবাসে। প্রায় সব জাতীয় ভালুকের কাছেই মধু, প্রিয় খাদ্য।

পিঙ্গল ভালুক

এই জাতীয় ভালুক পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়া মহাদেশে ইহাদের বাস। অতি পূর্ব্বে এই জাতীয় ভালুক ইংল্যাণ্ডেও দেখা যাইত। একাদশ শতাব্দীর পরে ভালুক আর বড় একটা ব্রিটেনে দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে নরওয়ে, সুইডেন, জার্ম্মেনী, জাপান, মালয়দ্বীপপুঞ্জ, বোর্ণিয়ো, প্রভৃতি দ্বীপে পিঙ্গল ভালুক বাস করে। আমেরিকার আলাস্কান পিঙ্গল ভালুক, অতিশয় ভয়ঙ্কর। মেরু প্রদেশের শ্বেত ভল্লুক ব্যতীত এইরূপ হিংস্র ভালুক আর নাই বলিলেই চলে। আমেরিকায় একজাতীয় কাল ভালুক আছে (Black bear) সে গুলিও খুব হিংস্র প্রকৃতির। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ন্যায় ভারতবর্ষে একজাতীয়

ভালুক আছে (Sloth bear) তাহারা অত্যন্ত ভীষণ প্রকৃতির ইহারাও মানুষ খাইয়া থাকে। অন্যান্য জন্তুরা মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর সাড়া পাইয়া পলায়ন করে, কিন্তু ভালুক অতি

হিমালয়ের কাল ভালুক

কাছাকাছি না আসিলে কোন প্রাণী আসিতেছে কিনা তাহা টের পায় না, একেবারে যখন কাছাকাছি আসে তখন টের পাইয়া মানুষই হউক বা অন্য কোন জন্তু জানোয়ারই হউক তাহারা এমন জোরে তাহার মাথায় বা শরীরের কোন স্থানে চড় মারে যে প্রাণীর প্রাণনাশের কারণ ঘটে।

ভালুক যে দেশের যে বর্ণেরই হউক না কেন বরফাবৃত মেরু প্রদেশের সাদা ভালুকের মত সুন্দর ও বৃহৎ ভল্লুক পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই জাতীয় ভালুকের সহিত বাঘের তুলনা চলিতে পারে। এই তুষারশুভ্র ভালুকের সহজ ও মন্থর গতি, এবং সমুদ্রের নীলাভ জলের মধ্যে ভাসমান বরফ স্তূপের উপর এই শ্বেত ভল্লুকগুলি দেখিলে বাস্তবিকই তাহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। তোমরা হয়ত অনেকে এই সুন্দর কবিতাটি জান,—

আসছি আমি সাদা সাদা ভালুকের দেশ থেকে,
জল স্থল সদাই উজ্জল বরফে আছে ঢেকে,
বিশাল দেহ তিমির সনে সিন্ধু-ঘোটক খেলে,
সারাজীবন থপ্ থপ্ থপ্ কাঁপবে সেথায় গেলে।

সেই বরফের দেশে সাদা সাদা ভালুকেরা বাস করে। শ্বেত ভালুকেরা মাছ, শীল, প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই শ্বেত ভালুকের গায়ের শক্তি অসাধারণ, মেরু প্রদেশের কোন প্রাণীই ইহাদের লোহের ন্যায় কঠিন মাড়ি এবং হাত ও পায়ের থাবার আঘাত সহ্য করিতে পারে না। সত্য সত্যই শ্বেত ভল্লুক মেরু প্রদেশের রাজা।

শীত প্রধান দেশবাসী অন্যান্য ভল্লুকের মত এই মেরুপ্রদেশবাসী শ্বেত ভালুকেরা শীতকালে ঘুমাইয়া কাটায় না, সে সময়ে তাহারা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। মেরু প্রদেশের সেই দারুণ শীতকালে ভালুকী বরফ সরাইয়া তাহার ভিতরে গুহার মত করিয়া বাসা তৈরী করিয়া তাহা থাকিবার ব্যবস্থা করে এবং বাচ্চা কাচ্চা লইয়া বাস করিয়া থাকে। বাচ্চাদের গায়ের রোম ও খুব পুরু বলিয়া শীতে ইহাদের কোন কষ্ট হয় না।

শ্বেত ভালুক
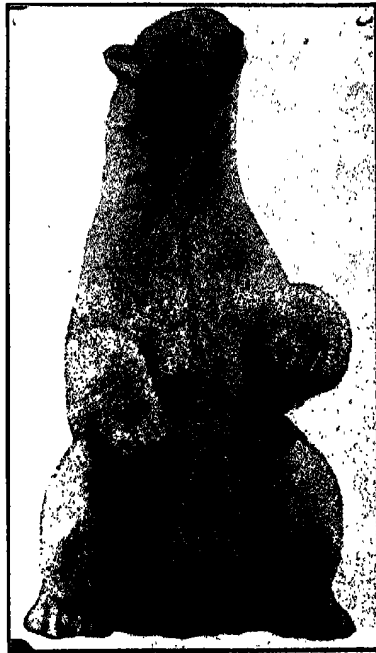
এই শ্বেত ভালুকগুলির আকার নেহাৎ কম নয়, কখনও কখনও নয় ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

পিঙ্গল বর্ণের ভল্লুক

কোয়ালা ভালুক

এই ভালুকের বাড়ী অষ্ট্রেলিয়া দেশে। ইহাদের লেজ নাই। ইহারা পোষ মানে। কোয়েলা ভালুকেরা গাম জাতীয় গাছের উপর থাকিতে ভালবাসে

সাইবেরিয়ার ভালুকেরা নির্জ্জন প্রদেশে বিচরণ করে। সময় সময় পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। এই ভালুকের স্বভাবটি একেবারেই ভদ্র নহে। তবে খাদ্য বিষয়ে ইহারা সুবোধ সুশীল বালক, যাহা পায় তাহাই খায়। ইহারা সিংহের অপেক্ষাও ওজনে ভারী। ভালুকের বাচ্চারা বেশ আমুদে হয়, তাহারা গাছের উপরে উঠে, শাখায় শাখায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এইরূপ ক্রীড়া-কৌতুক করিতে কৃষ্ণ ভল্লুকেরাই বেশী ভালবাসে। বন্য অবস্থায় কৃষ্ণ ভল্লুকেরা কোনও নির্জ্জন স্থান দেখিয়া বাচ্চাদের স্তন্যপান করাইয়া থাকে।

ভালুকেরা চারি হাত পায়ে চলাফেরা করে। সময় সময় বেশ সোজা হইয়াও দাঁড়াইতে পারে। ইহারা সময় সময় মাংস খাইলেও সচরাচর ফল, মূল ও মধু খাইতেই ভালবাসে। অনেক জাতীয় ভালুক আবার উই ইত্যাদি পোকা খাইতেও ভালবাসে।

পিঙ্গল বা ধূসরবর্ণের ভালুকেরা আকারে ৬ ফিট দীর্ঘ ও উচ্চতায় ৩ ফিট হয় এবং এই জাতীয় ভালুকেরা গাছে চড়িতে ও পাহাড় পর্ব্বতে চলাফেরা করে। ইহারা বেশ দীর্ঘজীবী হয়, এমনকি চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সাধারণতঃ সব জাতীয় ভালুকের অভ্যাসই প্রায় এক রকমের। গ্রীষ্মকালে মনের আনন্দে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া খাওয়া দাওয়া করে আর শীতের সময় গুহার ভিতরে যাইয়া আশ্রয় লয়। শীতের পর ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত যখন তাহারা বাহির হয় তখন তাহাদের স্বভাব এমন হিংস্র ও ভয়ঙ্কর হয় যে সে সময়ে উহাদের কাছাকাছি গেলে বাঁচিবার আশা বড় একটা থাকে না। এ সময়ে ক্ষুধার্ত্ত ভালুকেরা আপনাদের শাবকগুলির প্রাণনাশ করিতেও ইতস্ততঃ করে না, এজন্য ভাল্লুকী বিশেষ সতর্কতার সহিত বাচ্চাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, এবং যাহাতে তাহা ক্ষুধার্ত্ত ভালুকের নজরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ মনোযোগী হয়।

এস্কিমোরা শ্বেতভালুক শিকার করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে। এইরূপ শিকারের জন্য ঐ ভালুকের বংশ ও হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। তাহাদের ভালুক শিকার করিবার আবশ্যকতাও যথেষ্ট আছে। সেই দারুণ শীতের দেশে শীতের আক্রমণ হইতে বাঁচিতে হইলে উপযুক্তরূপ গাত্রাবরণীর আবশ্যক। এজন্য এস্কিমোরা শ্বেতভালুক শিকার করিয়া তাহার চর্ম্মদিয়া পোষাক তৈরী করিয়া পরিধান করে। যে দেশে যত বড় গরম কাপড়ই হউক না কেন, তাহার দ্বারা শীত দূর হইতে পারে না, এজন্য শ্বেত ভালুকের চামড়া দিয়া পোষাক তৈরী করে। এই ভাবে প্রতি বৎসর শত শত শ্বেত ভালুক এস্কিমোদের হাতে প্রাণ হারায়।

ভালুকদের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা তোমাদের বলিতেছি। ভালুকেরা কখনও দল বাঁধিয়া বিচরণ করে না। নিজ পরিবার লইয়া অর্থাৎ ভাল্লুকী ও তাহার বাচ্চাদের লইয়া চলাফেরা করে। সাধারণতঃ তাহারা উচ্চ পাহাড় পর্ব্বতের

সাইবেরিয়ার বিড়াল-ভালুক (Cat-Bear)

গুহায়, গাছের কোটরে এইরূপ স্থান নিজেরাই ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় ঠিক করিয়া লয়। মানুষের মত ভালুকেরাও নিরামিষ ও আমিষ দুই জাতীয় খাদ্যেরই পক্ষপাতী। ভালুকের আর একটা বিশেষত্ব এই যে ইহারা বিড়ালের মত অনায়াসে গাছে চড়িতে পারে। ভালুকের চরিত্র দেশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকারের। দেশ-ভেদে ঋতু-ভেদে ইহাদের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। শীতের দেশের ভালুকেরা সারা শীতকাল ঘুমাইয়া কাটায়।

ভালুক নানা জাতীয় হয়, সে কথা তোমাদের পূর্ব্বেও বলিয়াছি। পরেও বিশেষভাবে বলিব।

বলটি কে গড়িয়ে দিল ?

২৫৪৫ পৃষ্ঠার পর

সিরিয়ার মরুভূমিতে একজন ভ্রমণকারী বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন যে একটি বল গড়াইতেছে। বাতাসে ইহা বেশ দ্রুতবেগে গড়াইতেছে। ভদ্রলোক বলটিকে হাতে লইয়া দেখিলেন যে উহা কতকগুলি তন্তুর সমষ্টি। তন্তুগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও এমন

জেরিকোর গোলাপ

ভাবে জড়িত যে আকারে একটি সুন্দর গোলক হইয়াছে। কে এই গোলকটি নির্ম্মাণ করিল ?

এই গোলকটি কি জান ? ইহা এক জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার নাম জেরিকোর গোলাপ (Rose of Jericho) বা Resurrection plant, আর উদ্ভিদবিদ পণ্ডিতেরা এই উদ্ভিদকে বলেন Anastatica hierochuntica. সিরিয়া দেশে এবং মিশরদেশে এই উদ্ভিদের জন্মস্থান। সূর্য্যের কিরণে ইহাদের জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদের জলের প্রয়োজন, কাজেই শুষ্ক হইয়া গোলকের আকারে জড়াইয়া মাটির ভিতর হইতে মূল টানিয়া তুলিয়া বাতাসের সঙ্গে উড়িতে উড়িতে এবং মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে যেখানে জল আছে সেখানে যায় এবং জলের স্পর্শে আবার পাতা মেলে এবং পূর্ণ শোভায় বিকশিত হয়। লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় সহরে গোলকের আকারের এই জাতীয় উদ্ভিদের বিক্রয় হয়। ঐ শুষ্ক গোলকটি যেমন এক পাত্র জলের মধ্যে রাখা যায়। অমনি তাহা আবার পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে। এ উদ্ভিদ বিচিত্র নয় কি !

পৃথিবী ভ্রমণ করিতে কত সময় আবশ্যক ?

তুমি যদি পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার ৪২৮ দিন লাগিবে দ্রুতগামী রেল গাড়ীতে ৪০ দিন, শব্দের ২১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট, আলোর ১ সেকেণ্ডের ১০ ভাগের কিছু

উপর, বৈদ্যুতিক প্রবাহের ১ সেকেণ্ডের দশ ভাগের কিছু কম সময় লাগিয়া থাকে।

সমুদ্রের গভীর জলের তাপ কি ভাবে জানা যায় ?

তোমরা এ বিষয়ে সমুদ্র-তত্ত্বের সমুদ্রতল প্রবন্ধে ও পড়িয়াছ। কিন্তু সেখানে যন্ত্রের ছবি দেওয়া হয় নাই। গভীর জলের উত্তাপ দেখিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার হয় এখানে তাহার ছবি দিলাম। এই
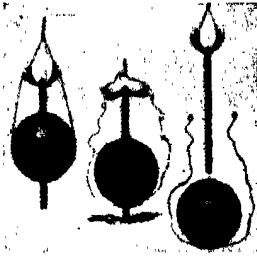
সমুদ্রের তলের তাপ মাপার যন্ত্র

যন্ত্রগুলি দেখিতে অনেকটা গোলাকার বোতলের মত। এই বোতলের মত পাত্রের মধ্যে পারার থার্মমিটার বসাইয়া সেই পাত্রটীকে গভীর জলে নামাইয়া দেওয়া হয়। এমন ব্যবস্থা আছে যে পাত্রটী উপর হইতে খোলাও বন্ধ করা যায়। তলায় নামাইয়া দিয়া পাত্রের মুখ খুলিয়া দিলেই সেটী জলে ভরিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে থার্মমিটার তার উত্তাপ নির্দ্দেশ করে। তখন বোতলের মুখ আবার বন্ধ করিয়া তাহাকে টানিয়া উপরে আনা হয়। বোতলটি এমন উপাদানে তৈরী যে তার গায়ের মধ্য দিয়া তাপ চলাচল প্রায় হয় না। এই রকম যন্ত্রের সাহায্যে বর্ত্তমান সময়ে উপর নীচে সর্ব্বত্র সমুদ্রের তাপের হিসাব হইয়া গিয়াছে। প্রথম চিত্রে যে ভাবে জলে এই যন্ত্রটি নাবাইয়া দেওয়া হয়, দ্বিতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে যন্ত্রটী সমুদ্রতল স্পর্শ করিয়াছে, তৃতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে যন্ত্রটি উপরে তুলিয়া খুলিয়া তাপের মাপ লইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

প্রার্থনারত হস্ত

এলবার্ট ড্যারার (Albert Durery) নামক একজন চিত্রকরের অঙ্কিত প্রার্থনারত যুগ্ম হস্ত বিশেষ বিখ্যাত। এই চিত্রের সঙ্গে একটি করুণ ইতিহাস জড়িত আছে। ড্যারা যে নুরেমবার্গ (Nuremberg) সহরে বাস করিতেন, সেখানে আর একজন চিত্রকরও বাস করিতেন। দুইজনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন ড্যারার তাঁহার বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। এলবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন? বন্ধু বলিলেন—এলবার্ট, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আমার প্রতিভা বলিয়া কোন কিছুই নাই, কাজেই চিত্রশিল্পে কি ভাবে উন্নতি করিতে পারি? আমার দ্বারা এমন কিছু আঁকা হইতে পারে না, যাহাতে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এলবার্ট তুমি চিত্রজগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবে।

এলবার্ট কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন, তারপর বলিলেন বন্ধু—তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, হয়ত তোমার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা

নাই কিন্তু ভাই তোমার প্রার্থনারত যুগ্মহস্ত খানি দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগে। আমি বরাবর তোমার এই প্রার্থনারত হাত দু'খানি দেখিয়া আসিতেছি, আর আমার ইচ্ছা হইতেছে যে এই হাত দু'খানি আঁকি।

এই ভাবে এলবার্টড্যারার তাহার বিখ্যাত প্রার্থনারত হস্ত অঙ্কিত করেন। বল দেখি বাঙ্গলা দেশের কোন্ মহাপুরুষের এইরূপ প্রার্থনারত দুইখানি যুগ্ম হস্ত আছে?—তাহা মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র সেনের। তোমরা 'শিশু-ভারতী'তে সেই ছবি দেখিয়াছ। [শিশু-ভারতী—১৭৮৩ পৃষ্ঠা]

বাঙ্গালী বিজয়সিংহের বিজয়-যাত্রা অজন্তা গুহা চিত্রাবলী হইতে

ভারতের বৈষ্ণবতীর্থ

১৬৪২ পৃষ্ঠার পর

সকল সম্প্রদায়ের লোকের তীর্থস্থান আছে। বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থ স্থানের বিবরণ 'শিশু-ভারতী'তে (১৩৩৮ ও ১৬৩৮ পৃষ্ঠা দেখ) পূর্ব্বে পড়িয়াছ। এবার বৈষ্ণবদিগের তীর্থ স্থান সম্বন্ধে বলিতেছি। উত্তর ভারতে মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, হরিদ্বার, বদরিনাথ প্রভৃতি নগরগুলি বৈষ্ণবদিগের পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। পশ্চিম ভারতবর্ষে দ্বারকা, এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে পুরী, কাঞ্চিপুর, ইত্যাদি বৈষ্ণবদিগের কতকগুলি পুণ্য স্থান আছে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গলাদেশেও নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালনা, কাটোয়া, খড়দহ, সপ্তগ্রাম, প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত।

মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। নন্দিগ্রাম হইতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বৎস ও বকাসুর বধ করিলেন। ইহার পর ব্রজমোহন, কালিয়াদমন ও রাসাদি লীলা শেষ করেন। শ্রীগোপালচম্পূ মতে দন্তবক্র বধের পর বৃন্দাবনে আসেন। বৃন্দাবনে দোল-লীলা পর্য্যন্ত এগার বৎসর যাবৎ বৃন্দাবন-লীলা শেষ করিয়া তিনি অক্রূর সহ মথুরায় গমন করিলেন। মথুরায় নিম্নলিখিত লীলা সংঘটিত হয়। যথা রজক বধ, সুদাম মালাকরকে বর প্রদান, কুব্জার দিব্যরূপ দান, ইন্দ্রধনু ভঙ্গ, কংসের হস্তী বধ এবং কংস-বধ। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞো-পবীত ধারণ করিয়া অবন্তিপুরস্থিত সন্দিপণি মুনির নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করেন। পাণ্ডব-দিগের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পাণ্ডবদিগের সংবাদ লইবার জন্য অক্রূরকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ হয় এবং জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই ভাবে তাঁহার সহিত সতেরো বার পুনঃ পুনঃ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় দুর্গ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কংস ভয়ে ভীত বহু দেশান্তরগত আত্মীয়-স্বজনকে তিনি দ্বারকাপুরীতে আশ্রয়

দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিবার পর কাল যবনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিয়া মুচুকুন্দ রাজাকে উদ্ধার করেন। মথুরাপুরীর উল্লেখ বৌদ্ধ, জৈন, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের ইহা একটি পবিত্র স্থান। এখানে ভাগবৎ ধর্ম্মের উৎপত্তি। কুষাণরাজাদিগের সময়ে জৈন দিগের ইহা একটি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মকেন্দ্র ছিল। ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকপর্য্যটক্ মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন যে যখন তিনি মথুরা দর্শন করিতে আসেন তখন ইহা মৌর্য্যদিগের আয়ত্বাধীনে ছিল।

বর্ত্তমানে মথুরা দুই ভাগে বিভক্ত:—মথুরা নগর এবং মথুরা ক্যাণ্টনমেণ্ট্ (সেনানিবাস)। মথুরা সহরে বহু লোকের বাস আছে। এই স্থানে 'চক' নামে একটি বৃহৎ বাজার আছে এবং হিন্দুদিগের কতক
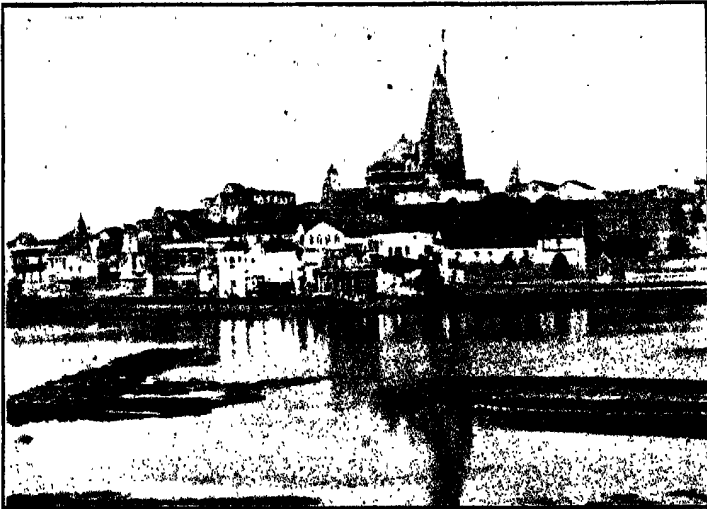
দ্বারকার সাধারণ দৃশ্য

বহুকাল ধরিয়া এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং বুদ্ধদেব এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, এই পুরী শত্রুঘ্ন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগরটী যমুনার তীরে অবস্থিত। এখানকার বিশ্রামঘাট হিন্দুদিগের একটি পবিত্র স্থান। হিন্দু যাত্রীরা এই ঘাটে স্নান করে। মথুরার আর একটি নাম অধুরা। গ্রীক লেখকের মতে মথুরা মেথোরা নামে পরিচিত গুলি মন্দির ও আছে যথা কেদারেশ্বর, কুব্জা-মন্দির, কালভৈরব প্রভৃতি। এই মন্দির গুলির মধ্যে কেদারেশ্বরের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দর।

মথুরার উত্তরদিকে পাঁচ মাইল দূরে **বৃন্দাবন** নামে হিন্দুদিগের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ যমুনা তীরে অবস্থিত। এইস্থানে হিন্দুদিগের অনেক মন্দির আছে। মদনগোপালদেবের মন্দির বহু পুরাতন এবং ইহার বর্ত্তমান নাম

মদনমোহন। গোবিন্দজীর মন্দির এবং মন্দিরও সুবিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ আছে এবং বহুতীর্থ যাত্রী বহুদেশ হইতে এই সকল বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য সমবেত হয়। রাজপুতানার নামে একজন ধনী গোপীনাথ-জীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ইহাই গোপীনাথের পুরাতন মন্দির নামে খ্যাত।

নিধুবন, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ইত্যাদি।

রাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপে অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রামের নাম আরিট্ হইয়াছে। শ্রীরাধা গোবধকারী শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে অসম্মত হওয়ায় তিনি শ্যামকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড খনন করাইয়া তাহাতে স্নান করিয়া পাপ মুক্ত
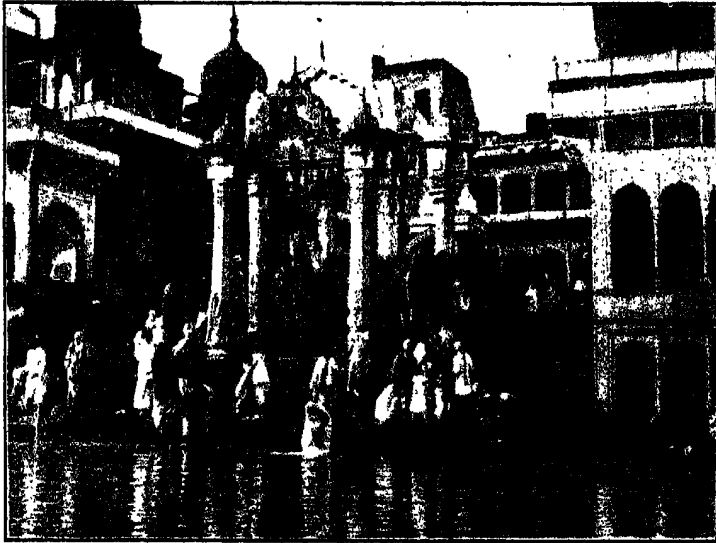
বিশ্রাম ঘাট—মথুরা

ইহা ব্যতীত আরও অনেক আধুনিক মন্দির আছে, যথা লালা বাবুর মন্দির, শেঠের মন্দির ইত্যাদি বৃন্দাবনে যমুনার তীরে অনেক গুলি ঘাট আছে—কেশীঘাট, রাজঘাট, বরাহ ঘাট, আদিত্য ঘাট, যুগল ঘাট, শৃঙ্গারবট ঘাট ইত্যাদি। ইহার নিকটে কতকগুলি বন ও কুণ্ড আছে যে গুলিকে হিন্দুরা খুব পবিত্র বলিয়া মনে করেন, যথা, নিকুঞ্জবন,

হন। শ্রীরাধাও শ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে নিজ নামে একটি কুণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার নাম রাধাকুণ্ড।

যমুনার বাম তীরে অবস্থিত **গোকুল গ্রাম** বৈষ্ণব ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এখানে গোকুল-নাথজীর মন্দির আছে। কংস ভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইয়া মহাবনের নিকটস্থ গোকুলে নন্দভবনে

রাখিয়া আসেন। পরে সেখানে তিনি পুতনা, তৃণাবর্ত্তক প্রভৃতি অসুরের উপদ্রব দেখিয়া নন্দিগ্রামে আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই গোকুল গ্রামটী দেখিতে গিয়াছিলাম। গ্রামটী যে বহু পুরাতন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খুব ছোট ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। বহু ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য দিয়া

অযোধ্যাও একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহাকেও বৈষ্ণব-তীর্থ বলিলে দোষের কারণ হয় না। শ্রীরামচন্দ্র কোটি কোটি ভারত-বাসীর আরাধ্য দেবতা। অযোধ্যা ছিল—শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য রাজধানী। এখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকেন। পুণ্য সলিলা সরযূর তীরে অযোধ্যা নগরী অবস্থিত।

একটি প্রাচীন মন্দির—বৃন্দাবন
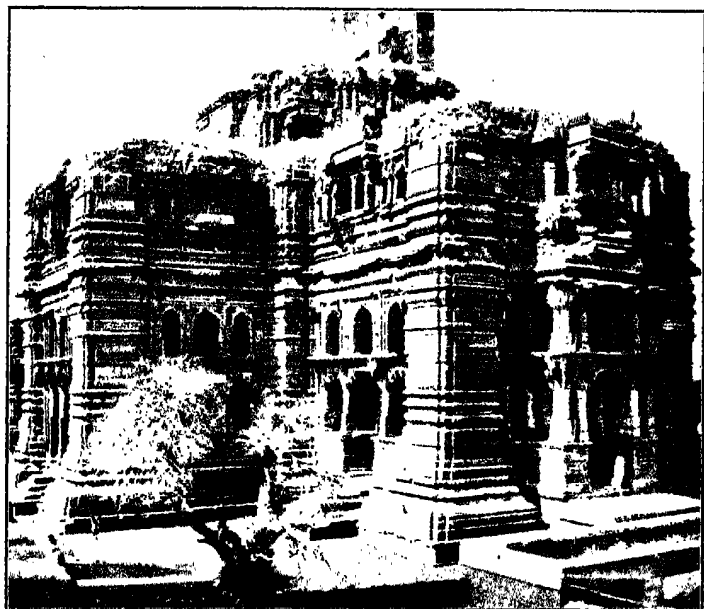
গোকুলনাথজীর মন্দির দেখিতে যাইতে হয়। যমুনার তীরের দৃশ্য অতি মনোরম। আমরা মোটর যোগে মথুরা হইতে গোকুলে গিয়াছিলাম। মোটরের পথটি ভাল কিন্তু ধূলা পূর্ণ। মথুরা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে গোকুলগ্রাম অবস্থিত। ভারতবর্ষের বহু স্থান হইতে এখানে তীর্থ যাত্রীর সমাগম হয়।

গোবর্দ্ধন গিরি—মথুরা হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে। এখানে বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত হরিদেবের এবং চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এখানে গোপাল বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে এবং এই বিগ্রহটি এখন শ্রীনাথজী নামে প্রসিদ্ধ। মথুরার দক্ষিণে ছয় মাইল দূরে মহাবন। ইহা হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে জরাসিন্ধুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া **দ্বারকায়** আসিয়া বাস করেন। এই নগরটি গুজরাট দেশের অন্তর্গত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট নারীর পাণিগ্রহণ করেন। বানাসুরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যা উষার সহিত নিজের পুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দেন। দ্বারকায় শ্রীদাম নামক ব্রাহ্মণের তণ্ডুল গ্রহণ

[illegible] মন্দির—অযোধ্যা
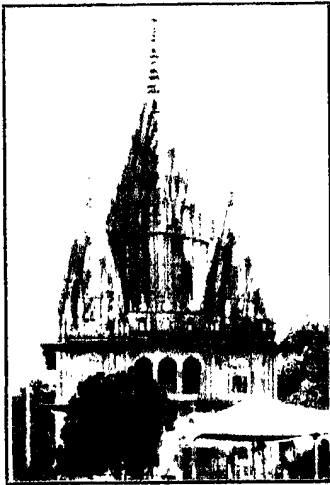
করিয়া তাহাকে তিনি বিপুল বৈভব প্রদান করেন। শ্রীদাম তীর্থ বৈষ্ণবদিগের একটি পুণ্যভূমি। ১২৫ বৎসর ধরিয়া দ্বারকা-লীলা সংঘটিত হইয়াছিল। দ্বারকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি উপস্থিত হন এবং তথায় তিনি শিশুপালকে বধ করেন।

উত্তর ভারতবর্ষে **হরিদ্বার** বা হরদ্বার বৈষ্ণবদিগের আর একটি তীর্থ। মহাভারতে উহা গঙ্গাদ্বার নামে পরিচিত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহা মায়াপুরী নামে প্রসিদ্ধ। পুণ্যতোয়া স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী-তীরে মৈত্রেয়-মুনি বিদুরকে শ্রীমদ্ভাগবৎ শ্রবণ করান। এই স্থানে গঙ্গা হিমালয় পর্ব্বত হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন। হরিদ্বার হইতে ২০ মাইল দূরে গঙ্গাতীরস্থ হৃষীকেশ পুরী বৈষ্ণবদিগের অন্যতম তীর্থ স্থান। ইহাও নারায়ণের একটি বাসভূমি ছিল বলিয়া ইহাকে বৈষ্ণবতীর্থ বলা যায়। বদরিনারায়ণের মূর্ত্তি নারায়ণের বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে, যিনি কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর দুষ্ট রাজন্যবর্গকে দমন করিয়াছিলেন। ইহা একটি প্রস্তর মূর্ত্তি। ইহাকে দর্শন করিতে হইলে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। এখানে গঙ্গা তুষারাচ্ছাদিতা এবং ইহাকে স্পর্শ করা যায় না। আদি বদরিনারায়ণ বিগ্রহ জাগ্রত এবং মন্দিরটিও সুন্দর। বদরীনারায়ণের পথে পাহাড়গুলির মাথায় তুষারাবৃত বরফ সূর্য্য কিরণে ঝলমল করে। নদীর অপর পাড়ে সমতল ভূমিতে চাষ হইতেছে দেখা যায় এবং কোথাও কোথাও কেবলমাত্র বৃক্ষরাজি বিরাজিত আছে। বদরিনারায়ণের পথ খুবই দুর্গম। এই পথ দিয়া যাইতে হইলে বহু দুঃখ, পীড়ন, কাতরতা, উপবাস, ব্যথা ও বেদনা সহ্য করিতে হয়। এই বিগ্রহের স্থানটি বৈষ্ণবদিগের আরও একটি পুণ্যভূমি।

কাহারও কাহারও মতে যুক্তপ্রদেশস্থিত বারাণসীও বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থ স্থান, কারণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে প্রভেদ স্বীকার না করায় এবং বারাণসীতে বিন্দুমাধব বিগ্রহ বিরাজিত থাকায় বারাণসী ধামকে বৈষ্ণব তীর্থ বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে পুরী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষী-গোপাল ও কাঞ্চিপুর বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া পরিচিত। কাঞ্চিপুরে নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কাঞ্চিপুরের (Conjee-

veram) আর একটি নাম সত্যব্রত ক্ষেত্র পুরীর জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরের বিগ্রহ এবং সাক্ষীগোপালকে বৈষ্ণবেরা ভক্তি করে এবং পূজা করে। বৈষ্ণবেরা এই গুলিকে নারায়ণ মূর্ত্তি বলিয়া জানে। উৎকলের কেশরীদিগের সময়ে ভুবনেশ্বর রাজধানী ছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় রাজাদের সময়ে উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণবদিগের প্রাধান্য যথেষ্টই ছিল ও আছে। কলিকাতা হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে খড়দহ গ্রামে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর নামক প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছে। মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান সঙ্গী নিত্যানন্দ গোস্বামী এখানে তপস্যা করিতে আসেন। একদিন গঙ্গাতীরে এক রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া নিত্যানন্দ দেখিলেন যে একটি শব পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচয়ে জানিলেন যে মৃতা রমণীর একমাত্র কন্যা। কন্যাটিকে পুনর্জীবন দান করিয়া নিত্যানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং স্থানীয় ভূস্বামীর নিকট বাসের জন্য এক খণ্ড ভূমিপ্রার্থনা করায় তিনি বিদ্রূপ-ছলে গঙ্গায় একটি খড় ফেলিয়া দিয়া বলিলেন যে উহাই তাঁহার বাসস্থান। নিত্যানন্দের প্রভাবে এই প্রবল দহ তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া গেল এবং নিত্যানন্দ সেই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী খড়দহের গোস্বামী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

হর কি পাওরি বা হরি-কি পাওরি ঘাট

নবদ্বীপ ও বৈষ্ণবদিগের একটি পুণ্যভূমি। নবদ্বীপ নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া পরিচিত বৈদিক ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীচৈতন্য চব্বিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কথিত আছে বাঙ্গলাদেশের হিন্দু-রাজাদের শেষ রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। লক্ষ্মণসেনের পৌত্র এবং বল্লালসেনের প্রপৌত্র অশোক সেন এই স্থানে তাঁহার বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্তু পরে বক্তিয়ার খিলিজি এই স্থান ত্যাগ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করেন। এক সময়ে নবদ্বীপে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যবিদ পণ্ডিতের কেন্দ্র ছিল। বাঙ্গলাদেশস্থিত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটদ্বীপ ও কাটোয়া বৈষ্ণবদিগের একটি পুণ্যভূমি। এখানে শ্রীচৈতন্য চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস দক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। কাটোয়ার উত্তরদিকে চারি মাইল দূরে ঝামটপুর গ্রামে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাস করিতেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাল্‌না দেশ বৈষ্ণবদিগের আর একটি পুণ্যস্থান এখানে সূর্য্যদাস ও গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে বহু দেবমূর্ত্তি পূজিত হয়। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস ও ভগবানদাস বাবাজীর এখানে আশ্রম আছে। বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি দেব মন্দির এখানে আছে। এই কাল্‌না অম্বিকাকাল্‌না নামে প্রসিদ্ধ। হুগলীজেলার অন্তর্গত বংশবাটীতে হংসেশ্বরীর মন্দির বৈষ্ণবদিগের একটি পুরাতন মন্দির। এখানে এই বিগ্রহ দর্শনের জন্য বহুলোক সমাগম হয়। বংশবাটীর কিছু দূরে উদ্ধারণ দত্তের পাট আছে। এখানে বহু বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্তের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর গঙ্গা-তীরে অবস্থিত। ইহাও বৈষ্ণবদিগের একটি পুণ্যতীর্থ। এখানকার মদনগোপাল, মদনমোহন, কালাচাঁদ, শ্যামচাঁদ প্রভৃতি বিগ্রহ-সকলকে বৈষ্ণবেরা ভক্তিভরে পূজা করেন। এইস্থানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তপস্যা করিতেন।

বাঙ্গালা দেশে বহু বৈষ্ণবের বাস। বৃন্দাবনে ও মথুরা নগরীতে অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কীর্ত্তি আছে। লালা বাবুর নাম বৈষ্ণবদের নিকট বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার নির্ম্মিত মন্দির বৃন্দাবনের একটি দর্শনীয় বস্তু। বৃন্দাবনের প্রধান দেবতা গোবিন্দজীর মন্দিরেও বাঙ্গালী বৈষ্ণবের প্রাধান্য রহিয়াছে। বৃন্দাবনের তীর্থসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করেন, সেদিন হইতেই বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বাঙ্গালী-বৈষ্ণবেরা আপনাদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। সেখানে দুই একটি মন্দির ছাড়া, আর প্রায় সব স্থানেই বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের প্রভাব দেখা যায়, এ স্থানে বহু ত্যাগী ও সাধু বাঙ্গালী বৈষ্ণব বাস করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বৃন্দাবনের ভিখারী ব্রজ-বালকগণের মুখে বৈষ্ণব কবিগণের কবিতার আবৃত্তি বড়ই সুন্দর শুনায়। দুই একটি কবিতা প্রায় সকল ব্রজবালকগণই বলিয়া থাকে—

ধলা নয় ধূলা নয় গোপীর পদ রেণু
এই ধূলা মেখেছিল নন্দের ধেনু কানু।
আন্ সখি পার করিতে নিব আনা আনা
শ্রীমতীকে পার করিতে নিব কানের সোনা।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'

১১০৬ পৃষ্ঠার পর
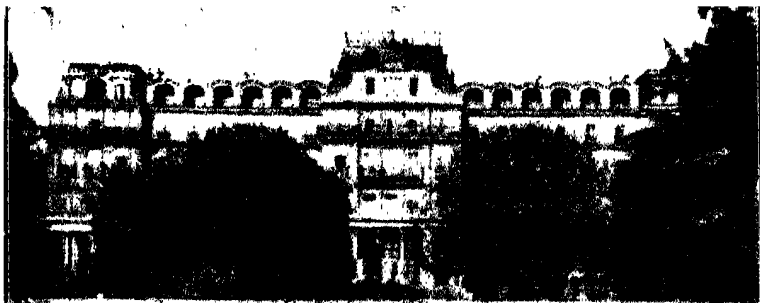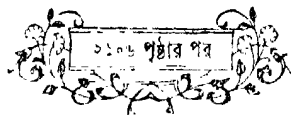
খৃষ্টপূর্ব ৩২১ অথবা ৩২০ অব্দে নন্দবংশকে ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ক্রমশঃ আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের এবং সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যেরও কিয়দংশের সম্রাট হন। আগে সকলে মনে করিত, 'মুরা' নামে একজন শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই চন্দ্রগুপ্তকে 'মৌর্য্য' বলা হয়। কিন্তু এখন অনেক পণ্ডিতে বলেন যে, তা নয়,---হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদদেশে শাক্যবংশীয় (যে বংশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) একজন রাজা মগধের আকারে 'মগধ' অথবা 'মোর' নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন, এজন্য তাঁহার বংশধরগণ 'মৌরিয়' নামে খ্যাত হন, আর চন্দ্রগুপ্তের মাতা ছিলেন এই 'মৌরিয়' বংশের সর্দ্দারের রাণী, কাজেই চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরদিগকেও 'মৌরিয়' বা মৌর্য্য বলা হয়।

এই চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বিষ্ণুগুপ্ত। ইঁহার আর এক নাম ছিল চাণক্য, আমরা বলি চাণক্য মুনি। আর ইঁহার বুদ্ধিটা অত্যন্ত কুটিল ছিল বলিয়া, ইনি কৌটিল্য নামেও পরিচিত ছিলেন। এই কৌটিল্যের বুদ্ধিবলেই চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শুধু রাজা হইলেই ত হয় না, রাজার রাজ্যও ত রক্ষা করিতে হইবে। অতএব সেই উদ্দেশ্যে কৌটিল্য একখানা 'অর্থশাস্ত্র' লিখিলেন। 'অর্থশাস্ত্র' মানে এই নয় যে, ঐ শাস্ত্র বা গ্রন্থখানি পড়িলে অনেক অর্থ বা টাকা লাভ করা যায়। কি করিয়া রাজ্যলাভ ও সেই রাজ্য রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার উপায় যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়, তাহার নাম অর্থশাস্ত্র। রাজা কেমন হইবেন, কিরূপ ভাবে থাকিবেন, তাঁহার কোন্ কোন্ কাজ করা উচিৎ বা উচিৎ নয়, প্রজাকে তিনি কেমন ভাবে পালন করিবেন, মন্ত্রীরা কিরূপ হইবেন, তাঁহাদের কাজ কি, রাজপুত্রেরা কি করিবেন না করিবেন, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য কি, প্রজারা কি করিবে না করিবে, তাঁহাদের কোন্ কোন্ কাজ করা অন্যায় বা ন্যায়, তাহারা কিরূপ কাজ করিলে শাস্তি বা সম্মান পাইবে, রাজা-প্রজা প্রভু-ভৃত্য স্বামী-স্ত্রী

ক্রেতা বিক্রেতা প্রভৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, রাজাকে কি পরিমাণ কর ও শুল্ক দিতে হইবে, যুদ্ধের সময় রাজা কি করিবেন, তাঁহার সৈন্য কিরূপ হইবে, রাজ্যের আয় কি ভাবে বাড়িবে, নগরগুলি কিরূপ হইবে, গ্রামগুলি কিরূপ হইবে, দুর্গগুলি কিরূপ হইবে, [illegible] রাজা ও প্রজা কি করিবেন—এই সকল নানা কথা ও নিয়ম-কানুন 'অর্থশাস্ত্রে' লেখা থাকে। কৌটিল্যের বইখানিও তাহাই আছে।

নন্দবংশের শেষ নৃপতির আমলে রাজ্যে বড় [illegible] দেখা দিয়াছিল। ফলে লোকে অনেকটা [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য [illegible] এই [illegible] কৌটিল্যের [illegible] হইয়াছিল। [illegible] হইয়াছে, [illegible] তাঁহার [illegible] কোন [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছিল, [illegible] দেখা যায়। কৌটিল্যের আগেও [illegible] কেহ কেহ অর্থশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বই এখন আর পাওয়া যায় না। কেবল তাঁহাদের মতামত কৌটিল্য তাঁহার বইয়ের অনেক স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের বইগুলির কথা বড় কিছু জানা যায় না, কিন্তু কৌটিল্যের বইখানি বেশ বড়। উহা পনের ভাগে বিভক্ত এবং প্রতি ভাগে কতকগুলি করিয়া অধ্যায় আছে। নিচে এই বইখানি হইতে সমাজের কয়েকটি কথা ও রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ম কানুন উদ্ধৃত করা হইল।

রাজা কেমন হইবেন ?

দেশের রাজা উচ্চবংশজাত হইবেন। উচ্চবংশীয় রাজা যদি দুর্বলও হন তবু ভাল, কিন্তু নীচবংশজাত প্রবল রাজা ভাল নয়। এবং রাজা উচ্চশিক্ষিত হইবেন। কারণ, শিক্ষাই চরিত্র গঠন করে, আর উচ্চশিক্ষা না পাইলে রাজার চরিত্র কিরূপে ভালরূপে গঠিত হইবে ? ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত থাকিবেন এবং যিনি যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ, তাঁহার নিকট সেই সেই বিষয় মনোযোগ দিয়া পড়িবেন। এমন কি, তিনি কৃষি, গো-পালন ও ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়েও লেখাপড়া করিবেন। আর, অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারার জন্য—দণ্ড-নীতিও খুব ভাল করিয়া শিখিবেন। কারণ, উপযুক্ত দণ্ড না দিয়া গুরুদণ্ড দিলে রাজা প্রজার নিকট অপ্রিয় হন এবং লঘু দণ্ড দিলে লোকের নিকট হেয় হইয়া যান। ঠিক উপযুক্ত দণ্ড দিতে গেলে, বিনয় বা চরিত্রের প্রয়োজন আবশ্যক। অতএব বিনয় শিক্ষা করিবার জন্য তিনি সর্বদা বয়োবৃদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ ও চরিত্রবান আচার্যগণের সাহচর্যে যত্নবান হইবেন। প্রত্যহ তিনি হাতী, ঘোড়া, রথ ও অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত সমরের নানা কৌশল শিক্ষা করিবেন। এইরূপে নানা বিদ্যা ও বিনয় শিক্ষা করিয়া রাজা যদি ভাল করিয়া প্রজাপালন করেন ও সকলের হিতসাধনে যত্নবান হন, তাহা হইলে তিনি বিনা বাধায় রাজ্যভোগ করিতে পারিবেন।

রাজা ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ছয় রিপুকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিবেন। তিনি কর্মঠ ও উৎসাহশীল হইবেন, তাহা হইলে প্রজারাও সেইরূপ হইবে। রাজা অমনোযোগী ও নিজের কাজে অনবহিত হইলে, প্রজারাও সেই রকম হইবে, উপরন্তু তিনি সহজেই শত্রুর হাতে পতিত হইবেন। এই জন্য তিনি সকল সময়ে নিজের কর্তব্য বিষয়ে সজাগ থাকিবেন। তিনি বৃথাই আলস্যে সময় কাটাইবেন না। দিনকে দেড় ঘণ্টা হিসাবে আট ভাগে ভাগ করিয়া লইয়া তিনি প্রতি ভাগে এক এক নির্দিষ্ট কর্ম করিবেন। যথা, সকাল ৬টা হইতে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চৌকিদার নিয়োগ করিবেন ও আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিবেন। সাড়ে সাতটা হইতে ৯টা পর্যন্ত নগর ও গ্রামবাসীদের সংক্রান্ত কাজে নিজেকে নিয়োগ করিবেন। এইরূপ দুপুরবেলা দেড়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রিয় আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে পারেন। এইভাবে রাত্রিকেও আটভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগে এক এক নির্দিষ্ট কাজ করিবেন। তিনি ঘুমাইবেন মাত্র রাত্রি, নয়টা হইতে দেড়টা পর্যন্ত।

পরেপর তাঁহাকে দামামা বাজাইয়া জাগাইয়া দেওয়া হইবে।

রাজা ঐ সকল কার্য্যের ভার তাঁহার কর্ম্মচারিদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজকার্য্যে গোলমাল দেখা দিবে এবং তিনি প্রজার নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিবেন এবং শত্রুরাও তাঁহাকে বধ করিবে।

যে সকল কাজ খুব জরুরী, সেগুলি তিনি তৎক্ষণাৎ সারিয়া ফেলিবেন, পরের জন্য ফেলিয়া রাখিবেন না। দেব, ব্রাহ্মণ, গো, তীর্থ, শিশু, বৃদ্ধ, আর্ত্ত, নিঃসহায় এবং নারী, এই সকলের কাজ রাজা সকল সময়ে নিজে সম্পন্ন করিবেন।

রাজপুত্রদের রাজা সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবেন। তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা তাহাদের বিদ্যা ও বিনয় শিক্ষা দিবেন। কেহ যেন তাহাদিগকে কোনওরূপ দুষ্টবুদ্ধি না দেয়, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার পরামর্শ না দেয়, অথবা অসৎপথে লইয়া না যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। তাহারা বিপথে গেলে, গোপনে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া বা ভয় দেখাইয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দুষ্টপ্রকৃতির বা একই মাত্র রাজপুত্রকে কখনও সিংহাসনে আরোহণ করিতে দিতে নাই।

এক চাকার রথ যেমন চলিতে পারে না, সেইরূপ রাজাও একাকী সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য ও সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রী, পুরোহিত ও অমাত্যবর্গ নিযুক্ত করিতে হইবে। ইঁহারা সকলেই উচ্চবংশজাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সাধু উদ্দেশ্যযুক্ত, সাহসী ও রাজভক্ত হইবে। অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া, রাজা প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান পুরোহিতের সাহায্যে প্রলোভন দ্বারা তাহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিবেন।

গুপ্তচর বিভাগ

রাজকার্য্য ভাল করিয়া চালাইবার জন্য রাজার একটি গুপ্তচর বিভাগ থাকিবে। গুপ্তচরগণ নানা-বেশে রাজ্যের নানাস্থানে ঘোরা-ফেরা করিয়া লোককে নানা ভাবে পরীক্ষা করিবে এবং মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় লোক কে কি করে, কে কি বলে, কে কি রকম লোককে আশ্রয় দিতেছে, রাজ্যে সন্তোষ কি অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে ইত্যাদি সকল সংবাদ আনিয়া গুপ্তচর বিভাগকে অথবা সরাসরি রাজাকে দিবে।

যাহারা রাজার প্রতি সন্তুষ্ট, রাজা তাহাদিগকে সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর যাহারা অসন্তুষ্ট, তাহাদিগকে লোক দ্বারা বুঝাইয়া, টাকা দিয়া, শাস্তি দিয়া, অথবা সেই দলের পরস্পর সকলের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া তাহাদিগকে নিজের পক্ষে আনিবেন।

সৈন্য ও রাজকোষ

সৈন্য ও রাজকোষের উপর রাজার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকিবে। এই দুইয়ের উপর প্রভুত্ব হারাইলেই, সেই রাজা অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন।

রাজা কখনও একাকী যেখানে সেখানে পরিভ্রমণ করিবেন না। অথবা কাহারও সহিত একাকী দেখাসাক্ষাৎও করিবেন না। সর্ব্বদা তিনি শরীররক্ষী বা 'বডি-গার্ড' দ্বারা পরিবৃত থাকিবেন। এমন কি, তিনি যখন তখন অন্দরমহলে গিয়া একাকী রাণীর সহিতও দেখা করিবেন না; রাণীদেরও তিনি ন্যাড়ামাথা অথবা জটাধারী সন্ন্যাসী, বাহিরের অচেনা দাসী, ভাঁড় (বিদূষক) প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিতে দিবেন না। কারণ, পূর্ব্বকালে অনেক রাণীর আত্মীয়েরা গুপ্তবেশে, অথবা রাণীরা নিজেরাই পরের কুপরামর্শে পড়িয়া রাজাদিগকে হত্যা করিয়াছে। রাজা যখনই যাহা খাইবেন, আগে তাহা অপর বিশ্বস্ত লোক তাঁহার সম্মুখে খাইয়া দেখাইবে, তাহাতে কোনও বিষ মিশান আছে কি না। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবার আগে ভাল করিয়া অপরে পরীক্ষা করিয়া দিবে।

রাজস্ব

রাজস্ব সংক্রান্ত নানা বিভাগের উপর রাজা এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। যে স্বর্ণাধ্যক্ষ হইবে, সে তাহার অধীনে একজন সরকারী স্বর্ণকার

রাখিবে, উহাকে সদর রাস্তার মধ্যস্থলে একটি সোনারূপার দোকান খুলিতে হইবে। যে ব্যক্তি লোককে সোনা, রূপা প্রভৃতি কিনিতে বা বিক্রয় করিতে সাহায্য করিবে এবং অনেকগুলি শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সোনা ও রূপার মুদ্রা তৈয়ার করাইবে। কোষাগার বা রাজভাণ্ডারের একজন অধ্যক্ষ থাকিবে, তাহার কাজ কৃষিজ দ্রব্যের হিসাব পরীক্ষা করা, এবং নানারকমে যে সমস্ত কর আসে তাহার হিসাব পত্র রাখা ও তত্ত্বাবধান করা। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য একজন অধ্যক্ষ থাকিবে। বনজাত দ্রব্যের জন্য একজন অধ্যক্ষ থাকিবে। অস্ত্রাগারের জন্য একজন অধ্যক্ষ থাকিবে, যে যুদ্ধের জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করাইবে এবং সে সেগুলির উপযুক্ত যত্ন লইবে। একজন অধ্যক্ষ লোহার ও পাথরের কারখানা এবং দাঁড়ি তৈয়ার করাইবে। একজন অধ্যক্ষের উপর ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায়ের ভার থাকিবে। রাজার বয়ন বিভাগের উপর একজন অধ্যক্ষ থাকিবে, যে বিধবা, অক্ষমা বা খোঁড়া স্ত্রীলোক, বালিকা, সন্ন্যাসিনী, রাজার বৃদ্ধা দাসী প্রভৃতি দ্বারা সূতা, বস্ত্র (কোটি), কাপড়, দড়ি প্রভৃতি বয়ন করাইবে। কিন্তু ছুটির দিনে ইহাদিগকে খাটাইতে পারিবেনা, খাটাইতে হইলে অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যাহারা বাড়ীর বাহিরে আসেনা, বা আসিতে অনিচ্ছুক, অথচ জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগকে বয়ন-বিভাগের দাসীরা বাড়ী গিয়া যথোচিত সম্ভ্রম দেখাইয়া কাজ দিয়া আসিবে। যে সকল স্ত্রীলোক বয়নাগারে আসিবে, তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, অথবা তাহাদের মাহিনা দিতে দেরী করিলে, বয়নাধ্যক্ষের জরিমানা হইবে। কৃষিবিভাগের জন্য একজন অধ্যক্ষ থাকিবে। এইরূপ মদের দোকান, কসাইখানা, জাহাজ-নৌকা, গরু মহিষ, ঘোড়া, হাতী, রথ, পদাতিকসৈন্য, এই সকল প্রতি বিভাগের উপর একজন করিয়া অধ্যক্ষ থাকিবে। সকল রকম সৈন্যের উপর একজন সেনাপতি থাকিবে। এক দেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে হইলে ছাড়পত্র বা 'পাশ' লাগিবে এবং ছাড়পত্র বিভাগের উপর একজন অধ্যক্ষ থাকিবে। পথিকের সুবিধার জন্য অনুর্বর স্থানে পুষ্করিণী, কূপ, বিশ্রাম স্থান, এমন কি ফুলের ও ফলের বাগান নির্মাণ করাইতে হইবে। চোরে, ডাকাতে বা বন্য পশুতে তাহাদের আক্রমণ না করে তাহাও দেখিতে হইবে।

জনপদের শাসন রীতি

বড় রাজ্য বা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে সকল ছোট ছোট রাজ্য বা জনপদ থাকিবে, সেগুলি এক এক জন 'কালেক্টার-জেনারেল'-এর অধীনে থাকিবে। তিনি প্রত্যেকটি ছোট রাজ্য বা জনপদ চারি ভাগে বিভক্ত করিবেন। এই এক একটি বিভাগ যাহার অধীনে থাকিবে তাহার নাম **'স্থানিক'**। এই সকল বিভাগগুলির অন্তর্গত আবার কতকগুলি গ্রাম থাকিবে। কর প্রদানের দিক হইতে গ্রামগুলি চারি প্রকারের, যথা (১) যেগুলি কর প্রদান হইতে মুক্ত, (২) যেগুলি কর না দিয়া সৈন্য যোগাইতে পারে, (৩) যেগুলি শস্যাদি, গো-মহিষাদি, স্বর্ণ, কাঁচামাল প্রভৃতি দ্বারা কর দিতে পারে এবং (৪) যেগুলি করের পরিবর্তে বিনা মাহিনায় খাটিবার লোক অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্য যোগাইতে পারে। পাঁচ হইতে দশটি গ্রামের উপর একজন করিয়া কর্মচারী থাকিবে, তাহার নাম **গোপ**। প্রত্যেক গোপ তাহার অধীনস্থ গ্রামগুলির হিসাবপত্র রাখিবে, এবং কর্ষিত, অকর্ষিত সমতল স্থান, জলাভূমি, বাগান, ফলের বাগান, মন্দির, শ্মশান, সত্র (যে বাড়ীতে খাইতে দেওয়া হয়), প্রপা (যে সকল স্থানে পথিকগণকে বিনামূল্যে জলদান করা হয়) প্রভৃতি দেখে এক এক খণ্ড জমির নম্বর দিবে এবং প্রতি গ্রামের সীমানা ঠিক রাখিবে। যে সকল বাড়ী কর দেয়, তাহাদের নম্বর দিবে, যেগুলি দেয় না তাহাদেরও নম্বর দিবে। কোন গ্রামে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির কত লোক থাকে, তাহার হিসাব রাখিবে, উপরন্তু কৃষক, গোয়ালা, ব্যবসায়ী, শিল্পী (মুটে-মজুর) ক্রীতদাস এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু প্রতিগ্রামে কত আছে তাহার ঠিক ঠিক সংখ্যার ফর্দ রাখিবে। তা ছাড়া, প্রতি গ্রামের প্রতি বাড়ী হইতে কি পরিমাণ সোনা, বিনা মাহিনায় পরিশ্রম করিবার লোক, শুল্ক ও

তাহাকে ঐ মন্ত্রীর সম্পত্তি দখল ও ভোগ করার অধিকার দিবেন এবং তাহাকে দিয়া মন্ত্রীর জীবন আক্রমণ করাইবেন। যখন ঐ ভাই মন্ত্রীকে বিষ খাওয়াইয়া বা অস্ত্র দিয়া হত্যা করিবে, তখন রাজা সেই স্থানেই সেই ভাইকেও ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে বধ করিবেন। এইরূপ নানা রকম ছল, বল, ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া রাজা তাঁহার রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমন করিবেন। যুদ্ধ বা অন্য কারণে রাজকোষ শূন্য হইয়া গেলে অথবা রাজা অন্য প্রকারে দারুণ অর্থকষ্টে পড়িলে,—সম্পত্তিপন্ন অব্রাহ্মণ প্রজার নিকট হইতে শস্যাদির এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ দাবী করিবেন, সম্পত্তিপন্ন কৃষকদিগের নিকট হইতেও তাহাদের যাহা আছে তাহার ভাগ দাবী করিবেন, বণিকদের নিকট হইতেও অতিরিক্ত শুল্ক দাবী করিবেন। যদি এইরূপ দাবী করা সম্ভবপর না হয়, তবে 'কালেক্টর জেনারেল' নগরের ও গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট কোনও মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া চাঁদা তুলিবেন। যাহারা ধনী, তাহারা যতখানি স্বর্ণ দিতে পারে ততখানি দিতে তাহাদের অনুরোধ করা হইবে। যদি কেহ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এবং উপকার করিবার বাসনায় রাজাকে ধন প্রদান করে, তবে তাহাকে তাহার ধনের পরিবর্তে, রাজসভায় উচ্চস্থান প্রদান করিয়া, অথবা ছত্র, উষ্ণীষ (পাগড়ি) বা কোনও রকম অলঙ্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইবে। রাজকর্ম্মচারিদিগকে যথেষ্ট বেতন দিতে হইবে, তাহাদের শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বিধান করিতে হইবে, তাহা হইলে কাজে তাহারা আগ্রহ দেখাইবে। যে সকল কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেই পরলোক গমন করিবে, তাহাদের সন্তানদের ও পত্নীদের ভরণ-পোষণ ও বেতন দান করিতে হইবে এবং ঐ মৃত কর্ম্মচারিদিগের শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন আত্মীয়গণকেও অনুগ্রহ বা সাহায্য করিতে হইবে। যদি কোন কর্ম্মচারীর বাড়ীতে ব্যারাম থাকে, সন্তান প্রসব হয়, বা কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় তবে রাজা ঐ কর্ম্মচারিদিগকে ঐ উপলক্ষে উপঢৌকন প্রেরণ করিবেন।

রাজার বিরুদ্ধে কেহ কোনও কাজ করিতে পারিবেনা। রাজার হাতী, ঘোড়া, বা কোনও গাড়ী কেহ চুরি করিলে বা অনিষ্ট করিলে, তাহার ফাঁসী দেওয়া হইবে। এই সকল লোকের শব যদি কেহ বহন বা দাহ করে, তবে তাহাকেও ঐ শাস্তি দেওয়া হইবে। এই সকল অপরাধীর স্ত্রী ও সন্তানগণ যদি এই সকল অপরাধে লিপ্ত না থাকে, তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যদি কেহ রাজ্যের প্রতি লোভ করে, জোর করিয়া রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, রাজার বিরুদ্ধে বন্য জাতিকে বা অন্য শত্রুকে উত্তেজিত করে বা দুর্গের ভিতরে, গ্রামে বা সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ বিস্তার বা সৃষ্টি করে, তবে তাহাকে আপাদমস্তক দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। যদি কেহ রাজাকে অপমান করে, রাজার মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেয়, রাজার বিরুদ্ধে কোনরূপ কুচেষ্টা করে তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইবে। রাজার প্রতি উদ্ধতভাব দেখাইলে, তাহার মোটা জরিমানা হইবে। রাজকর্ম্মচারিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিলে, অথবা রাজকর্ম্মচারী সাজিলে, তাহার শাস্তি হইবে।

জালটাকা তৈয়ার ও ব্যবহার করিলে বা রাজকোষে জমা দিলে, ধার-করা, ভাড়া-করা বা গচ্ছিত দ্রব্য ফেরৎ না দিলে, ধারশোধ না দিয়া পলাইলে, মিথ্যা নালিশ করিলে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, ঘুস লইলে, ভয় দেখাইয়া বখশিস লইলে, সুদের নির্দ্দিষ্ট হার বাড়াইলে, জিনিসের দাম বাড়াইলে, পকেট (গাঁট) কাটিলে, ঝুটা বাটখারা ব্যবহার করিলে, গণনায় কম দিয়া ঠকাইলে, খারাপ জিনিস বিক্রয় করিলে, রোগযুক্ত জন্তুর বা পক্ষীর মাংস বিক্রয় করিলে, পচা মাংস বিক্রয় করিলে, ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করিলে শাস্তি হইবে।

খনি হইতে খনিজ দ্রব্য, বাগান হইতে ফল ফুল, ক্ষেত্র হইতে শস্য ক্রয় করিলে, হাঁটিয়া নদী পার হইলে, জরিমানা হইবে (কারণ উহাতে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়)। অনুমতি অর্থাৎ লাইসেন্স ব্যতীত লবণ তৈয়ার করিলে এবং মদ তৈয়ার করিলে জরিমানা হইবে।

যদি কেহ বলা সত্ত্বেও ভাড়া বাড়ী ছাড়িয়া না দেয়, অথবা কেহ ভাড়াটিয়াকে বল পূর্ব্বক বাড়ী হইতে সরাইয়া দেয় তবে তাহার জরিমানা হইবে।

প্রতিবেশীর বাড়ী বা দেওয়াল ক্ষতি করিলে, তালা ভাঙ্গিয়া কোনও বাড়ীতে প্রবেশ করিলে, বিপদ ব্যতীত জোর করিয়া অপরের বাড়ীর মধ্যে গেলে, অপরের বাড়ীর মধ্যে অনিষ্টকর দ্রব্য ফেলিলে, অপরের মাঠ বা জমি অন্যায় পূর্ব্বক অধিকার করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে। যে জন্য টাকা দেওয়া হইয়াছে, সে কাজ না করিলে, মুটে মজুর কথা মত কাজ না করিলে বা কাজ ফেলিয়া রাখিলে, অথবা নিয়োগকর্ত্তা তাহাদিগের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া না লইলে, জরিমানা হইবে। ব্যবসায়ীরা যদি বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতাকে দিতে অস্বীকার করে বা বিক্রয় বন্ধ করে, তবে তাহাদের জরিমানা হইবে। কাজে অবহেলা করিলে কাজ ফেলিয়া রাখি অথবা শিল্পীকে বিরক্ত করিলে, জরিমানা হইবে। চৌকিদার, গোয়ালা, ছুতোর, সহিস প্রভৃতি যে কেহ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিবে, তাহার জরিমানা হইবে।

বিয়ের কনে বদলাইলে বা কেহ মিথ্যা বর সাজিয়া অন্যের কনে বিবাহ করিলে, বরের বা কনের যদি কোনও দোষ বা কলঙ্ক থাকে, তাহা গোপন করিয়া বিবাহ দিলে, স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনর্থক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলে, অথবা স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে, নিন্দাবাদ করিলে, স্বামীর বাড়ীর বাহিরে গেলে এবং অনুমতি বিনা অন্য গ্রামে গেলে, জরিমানা হইবে। স্ত্রীলোককে প্রয়োজনের সময় তাহার আত্মীয়বর্গকে সাহায্য করিতে মানা করিলে জরিমানা হইবে।

কোনও আর্য্যকে কেহ ক্রীতদাস করিতে পারিবেন না। কোনও ক্রীতদাসকে কেহ হীনকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। টাকা লইয়াও ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া না দিলে, তাহাকে কোনও রকমে ঠকাইলে, বা তাহার স্ত্রী বা মেয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করিলে, জরিমানা হইবে। কোনও চণ্ডাল কোনও আর্য্যমহিলাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কোনও নিম্নজাতীয় লোক উচ্চজাতীয় কাহাকেও আক্রমণ করিলে গুরুতর শাস্তি হইবে। কোনও শূদ্র ব্রাহ্মণ সাজিলে, অথবা কেহ ব্রাহ্মণকে নিষিদ্ধ খাদ্য দিলে, সে কঠোর শাস্তি পাইবে। ব্রাহ্মণের পাকশালার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মণ যদি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারা হইবে না, জলে ডুবান হইবে। ব্রাহ্মণ অন্য যে কোনও প্রকারই অপরাধ করুক না কেন, তাহাকে কখনও উৎপীড়ন করা হইবে না।

জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। পশু পক্ষী চুরি করিলে, তাহাদের লাঠি দিয়া জোরে মারিলে, বা বিরক্ত করিলে, অনিষ্ট করেনা এইরূপ জন্তুকে মারিলে, গোয়ালা অধিকবার গো মহিষাদি দোহন করিলে, তাহাদের ব্যারাম হইলে চিকিৎসা করাইতে অবহেলা করিলে, গরু, ষাঁড়, প্রভৃতি শিংওয়ালা জন্তুদিগকে পরস্পর মারামারি করিতে দিলে, গোচারণভূমিতে আগুন ধরাইয়া দিলে, শাস্তি হইবে।

বিপদের সময় লোককে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কাহাকেও বাঘে বা অন্য জন্তুতে আক্রমণ করিলে, তাহাকে উদ্ধার না করিলে, যাহারা বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে তাহাদের নৌকা থাকা সত্ত্বেও, উদ্ধার না করিলে, আগুন লাগিলে নিবাইতে সাহায্য না করিলে, আগুন রাখিবার যন্ত্রপাতি বাড়ীতে না রাখিলে, অপর কোনও স্ত্রীলোক অপরের প্রসবের সময় সাহায্য না করিলে, জরিমানা হইবে। পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে ত্যাগ করিলে, গ্রামে আগন্তুক আসিলে তাহাদের আসা যাওয়ার খবর রাজকর্ম্মচারীকে না জানাইলে, নিন্দিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ রাখিলে, কুৎসিৎ কথা বলিলে, কাহারও অযথা নিন্দাবাদ করিলে, অশক্ত বড়ী তৈয়ার করিলে, বাড়ীর নিকট জল নিঃসরণের পথ তৈয়ার না করিলে, বাড়ীতে আগুন রাখার স্থান নির্ম্মাণ না করিলে, কৃপণতা দেখাইলে অথবা বেশী ব্যয় করিলে, জরিমানা হইবে। গায়করা বেশীক্ষণ গান গাহিতে পারিবে না, কোনও গাছের তলায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশীক্ষণ কেহ বসিয়া থাকিতে পারিবে না, রাত্রিকালে কেহ নিজের বা অপরের বাড়ীর ছাদে উঠিতে পারিবে না। বিনা কারণে দৌড়াইলে, জোরে ঘোড়া প্রভৃতি চালাইলে গাড়ীতে ঢিল ছুঁড়িলে, রাস্তা বন্ধ করিলে, জীব-জন্তুকে যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে দিলে, মাঠের উপর দিয়া গরু মহিষ প্রভৃতি চালাইলে,

গ্রামের বেড়া ভাঙ্গিলে, গ্রামের সীমানা চিহ্ন নষ্ট করিলে, গাছ কাটিলে, ফলের গাছের ডাল কাটিলে, শস্যাদির উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে, জন্তুর গলার দড়ি চুরি করিলে, জরিমানা হইবে। মিথ্যা ও কুৎসিৎ গুজব রটাইলে, পথে পথিককে বাধা দিলে, তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হইবে। জলপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধ কাটিয়া দিলে তাহাকে ঐ জলাশয়েই ডুবান হইবে।

সেকালের ব্রাহ্মণেরা মদও খাইত, মাংসও খাইত। ব্রাহ্মণেরা সৈন্যও হইত, যদিও কৌটিল্যের নিজের মতে ব্রাহ্মণ সৈন্য তত সুবিধাজনক নয়। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা রমণী ব্যতীত, ব্রাহ্মণ শূদ্রা নারীও বিবাহ করিতে পারিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মেয়েদের পিতা বা অভিভাবকগণ বিবাহ না দিলে, সেকালের মেয়েরা নিজের ইচ্ছামত পুরুষকে বিবাহ করিবার অধিকার ভোগ করিত। স্বামীর মৃত্যুর পর, বা স্বামী বিদেশে গিয়া বহুকাল থাকিলে, স্ত্রী ইচ্ছা করিলে অন্য লোককে আবার বিবাহ করিতে পারিত। স্বামী দুশ্চরিত্র হইলে, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে, জাতিচ্যুত হইলে, অথবা স্বামী হইতে স্ত্রীর জীবনের আশঙ্কা থাকিলে, সেই স্বামীকে পত্নী ত্যাগ করিতে পারিত। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হইলে, স্বামী অথবা স্ত্রী বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করিতে পারিত, অর্থাৎ সেকালে 'ডিভোর্স সিষ্টেম' প্রচলিত ছিল, এখন যেরূপ পাশ্চাত্যদেশে আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়িলে আরও জানা যায় যে, সেকালেও দেশে হোটেল ছিল, হাসপাতাল ছিল, নার্স ছিল, বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্র ছিল, সময় নিরূপণের যন্ত্র ছিল, নানা প্রকার দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল, আরও কত কি ছিল। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণেরা বিষাক্ত গ্যাস্ ব্যবহার করিয়াছিল, কৌটিল্যের সময়েও ঐরূপ বিষাক্ত গ্যাস্ (বাষ্প) ছাড়িয়া শত্রুপক্ষকে বিনাশ করা অথবা অকর্ম্মণ্য করার রীতি জানা ছিল এবং কৌটিল্য যুদ্ধের সময় তাহা ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব্বেই জার্ম্মানীতেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একখানা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কৌটিল্যের সময়েই সেলুকস নিকেটারের দূত মেগাস্থিনিস্ অনেকদিন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন। কিন্তু মেগাস্থিনিস্ যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, তাহার সহিত কৌটিল্যের অনেক কথার মিল নাই। না থাকুক, কিন্তু কৌটিল্যের শাসনে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা মেগাস্থিনিসের তিনটি কথা হইতেই বেশ বোঝা যায় (১) ভারতবাসীরা সাধারণতঃ মিতব্যয়ী, (২) ভারতবর্ষে চুরির সংখ্যা অতি অল্প, ও (৩) ভারতীয়গণ কদাচিৎ বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা করে।

কৌটিল্যের সময় বাঙ্গলা দেশে ভারী চমৎকার নরম কম্বল, এবং উৎকৃষ্ট চাদর কাপড় তৈয়ার হইত, এবং অর্থশাস্ত্রে তিনি সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর গৌড়ে এক প্রকার রূপা পাওয়া যাইত, তাহার নামই ছিল 'গৌড়িক', একথাও বলিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র-নীতিতে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থ তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বর্ত্তমান যুগে যেমন নানারূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা ও বিভাগ অনুযায়ী শাসনকার্য নির্ব্বাহ হইতেছে সে কালেও এইরূপই ছিল, তাহা তোমরা এই বিবরণ জানিতে পারিবে। সে কালের মন্ত্রিগণ রাজ্যশাসন সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। রাজা তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবেন। কোনরূপ গুরুতর রাজকার্য্য সুমীমাংসার জন্য একটি মন্ত্রণা পরিষৎ ছিল। রাজা, মন্ত্রী ও পরিষদবর্গকে মিলিত করিয়া সভা আহ্বান করিতেন এবং তাঁহারা যে মীমাংসায় আসিতেন তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। অর্থশাস্ত্র হইতে ইহা বিশেষ ভাবে জানিতে পারা যায় যে, রাজা জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না। এমনও জানা গিয়াছে যে, অনেক রাজা জনমত অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করায় প্রাণ হারাইয়াছেন। রাজা রাজ্যের একজন বেতনভুক্ কর্ম্মচারী জ্ঞানে প্রজার কল্যাণের জন্য আত্মশক্তি নিয়োগ করিতেন।

ডাকঘরের ইতিহাস

১৬০৪ পৃষ্ঠার পর
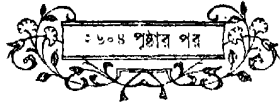
গবর্ণমেণ্ট অনন্যোপায় হইয়া জন পামারের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ডাকাতের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য চালক ভিন্ন গাড়ীতে আরও একজন সশস্ত্র প্রহরী থাকিত। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে ডাক লুণ্ঠন বন্ধ হইল বটে; কিন্তু ডাকবিভাগের খরচ বৃদ্ধি পাইল। এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে চিঠির মাশুল পুনঃ বৃদ্ধি করা হয়। তখন মাশুলের হার এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—

১	হইতে	১৫	মাইল	পর্য্যন্ত	৩ পেনি
১৬	হইতে	৩০	,,	,,	৪ পেনি
৩১	,,	৬০	,,	,,	৫ ,,
৬১	,,	১০০	,,	,,	৬ ,,
১০১	,,	১৫০	,,	,,	৭ ,,
ইহার উপর					৮ ,,
এডিনবরা					৮ ,,

তারপর ১৮০১ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পুনঃ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়। শেষোক্ত বৃদ্ধিই শেষ বৃদ্ধি। এই সময়ে যিনি 'পোষ্টমাষ্টার জেনারেল' ছিলেন, তিনি মাশুল বাড়াইবার যত রকম উপলক্ষ খুঁজিতেন এবং ডাকমাশুল বাড়াইতে পারিলেই যেন আনন্দ পাইতেন। ফরাসী দেশের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাহার এই মাশুল বাড়াইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তাহার কিয়দংশ ডাক বিভাগ হইতে যোগান হইত। ইহার ফলে মাশুল এত বাড়িয়া যায় যে মধ্যবিত্তলোকের পক্ষে ডাকে চিঠি দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ভাল রাস্তাঘাট ও চলাফেরার সুবন্দোবস্তের সহিত ডাকবিভাগের উন্নতির এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের রাস্তাঘাটের অবস্থা কিরূপ ছিল, আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সারা ইংল্যাণ্ডের আধুনিক সুন্দর ও বিস্তৃত রাজপথগুলি দেখিলে সেই সময়কার রাস্তাঘাটের অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণাই করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে একখানা ভাল মোটরে চড়িয়া ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড অল্প কয়দিনে রাজার হালে ভ্রমণ করিয়া আসা যায়। কিন্তু মাত্র দেড়শত বৎসর আগে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতাভিমানী ও শক্তিশালী ইংরাজ জাতির দেশের রাস্তাঘাটের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে 'কিউ' (Kew) নামক পাড়া হইতে সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে যাইতে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ও রাণী

কেরোলাইনকে একরাত্রি পথে যাপন করিতে হইয়াছিল। আর একবার রাজশকট উল্টাইয়া গিয়া রাজা ও রাণীকে কর্দ্দমাসিক্ত হইতে হইয়াছিল। রাজধানীর পথে রাজশকটের যখন এরূপ দুর্গতি হইত তখন, অন্যত্র রাস্তার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী কেন্‌সিংটন নামক স্থানের জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ হইতে একটি রাস্তা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনৈক বিশিষ্ট ইংরাজ নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—"এই রাস্তা বার মাইল পর্য্যন্ত এত সঙ্কীর্ণ যে, ইহাতে একটি গাড়ী চলিলে তাহার পার্শ্ব দিয়া মানুষ চলা দূরে থাক, একটি ইঁদুর পর্য্যন্ত চলিতে পারিত না। একদিন আমার গাড়ী কাদায় আটকাইয়া গেলে—সেই আশঙ্কা প্রায় সব রাস্তায়ই ছিল—তাহা কাদা হইতে তুলিবার জন্য

তুষার ও ঝড়ের মধ্য দিয়া ডাকগাড়ী চলিয়াছে—২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৩৬—একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে

তখনকার অবস্থা খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে :—

"লণ্ডন সহরের এত নিকটে থাকিয়াও চলাচলের পক্ষে রাস্তাটি নিতান্ত অনুপযুক্ত হওয়ায় আমাদের মনে হইত যেন আমরা দূরে সমুদ্র মধ্যস্থ কোন নির্জ্জন দ্বীপে বাস করিতেছি।" বলা বাহুল্য কেন্‌সিংটন বর্ত্তমানে লণ্ডন সহরের একটি উপকণ্ঠ মাত্র।

তখনকার রাস্তা এত উচ্চ-নীচ ছিল যে সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণকে গাড়ী করিয়া চলিবার সময় গাড়ী উল্টাইয়া যাইবার আশঙ্কায় উভয় পার্শ্বে লোক রাখিতে হইত। শুধু তাহাই নহে, এইসব রাস্তা আবার অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল। তদানীন্তন কোন সঙ্গীয় অনুচরের পিছন হইতে সম্মুখের দিকে যাইবার দরকার হয়, কিন্তু পাশ দিয়া যাইবার স্থান না থাকায় তাহাকে গাড়ীর নীচ দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইয়াছিল।" ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৪ খৃঃ মধ্যে রাস্তার উন্নতি সম্পর্কে ৪৫২টি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের রাজপথের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। একে রাস্তা অপরিসর, তাহার উপর পথিপার্শ্বস্থ গাছগুলি রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়া রাখিত। ইহাতেই দুরবস্থার শেষ ছিল না, তাহার সঙ্গে ছিল—জল, কাদা, গর্ত্ত। এই সমস্ত মিলিয়া রাস্তার অবস্থা এরূপ বিশ্রী হইয়া

থাকিত যে গাড়ীতে চলাচল করাও আরামদায়ক ত ছিলই না ; বরং বিশেষ বিপজ্জনক ছিল। যাহারা পদব্রজে যাতায়াত করিত তাহাদিগকেও গাড়ীর চাকা, ঘোড়ার পা হইতে ছিটান জল কাদায় অস্থির হইতে হইত। সমসাময়িক্ ফরাসীদের রাস্তার অবস্থাও তদ্রূপই ছিল। ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই ও রাণী মেরী রাজ্যাভিষিক্ত হইবার জন্য রাজধানী 'প্যারি' নগরী হইতে 'রিম্‌স' সহরে শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার সময়ের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে দর্শকগণ

রাস্তাঘাটের এইরূপ দুর্দ্দশা সত্ত্বেও তাহার উন্নতিকল্পে চেষ্টা হইলে তাহার কিরূপ প্রতিকূলতা হইয়াছিল তাহা শুনিলে এখন অবাক্ হইতে হয়। ভাল রাস্তার প্রতি দেশের লোকের বিদ্বেষ এরূপ প্রবল ছিল যে, নূতন রাস্তা তৈরী হইলে অনেকে তাহা ব্যবহার পর্য্যন্ত করিত না। পথঘাটের উন্নতি উপলক্ষে অনেক সময় রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। পুরাতন প্রথার প্রতি মানব জাতির অহেতুক অন্ধভক্তিই ইহার কারণ। মানুষের এই মূঢ়তা যে কতদূর পৌঁছিতে পারে এই সম্পর্কে

ডাকগাড়ী বিপদের মুখে—তুষার-ঝটিকা—১৮৩৬

গাড়ীর চাকার ও ঘোড়ার পায়ের জল কাদার ভয়ে দূর হইতে এই শোভাযাত্রা দেখিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই জলকাদার জন্য প্যারি সহরে পোষাক বাঁচাইয়া রাস্তা পার হওয়াই দুষ্কর ছিল। এমন কি অনেকে পোষাক নষ্ট হইবার ভয়ে কাল পোষাক ও কাল মোজা পরিয়া রাস্তায় বাহির হইত। দেশের সর্ব্বত্রই প্রায় এই অবস্থা ছিল বলিয়া অনুমান হয়। য়ুরোপের এই দুই সভ্য দেশের পথঘাটের অবস্থাই যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের পথঘাটের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

তাহার আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রথম যখন গাড়ীর সৃষ্টি ও প্রচলন হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধেও ঘোরতর আন্দোলন ও প্রবল বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও আমরা পদে পদে দেখিতে পাই। এখানে একটি দেশীয় উদাহরণ দিবার লোভ-সংবরণ করিতে পারিলাম না। এক গ্রামে কোন এক ভদ্রলোক একটি নূতন পুষ্করিণী সর্ব্বসাধারণের পানীয় জলের সুবিধার জন্য খনন করিয়া দিলে, গ্রামের প্রবীণ মুরুব্বিরা ঐ নূতন পুষ্করিণীর জল ব্যবহার না করিয়া বহুদিনের শেওলা-পড়া দূষিত

পুরাতন ডোবার জল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের বাপ-দাদা তিন পুরুষ যে পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পুষ্করিণীর পরিষ্কার জল পান করিবার কোন সঙ্গত যুক্তিই তাহারা দেখিতে পান নাই।

রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালের (১৫৫৬—১৬০৩ খৃঃ) পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডে গাড়ীর অস্তিত্ব ছিল না। ইংল্যাণ্ডে প্রথম গাড়ী প্রস্তুত হয়। তখন গাড়ীতে স্প্রিং থাকিত না। অনেকটা আমাদের দেশের গোযানের মত ছিল! তাহার উপর রাস্তার অবস্থা নিতান্ত মন্দ থাকায় ঝাকানির চোটে গাড়ী চড়া মোটেই আরামজনক ছিল না। এমন কি অনেকেই ঝাকনির ভয়ে পারতপক্ষে গাড়ী চড়িতে চাহিত না। প্রথম গাড়ী রাণী এলিজাবেথের ব্যবহারের জন্য তৈরী হয় এবং তিনি পার্লামেণ্টের

সেকালের ডাকের পেয়াদা

তখন সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করিত। সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের জন্য পুরুষ অশ্বারোহীর পিছনে একটি স্বতন্ত্র আসন থাকিত। আত্মীয় বা কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর লোকের সাথে তাহারা সচরাচর এভাবে যাইতেন না। রাণী এলিজাবেথ অশ্বপৃষ্ঠে সাধারণতঃ লর্ড চ্যানসেলারের পশ্চাতে বসিয়া নগরে বাহির হইতেন। তদানীন্তন বৃটিশ দরবারের ফরাসী দূতের পরামর্শ অনুযায়ী এক অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে ইহা প্রথম ব্যবহার করেন। কিন্তু এই একবারের অভিজ্ঞতার পর তিনি আর দ্বিতীয়বার ইহাতে চড়েন নাই।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় হইতে সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য লণ্ডন সহরে প্রথম গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম গাড়ী ঘণ্টায় মাত্র ৩ মাইল করিয়া চলিত। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই গাড়ী ব্যবহারের

বিরুদ্ধে একদল লোক খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বিরুদ্ধদল কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তকে গাড়ী চড়ার বিপক্ষে নিম্নলিখিত অভিমত লিপিবদ্ধ থাকা দেখিতে পাওয়া যায়!

"গাড়ী চড়িলে লোক অলস ও আরামপ্রিয় হইয়া যায়; পরিশ্রমে অপটু হইয়া পড়ে; তখন আর ঘোড়া চড়িতে, তুষার ও বৃষ্টিপাত সহ্য করিতে কিংবা খোলা মাঠে রাত্রি যাপন করিতে পারে না।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ সুখ সুবিধার প্রতিকূলে এই সব মানবহিতৈষীর কোন যুক্তিই টিকিল না—গৃহীত হয় নাই। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মাল বহন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম রেলগাড়ী ব্যবহৃত হয়।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোক চলাচলের জন্য লিবারপুল হইতে ম্যানচেষ্টার পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হয় এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রেলযোগে প্রথম ডাক পাঠান হয়। তারপরে রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে ডাক পাঠান বন্ধ হইয়া যায়। সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে বার্ম্মিংহাম পর্য্যন্ত রেললাইন খোলা হইলে পাকাপাকিভাবে রেলে ডাক চলা সুরু হয়।

পথের বিপদ

গাড়ীর ব্যবহার ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে লাগিল।

গাড়ী প্রথম প্রচলিত হইবার প্রায় ২০০ শত বৎসর পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে গাড়ীতে ডাক বহন করিবার ব্যবস্থা হয়। এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও টিকে নাই। প্রায় ৬০ বৎসর [illegible] গাড়ীতে ডাক চলাচলের পর রেল প্রচলন হইলে রেলযোগে ডাক পাঠাইবার [illegible]। বলাবাহুল্য, রেলে ডাক পাঠাইবার [illegible] হয় একেবারে বিনা প্রতিবাদে

এখন রেলে ডাক পাঠাইবার প্রতিবাদীগণের আপত্তির কয়েকটি নমুনা দিতেছি। তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ার সঙ্ঘের সভাপতি এই বলিয়া আপত্তি তুলিলেন যে, রাত্রে রেল চালাইতে হইলে পুলিশ দ্বারা সমস্ত লাইন পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ বা এই বলিয়া আপত্তি করিল যে রাত্রে রেল চালাইতে হইলে সমস্ত লাইন গ্যাস দ্বারা আলোকিত করিতে হইবে। এই সব আপত্তি হইতে জানা যায় তখন পর্য্যন্ত রাত্রে রেল চলিত না।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাতায়াতের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার দুইটি নমুনা দিয়া এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। বর্ত্তমান সময়ে তারে ও বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হওয়ায় সামান্য ঘটনার কথা কয়েক মিনিটের ভিতর সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতেছে ; কিন্তু সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দেশেও **প্রথম চার্লস্**-এর হত্যার খবর ও তৎস্থলে **ক্রমওয়েলের প্রোটেক্টর** হওয়ার খবর লণ্ডন হইতে ব্রিজওয়াটার পৌছিতে ১৯ দিন এবং ওয়েলস্ প্রদেশের কোন কোন স্থানে পৌছিতে ২ মাসের উপর লাগিয়াছিল।

১৮০১ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধিত মাশুলের হার এইরূপ ছিল :—

১৮০১ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত মাশুল।

	১৫ মাইল পর্য্যন্ত	৩ পেনি	
১৬ হইতে	মাইল পর্য্যন্ত	৪ ,,	
৩১ ,,			
৫১ ,,	৮০		
	১২০		
১২১ ,,	১৭০		
১৭১ ,,	২৩০ ,,	৯ ,,	(লিভারপুল)
২৩১ ,,	৩০০ ,,	১০ ,,	
৩০১ ,,	৪০০ ,,	১১ ,,	
৪০১ ,,	৫০০ ,,	১২ ,,	(এডিনবরা)
৫০১ হইতে	৬০০ মাইল পর্য্যন্ত	১৩ ,,	
৬০১ হইতে	৭০০ ,,	১৪ ,,	
তাহার উপর		১৫ ,,	

১৮১২ খৃষ্টাব্দের নির্দ্ধারিত মাশুল :—

	১৫ মাইল পর্য্যন্ত	৪ পেনি	
১৬ হইতে	১৯ মাইল পর্য্যন্ত	৫ ,,	
২০ ,,	২৯ ,,	৬ ,,	
৩০ ,,	৪৯ ,,	৭ ,,	
৫০	৭৯		
৮০	১১৯		
১২০	১৬৯	১০	(লিভারপুল)
১৭০	২২৯	১১	
২৩০	২৯৯	১২	
৩০০	৩৯৯	১৩	
৪০০	৪৯৯	১৪	(এডিনবরা)
৫০০ ,,	৫৯৯	১৫ পেনি	
৬০০ ,,	৬৷	১৬ ,,	
৭০০ মাইলের উপর		১৭ ,,	

মাশুল এতটা বৃদ্ধি পাইবার ফলে অনেকে ডাকে চিঠি না দিয়া গোপনে অন্য উপায়ে চিঠি পাঠাইতে আরম্ভ করে। যে গাড়ী সরকারী ডাক লইয়া যাইত, তাহাদের চালকগণকে ঘুষ দিয়া অল্প খরচে চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা অনেকেই এই সময়ে করিতে লাগিল। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম ডাক-মাশুল প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ৮০ মাইল পর্য্যন্ত চিঠির মাশুল ২ পেনি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তাহা চতুর্গুণ হইয়া ৮ পেনিতে দাঁড়াইল। সর্ব্ব-নিম্ন মাশুলই তখন ৪ পেনি হইয়া গিয়াছে। সেই সময় সাধারণ মজুরের দৈনিক আয় ছিল মাত্র ১৫ পেনি।

১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাস্তায় চিঠির বাক্স প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাতে ৮ হইতে সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে পোষ্টাফিসে চিঠি দিতে হইত। ইহার পূর্ব্বে বা পরে ডাকে চিঠি দিবার উপায় ছিল না। ডাক বিভাগের কাজ বৃদ্ধির ভয়ে তদানীন্তন 'পোষ্টমাষ্টার জেনারেল' চিঠি ডাকে দিবার সময় বাড়াইয়া দিতে রাজী হন নাই। সাধারণের সুবিধা অপেক্ষা এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের সুবিধার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি ছিল বেশী। আর একটি আশ্চর্য্য নিয়ম এই ছিল যে পোষ্টাফিসের কেরাণীগণ প্রাতে ৯ টার আগে এবং বৈকালে ৫ টার পর আফিস করিত এবং ৯ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে অন্যত্র কাজ কর্ম্ম করিতে পারিত। চিঠি যে স্থান হইতে লেখা হইয়াছে সেইস্থানে ডাকে দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা দেখিবার জন্য সেই সময়ে সদা সর্ব্বদা চিঠি খোলা হইত। এই সব অসুবিধার বিরুদ্ধে লোকেরা আন্দোলন সুরু করে এবং সেই আন্দোলন ক্রমে পার্লামেণ্টে পৌছায়। গবর্ণমেণ্ট জনমত উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই সব অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিশন বসাইতে বাধ্য হয় এবং উহার নির্দ্দেশমত 'পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের' ছি তুলিয়া দিয়া তাহার স্থলে ৩ জন কমিশনার নি ; রিবার প্রস্তাব হয়। এই সময় **রোলাণ্ড হিল** ন্য জনৈক ইংরেজ ডাকবিভাগের উন্নতিনির্দ্দিষ্ট র। একটি সারগর্ভ পুস্তক প্রকাশ করেন স্থা হয় করি: লে গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবও গাড়ী ালীর আমূল

সংশোধন করিতে বাধ্য হয়। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে উইদারিঙ্গস সাহেব ডাকে সর্ব্বসাধারণের চিঠি দিবার অধিকার দান করিয়া এবং চিঠির মাশুল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া এই বিভাগের উন্নতির যে সূচনা করিয়া যান, দুইশত বৎসর পরে রোলাণ্ড হিল সাহেবের মহৎ চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণ হয়। বর্দ্ধিত মাশুল এড়াইবার জন্য লোকেরা যে সব উপায় অবলম্বন করিত তাহার একটি দৃষ্টান্ত কবি কোলারিজ-এর স্কটল্যাণ্ডের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। একদিন তিনি এক ডাকপিওনকে কোন একটি গৃহস্থবাড়ীতে একটি চিঠি বিলি করিতে দেখিতে পান। তিনি লক্ষ্য করিলেন, গৃহস্বামিনী চিঠিটি হাতে লইয়া এদিক ওদিক উল্টাইয়া উহা না রাখিয়া ডাকপিওনকে পুনরায় ফিরাইয়া দিল।

অদ্ভুত ঠিকানা
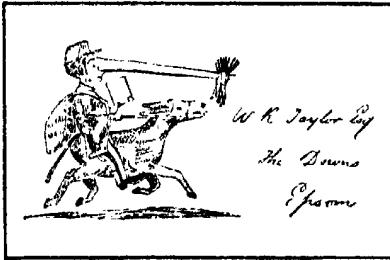
তখনও চিঠির মাশুল অগ্রিম দিতে হইত না। কাজেই চিঠি না লইলে আর মাশুল লাগিত না। স্ত্রীলোকটি অর্থাভাবে মাশুল দিতে অসমর্থ হওয়ায় চিঠিটি ফিরাইয়া দিতেছে মনে করিয়া তিনি নিজে মাশুল দিয়া উহা রাখিয়া দেন। ডাকপিওন চলিয়া গেলে বৃথা অর্থনষ্ট করিবার জন্য স্ত্রীলোকটি কবিকে অনুযোগ দিলে তিনি ভিতরকার রহস্য জানিতে চাহেন। স্ত্রীলোকটি তখন তাহাকে যাহা বলে তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—অধিক মাশুল দিয়া চিঠি রাখিবার মত অবস্থা তাহার নয়; অথচ তাহার যে ভাই লণ্ডন সহরে থাকে তাহার খবর না পাইলেও চলে না। লণ্ডন হইতে তাহাদের ওখানে চিঠির মাশুল ১৪ পেনি। সেইজন্য ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে এই ব্যবস্থা স্থির হয় যে, ভাই ভাল থাকিলে চিঠিতে কিছু লেখা থাকিবে না এবং সেই চিঠি বোনটি অনর্থক পয়সা নষ্ট করিয়া গ্রহণ করিবে না। কিছু
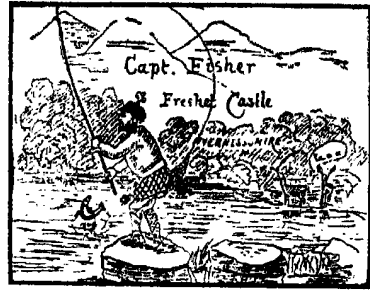
অদ্ভুত ঠিকানা

লেখা আছে কি না তাহা বুঝিবার সঙ্কেত ও তাহারা স্থির করিয়া লয়। এইরূপ অনেক উপায়ে লোকেরা তখন ডাকবিভাগকে ঠকাইত। পার্লামেণ্টের সভ্যগণের তখন বিনা মাশুলে চিঠিপত্র দিবার অধিকার ছিল। চিঠির উপর তাহাদের নামও পার্লামেণ্টের সভ্য এই কথা কয়টি লেখা থাকিলেই চলিত। পার্লামেণ্টের অনেক সভ্য নির্দ্দিষ্ট মাশুল অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের স্বাক্ষরযুক্ত খাম অন্যের নিকট বিক্রয় করিতেন।

আবার সেকালে চিঠির উপরকার ঠিকানাও লেখা হইত অত্যন্ত অদ্ভুত উপায়ে। অনেক সময়
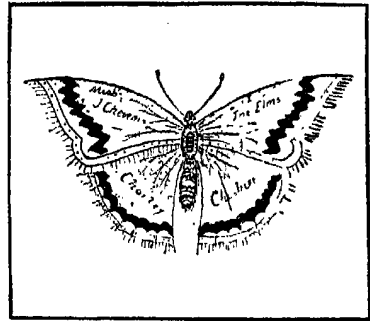
অদ্ভুত ঠিকানা

ছবি আঁকিয়া ঠিকানা লেখা হইত। কোন কোন চিঠির উপরের ঠিকানা একেবারেই পড়া যাইত না

এখানে তাহার কয়েকখানির নমুনা দিলাম। তোমরা পড়িয়া দেখিতে পার কিনা চেষ্টা করিও।

হিল সাহেব দেখিলেন দেশের লোক-সংখ্যা ও ধনবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ডাক বিভাগের আয় দিন দিন কমিতেছে। অতিরিক্ত মাশুলই যে এই অস্বাভাবিক অবস্থার একমাত্র কারণ ইহাতে তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে ডাক বহনের ও এই বিভাগের অন্যান্য খরচ যথাসম্ভব কমাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট কখনও মাশুল কমাইতে রাজী হইবে না। এই ধারণা হইতে তিনি প্রথমেই এই বিভাগের ব্যয় হ্রাস করিবার পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। তখন চিঠির মাশুল অগ্রিম দিতে হইত না বলিয়া, কত মাশুল আদায় হইবে তাহার একটা হিসাব রাখিতে হইত; ইহাতে অনেকটা সময় নষ্ট হইত এবং খরচও অধিক পড়িত। দ্বিতীয়তঃ চিঠি বিলি করিবার সময় মাশুল আদায় করিতেও ডাকপিওনদের অনেক সময় যাইত। তজ্জন্য পিয়নের সংখ্যাও বেশী ছিল আবার দূরত্ব অনুসারে চিঠির মাশুল আদায় করিতে হইত বলিয়া তাহারও পৃথক হিসাব রাখিতে হইত। এই জন্যও অতিরিক্ত লোকের আবশ্যক হইত। তিনি দেখিলেন, সব জায়গায় চিঠির মাশুল একরূপ নির্দ্দিষ্ট হইলে এবং তাহা অগ্রিম দিবার ব্যবস্থা

অস্পষ্ট ঠিকানা

করিলে, অনেক কম সংখ্যক কর্ম্মচারী দ্বারা কাজ চলিতে পারে এবং ফলে খরচেরও অনেক সাশ্রয় হইতে পারে। তিনি হিসাব করিয়া প্রমাণ করিয়া দেন, দূরের চিঠি বহন করিবার জন্য খরচ খুব বেশী পড়ে না এবং এক পেনি খরচেই ইংল্যাণ্ডের যে কোন স্থানে চিঠি পাঠান সম্ভব। এই সময়ে (১৮৩৭ খৃঃ) ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্ত্তে রেলে ডাক যাতায়াত আরম্ভ হওয়ায় হিল সাহেবের

ঠিকানা পড় দেখি?

আন্দোলনের পক্ষে সুবিধা ঘটে। ডাকবিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাগণ হিল সাহেবের সংস্কার প্রস্তাবের বিশেষ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাহাদের আপত্তির দু' একটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

সেই সময় যুক্তরাজ্যে ৪ কোটী ২০ লক্ষ চিঠির মাশুল আদায় হইত। ইহা হইতে যে পরিমাণ আয় হইত, এক পেনি মাশুল হইতে সেই পরিমাণ আয় হইতে হইলে ৪৮ কোটী চিঠির দরকার। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—এত চিঠি কখনো হইবে না, আর হইলেও প্রতিদিন যে পরিমাণ চিঠি হইবে তাহা ধরিতে পারে এমন কোন পোষ্টাফিস নাই। অধিকন্তু কর্ম্মচারীগণও কাজ করিয়া কুলাইতে পারিবে না। আবার কেহ কেহ বলিলেন অগ্রিম মাশুল দেওয়া ইংরাজ জাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ—তাহারা ইহাতে কোন মতেই রাজী হইবে না।

ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ভীত হইলেও দেশের লোক সংস্কার প্রস্তাবের সমর্থনই করিতে লাগিল এবং পরিশেষে পার্লামেণ্টও হিল সাহেবের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিল। এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বসাধারণের নিকট সহনীয় করিবার জন্য মাশুল হঠাৎ একেবারে এক পেনি না করিয়া সেই সময়কার সর্ব্ব নিম্ন মাশুল ৪ পেনি ধার্য্য করা হয়। ইহার

LONDON

মাস খানেক পর, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী হইতে ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র এক পেনি মাশুল নির্দ্দিষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে টিকিট দিয়া মাশুল অগ্রিম আদায় করিবার ব্যবস্থা হয়। ঐদিন পোষ্টাফিসের

অনেকে বিনা প্রয়োজনেও পরস্পরের নিকট চিঠি প্রেরণ করিয়াছিল। একমাত্র লণ্ডন সহরেই সে দিন ১ লক্ষ ১২ হাজার চিঠি ডাকে দেওয়া হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পেনি পোষ্টেজ প্রচলিত হয়। আয় কমিয়া যাইবার ভয়ে ঐ দুই দেশ তখন পর্য্যন্ত উহা প্রচলন করিতে সাহসী হয় নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ কলোনী, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ড, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া পেনি পোষ্টেজ গ্রহণ করে। শেষোক্ত দেশ ইংল্যাণ্ড হইতে লিখিত চিঠি এক পেনি মাশুল নিতে রাজী হইলেও নিজেদের দেশের চিঠির জন্য ২ পেনি মাশুল আদায় করিত। ১৯০৮ সালে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ও ১৯০৯ সালে জার্ম্মাণী ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে

অদ্ভুত ঠিকানা

এক পেনি ডাক প্রচলিত হয়। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় যুদ্ধের অতিরিক্ত খরচ সংগ্রহের জন্য প্রায় সব দেশের ডাকমাশুলই বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এখনও অনেক দেশে মাশুলের হার যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে ঐ দেশের অন্তর্গত চিঠির জন্য পুনঃ এক পেনি মাশুল নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও দুই আনা মাশুল

অদ্ভুত ঠিকানা

চলিয়াছে। মোট কথা, হিল সাহেবের চেষ্টা ডাক বিভাগে যুগান্তর আনয়ন করে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পেনি পোষ্টেজের ফলে জ্ঞান বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয় ও অশেষবিধ উপকার ও উন্নতি সাধিত হয়। ডাকবিভাগের এই উন্নতি না হইলে পৃথিবীর সভ্যতার এত দ্রুত উন্নতি হইত কিনা সন্দেহ।

ডাকবিভাগের উন্নতি-বিধান ও তাহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য রোলাণ্ড হিলকে "পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল"এর পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই কাজে তাঁহার সমস্ত শক্তি ও চিন্তা নিয়োজিত করেন। বলিতে গেলে তাঁহার সমস্ত সত্তা তিনি তাঁহার এই কার্য্যের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইটালীর ত্রাণকর্ত্তা বিশ্ববিশ্রুত গ্যারিবল্ডি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলে হিল সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই ঐ দেশের ডাকবিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন! গ্যারিবল্ডি কিন্তু তাঁহার কৌতূহল সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহাতে গ্যারিবল্ডি সম্বন্ধে তাঁহার যে উচ্চ ধারণা ছিল তাহা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। কথা-প্রসঙ্গে তিনি এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতার নিকট গল্প করিলে তাঁহার ভ্রাতা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয় আপনি

মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইয়াও সেখানকার দ্বাররক্ষক সেণ্ট পিটারকে, সেখানে দিনে কয়বার চিঠি বিলি হয়, স্বর্গ ও অন্যান্য স্থানের মধ্যে ডাক কি করিয়া যায় এবং তাহার খরচ কিরূপে নির্ব্বাহ হয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবেন; এবং এই সব খবর না লইয়া স্বর্গেও প্রবেশ করিবেন না।"

খৃষ্টাব্দ	চিঠির সংখ্যা	আয়
১৮৩৯	৭,৬০,০০,০০০	১৬,৩৪,০০০ পাঃ
১৮৪০	১৬,৯০,০০,০০০	৫,০০,০০০ পাঃ
১৮৪৫	২৪,২০,০০,০০০	৭,২০,০০০ পাঃ
১৮৫০	৩৩,৭০,০০,০০০	৮,৪০,০০০ পাঃ
১৮৫৬ হইতে ১৮৬০ গড়ে	৫২,১০,০০,০০০	অজ্ঞাত

উল্লিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 'পেনি

সেকালের রিটার্ণড্ অফিস্

পোষ্টেজ' প্রবর্ত্তনের বৎসর চিঠির সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হইয়াছিল। আয় পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। চিঠির সংখ্যা প্রতি বৎসর এরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে তাহার ফলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পেনি পোষ্টেজ হইতেই ডাক বিভাগের আয় পূর্ব্ব আয় অপেক্ষা ১ লক্ষ পাউণ্ড অধিক হয়। পূর্ব্বে যেখানে সর্ব্বসাধারণের ন্যূনকল্পে ৪ পেনি ঊর্দ্ধকল্পে ১৫ পেনি মাশুল দিতে হইত, সেখানে হিল সাহেবের কল্যাণে সকলকে মাত্র ১ পেনি দিতে হইলেও আয়ের ঘাটতি আর রহিল না।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হিল সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে দেশের লোকের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পার্লামেণ্ট তাঁহাকে বিশ হাজার পাউণ্ড এককালীন দান করেন এবং তাঁহার পদের পূরা বেতন বার্ষিক ২০০০ পাউণ্ড পেন্‌সন্ মঞ্জুর করেন। এতদ্ব্যতীত সম্রাট তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ডাক-বিভাগে যে সব সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(১) পেনি পোষ্টেজ প্রবর্ত্তন।

(২) টিকিট দ্বারা অগ্রিম মাশুল আদায়।

(৩) বুক পোষ্ট প্রথার প্রবর্ত্তন।

(৪) পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা।

(৫) মনিঅর্ডার কমিশন ও রেজিষ্ট্রেশন ফিস কমান।

(৬) ফ্রাকিং প্রথা (franking) রহিত করা।

ডাক-বিভাগের এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পাল-পরিচালিত অর্ণবপোতের পরিবর্ত্তে বাষ্প-চালিত স্থল ও জলযানের প্রবর্ত্তন ও টেলিগ্রাফের আবিষ্কার ও প্রচলন হওয়ায় এই বিভাগের উন্নতি অধিকতর দ্রুত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। শিক্ষার উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার এবং বৃটিশ রাজত্বের বিস্তারে এই বিভাগ যেরূপ সাহায্য করিয়াছে, সেইরূপ আবার ইহাদের সাথে সাথেই এই বিভাগেরও উন্নতি সহজসাধ্য হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের এপার হইতে ওপারে, কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। উড়ো জাহাজের কল্যাণে চিঠিপত্র অসম্ভব রকম অল্প সময়ের মধ্যে দেশ-দেশান্তরে পাঠান যাইতেছে। এই সব আধুনিক উন্নতির কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। বিগত এক শতাব্দীর ভিতর খুব দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকিলেও এই বিভাগের মূলনীতি বা কার্য্য-প্রণালীর আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন এই সময় মধ্যে হয় নাই।

শ্যামদেশ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ

২৬৩৪ পৃষ্ঠার পর

নৌবিদ্যায়ও শ্যামদেশবাসীর কৃতিত্ব বড় কম নয়। ইহারা মাছ ধরিবার জন্য যে সকল নৌকা বড় বড় গাছ খুঁদিয়া তৈরী করে, সে সকল নৌকায় চড়িয়া নির্ব্বিবাদে সাগরের বুকে ভাসাইয়া দিয়া মাছ ধরে, নদী ও খালে বিচরণ করে এবং হাটে বাজারে ও সহরে যাতায়াত করিয়া থাকে। নৌকা তাহাদের প্রিয় যান।

গ্রাম্য মন্দির—শ্যাম

সে কালে তাহারা যে বাণিজ্যতরী নির্ম্মাণ করিত তাহাদের সে সমুদয় বাণিজ্য-পোত চীন সাগর, শ্যাম উপসাগর ও মার্ত্তাবান উপসাগরের পথে তাহাদের পণ্য বহন করিয়া গমনাগমন করিত এবং আবার বিদেশী পণ্য বহিয়া আনিত। এখনও শ্যামের সূত্রধরেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে এক সময়ে তালপাতায় পুঁথি লেখা হইত। যতদিন কাগজের সৃষ্টি না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত কাগজের পরিবর্ত্তে তালপাতায় লেখা হইত। এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঐরূপ পুঁথি রহিয়াছে। শ্যামদেশেও এক সময়ে তালপত্রে লেখা হইত। সেখানকার বৌদ্ধবিহারগুলিতে অনেক তালপাতার পুঁথি-আছে, এখনও সেখানে তালপাতায় লেখা হয়। তালপাতাগুলি কি ভাবে পরিষ্কার করিয়া পুঁথি লেখা হইত, এখানে তাহার একখানি চিত্র দেওয়া হইল, তাহা হইতেই উহার আভাস পাইবে।

যদিও স্থানে স্থানে রেলগাড়ীর প্রচলন হইয়াছে, তবু গোযানের চলন রহিয়াছে। কি ভাবে জল তোলা হয়, তাহাও দেখ। আমাদের দেশেও এই ভাবে এখন পর্য্যন্ত ক্ষেতে জল দেওয়া

হয়।—যেমন সব দেশে নূতন যুগে নানা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, শ্যামদেশেও তাহাই হইতেছে। দূর গ্রামের নেহাৎ সেকেলে সাঁকোর পরিবর্ত্তে এখন নূতন রকমের কাঠের ও ইটের পুল

ব্যাঙ্ককের একটি পথ

তৈরী হইতেছে এবং রাস্তাঘাটেরও অনেক সংস্কার হইতেছে। এখন শ্যামদেশের অনেক স্থানেই রেলগাড়ী চলাচল করে। দিন দিন আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। শ্যামের শাসন-নীতির ও অনেক উন্নতি হইয়াছে। রাজা, মন্ত্রীসভা ও ব্যবস্থাপকসভার সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশ শাসন করেন। শাসন বিভাগে অনেক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী এবং ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। দিন দিনই নানা ভাবে এই রাজ্যের উন্নতি হইতেছে।

ভাষা, ধর্ম্ম ও সাহিত্য—শ্যামদেশের ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানা কথা বলিলেও ইহার সহিত চীনা ভাষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তবে ইহার সহিত সংস্কৃত, পালি এবং এসিয়ার অনেক প্রাদেশিক ভাষার ও প্রভাব দেখা যায়। শ্যামের গদ্য সাহিত্যের বেশীর ভাগ্ গ্রন্থই পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়া বিরচিত। এই সব পৌরাণিক কাহিনী আবার নানা উপজাতির মধ্য হইতে আসিয়াছে। এমন কি অনুরুদ্ধ ও উষার (Unarad) কাহিনীও আছে। এই পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং শ্যামদেশের নানা জাতীয় কাহিনী ও উপকথা সংগৃহীত আছে। শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে একটি বৃহত্তম পাঠাগার রহিয়াছে। শ্যামদেশীয় বর্ণমালায় মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর হইতে শ্যামসাহিত্যে নূতন জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। দেশের লোকদের মধ্যে পড়িবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে, লোকেরা

মন্দির-তোরণ

লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সহরে সহরে বইয়ের দোকান হইয়াছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ নিচয় লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগ ও সৎসাহিত্য প্রচারে এবং শিক্ষার

জন্য উৎসাহ প্রদানে একান্ত মনোযোগী হইয়াছেন।

ফ্রাপ্রোং

ব্যাঙ্কক হইতে কয়েকখানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে Bangkok Times, Bangkok Daily Mail, Siam Observer প্রভৃতি প্রধান। এইগুলি ইংরাজীতে লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

এখানে শ্যাম সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। এক সময়ে এ দেশে নৌ-নির্ম্মাণ-শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। এক সময়ে চীনের জাঙ্ক (নৌকা) জলপথে পাল ভরে ছুটিতে ছুটিতে এদেশে আসিত। এ দেশের বণিকদের বাণিজ্যতরী এবং রাজার বিলাস-তরণী রাজধানী ব্যাঙ্ককের নদীর জলে ভাসিয়া বেড়াইত, তার অপূর্ব্ব সাজ-সজ্জা দেখিয়া লোকে বিস্মিত ও পুলকিত হইত। এ দেশীয় নৌকাগুলি থিঙ্গান্ (Thingan) মাইতাখিয়েন্ প্রভৃতি একজাতীয় কাঠ দিয়া তৈরী হইয়া থাকে।

এ দেশের চাষবাসের মধ্যে ইক্ষুর চাষ যে প্রধান, সে কথা পূর্ব্বেই তোমাদের বলিয়াছি। ক্ষেতে ধান বুনিবার (বেং-ক্রে) পর কিছুদিনের জন্য ক্ষেতের কাজের ভাগটা একটু কম থাকে। ঐ সময়ে মাঝে মাঝে শুধু চাষারা আসিয়া ক্ষেতের জল সরান, নিড়ানি ইত্যাদি মাত্র দেয়। এখানে ধানের মরাইয়ের বাহিরটা বাঁশ দিয়া তৈরী করে। ভিতরটাতে কাদার লেপ থাকে। এ দেশে ধানের প্রধান শত্রু হইতেছে টিয়া পাখী। ধান পাকিলে দলে দলে টিয়াপাখী আসিয়া ক্ষেতের ধান সাবাড় করিয়া ফেলে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের ক্ষেতে ক্ষেতে হাজার হাজার পাখী আসিয়া ক্ষেতের ফশল নষ্ট করে, সেজন্য ধান পাকিবার সময় ক্ষেতে সতর্কভাবে পাহারা দিতে হয়।

নদীর ঘাট

রাবারের চাষ—মালয় দ্বীপপুঞ্জের সমীপবর্ত্তী হইলেও শ্যাম দেশে রাবারের চাষ অতি অল্পদিন

লিখিবার জন্য তালপাতা পরিষ্কার করা হইতেছে

রাজার বিলাস-তরী

হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সিঙ্গাপুর রাবার চাষের জন্য বিখ্যাত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে হইতে শ্যামে রাবারের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর শ্যামের পার্ব্বত্য বনভূমে পাহাড়িয়াগণ এক নিকৃষ্ট জাতীয় রাবার সংগ্রহ করিয়া আনিত। তাহাই ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইত। ঐ রাবার ছিল ফিকাস্ (Ficus) জাতীয়। ইহাদের কাড়স্ত ছিল বড় কম। সে সময়ে শ্যাম রাজ-সরকার কোন্ কোন্ অঞ্চলে

ইক্ষু নিম্নভূমিতে ভাল হয়, কোন জাতীয় ইক্ষু উচ্চ প্রস্তরময় বা লোহিতবর্ণের মৃত্তিকায় ভাল জন্মিয়া থাকে।

শ্যামদেশে এক সময়ে গোযানের খুবই প্রচলন ছিল, এখনও আছে। কোন দেশ হইতেই একেবারে প্রাচীনের স্মৃতি অল্প সময়ের মধ্যে মুছিয়া যাইতে পারে না। শ্যাম দেশেও যায় নাই, এই দেশের সর্ব্বত্র এখনও গরুর গাড়ী চলে।

আখ মাড়াই

রাবারের চাষ হইতে পারে তাহার একটা জরিপ করিলেন এবং উৎকৃষ্ট পারা (Para) জাতীয় রাবারের চাষ আরম্ভ করিলেন তাহারই ফলে বহু একর জমিতে আজকাল রাবারের চাষ চলিতেছে।

ইক্ষুর চাষও এখানে বেশ প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন মাটির ভাঁড়ে করিয়া ইক্ষুর রস লইয়া পরে জ্বাল দিয়া গুড় তৈরী করা হয়। এ দেশে ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় দুই-ই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে নানা জাতীয় ইক্ষু আছে। কোন জাতীয়

শ্যামদেশে বিবিধ বৌদ্ধধর্ম্মানুযায়ী উৎসব থাকিলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুরূপ উৎসবও আছে অনেক। এদেশে শিশুদের জন্ম সময় হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা নানারূপ উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন শিশুর নামকরণ, শিশুর প্রথম হাঁটা, প্রথম কথা বলা, কাপড় পরা, কর্ণ-বেধ, চুলকাটা, উপবীতধারণ প্রভৃতি নানা কর্ম্মে বেশ ঘটা করিয়া কাজ হয়। তারপর বিবাহ ইত্যাদি উৎসব তো আছেই। এক সময়ে এই বৃহত্তর ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদের এই সব কার্য্যাদি সুচারুরূপে

সেকালের গরুর গাড়ী

গ্রামের সাঁকো

নিষ্পন্ন হইত এবং ব্রাহ্মণদের প্রভাবও ছিল

তোমরা আমাদের দেশের জ্যোতিষীদের কথা জান। বড় বড় সহরে তাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যবসায় করেন এবং বেশ অর্থ উপার্জ্জন ও করেন। শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে তাহারা হোন্ (Hon) নামে পরিচিত। ইহারা ঠিক আমাদের দেশের জ্যোতিষীদের মত। কি রাজদরবারে কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে, সর্ব্বত্রই ইহাদের সমাদর। এই জ্যোতিষীরা দিন তারিখ ঠিক করিয়া দেন, তদনুযায়ী কাজ হয়। হোনদের একটি স্বতন্ত্র দেবালয় আছে। সেই মন্দিরে তাহারা জ্যোতিষীবিদ্যার নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। শুভ ও অশুভ দিন নির্ণয় করেন। রাজা কবে দরবার করিবেন, কোন্ পথে চলিবেন, কোন্ কোন্ মাস ও তারিখ ভাল, এ সমুদয় গণিয়া বাছিয়া ঠিক করিয়া দেওয়াই হইতেছে হোনদের বা জ্যোতিষীদের প্রধান কাজ। শ্যামের সংক্রান্ত উৎসব (The So'ngkran festival) এবং নব-বৎসরের প্রথমদিন মহা শকরাজ (Maha-Sakaraj) উৎসব বিশেষ প্রধান।

ব্রাহ্মণদের ন্যায় বৌদ্ধদের ও অনেক উৎসব আছে। সে গুলির সংখ্যাও বড় কম নহে। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের আশ্রয় করিবার সময় একটি উৎসব আছে, সেইটিত খুবই প্রধান। শ্যামদেশে বৌদ্ধশ্রমণের সংখ্যা হইবে প্রায় একলক্ষ এবং ভিক্ষুণীর সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না।

পল্লী-দৃশ্য

শ্যামদেশ সম্বন্ধে তোমাদের যাহা কিছু বলিবার সব কথাই বলিলাম। এখন এদেশে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব খুবই বেশী। কি শিক্ষা, সভ্যতা, কি রাজশাসন, সবদিকেই আজকাল ইউরোপীয়দের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে

মালয় দ্বীপপুঞ্জ

শ্যামের কথা বলিলাম, এখন মালয়দ্বীপপুঞ্জের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। এই দ্বীপপুঞ্জ সুমাত্রা, যবদ্বীপ (Java), শুণ্ড, বোর্ণিও, সেলিবেশ, টাইমোর, মালক্কা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দ্বারা
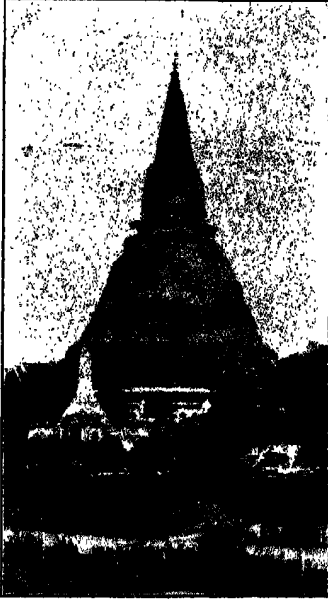
বৌদ্ধ-মন্দির

গঠিত। এই সমুদয় দ্বীপগুলির মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপ মার্কিনদের, বোর্ণিওর উত্তরাংশ ইংরাজ রাজের এবং টাইমোরের বেশীর ভাগই হইতেছে পর্ত্তুগীজ দের অধীনে, অন্যান্য দ্বীপসমূহ ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত।

মালয় দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই পাহাড় পর্ব্বত। এদেশে আবার অনেক আগ্নেয়গিরিও রহিয়াছে। এদেশের অধিবাসীরা মঙ্গোলজাতির একটি শাখা এবং মালয় নামে পরিচিত। এই দ্বীপপুঞ্জের অনেক গুলি দ্বীপ বিষুবমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া এখানে প্রায় বারমাস বৃষ্টি হইয়া থাকে। এজন্যই এখানকার জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র; চারিদিক বেড়িয়াই সমুদ্র আছে বলিয়া এখানকার উত্তাপ তেমন বেশী নহে।

এ সমুদয় দ্বীপপুঞ্জের ভূমি উর্ব্বরা। এখানে নানা প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। যবদ্বীপের বা জাভার চা, চিনি, বোর্ণিওর সাগু, মালাক্কার জয়ত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা এবং ফিলিপাইনের শণ ও তামাক বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ দেশের পর্ব্বতসমূহ গভীর জঙ্গলে ঢাকা। সেই সব পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে সিংকোনা, রাবার, সেগুন গাছ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। রাবারের চাষের জন্য মালয় দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ বিখ্যাত।

শ্যামের একটি বৌদ্ধ দেবতা

মালয় উপদ্বীপের অসংখ্য রাবার গাছ জন্মিয়া থাকে। তথায় রাবারের কারবার করিয়া অনেকেই অল্প পরিশ্রমে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এই কারণে যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বহুলোক সেখানে গমন করিয়া উপনিবেশ

স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে। তামিল ও চীনারাই বরাবর রাবারের কাজ বেশী করে। বিদেশী লোকেরা রাবারের ব্যবসায় করিতে আসিয়া প্রথমে মালয়বাসীদের নিকট হইতে কিছু জঙ্গলা জমি কিনিয়া থাকে। জমির গুণানুযায়ী তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। সময় সময় এক একর জমির দাম এক হইতে ছয় ডলার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। জমি কিনিবার পর জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া জমি পরিষ্কার করিয়া রাবার গাছগুলি সারি সারি পুতিয়া দেয়! জমিতে আগাছা থাকিলে রাবারের গাছগুলি সেখানে বাড়িয়া উঠিতে

পারে না। এই ভাবে রাবার গাছ জন্মাইয়া পরে তাহার নির্য্যাস লইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান প্রধান রাবারের ব্যবসায়ীদের কারখানায় এক একজন কুলি প্রত্যহ তিন পাউণ্ড করিয়া রাবার তৈরী করিয়া থাকে। দুধের মত সাদা নির্য্যাস টিনের পাত্র হইতে একটা বৃহৎ চ্যাটালো কড়াইয়ের মধ্যে ঢালিয়া উহার সহিত কয়েক বিন্দু দ্রাবক মিশানো হয়। দ্রাবক মিশাইলেই নির্য্যাস জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। একটা চালার নীচে কড়াইগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাখিয়া রসগুলিকে জমিতে দেওয়া হয়। তারপর ঐ জমাট বাঁধা রাবারকে কলের সাহায্যে রোলার বা চাকার তলে ফেলিয়া পিসিয়া পাতে পরিণত করিতে হয়। এই পাত গুলিকে টীনের বাক্সে ভরিয়া বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়। এইরূপ সোজা প্রণালীতে প্রত্যহ রাশি রাশি রাবার প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক। অনেকে মাত্র দুইশত ডলার লইয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন।

তোমরা গাটাপার্চ্চার নানা প্রকার জিনিষ দেখিতে পাও, ঐ গুলি এই দ্বীপপুঞ্জের একপ্রকার নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই দ্বীপপুঞ্জের বালি, লম্বক প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তির ধ্বংস চিহ্ন দেখা যায় বর্ত্তমান সময়ে এ সব অঞ্চলের লোক সংখ্যার বেশীর ভাগই মুসলমান।

যবদ্বীপ বেশ বৃহৎ দ্বীপ। ইহার ক্ষেত্রফল প্রায় ৫০,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যাও প্রায় চারিকোটি হইবে। রাজধানীর নাম **বটেভিয়া** এবং প্রধান বন্দর হইতেছে **সুরবয়**।

এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ হইতেছে বোর্ণিও। পৃথিবীর দ্বীপ সমূহের মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত লাবুয়ান্, সুমাত্রা সেলিবাস দ্বীপ প্রভৃতি বিখ্যাত। তাহাদের সকলের কথা আর বলিলাম না। ভূগোল পড়িলেই জানিতে পারিবে।

বুধ

১৬১১ পৃষ্ঠার পর

যে সকল গ্রহ সৌরজগতে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, তন্মধ্যে যে গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, তাহার নাম 'বুধ'। বুধের আয়তন ক্ষুদ্র এবং তাহা সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী, যে যখন তাহাকে সূর্য্য হইতে সর্ব্বাধিক দূরে দেখা যায়, তখনও তাহা সূর্য্যের কিরণজালের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, এই জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়া বহুদিন পর্য্যবেক্ষণ না করিলে তাহাকে সহজে দেখা যায় না। এই অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাচীন হিন্দু, আরবীয় ও গ্রীক জ্যোতিষীদিগের নিকট বুধ বিশেষ পরিচিত ছিল। গ্রীক কবিগণ বুধকে নিয়ত সূর্য্যের কাছাকাছি চলিতে দেখিয়া, তাহাকে 'সূর্য্যদূত' নাম দিয়াছিলেন। বুধের ইংরাজী নাম মার্কারি (Mercury)।

সূর্য্য হইতে বুধের গড় দূরত্ব প্রায় ৩,৫৯,৫৮,০০০ তিনকোটী উনষাট লক্ষ আটান্ন হাজার মাইল ; ইহা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ১৩ ভাগের ৫ ভাগ মাত্র। এই দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না ; যখন বুধ সূর্য্যের সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার দূরত্ব ২,৮৫,৬৯,০০০ মাইল এবং যখন সর্ব্বাধিক দূরবর্ত্তী হয় তখন ৪,৩৬,৪৭,০০০ মাইল হইয়া থাকে। বুধ একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার সময় তাহার দূরত্বে যে পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, অপর কোন গ্রহে সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না। সূর্য্য বুধের কক্ষের যে নাভিতে অবস্থিত, কক্ষের মধ্যবিন্দু হইতে তাহা অনেক বেশী দূরে থাকাতেই, সূর্য্য হইতে গ্রহের দূরত্বের এইরূপ বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

বুধ প্রায় ৮৮ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহাকে যদি 'বুধ-বৎসর' বলা যায় তবে দেখা যায় যে আমাদের এক বৎসর পূর্ণ হইতে বুধের চারিবৎসরের বেশী লাগে। বুধের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত ; এজন্য তাহার আবর্ত্তন কালে আমরা সময় সময় তাহাকে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী দেখিতে পাই। তোমরা চিত্রে মনে কর 'স' সূর্য্য, 'ব' বুধ এবং 'প' পৃথিবী। বুধ যখন 'ব' বিন্দুতে থাকে তখন উহা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয়। তৎপর এক আবর্ত্তন পূর্ণ করিয়া বুধ যখন পুনরায় 'ব' বিন্দুতে আসে তখন এক 'বুধ-বৎসর' পূর্ণ হয়। কিন্তু সেই অবসরে পৃথিবী প, বিন্দুতে গমন করে, অতএব বুধ পুনরায় সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইতে আরও বেশীদিন লাগিয়া থাকে। গণনা দ্বারা দেখা যায়, যে বুধ 'ব' বিন্দু ছাড়াইয়া আরও ২৮ দিন চলিলে, অর্থাৎ পৃথিবী যখন 'প' বিন্দুতে গমন করে, তখন 'ব' বিন্দুতে তাহা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয়। এ কারণ বুধকে একবার সূর্য্য মধ্যবর্ত্তী

হইবার প্রায় ১১৬ দিন পরে পুনরায় ঐ অবস্থায় দেখা যায়।

চিত্র দৃষ্টে ইহাও জানা যায় যে পৃথিবী যখন 'প' হইতে 'প' বিন্দুর দিকে চলিতে থাকে, তখন বুধ আপন কক্ষে আবর্ত্তন করিতে করিতে একবার সূর্য্যের অগ্রে ও একবার পশ্চাতে চলিতে দেখা যায়। বুধ ৮৮ দিনে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করে, এ কারণ তাহার গতি পৃথিবী অপেক্ষা দ্রুত।

অতএব 'ব' বিন্দু ছাড়াইয়া চলিবার সময় তাহাকে ক্রমশঃ সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখা যায়; তখন বুধ সূর্য্যের অগ্রে উদয় হইতে আরম্ভ করে। এইরূপ চলিতে চলিতে কিয়দ্দিন পরে তাহার অগ্রগমন বন্ধ হইয়া তাহাকে বিপরীত দিকে চলিতে দেখা যায়; তখন উহা সূর্য্যের অপরদিকস্থ কক্ষাংশে ঘুরিয়া যায়। ক্রমে তাহা সূর্য্যের যে দিকে পৃথিবী অবস্থিত, তাহার বিপরীত দিকে সূর্য্যের অন্তরালে চলিয়া যায়, এবং তাহার পর সূর্য্যের পশ্চাদগমন করে, তখন তাহাকে সূর্য্যের পরে অস্ত যাইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায়, যে বুধ সূর্য্য হইতে বেশী দূরে গমন করিতে পারে না; এ কারণ যখন উহার অগ্র কিংবা পশ্চাদগমন অত্যধিক হয়, তখনও সূর্য্যের উদয়াস্ত কাল হইতে তাহার উদয়াস্ত কালের অন্তর ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিটের বেশী হয় না।

এদিকে উষালোক সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় এবং গোধূলির আলোক সূর্য্যাস্তের প্রায় একঘণ্টা পরে পর্য্যন্ত পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া রাখে। তখন বুধ ঐ আলোকে আলোকিত থাকাতে তাহাকে সহজে চক্ষে দেখা যায় না। কেবল ঐ আলোকের সীমা অতিক্রম করিলেই অল্পক্ষণের (প্রায় আধঘণ্টার অনধিক কালের) জন্য কিছুদিন উষার পূর্ব্বে অথবা গোধূলির পরে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তখন বুধ আকাশের এত নিম্নভাগে থাকে যে, ভূবায়ু বিশেষ পরিষ্কার না থাকিলে মুক্ত নেত্রে বুধদর্শন সহজে মানুষের ভাগ্যে ঘটে না।

বুধের ব্যাস প্রায় ৩০০৮ তিন হাজার আট মাইল। ইহার দেহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ১৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র; ইহাকে মানদণ্ডে তৌলাইতে পারিলে দেখা যাইবে যে তাহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ১৫ ভাগের একভাগ হইবে। বুধের আয়তনের পরিমাণে ওজন বেশী হওয়াতে ইহা প্রমাণ হয়, যে বুধ পৃথিবীর অপেক্ষা গাঢ়তর পদার্থ দ্বারা গঠিত। ঐ পদার্থের গাঢ়তা পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার গাঢ়তার প্রায় ১½ গুণ। ইহা জানা আবশ্যক, যে সৌরজগতে বুধের ন্যায় গাঢ় ও কঠিন গ্রহ আর একটিও নাই। বুধের দৈহিক উত্তাপ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না, যে আমরা ধরাপৃষ্ঠ ছাড়িয়া বুধের পৃষ্ঠে গমন করিলে সেখান হইতে অধিকতর শীত অনুভব করিব। বুধ সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তাহাতে সূর্য্যের আলোক অত্যন্ত প্রখর অনুভূত হইবে, এ কারণ তাহার পৃষ্ঠদেশে রৌদ্রের তেজ আমাদের অসহনীয় হইবে। আমরা সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে যে পরিমাণ উত্তাপ পাই, বুধে সূর্য্য কিরণের উত্তাপ তাহার প্রায় সাত-গুণ। বুধের দেহের বর্ণ শীষের ন্যায়, কিন্তু সূর্য্যের আলোক তাহাতে প্রতিফলিত হওয়াতে আমরা তাহাকে তারার ন্যায় উজ্জ্বল দেখিয়া থাকি। বুধে ভূবায়ুর ন্যায় কোন বাষ্পীয় আবরণের লেশমাত্র দেখা যায় না।

বুধ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিবার সময় তাহাকে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া ঘুরিতে দেখা যায়; এজন্য তাহার এক আবর্ত্তন কালে আমরা পৃথিবী হইতে তাহাকে স্বীয় মেরুদণ্ডে একবার ঘুরিতে দেখিলেও, সূর্য্য হইতে তাহার কোনও আবর্ত্তন দেখা যায় না।

ইহা হইতে সহজে বুঝা যায়, যে বুধের একাংশ নিয়ত দিন ও অপরাংশে নিয়ত রাত্রি ও দারুণ শীত থাকে। বুধের এক অহোরাত্র আমাদের অহোরাত্র হইতে কিঞ্চিৎ বেশী। কিন্তু অল্পদিন হইল একজন ইতালীয় পণ্ডিত বহু পরীক্ষার পর ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে বুধ সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেই একবার স্বীয় মেরুদণ্ড ঘুরিয়া যায়। এজন্য তাহার একমুখ নিয়ত সূর্য্যের দিকে থাকে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে কোন জিনিষের ওজন যে পরিমাণ হইয়া থাকে, ঐ জিনিষকে বুধের উপর লইয়া গেলে দেখা যাইবে, যে তথায় তাহার ওজন এখানকার অর্দ্ধেকেরও কম হইবে। এখান হইতে কোন জিনিষ বুধে লইয়া গেলে তথায় তাহার ওজন ৭½ ছটাক মাত্র হইবে। ইহার কারণ এই যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে কোন জিনিষ যে বলে পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, বুধের আয়তনের ক্ষুদ্রতা হেতু তাহার পৃষ্ঠদেশে ঐ বল তদপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে।

বুধের কোন উপগ্রহ নাই। কিন্তু প্রায় ৫০ বৎসর যাবত ইয়ুরোপের কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন, যে বুধের কক্ষের ভিতরে অপর একটি ক্ষুদ্র গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহা সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী এবং বুধাপেক্ষা অনেক পরিমাণ ক্ষুদ্র হওয়াতে আমরা তাহাকে কোন মতে চক্ষে দেখিতে পাই না। একবার একজন ফরাসী পণ্ডিত দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্য দেহ পরীক্ষা করিবার সময় দেখিতে পাইলেন, যে তাহার উপর দিয়া একটি কাল বিন্দু চলিয়া যাইতেছে। একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী এই সংবাদ পাইয়া ঐ বিন্দুর গতি গণনা করিয়া স্থির করিলেন, যে উহা বুধান্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে একটি কাল বিন্দুরূপে সূর্য্যদেহে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ইহার নাম 'বৈশ্বানর' রাখিয়াছিলেন এবং তাহার গতি দৃষ্টে গণনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে যদি উহা একটি গ্রহ হয়, তবে তাহা সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্বের প্রায় ৩ ভাগের এক ভাগ দূরে থাকিয়া প্রায় ১৯ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে, তিনি উহার আকৃতি দেখিয়া ইহাও গণনা করিয়াছিলেন যে ঐ গ্রহের ব্যাস বুধের ব্যাসের এক তৃতীয়াংশের বেশী নহে। কিন্তু এ যাবত গ্রহের অপর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি একজন আমেরিকান জ্যোতিষী নানা যুক্তি দেখাইয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে বুধের কক্ষের অভ্যন্তরে কোন গ্রহ থাকার সম্ভাবনা নাই। আমরা সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝিতে পারি, যে যেখানে বুধকে চক্ষে দেখিতে এত কষ্ট হয়, সেখানে তাহা হইতেও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র
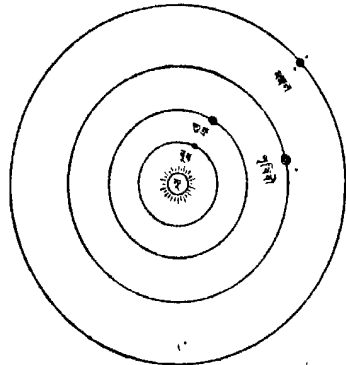
সূর্য্যের ছোট গ্রহ।

কোন গ্রহ থাকিলে তাহাকে চক্ষেতো দেখা যাইতেই পারে না, দূরবীক্ষণ দ্বারাও সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সূর্য্যের গাত্রে একটি কালিমার আকারে, অথবা পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণ কালে তাহার বিম্বের খুব নিকটে ভিন্ন অন্য কোন অবস্থায় তাহাকে দেখা যাইতে পারে না।

বুধ সূর্য্যের ছোট গ্রহ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বুধে সূর্য্যের তাপ এত বেশী যে, তাহাতে জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে পারে। সেখানে সূর্য্যকে আকারে খুব বড় দেখায়—বুধ গ্রহের সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের প্রায় নয় গুণ বড়। বুধ গ্রহে জল নাই, বাতাস নাই, বৃষ্টি নাই, এবং মানুষের বা পশু পক্ষীদের মত প্রাণীও নাই। একথা তোমাদের না বলিলে বুঝিতে পারিয়াছ। বুধ চাঁদেরই মত জল প্রাণিহীন শুষ্ক গ্রহ। হিন্দুরা বুধকে চন্দ্রের পুত্র বলেন।

ব্যায়ামবিধি

১৮৮৯ পৃষ্ঠার পর
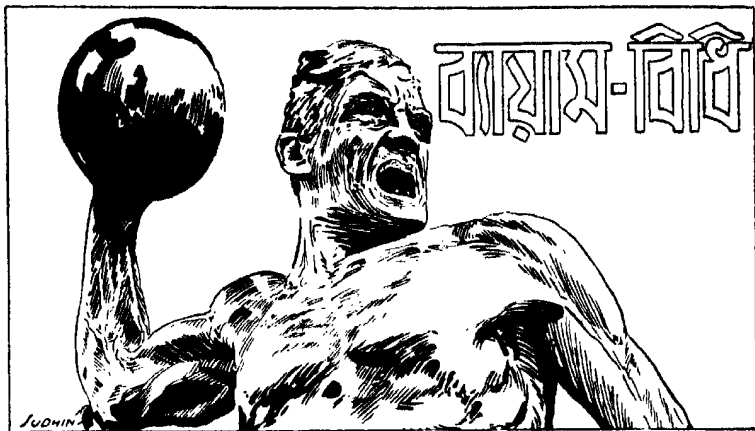
আমার আগেকার প্রবন্ধগুলিতে তোমরা ব্যায়ামবিধির মূল তথ্যের কথা কিছু পড়েছ। চলতি ব্যায়ামধারাগুলির বিষয়েও তাতে কিছু আলোচনা ছিল। এখন আমরা কতকটা ব্যাপকভাবে আলোচনা করব।

ব্যায়ামধারাগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, আন্তরিক, দ্বিতীয় বাহ্যিক। বাহ্যিক ব্যায়ামেরও দুটি ভাগ আছে,—সাধারণ ও আক্রমণক।

যাকে আন্তরিক ব্যায়াম বলা যায় সে গুলির লক্ষ্য দেহাভ্যন্তরের নানা প্রকরণগুলিকে সুস্থ ও কর্ম্মঠ করে রাখা, কিছু কিছু রোগ নিবারণ করা, এবং সে সকল রোগ হলে আরোগ্য করা। কাজেই বাহ্যিক ব্যায়ামের চেয়েও এ সকল ব্যায়ামের মূল্য অত্যন্ত বেশী। বাহ্যিক ব্যায়াম বাল্য ও যৌবনকাল সুলভ, আন্তরিক ব্যায়াম দূরদর্শী স্বাস্থ্যাভিলাষীদের মন আকর্ষণ করে।

তোমরা সুইডিস্ ব্যায়ামের সঙ্গে পরিচিত। মাত্র অষ্টাদশ শতকে জারমানিতে এই ধারার উৎপত্তি হয়েছিল কিন্তু তার উন্নতি ও প্রসার হয়েছিল আরো অনেক বৎসর পরে সুইডেনবাসী এক ব্যক্তির হাতে। কিন্তু এ ব্যায়ামধারা তাদের কাহারও নূতন আবিষ্কার নয়। স্মরণাতীত যুগ থেকে ভারত, চীন, মিশর ও পারস্য দেশে এক ধরণের অত্যন্ত উন্নত ব্যায়ামধারা বর্ত্তমান ছিল। সুইডিস্ ব্যায়ামধারার জারমান প্রবর্ত্তক তারই কিছু কিছু ভেঙ্গেচুরে ওই ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পুরানো ধারার যা গুণ তার কিছু অংশ ও এ ধারায় নেই। এর থেকেই আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় ব্যায়াম তৈরী হয়েছে। আধুনিক এই ব্যায়ামে কঙ্কালের খুঁত বা রোগনিবারণ করবার যা ধারা তৈরী হয়েছে তা সত্যই অপূর্ব্ব যথা সময়ে আমরা সে ধারা সম্বন্ধেও আলোচনা করব।
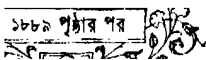
প্রাচীন যে ব্যায়ামের কথা বললাম তার সম্যক উন্নতি হয়েছে এই ভারতবর্ষে; এবং এইগুলি ভারতীয় সভ্যতার অত্যুগ্র উন্নতির বিশেষ চিহ্ন। এ রকম জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় ব্যায়াম আর কোন

দেশে আছে কিনা সন্দেহ। মিশর, পারস্য ইত্যাদির ধারা লোপ পেয়েছে, কিন্তু ভারতীয় ধারা শুধু বেঁচে নেই, আবার নূতন করে সভ্যজগতে প্রসার করতে আরম্ভ করেছে। আমাদের জীবিত কালেই এই ধারাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থানীয় ব্যায়মধারা হিসাবে আমরা দেখে যেতে পারব হয়ত।

এই প্রাচীন ব্যায়মধারা দুটি—হঠযোগ এবং পায়াত বা অভ্যাসম্। হঠযোগের কথা তোমরা বড়দের মুখে শুনেছ, কারণ হঠযোগের খ্যাতি পৃথিবী বিস্তৃত। পায়াত ও হঠযোগের উৎপত্তি আনুমানিক সমকালীন; কিন্তু কোন অজ্ঞাত ও অনিবার্য্য কারণে পায়াত চিরকাল মালাবার দেশে আবদ্ধ হয়েছিল। বিগত পনেরো বৎসরে আমরা জনকয়েক বিস্তৃত ক্ষেত্রে তার প্রচার আরম্ভ করেছি মাত্র।

বড় হলে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবে যে হিন্দুভারতে পুরানো যা অনুশীলন, প্রায় সকলগুলিই ধর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত। শরীরচর্চ্চাও পূজা করার সমান গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। তাতে ছেলেমানুষী বা অবহেলার ভাব মোটেই নেই। হঠযোগ ও পায়াতের একটা অংশ উচ্চতর সাধনার অন্তর্গত এ লক্ষ্য যে কেন ওতে যোগ করা হয়েছে বলা শক্ত; হয়ত দেহ সুস্থ থাকলে সাধনার বিঘ্ন হবে না বা দীর্ঘজীবি হয়ে সুদীর্ঘকাল সাধনা করা সম্ভব হবে এটাই ছিল লক্ষ্য। কারণ হঠযোগের প্রক্রিয়া দেহকে সম্পূর্ণভাবে মনের দাস করে দিতে সক্ষম।

পায়াত বা অভ্যাসমের দুটি অংশ,—একটি সাধারণ, দ্বিতীয়টি যান্ত্রিক। যেটি সাধারণ তা লক্ষ্য হঠযোগের সমকক্ষ ও কাজে অনেকটা হঠযোগের মত। যান্ত্রিক অংশগুলিকে সাধারণ অনুশীলনের পর্য্যায়ে ফেলা যায়, যদিও তাতে ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য ও আবরণ বিরল নয়। পায়াতের বৈশিষ্ট্য এই যে সাধারণ বা যান্ত্রিক যে অভ্যাসই হোক না কেন প্রত্যেকটিতে উচ্চরবে মন্ত্রজপ করবার ব্যবস্থা আছে। মন্ত্র জপ করাটা বাজে কথা নয়। পরীক্ষায় জানা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণের সময়ে দেহপ্রকরণের অনেক অংশের মৃদু সম্প্রসারণ ঘটে। বৃহদন্ত্রের শেষ অংশের যে সম্প্রসারণ তা আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। এ ধরণের ব্যায়াম পৃথিবীতে আর নেই।

পায়াতে রসাধারণ অংশের নাম **সূর্য্য নমস্কার**। নানা কারণে সূর্য্য নমস্কার অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। এ ব্যায়াম অভ্যাস করার একটি বিশিষ্ট ক্ষণ আছে, যখন তখন এ অভ্যাস চলে না। সে ক্ষণটি কি? নাম থেকে বোঝা যায় যে সূর্য্যের সঙ্গে এই ব্যায়ামের যোগস্থাপন করা হয়েছিল। প্রভাতে সূর্য্যরশ্মি যখন ৪৫° ডিগ্রি কোণে থাকে সেই সময়টি এই ব্যায়াম অভ্যাসের ক্ষণ। পূর্ব্ব-কালের হিন্দু বিশেষজ্ঞেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে সূর্য্যরশ্মি যখন ওই বিশিষ্ট কোণে অবস্থান করে তখন তা মানুষের দেহের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। মিশর ও পারস্য দেশেও আগে সূর্য্যরশ্মির ব্যবহার ছিল। আমাদের কালের জ্ঞান বলে যে প্রভাত সূর্য্যের কিরণে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থাকে, সে রশ্মি স্বাস্থ্যের উপকার করে ও নানা প্রকারের রোগ আরোগ্য করে। আধুনিক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা চিকিৎসাকে হিলিওথেরাপি (Heliotherapy) বলা হয়।

আধুনিক জগতের হিলিওথেরাপির ব্যবহার অল্পদিনের। মাত্র অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে রিকলি নামের এক অষ্ট্রিয়াদেশবাসী চিকিৎসক অষ্ট্রিয়ান টাইরোল প্রদেশের এক স্থানে হিলিওথেরাপির স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠা করেন, সেইটি এই ধরণের প্রথম স্বাস্থ্যাবাস। হিলিওথেরাপির আরো ব্যবহারিক উন্নতি হয় মাত্র বিগত শতাব্দীতে। সুইটজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে অনেক বিশিষ্ট ধরণের সূর্য্য-স্বাস্থ্যাবাস তৈরী হয়েছে। এই বাড়ীগুলি এমন ভাবে তৈরী যে প্রয়োজন হলে তার যে কোন পিঠ সূর্য্যরশ্মির দিকে ঘোরানো যায়। বছর আড়াই হল ভাবতেও নওয়ানগর শহরে চার লক্ষ টাকা খরচ করে আধুনিক এক সোলারিয়াম (Solarium) তৈরী হয়েছে। সূর্য্যরশ্মির স্বাস্থ্যপ্রদ প্রভাব আছে বলেই সভ্যজগতের চারিদিকে এত সূর্য্যস্নানের বা রৌদ্রসেবনের ধুম লেগে গেছে। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যাবতীয় চর্ম্মরোগ, যক্ষ্মা, বাত প্রভৃতির চিকিৎসা করা হয়।

সমগ্রভাবে সূর্য্যনমস্কার একটি মাত্র ব্যায়াম কিন্তু ওতে পরপর দশটি প্রয়োজনীয় পর্য্যায় আছে।

আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যু

২৫৮৫ পৃষ্ঠার পর

পারস্য দেশের একটী সহরে কাসিম ও আলিবাবা নামে দুই ভাই বাস করিত। তাহাদের পিতা তাহাদের জন্য যে সামান্য কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাহারা দুই ভায়ে সমান ভাগে ভাগ করিয়া নিয়াছিল। কাজেই তাহাদের অবস্থা যে সচ্ছল ছিল না তাহা বুঝিতেই পারিতেছ; কোনরকমে তাহাদের দিন চলিত।

কাসিম বিবাহ করিয়া তাহার স্ত্রীর সম্পত্তির দ্বারা বেশ ধনী হইল। এবং শীঘ্রই সে হইল সহরের একজন সেরা বণিক। কিন্তু আলিবাবা বিবাহ করিয়াছিল তাহারি মত সামান্য অবস্থার একজন মহিলাকে, এবং স্ত্রী পুত্রকে ভরণ-পোষণ করিবার তাহার একমাত্র উপায় ছিল বনে কাঠ কাটিয়া তাহা তাহার গাধাগুলির পিঠে চাপাইয়া সহরে লইয়া গিয়া বিক্রী করা। কাসিম কিন্তু দরিদ্র আলিবাবার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না।

একদিন আলিবাবার কাঠ কাটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় সে দেখিতে পাইল দূরে ধূলি উড়িয়া প্রায় মেঘের মত হইয়াছে, এবং সেই ধূলার মেঘটা যেন ক্রমেই কাছে আসিতেছে। ক্রমে সে দেখিতে পাইল মস্ত একদল লোক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া দ্রুতবেগে সেদিকে আসিতেছে। আলিবাবার সন্দেহ হইল যে তাহারা ডাকাত। সে তাড়াতাড়ি একটা উঁচু গাছে উঠিয়া ডাল পালার আড়ালে এমন ভাবে লুকাইয়া রহিল যেন সে নীচেকার সব কিছুই দেখিতে পায় অথচ তাহাকে কেহ দেখিতে না পায়।
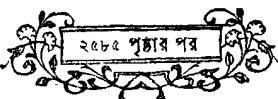
গাছটা উঠিয়াছিল একটা উঁচু খাড়া পাহাড়ের গা ঘেষিয়া। ঘোড়সওয়ারেরা আসিয়া ঠিক সেই পাহাড়ের গোড়াতেই থামিল। তাহাদের চেহারা, রকমসকম ইত্যাদি দেখিয়া আলিবাবার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহারা দস্যুদল। বাস্তবিকই ইহারা তাহাই। কিন্তু তাহারা ডাকাতি করিত অনেক দূরে দূরে, কাছাকাছি কোথাও নহে। এই জায়গাটা ছিল শুধু তাদের একত্রে জড় হইবার জায়গা। আলিবাবা গুণিয়া দেখিল তাহারা সবশুদ্ধ চল্লিশ জন।

দস্যুদের প্রত্যেকের পিঠে একটি করিয়া থলে। সে গুলিকে দেখিয়া এমন ভারী মনে হইতেছিল যে আলিবাবা বুঝিল ঐগুলি নিশ্চয় টাকা ও মোহর ভরা। সকলের আগে যে লোকটা ছিল, আলিবাবা বুঝিল সেই দলের সর্দার। লোকটা দরজা ঠেলিয়া ঢুকিয়াই চেঁচাইয়া "সিসেম্, খোলো।" বলিতে প[illegible]র

পাহাড়ের একটা দরজা আপনিই খুলিয়া গেল। সর্দ্দার এবং অন্যান্য দস্যুগণ ভিতরে ঢুকিলে দরজা

সিসেম দরজা খোল

আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। গুহার ভিতর তাহারা কিছুক্ষণ থাকিবার পর দরজা খুলিয়া আবার বাহির হইয়া আসিল। সর্দ্দার "সিসেম্ বন্ধ করো" বলিতেই পুনরায় দরজাটা আপনিই বন্ধ হইয়া গেল।

ডাকাতেরা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেলে আলিবাবা গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "সিসেম খোল।" বলিতেই দরজাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল পাহাড়ের ভিতরটা কাটিয়া একটা মস্ত ঘর করা হইয়াছে। ঘরের ভিতরকার ধনরত্ন দেখিয়া আলিবাবা অবাক্ হইল! সে বুঝিতে পারিল যে কয়েক-পুরুষ ধরিয়া ক্রমাগত ডাকাতি করিয়া ডাকাতেরা এই অতুল ঐশ্বর্য্য এখানে জমা করিয়াছে। আলিবাবা লুকাইয়া লুকাইয়া দরজা খুলিবার ও বন্ধ করিবার মন্ত্র শিখিয়া ফেলিয়াছিল। সে চট্ করিয়া মতলব ঠিক করিয়া ফেলিল। তাহার গাধা তিনটা যতগুলি থলে বহিতে পারে ততগুলি মোহরের থলে তাহাদের পিঠে চাপাইয়া বাড়ীর দিকে সে রওনা হইল। কিন্তু পাছে থলে দেখিয়া লোকের মনে কৌতূহল জাগে এই ভয়ে সে থলেগুলি কাঠ দিয়া [illegible]াল করিয়া ঢাকিয়া লইল।

আলিবাবার স্ত্রী এত মোহর দেখিয়া এবং আলিবাবার কাছে সব কথা শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা। সে মোহরগুলিকে গুণিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আলিবাবা কহিল—"এতগুলি মোহর কি আর গুণে শেষ করতে পারবে?" তাহার স্ত্রী বলিল—"তা হলে ওজন করব। কত বড়লোক আমরা হলুম সেটা তো মেপে দেখা চাই?" আলিবাবা দেখিল গৃহিণীর যখন মাপিবার খেয়াল হইয়াছে তখন কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করা যাইবে না। তাই সে বলিল, "মাপতে চাও মাপো। কিন্তু খবরদার কেউ যেন না জানতে পারে।"

আলিবাবা অবাক্ হইয়া গেল

আলিবাবার স্ত্রী কাসিমের বাড়ী গিয়া কাসিমের নিকট হইতে দাঁড়িপাল্লা চাহিয়া আনিল।

কাসিমের স্ত্রীর মনে হইয়াছিল "ওরা এত গরীব, ওদের আবার দাঁড়ি-পাল্লার কি দরকার? কি ওজন করে সেটা জানতে হচ্ছে তো!" এই মনে করিয়া সে পাল্লার তলায় চর্বি মাখাইয়া দিয়াছিল।

এতগুলি মোহর কি আর গুণে শেষ করতে পারবে?

মোহর ওজন করিয়া যখন আলিবাবার স্ত্রী দাঁড়িপাল্লা ফিরাইয়া দিল তখন কাসিমের স্ত্রী দেখিল একদিকের পাল্লার নীচে চর্বির সঙ্গে একটা মোহর লাগিয়া আছে। তখন তাহার হিংসা হইল। ভাবিল "আলিবাবার এত মোহর যে তা' গুণে পারা

দস্যুরা অতি নির্দ্দয়ভাবে কাসিমকে হত্যা করিল

যায় না, ওজন করতে হয়?" সে দিনই সন্ধ্যায় কাসিম বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে এ-কথা শুনিয়াই গিয়া আলিবাবাকে এমন করিয়া ধরিল যে আলিবাবা তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিতে বাধ্য হইল। ব্যাপার জানিয়া লোভী কাসিম ও ডাকাতদের রত্নাগারে গেল। সেখানকার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহার এমন মাথা ঘুরিয়া গেল যে বাহির হইবার মন্ত্র "সিসেম্ খোলো" তাহা ভুলিয়া গিয়া সে যা তা বলিতে আরম্ভ করিল। দরজা খুলিতেছে না দেখিয়া সে ভয়ানক ভয় পাইল। কিন্তু বাহির হইবার মন্ত্র তাহার কিছুতেই মনে হইল না। কাজেই ডাকাতরা ফিরিয়া আসিলে কাসিম তাহাদের হাতে ধরা পড়িল। দস্যুগণ অতি নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে হত্যা করিল এবং আবার যদি কেহ কাসিমের মত এই গুপ্ত ধনাগারে চুরি করিতে আসে তাহা হইলে তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা কাসিমের দেহটাকে চার টুকরা করিয়া কাটিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া দিল।

কাসিমকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া তাহার স্ত্রী সারারাত কাঁদিয়া কাটাইল। পরদিন ভোর-বেলা তাহার অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া আলিবাবা কাসিমের খোঁজে গেল। ডাকাতদের সেই গুহার ভিতরে ঢুকিয়া কাসিমের দুরবস্থা দেখিয়া

আলিবাবা মর্ম্মাহত হইল। হাজার হইলেও কাসিম তাহার ভাই ছিল ত? আলিবাবা কাসিমের দেহের টুকরা গুলি একটি থলিতে ভরিয়া এবং দুইটী থলে মোহর ভরতি করিয়া ফিরিয়া আসিল। মোহরের থলে দুটী নিজের স্ত্রীকে দিয়া কাসিমের দেহ যে ছালায় ছিল সেটী গাধার পিঠে চাপাইয়া কাসিমের বাড়ী গিয়া সে বাড়ীর ক্রীতদাসী মর্জিয়ানাকে চুপি চুপি বলিল"—মরজিয়ানা, এই ছালার ভিতরে তোমার প্রভুর মৃতদেহ। ইহাকে এমন ভাবে কবর দিতে হইবে যেন সকলেই মনে করে ইহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। এবার চল তোমার প্রভু পত্নীর-কাছে যাই।"

কাসিমের স্ত্রী তো শোকে অনুতাপে অধীর হইয়া পড়িল। আলিবাবা কহিল—"বৌদি, এখন ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গেলে আর রক্ষা নাই।·· ·· যা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর তো দাদাকে ফিরাইবার উপায় নাই; তুমি এখন হইতে আমাদের সঙ্গেই থাকিবে।"

যেন স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইয়াছে এ ভাবে কাসিমকে কবর দিতে হইবে: কেহ যেন তাহার অপমৃত্যুর কথা জানিতে না পারে। এ ভার মরজিয়ানার উপর। মরজিয়ানা ক্রীতদাসী হইলে কি হয়, ভারী বুদ্ধিমতী। সে এক হাকিমের কাছ হইতে কাসিমের নাম করিয়া মিছামিছি কয়েকদিন ওষুধ আনিল। অবশেষে একদিন রাত্রে কাসিমের স্ত্রীর কান্না শুনিয়া সবাই মনে করিল সেই রাত্রেই কাসিম মারা গেল। পরদিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই মরজিয়ানা গেল বুড়া মুচি মুস্তাফার দোকানে। মুস্তাফা খুব ভোরেই দোকান খুলিত। মুস্তাফাকে মরজিয়ানা একটা আস্ত মোহর দিয়া কহিল—"তোমার যন্ত্রপাতি নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। একটা জরুরি সেলাইয়ের কাজ করতে হবে।" প্রথমটা মুস্তাফা রাজী হইল না। কিন্তু আরেকটী মোহর দিতেই তাহার মন নরম হইয়া আসিল। মরজিয়ানা খানিক দূরে আসিয়া মুস্তাফার চোখ বাঁধিয়া লইয়া চলিল যেন সে পথ চিনিতে না পারে।

বাড়ীতে আনিয়া মুস্তাফার চোখ খুলিয়া দিয়া মরজিয়ানা মুস্তাফাকে দিয়া কাসিমের দেহের খণ্ডগুলি একত্রে সেলাই করাইয়া লইল। তারপর ব্যাপারটা কাহাকেও না জানাইতে অনুরোধ করিয়া মরজিয়ানা মুস্তাফাকে আরেকটী মোহর দিল এবং আবার তাহার চোখ বাঁধিয়া অনেক দূরে গিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিল। পরে রীতিমত অনুষ্ঠানের সঙ্গে কাসিমের মৃতদেহটা কবর দেওয়া হইল। আসল ব্যাপারটা সহরের লোক জানিতেও পারিল না।

কাসিমের বাড়ীতেই আলিবাবা তাহার সমস্ত জিনিষ পত্র লইয়া উঠিয়া গেল, এবং কাসিমের

জরুরি একটা সেলাইয়ের কাজ করতে হবে

দোকানটা দেখাশুনা করিতে লাগিল আলিবাবার ছেলে।

ওদিকে ডাকাতরা আসিয়া দেখিল কাসিমের মৃতদেহও নাই, মোহরও অনেক কমিয়া গিয়াছে। দেখিয়া তাহারা ভয়ানক ক্ষেপিয়া গিয়া পণ করিল যাহার এ কাজ তাহাকে যেমন করিয়াই হোক বধ করিতেই হইবে।

দস্যুদের মধ্যে একজন বিদেশী পথিকের ছদ্মবেশে শেষ রাত্রিতে সহরে প্রবেশ করিল। যে লোকটাকে তাহারা হত্যা করিয়াছিল (অর্থাৎ কাসিম) তাহার বাড়ীর খোঁজে। তখনও বাজারের দোকান-পাট

খোলে নাই ; খোলা রহিয়াছে শুধু বুড়া মুচি মুস্তাফার দোকান। মুস্তাফা দোকান খুলিয়া কাজে লাগিবার উপক্রম করিতেছিল। দেখিয়া ডাকাতটা মুস্তাফার কাছে গিয়া বলিল—"কি আশ্চর্য ! তুমি বুড়ো হয়ে গেছ এত অল্প আলোতে কাজ করিতে পার ?" মুস্তাফা বলিল—"বুড়ো হলে কি হবে? চোখ আমার কোনো জোয়ান লোকের চাইতে কম জোরালো নয়। এর চাইতে কম আলোতে একটা মরা মানুষকে এমন বেমালুম সেলাই করে দিয়েছিলুম যে

এখানে এসেই থেমেছিলাম

সেলাই ধরতে পারে কার সাধ্যি।" কথাটা শুনিয়াই দস্যুর মন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। এত সহজে যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে তাহা সে ভাবে নাই। সে মুস্তাফাকে বেশ কয়েকটি মোহর দিয়া কহিল যে বাড়ীতে সে মৃতদেহ সেলাই করিয়াছে সে বাড়ীটি তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে। মুস্তাফা মোহর পাইয়া ডাকাতটিকে লইয়া চলিল। যেখানে মরজিনা তাহার চোখ বাঁধিয়া দিয়াছিল সেখানে আসিয়া সে তাহার চোখ বাঁধিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মুস্তাফার আন্দাজ ছিল ভয়ানক তীক্ষ্ণ। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে যে ভাবে যতটা গিয়াছিল, ঠিক সেইভাবে এবং ঠিক ততটা পথ চলিয়া সে থামিয়া কহিল—"ঠিক এখানে এসেই থেমেছিলাম।" মুস্তাফা ঠিক আন্দাজ করিয়াছিল। যে বাড়ীর দরজায় সে আসিয়া থামিয়াছিল সেইটি ছিল কাসিমের বাড়ী, সেখানেই আলিবাবা তখন বাস করিতেছিল। ডাকাতটা সেই বাড়ীর দরজায় খড়ি দিয়া চিহ্ন দিয়া চলিয়া গেল, যেন পরে বাড়ীটি ঐ চিহ্ন দেখিয়াই চেনা যায়। ভোরে উঠিয়া মরজিয়ানার চোখ পড়িল ঐ চিহ্নটির দিকে, সে অমনি একটি খড়ি নিয়া অন্যান্য বাড়ীর দরজাতেও ঠিক ঐ রকম চিহ্ন আঁকিয়া দিল। কাজেই পরে ডাকাতরা যখন বাড়ী খোঁজ করিতে আসিল তখন সে পাড়ার সবগুলি বাড়ীর দরজাতেই একরকম খড়ির চিহ্ন আঁকা। সবগুলি বাড়ীই দেখিতে প্রায় একই রকম, কাজেই যে ডাকাতটা নিজে চিহ্ন দিয়া গিয়াছিল সেও বাড়ী চিনিতে পারিল না। কাজেই জব্দ হইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল এবং কাজে অসাফল্যের জন্য সেই ডাকাতটির প্রাণদণ্ড হইল। আরেকটা ডাকাত মুস্তাফাকে সেই ভাবেই লইয়া আসিয়া আলিবাবার বাড়ীতে পৌঁছাইল। এবার সে দরজার এককোণে যেন সহজে চোখে না পড়ে—লাল খড়ি দিয়া চিহ্ন দিয়া গেল। কিন্তু এবারেও তাহা মরজিয়ানার চোখ এড়াইল না। সে পাড়ার সবগুলি বাড়ীর দরজাতেই লাল খড়ি দিয়া ঠিক সেই রকম চিহ্ন দিয়া দিল। দ্বিতীয়বারেও ডাকাতরা জব্দ হইয়া ফিরিয়া গেল এবং অসাফল্যের জন্য আরেকটা দস্যুর প্রাণদণ্ড হইল। সর্দ্দার দেখিল দুটা ডাকাত তাহাদের দল হইতে কমিল। এভাবে কমিতে কমিতে গেলেই তো মুস্কিল। তাই তৃতীয়বার সে নিজেই মুস্তাফার সাহায্যে আলিবাবার বাড়ীতে গিয়া এমনভাবে সেটা চিনিয়া রাখিল যেন আর ভুল না হইতে পারে।

সে দিন রাত্রিতে আলিবাবা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বিশ্রাম করিতেছে এমন সময় তাহার অতিথি হইল এক তৈল ব্যবসায়ী। তাহার সঙ্গে উনিশটা গাধার পিঠে চাপানো আটত্রিশটা তেলের ভাঁড়। আসলে কিন্তু তৈলব্যবসায়ী আর কেহ নয়, সেই দস্যুদলের সর্দ্দার। আটত্রিশটা ভাঁড়ের মধ্যে একটার মধ্যে শুধু তৈল ছিল, বাকী

প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করিয়া সশস্ত্র ডাকাত লুকানো। আলিবাবা সসম্মানে অতিথিকে অভ্যর্থনা করিল, এবং তাহার ক্রীতদাসীকে দিয়া সবগুলি ভাঁড় উঠানে সাজাইয়া রাখাইল। রাত্রে সর্দ্দার উঠিয়া ভাঁড়ের মুখের কাছে গিয়া প্রত্যেকটা ডাকাতকে আস্তে আস্তে বলিল—"আমি উঠোনে ঢিল ছুঁড়লেই ভাঁড়ের মুখ তোমাদের ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে তোমরা সবাই বেরিয়ে পড়বে।"

এ দিকে ঘুমাইতে যাইবার আগে আলিবাবা মরজিয়ানাকে বলিয়াছিল—"মরজিয়ানা, কাল আমি খুব ভোরে নাইতে যাবো। স্নান সেরে ফিরে এসে খাবার জন্য রাতারাতিই কিছু সুরুয়া তৈরী করে রেখো।" রাতে সুরুয়া বানাইতে গিয়া বাতি নিবিয়া গেল। বাড়ীতে মোমবাতিও নাই, তেল ও আর নাই। কি করিয়া বাতি জ্বালানো যায়? মরজিয়ানা দেখিল উঠানে একটা ভাঁড় হইতে তেল লওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। সে তেলের একটা ভাণ্ড লইয়া একটা ভাঁড়ের কাছে গেল। যাইতেই ভিতরের ডাকাতটা বলিল—"এখনই সময় হয়েছে নাকি।" অন্য কেহ হইলে ভয়ানক ভয় পাইয়া যাইত। মরজিয়ানা ও যে ভয় পাইল না তাহা নহে, কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গিয়া দিশা হারাইল না। কহিল—"না, এখনো নয়। আরেকটু পরে।" সে যে ভাঁড়ের কাছে মরজিয়ানা গেল সেখানেই ঐ এক প্রশ্ন মরজিয়ানাও সেই একই উত্তর দিল। অবশেষে একটা ভাঁড়ের কাছে গিয়া মরজিয়ানা কোনও প্রশ্নই শুনিল না। সেই ভাঁড়টাই ছিল তেলে ভরা। সমস্ত ব্যাপারটা মরজিয়ানার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। সে বুঝিল যে আলিবাবাকে ও পরিবারের সকলকে হত্যা করিবার জন্যই ডাকাতদের এই চালাকী। নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে বাড়ীর সকলকে বাঁচাইবার একটা চমৎকার ফন্দী তাহার মাথায় খেলিল। সে ভাঁড় হইতে তেলের ভাণ্ডে তেল লইয়া তেলটা উনুনে বেশ করিয়া গরম করিল। তারপর এক একটা ভাঁড়ে সেই গরম তেল ঢালিয়া দিয়া তাহার ভিতরের ডাকাতটাকে মারিয়া ফেলিল। এভাবে সবগুলি ডাকাত মরজিয়ানার হাতে মারা পড়িল।

অতিথি হইল এক তেল ব্যবসায়ী

গভীর রাতে বার কয়েক ঢিল ছুঁড়িয়াও দলের ডাকাতদের কোন সাড়া না পাইয়া সর্দ্দার ভাবিল ব্যাপার কি? ব্যাপার যে কি তাহা উঠানে গিয়া দেখিয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার মতলব ছিল গভীর রাতে বাড়ীর সকলকে হত্যা করিয়া সবাই মিলিয়া ধনরত্ন লইয়া পালাইবে; সে মতলব আর সফল হইল না। সর্দ্দার তখন ভয়ে ভয়ে দেয়াল টপকাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পালাইল।

পরদিন ভোরবেলা সব ব্যাপার দেখিয়া ও মরজিয়ানার কাছে সব কথা শুনিয়া আলিবাবার মন মরজিয়ানার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। আলিবাবা বলিল—"মরজিয়ানা, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ এতদিন তুমি ছিলে ক্রীতদাসী, কিন্তু আজ থেকে তুমি আর ক্রীতদাসী নও। তোমার এ ঋণ কিছুতেই শুধ্‌বার নয়। তবুও আমি তোমায় পুরস্কৃত করব। তুমি আমাদের প্রাণদাত্রী।"

পাছে জানাজানি হইয়া সহরে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এই ভয়ে সবগুলি ডাকাতের মৃতদেহ আলিবাবা তাহার বাগানে কবর দেওয়াইল।

সমস্ত সহচরদিগকে এভাবে চিরদিনের মত হারাইয়া দস্যুদলের সর্দ্দারের কি ভীষণ দুঃখ ও

সময় হয়েছে নাকি ?

রাগ যে হইল তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। সে চিন্তা করিতে লাগিল কি করিয়া প্রতিশোধ লওয়া যায়। কিছুদিন পরে সে কজিয়া হোসেন ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া সহরে এক মস্ত দোকান দিল, এবং দোকানে যাহারা আসিতে লাগিল তাহাদের সঙ্গে এত অমায়িক ব্যবহার করিতে লাগিল যে সকলেই তাহার ব্যবহারে খুব খুসী হইয়া গেল। দোকানটা ছিল আলিবাবার পুত্রের দোকানের ঠিক বিপরীত দিকে। আলিবাবার পুত্রের সঙ্গে কজিয়া হোসেনের খুব ভাব হইয়া গেল এবং কজিয়া হোসেন প্রায়ই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিল কজিয়া হোসেন প্রায়ই তাহাকে নিমন্ত্রণ করে, কাজেই তাহাকে একদিন নিমন্ত্রণ না করিলে কেমন দেখায় ? তাই আলিবাবার পুত্র কজিয়া হোসেনকে একদিন বাড়ীতে নিয়া গেল আলিবাবা তাহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু কজিয়া হোসেন বলিল এক অদ্ভুত কথা! সে নাকি লবণ দেওয়া কোনো জিনিস খাইবে না। পরিবেশন করিবার সময় চতুরা মরজিয়ানা চিনিতে পারিল যে অতিথি আর কেহ নহে—ডাকাতের সর্দ্দার। দস্যুদের সর্দ্দার নুন ছাড়া রান্না করিতে বলিয়াছিল কেন জান ? কারণ তাহার মতলব ছিল আলিবাবাকে হত্যা করা। যাহার নুন (অর্থাৎ নিমক) খাইবে তাহাকেই হত্যা করিলে নিমকহারামী হইবে যে !

আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা

খাবার সময় মরজিয়ানা নর্ত্তকীর বেশে একটী ছুরী নিয়া নানারকম ভঙ্গীতে নাচিতে নাচিতে সর্দ্দারের কাছে গিয়া তাহার বুকে ছুরীটী আমূল বিধাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারের মৃত্যু হইল।

আলিবাবা কহিলেন—"মরজিয়ানা, তুমি দ্বিতীয়বার আমাদের জীবন রক্ষা করেছ। মুক্তি তো তোমায় আগেই দিয়েছিলুম। এবার তোমাকে করব আমার পুত্রবধূ।" এবং পরে এক শুভদিনে আলিবাবার পুত্রের সহিত মরজিয়ানার বিবাহ হইয়া গেল। সারা সহরের লোক আনন্দিত হইল

বাঙ্গলার কথা

বঙ্গ নাম হইল কেন ?

তোমাদের দেশের নাম যে বঙ্গদেশ তাহা তোমরা জানিয়াছ। অবশ্য চলিত কথায় তাহাকে বাঙ্গলা বলে। তোমাদের দেশের নাম বঙ্গ কেন হইল, তাহা তোমাদের জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। এখন সেই কথাই বলিব। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে দুইটী রাজবংশ ছিল। রামচন্দ্র প্রভৃতি সূর্য্যবংশে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই চন্দ্রবংশে বলি নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন তাঁহার পাঁচটী পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। বলিরাজা তাঁহার এই পাঁচপুত্রকে তাঁহার রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। সেই রাজপুত্রদের নামে তাঁহাদের রাজ্যের নাম হইল। রাজপুত্র বঙ্গের নামেই বঙ্গদেশ হয়। কিন্তু অবশেষে পুণ্ড্র ও সুহ্ম তাহার সহিত মিলিত হইয়া বর্ত্তমানে বঙ্গদেশ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বঙ্গদেশের উত্তরভাগকে পুণ্ড্র বলিত। এখন তাহাকে বারেন্দ্র বলা হয়। পশ্চিম ভাগের নাম সুহ্ম ছিল, এখন তাহা রাঢ় নামে পরিচিত। আর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগকে প্রাচীন কালে বঙ্গ বলিত। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ ভাগের নাম বগড়ী ও পূর্ব্ব ভাগের নাম বঙ্গ। বগড়ী কোন সময়ে সমতট ও কোন সময়ে উপবঙ্গ নামে অভিহিত হইত। আবার সুহ্ম বা রাঢ়ের পশ্চিম তাহাকে তাম্রলিপ্ত ও বলিত, এই সকল প্রদেশ এককালে গৌড়দেশ নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। এক্ষণে এ সমস্ত ভূভাগেরই নাম বঙ্গদেশ। হিন্দুদের রাজত্বের সময় বঙ্গদেশ নামই প্রচলিত ছিল। তাহার শেষ ভাগে বাঙ্গলা নামের প্রচলন হইলেও মুসলমান আমলে বঙ্গদেশ বাঙ্গলা নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইংরাজরা আবার বেঙ্গল (Bengal) করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গলা ও বেঙ্গল যে বঙ্গ হইতেই হইয়াছে তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ। এখনও

আমরা ভাল কথায় ইহাকে বঙ্গদেশই বলিয়া থাকি। কিন্তু চলিত কথায় বাঙ্গলা বা বাঙ্গালা বলা হয়। বাঙ্গলা নামটিই আমরা প্রায়-ই ব্যবহার করি, সেইজন্য তোমাদিগকে বাঙ্গলার কথা শুনাইতেছি।

কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালী

বঙ্গ বা বাঙ্গলার কথা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারতে বঙ্গের কথা বিশেষ ভাবেই জানা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। কুরুপাণ্ডব বা দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে রাজ্য লইয়া যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলে। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, এই যুদ্ধে বাঙ্গালীরা উপস্থিত থাকিয়া অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তের বীরগণ প্রাণপণে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গরাজার অসংখ্য হস্তী ছিল, সেই সমস্ত হস্তী ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। বঙ্গরাজ সেই সমস্ত হস্তী লইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কৌরব অর্থাৎ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুর্যোধনের সেনাপতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের অধীনে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গরাজ অবশেষে সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দেন। সমুদ্রসেন বঙ্গদেশের আর একজন রাজা ছিলেন, তিনি এবং তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা অনেক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করেন। ভীম, অর্জ্জুনের অধীনে কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গরাজের ন্যায় ইঁহারাও প্রাণদান করিয়াছিলেন। বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেনের ন্যায় অনেক বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তির বীরপুরুষ এই ভয়াবহ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালীর নাম অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা তাহার সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় বাঙ্গালী মাত্রেই যে গৌরব অনুভব করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বাসুদেব

তোমরা শ্রীকৃষ্ণের কথা অবশ্যই জান। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব বলা হইত। তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি পৌণ্ড্রদেশের রাজা, তিনিও বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব একসময়ে বঙ্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মগধ বা বিহার দেশের রাজা জরাসন্ধের সহিত যোগ দিয়া তিনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। এবং শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষতা আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। জরাসন্ধ ভীমের হাতে নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু পৌণ্ড্র বাসুদেব অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা আক্রমণ করেন। ইহার সহিত আর একজন বীর যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম একলব্য। একলব্য নিষাদ নামে হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়েরা হীন জাতিদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতেন না। এইজন্য কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষক ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা

দেন নাই। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া তাহাকেই গুরুজ্ঞান করিয়া অস্ত্রশিক্ষা করেন। শিষ্যকে বিদ্যাশিক্ষার পর গুরুদক্ষিণা দিতে হইত। একলব্য দ্রোণকে গুরু বলিয়া মানেন শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে তাঁহার ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলটী গুরুদক্ষিণা দিতে বলেন। একলব্য তৎক্ষণাৎ গুরুর আদেশ পালন করেন তাহাতে তাহার অস্ত্রচালনার ক্ষমতা হ্রাস হয়। পৌণ্ড্র বাসুদেব ও একলব্য দ্বারকা আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বংশের আর আর সকলের তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব ও একলব্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের অনেক সৈন্য-সামন্তকে নিহত করিয়াছিলেন। অবশেষে কিন্তু পৌণ্ড্র বাসুদেব, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের হস্তে জীবন-বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। নিষাদ-পতি একলব্য ও শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এইরূপে পৌণ্ড্রদেশাধিপতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালী বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়

লঙ্কার কথা তোমরা অবশ্য রামায়ণে পড়িয়াছ। লঙ্কা দ্বীপের রাজা রাবণ রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। কিন্তু একজন বাঙ্গালী বীর জাহাজ ভাসাইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া তাহা জয়
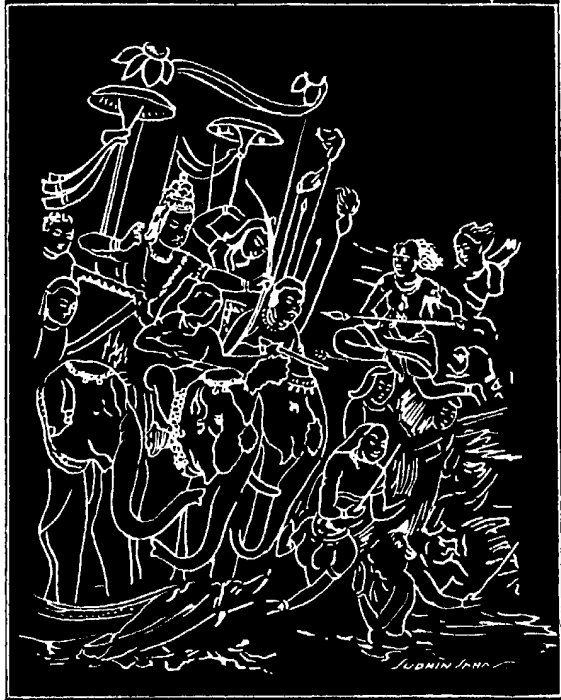
লঙ্কাবাসীদের সহিত বিজয়সিংহের যুদ্ধ

করিয়া লইয়াছিলেন। সেই বাঙ্গালী বীরের নাম বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহ বুদ্ধদেবের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। বুদ্ধদেবের কথা পরে তোমাদিগকে বলিব। এক্ষণে বিজয়-সিংহের কথাই বলা যাইতেছে। বঙ্গরাজের

দৌহিত্র সিংহবাহু রাঢ় প্রদেশের সিংহপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি লোকজনের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন। প্রজারা রাজা সিংহবাহুর নিকট বিজয়ের অত্যাচারের কথা জানাইলে,

বিজয়সিংহের শোভাযাত্রা

সিংহবাহু বিজয়কে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। বিজয়সিংহ আপনার অনুচরগণকে লইয়া, অনেকগুলি জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসাইয়া দিলেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে বিজয়ের জাহাজ সকল কোন কোন দ্বীপে আসিয়া লাগিল। আবার সেখান হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ-মুখে ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া পহুঁছিল। বিজয়সিংহ ও তাঁহার অনুচরেরা লঙ্কাদ্বীপে নামিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। লঙ্কাদ্বীপের তাম্রপর্ণী নগরে বিজয় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে লঙ্কাদ্বীপের অনেক উন্নতি হইতে লাগিল। বিজয়ের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বাঙ্গালা হইতে লঙ্কায় গিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসের বংশ অনেকদিন পর্য্যন্ত লঙ্কায় রাজত্ব করে। এই সিংহবংশের নামানুসারে লঙ্কার সিংহল নাম হয়। ভারতবর্ষের মানচিত্রের দক্ষিণে তোমরা যে ডিম্বাকার সিংহল দ্বীপের চিত্র দেখিতে পাইয়া থাক, উহাই সেই বিজয়সিংহের লঙ্কাদ্বীপ। বিজয়সিংহের লঙ্কাজয় হইতে তোমরা জানিতে পারিতেছ যে বাঙ্গালী তখন জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিত ও জাহাজে চড়িয়া দেশ বিদেশেও যাইত।

বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার

যে সময়ে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন, সেই সময়ে একটী নূতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত হইতেছিল। তাহার পর তাহা দেশ বিদেশেও বিস্তৃত হয়। এই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম্ম, যিনি এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশে ছিল, কিন্তু তাহা এত প্রবল হইতে পারে নাই। নেপালের দক্ষিণে কপিলবস্তু নগরে শাক্য-বংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের সিদ্ধার্থ নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিই গৌতম বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধার্থ রাজপুত্র হইয়াও সুখভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর দুঃখ নিবারণের উপায় স্থির করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যায় রত হন। তাহার পর জ্ঞান লাভ

করিয়া বুদ্ধ বা জ্ঞানী হইয়া উঠেন। পাপহীন হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তপস্যার দ্বারা সকল প্রকার দুঃখ দূর হইলে, অবশেষে নির্ব্বাণ নামে শান্তির অবস্থা আসে। বুদ্ধদেব এই কথা প্রচার করেন। একথা পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা জানিতেন, কিন্তু সাধারণের মধ্যে তাহার এরূপ প্রচার ছিল না। কারণ সকলে ইহা পালন করিতে পারিত না। সেইজন্য গৌতম বুদ্ধের নূতন ধর্ম্ম প্রথমে দলে দলে লোকে গ্রহণ করিলেও সকলে সে পথে চলিতে পারে নাই। ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে তাহার একরূপ চিহ্ন নাই বলিলেও হয়। বাঙ্গলাদেশে চট্টগ্রাম প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সামান্য মাত্র নিদর্শন দেখা যায়।

বুদ্ধদেবের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিলেও, বিহার বা মগধদেশের রাজা অশোকের সময় হইতে উহা দেশবিদেশে বিস্তৃত হয়। বঙ্গদেশেও তাহা বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ অনেকদিন হইতে মগধ রাজ্যের অধীন ছিল। মহাপদ্মনন্দ নামে মগধের একজন রাজা একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। তারপর মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত অনেক দেশ জয় করেন। তখন পাটলিপুত্র (পাটনা) মগধের রাজধানী ছিল। এই সময়ে গ্রীসদেশীয় আলেকজাণ্ডার পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। আলেকজাণ্ডার কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। গ্রীসদেশীয় লেখকগণ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মগধরাজ্যের পূর্ব্বদিকে "গাঙ্গ-রিডি" নামে আর একটী রাজ্য ছিল। তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন। গাঙ্গ-রিডিকে বাঙ্গলার পশ্চিম অংশ বলিয়াই মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। সে সময়ে
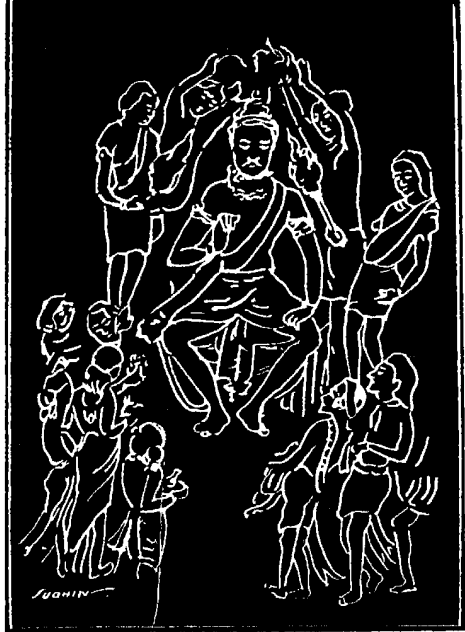
বিজয়সিংহের অভিষেক

তিব্বত হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সুতরাং বঙ্গদেশের অনেকেই যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। অশোক রাজা বাঙ্গলার অনেকস্থানে স্তূপ বা বৌদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈন ধর্ম্ম নামে আর একটী ধর্ম্ম

নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশেও তাহা প্রচারিত হয়। জৈনধর্ম্মও প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে ছিল। অহিংসা ইহাদের পরম ধর্ম্ম। জৈনদিগের শেষ প্রচারক মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। জৈনধর্ম্ম এখনও ভারতের অনেক স্থানে রহিয়াছে। বাঙ্গলার মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে জৈনগণ বাস করিতেছেন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে তাহাদের দুইটী সম্প্রদায় আছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও, হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই এদেশে বিদ্যমান আছে।

তাম্রলিপ্ত বন্দর

সুহ্ম প্রদেশের কথা তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছ। এখানকার লোকেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল। এইদেশ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী। ইহার প্রধান নগর তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের উপকূলেই অবস্থিত ছিল। ইহা একটী প্রসিদ্ধ বন্দর নামেই অভিহিত হইত। বঙ্গদেশের মধ্যে তাম্রলিপ্তের ন্যায় আর প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল না। বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীরা যে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত ও জাহাজে চড়িয়া দেশবিদেশে যাইত, সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালীরা সেই সকল জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্য ও দেশ বিদেশে পাঠাইত ও তাহা লইয়া আসিত। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সেই সকল জাহাজ সমুদ্র-যাত্রা করিত, আবার অন্যান্য দেশের জাহাজও তাম্রলিপ্তে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহারা অন্যান্য দেশের দ্রব্যাদিও বহন করিয়া আনিত এবং বাঙ্গলা হইতে অনেক দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। এইরূপে বাঙ্গলার সহিত অনেক দেশের বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় হইত। সিংহলের সহিত বাঙ্গলার বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় সর্ব্বদাই ঘটিত। সিংহলের ন্যায় ভারত মহা-সাগরের সুমাত্রা, যব, বলী প্রভৃতি দ্বীপেও বাঙ্গলার বাণিজ্য দ্রব্য তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইত। ঐ সকল স্থান হইতে তাম্রলিপ্তে মণিমুক্তাদি ও আসিত। বাঙ্গলার সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র গ্রীস, রোম প্রভৃতির বণিকেরা ক্রয় করিবার জন্য আসিতেন। ইউরোপের সম্ভ্রান্ত বংশীয় নরনারীরা সেই বস্ত্র আদরের সহিত ব্যবহার করিতেন। গ্রীস ও চীন-দেশীয় ভ্রমণকারীরা তাম্রলিপ্ত বন্দর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাম্রলিপ্ত এক্ষণে আর বন্দর নহে। সমুদ্র তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাম্রলিপ্তের বর্ত্তমান নাম তমলুক। ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত।

কর্ণসুবর্ণ রাজ শশাঙ্ক

বঙ্গদেশ যে অনেকদিন হইতে মগধের বা বিহার প্রদেশের রাজাদের অধীন ছিল, সে কথা তোমরা জানিয়াছ। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের পরে আরও কোন কোন বংশের রাজারা মগধে রাজত্ব করেন। তাহার পর গুপ্ত বংশীয় রাজগণ প্রবল হইয়া উঠেন। ইহারা অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই বংশের চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, প্রভৃতি রাজাদের অনেক কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গুপ্ত-বংশীয়েরা অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল মুদ্রা দেশ-বিদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে গুপ্ত বংশীয়দিগের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া

যায়। বাঙ্গলাদেশের অনেক স্থান হইতে ঐ সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মগধ গুপ্ত রাজগণের প্রধান স্থান হইলেও শেষে তাঁহাদের বংশের কোন কোন রাজা অন্যান্য স্থানেও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গদেশে ও গুপ্ত রাজবংশের রাজ্য স্থাপিত হয়। সে সময়ে বঙ্গদেশ গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত। এই গৌড়দেশের কর্ণ সুবর্ণ রাজ্যে শশাঙ্ক নামে গুপ্তবংশীয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণ সুবর্ণ হইতে রাজ্যের ও সেই নাম হয়। কর্ণ সুবর্ণ নগরের চলিত নাম ছিল কাণসোণা, বর্ত্তমানে তাহাকে রাঙ্গামাটি বলে। রক্তমৃত্তি নামে সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম হইতে উহার নাম রাঙ্গামাটি হইয়াছে। রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন শশাঙ্কের নরেন্দ্র গুপ্ত বা নরেন্দ্রাদিত্য বলিয়া আর একটি নামও ছিল। শশাঙ্ক অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দিল্লীর নিকট থানেশ্বর প্রদেশে রাজ্যবর্দ্ধন নামে এক রাজা ছিলেন। শশাঙ্ক তাঁহাকে নিহত করেন। রাজ্যবর্দ্ধন একজন বৌদ্ধ নরপতি। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, বৌদ্ধদের সহিত বিবাদ হওয়ায় গয়ায় যে বোধিতরু নামে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে গৌতম বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শশাঙ্ক তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহার রাজ্য মধ্যে যে সকল বৌদ্ধ আশ্রম ছিল, তাহা তিনি নষ্ট করেন নাই। তাহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরে রক্তমৃত্তি প্রভৃতি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ছিল। শশাঙ্ক অবশেষে রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন আবার দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজ পুলকেশীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের প্রচলিত মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শশাঙ্ককে হিন্দু শৈব বলিয়া জানা যায়।

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী রাজপুত্র

বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় তোমরা জান। যেখানে ছাত্রগণ উচ্চ-শিক্ষা লাভ করে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে। আমাদের বঙ্গদেশে কলিকাতা ও ঢাকা এই দুই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেকালে মগধে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তাহার নাম নালন্দা। পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে তাহার স্থান বাহির হইয়াছে। মাটির তলে তাহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র পড়ানো হইত। এখানে অনেক অধ্যাপক ছিলেন। নালন্দায় দেশ—বিদেশ হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। এমন কি; চীন প্রভৃতি দেশ হইতেও ছাত্র আসার কথা জানা যায়। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বঙ্গদেশের সমতট রাজ্যের এক রাজপুত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়া ক্রমে তাহার অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। যিনি এইরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম শীলভদ্র। শীলভদ্র নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, নালন্দায় আসিয়া তথাকার অধ্যক্ষ ধর্ম্মপালের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ছাত্র অবস্থায়ই একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া সেই দেশের রাজার নিকট হইতে একটি নগর পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আয় নিজে গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য একটি আশ্রম বা সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়া সেই অর্থ

তাহাতেই ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐ আশ্রম তাঁহার নামানুসারে শীলভদ্র সঙ্ঘারাম নামে অভিহিত হইত। শীলভদ্র ক্রমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। সে সময়ে নালন্দার নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। য়ুয়ানচুয়াং নামে একজন চীন দেশীয় ভ্রমণকারী বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র জানিবার জন্য নালন্দায় আসিয়া শীলভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি শীলভদ্র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদেশীর মুখে বাঙ্গালার কথা

তোমরা য়ুয়ানচুয়াংএর কথা শুনিয়াছ। তিনি চীন দেশের লোক কাজেই একজন বিদেশী। সেই বিদেশী আমাদের বাঙ্গলার কথা কি বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই কথাই তোমাদিগকে শুনাইব। য়ুয়ানচুয়াং যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশের উত্তরভাগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, দক্ষিণে সমতট এবং পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ এই চারিটী প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। তিনি এই সকল রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের ঐ নামেই রাজধানী ছিল এবং তাহাদের স্থান এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান মেদিনীপুরের তমলুক এবং মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণ-সুবর্ণের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সমতটের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা স্থির করা যায় না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান সুন্দরবনে অনেক নগরাদির চিহ্ন ছিল। এবং এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে কোন স্থানে সমতটের রাজধানী ছিল কিনা বলা যায় না।

য়ুয়ানচুয়াং বলিয়াছেন যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে অনেক অধিবাসী ছিল। সেখানকার অনেক পুষ্করিণী ও গৃহাদির কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা ছিল। সেখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। য়ুয়ানচুয়াং এখানকার পনস বা কাঁঠাল ফলের কথাও বলিয়াছেন। পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের জলবায়ু ও ভাল ছিল। অধিবাসীরা বিদ্যার আদর করিত। এখানে বিশটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কয়েকশত দেবমন্দির এবং অশোক রাজার স্তূপ ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক দিগম্বর জৈন ও পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে দেখা যাইত।

সমতট সমুদ্রতটেই অবস্থিত ছিল। এখাকার ভূমিতে চাষ দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে শস্য ও ফল ফুল জন্মিত। সমতটের জলবায়ু শীতল এবং অধিবাসীরা পরিশ্রমী ও বিদ্বান ছিল। এখানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। সমতটের ত্রিশটী সঙ্ঘারাম, কয়েক শত দেব-মন্দির ও অশোক রাজার স্তূপের কথাও য়ুয়ানচুয়াং বলিয়াছেন। সেঙ্গোচি নামে আর এক জন চীন দেশীয় ভ্রমণকারী সমতটে আসিয়াছিলেন সে সময়ে তথায় রাজভট নামে একজন রাজা ছিলেন। ইচিং নামে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী হরিকেল বা পূর্ব্ববঙ্গে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্ত ও সমুদ্র-তটে অবস্থিত ছিল। এখানকার ভূমিও উর্ব্বরা এবং তাহাতে চাষ দেওয়ার জন্য অনেক ফল-ফুল উৎপন্ন হইত। তাম্রলিপ্তের জলবায়ু কিছু উষ্ণ ছিল। অধিবাসীরা পরিশ্রমী ও সাহসী। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। দশটী সঙ্ঘারাম, পঞ্চাশটী দেবমন্দির এবং অশোক রাজার স্তূপেরও উল্লেখ আছে।

তাম্রলিপ্ত বন্দরে অনেক মণিরত্ন সংগৃহীত হইত। সেইজন্য এখানকার লোকেরা খুব ধনী ছিল। য়ুয়ানচুয়াংএর পূর্ব্বে ফাহিয়ান্ নামে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দরে দুইবৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান তথা হইতে এক বণিকের জাহাজে সিংহল-যাত্রা করেন। য়ুয়ানচুয়াংএর পর ইচিংও তাম্রলিপ্ত বন্দরে আসিয়াছিলেন।

য়ুয়ান্চুয়াং কর্ণসুবর্ণ নগরে অনেক অধিবাসীর বাস করার কথা বলিয়াছেন। এদেশের ভূমিও উর্ব্বরা এবং চাষ দেওয়ার নানা প্রকার পুষ্প উৎপাদন করিত। এখানকার জলবায়ু এবং অধিবাসীদের ব্যবহারও ভাল ছিল। অধিবাসীরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিত। এখানেও হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোকই ছিল। দশটি সঙ্ঘারাম, পঞ্চাশটি দেবমন্দির ও অশোক রাজার স্তূপের কথাও জানিতে পারা যায়। য়ুয়ানচুয়াং রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামও দেখিয়াছিলেন। ইহার গৃহাদি খুব প্রশস্ত ছিল এবং এখানে রাজ্যের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বাস করিতেন।

গৌড়বীরের প্রভুভক্তি

শশাঙ্কের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত গৌড় বা বাঙ্গালার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন কোন বিদেশী রাজা এদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমস্ত বঙ্গদেশকে গৌড়দেশ বলিলেও, ইহার উত্তর ভাগই বিশেষরূপে ঐ নামে অভিহিত হইত। এই প্রদেশ অনেক সময়ে মগধ রাজ্যের অধীনও ছিল। কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মগধনাথ বা গৌড়েশ্বরকে নিহত করিয়াছিলেন। অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গরাজ ও পরাজিত হইয়া যশোবর্ম্মার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা আবার কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের নিকট পরাজিত হন। ললিতাদিত্যের কলিঙ্গ জয়ের সময়ে গৌড়ের সামন্ত রাজা তাঁহার নিকট অনেক হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর নিজে কাশ্মীরে উপস্থিত ও হইয়াছিলেন। ললিতাদিত্য পরিহাস-কেশব নামে নারায়ণ মূর্ত্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ললিতাদিত্য সে প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। গৌড়েশ্বর তাঁহার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া গৌড়পতির লোকেরা তীর্থযাত্রাছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া পরিহাসকেশবের মন্দির অবরোধ করে। পূজকেরা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে, গৌড়বীরগণ রামস্বামী নামে রজতনির্ম্মিত আর এক নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে পরিহাসকেশব মনে করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করে। পরিহাসকেশব তাহাদের রাজাকে রক্ষা করেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের ক্রোধ জন্মিয়াছিল। দেবতার প্রতি ক্রোধ করা যে উচিত নহে প্রভুভক্ত গৌড়বীরেরা তখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা রামস্বামীকে পরিহাসকেশব মনে করিয়া ভ্রম করিয়াছিল। যখন তাহারা রামস্বামীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে সেই সময়ে রাজধানী শ্রীনগর হইতে সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু গৌড়বীরেরা রামস্বামীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া একে একে তাহাদের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। এইরূপে গৌড়বীরেরা প্রভুভক্তি দেখাইয়া অক্ষয় গৌরব লাভ

করিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত রামস্বামীর মন্দির শূন্য ছিল এবং কাশ্মীরবাসীরা গৌড় বীরগণের যশোগান করিত।

কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী

ললিতাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই কাশ্মীর হইতে এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শ্যালক জজ্জ কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। জয়াপীড়ের সৈন্যগণ ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। তিনি অবশেষে অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া প্রয়াগে উপস্থিত হন। পরে সেখান হইতে ছদ্মবেশে গৌড়দেশে আগমন করেন। সেই সময়ে জয়ন্ত নামে গৌড়দেশে এক রাজা ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজধানী ছিল। জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হইয়া গুপ্তভাবে আসিয়া এক সিংহ হত্যা করেন। তাহাতে লোকে তাঁহার পরিচয় পায়। রাজা জয়ন্ত জয়াপীড়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত নিজ কন্যা কল্যাণ দেবীর বিবাহ প্রদান করেন। জয়াপীড় কল্যাণ দেবীকে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন যেন কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী আবার ফিরিয়া পাইলেন। তিনি পঞ্চগৌড়ের রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়েশ্বর করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কল্যাণ দেবী যে জয়াপীড়ের পক্ষে কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী স্বরূপ হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায়। জয়াপীড় কল্যাণ দেবীকে লইয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার শ্যালক জজ্জ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া নিহত হন। জয়াপীড় আবার কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। কল্যাণ দেবীর জন্য জয়াপীড়ের এইরূপ কল্যাণ হওয়ায় তাঁহাকে কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী মনে করা অসঙ্গত নহে। যে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়াপীড় জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথায় কল্যাণপুর নামে এক নগর স্থাপিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক জয়াপীড়ের গৌড়বিজয় কাহিনী ইতিহাসমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে জয়াপীড় রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গৌড়বিজয় কাহিনী কাল্পনিক। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন,—জয়াপীড়ের গৌড়দেশ গমনের কথা সম্পূর্ণরূপে কল্পনা-প্রসূত।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন

বঙ্গদেশে শূরবংশ নামে এক রাজবংশের কথা জানা যায়। এই বংশের আদি বা প্রথম রাজা আদিশূর নামেই কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর বলা হয়। কেহ কেহ কল্যাণদেবীর পিতা জয়ন্তকে আদিশূর বলিতে চাহেন। কিন্তু সে কথা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমাদের দেশে এই কথা প্রচলিত আছে যে, আদিশূর রাজার সময়ে কান্যকুব্জ বা কনোজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে এদেশে ভাল ব্রাহ্মণ ছিলেন না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা যাগ-যজ্ঞ করিতে জানিতেন না। সেইজন্য আদিশূর যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ লইয়া আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ভ। আবার কোন কোন মতে তাঁহাদের নাম ক্ষিতীশ, মেধাতিথি বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভার। কেহ কেহ প্রথম পাঁচজনকে শেষের পাঁচজনের পুত্র বলিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মানব জাতির প্রথম সৃষ্টি এবং সভ্যতার উন্মেষ যে ভারতেই প্রথম হয়, সেকথাও তোমাদের বলিয়াছি। এদেশের সভ্যতা যে কত বড় প্রাচীন তাহা সিন্ধুদেশের ও পঞ্জাবের প্রাচীন সহর হারাপ্পা ও মহেনজোদড়োর আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে পাওয়া গিয়াছে। এক দিকে যেমন ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই অতি সুসভ্য মানবজাতির বাস ছিল, তেমনি অসভ্য নানা জাতীয় মানবের বাস ও ভারতের সেই অতি আদি যুগ হইতেই আছে। যেমন—কোল, ভীল, সাঁওতাল, নীলগিরির টোডা, ত্রিপুরা ও আসামের কুকী, নাগা, খাসিয়া, গারো, মিকির ইত্যাদি তোমাদের কাছে একে একে ভারতের এই সমুদয় আদিম জাতির কথা বলিব।

আসামের কুকী

২৫২৮ পৃষ্ঠার পর

ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি। কাজেই ভারতের বিষয় তোমরা বেশ ভাল করিয়াই পড়িয়াছ এবং তাহার নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত দেশ-প্রদেশ প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথাই জান কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কোন দেশে কিরূপ লোক বাস করে তাহাও জানা ভাল। কারণ পৃথিবীর লোক কখনও একরকমের নহে এবং সকলের অবস্থা ও সভ্যতার পর্য্যায় সমান নয়। কোন দেশের মানুষগুলি ধব্‌ধবে ফরসা, যেমন ধারো পার্শীরা বা সাহেবরা, কোন দেশের মানুষ একেবারে কালো যেমন আফ্রিকার নিগ্রোরা; কোন দেশের মানুষগুলি বেশ লম্বা চওড়া, যেমন ধরো কাবুলীরা। আবার কোন দেশের মানুষগুলি বেশ বেঁটে খাটো যেমন চীনেরা, আন্দামানের বর্ব্বর নিগ্রোরা। এমন ধারা সমস্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার মানুষের বাস। তাহাদের শুধু আকার ভিন্ন নয়, প্রত্যেকের আচার-ব্যবহার জীবনধারণের পদ্ধতি সবই প্রায় ভিন্ন প্রকারের।
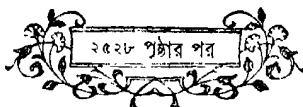
তোমরা প্রথমে জানিয়া রাখ যে এই মনুষ্য-জাতিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যেমন **সভ্য** ও **অসভ্য** (**আদিম**)। কারণ পৃথিবীর সকল জাতিই সভ্য নয় আবার সব মানুষই এক সঙ্গে সভ্য হয় না। সভ্যজাতি ছাড়াও পৃথিবীর এমন স্থান এখন ও অনেক আছে যেখানে আদিম জাতিরাই বাস করে। তাহারা অনেকেই আমাদের মত সভ্যভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরে না, সভ্য-জাতির মত লিখিতে পড়িতেও জানে না। তাহাদের সামাজিক নিয়ম উন্নত নয়—জ্ঞান বুদ্ধি

অর্জ্জন করিবার বা উৎকর্ষ সাধন করিবার (Culture) ক্ষমতা সভ্যজাতি অপেক্ষা তাহাদের অনেক কম।

ভারতবর্ষে এখনও কয়েক স্থানে বহু অসভ্য জাতি বাস করে। দাক্ষিণাত্যে, মধ্যভারতে ও পূর্ব্বাঞ্চলেই উহাদের সংখ্যা অধিক। প্রথমে পূর্ব্বদিক্ দিয়া আরম্ভ করিয়া দেখি আমাদের বাঙ্গলাদেশের পাশেই আসাম দেশটীর জঙ্গলে ও পাহাড়ের বুকে **কুকী, নাগা, খাসিয়া, গারো, মিকির, দাফ্‌লী** প্রভৃতি কয়েকটী দুর্দ্দান্ত আদিমজাতি

কুকী-স্ত্রীলোক

আজ পর্য্যন্তও অসভ্য ও অশিক্ষিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে তোমাদের শুধু কুকীদের কথাই বলিব।

এই কুকিদের আসামের দক্ষিণে ত্রিপুরা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ম্মা প্রান্ত পর্য্যন্ত সারা লুসাই পর্ব্বতে ও মণিপুরের বহুস্থানে পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মাঝে ঝরণা বা নদীর ধারে ছোট ছোট পল্লী বাঁধিয়া বাস করিতে দেখা যায়। উহাদের প্রতাপ এক কালে বন্যপশুর মতই নাকি ভীষণ ছিল এবং শোনা যায় নাগাদের মত উহারাও এক কালে লোকের মাথা কাটিয়া বেড়াইত।

কুকীরা মোঙ্গোল জাতীয় তিব্বত-বর্ম্মী (Tibeto-Burman) শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। উহাদের দেহের রং কালো বলিলেই হয় তবে স্ত্রীলোকের বর্ণ উজ্জ্বল ও চলদে আভা পূর্ণ। মেয়েরা আকারে ছোট হইলেও পুরুষেরা উচ্চতায় মাঝারী রকমের, অনেকে আবার বেশ লম্বাও দেখিতে পাওয়া যায়।

শরীর বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ ও শক্তিসম্পন্ন। পুরুষদের পাগুলি হাতের এবং দেহের অনুপাতে একটু বড়। মাথা চওড়া থেকে মাঝারি রকমের, নাকগুলি বেশ ছোট এবং চওড়া, নাসারন্ধ্র চওড়া, চক্ষু দুটী ছোট, চোখের পাতায় একটী করে কোঁচ (Mongolic fold) থাকে। গণ্ডদেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ, দাড়ী গোঁফ নাই বলিলেই হয় কাহারও কাহারও সামান্য গোঁফ ওঠে তাহাও দু'পাশেই বেশী।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সাধারণতঃ মাথায় পাগড়ী ধারণ করে কেহ কেহ বাবরী চুল ও রাখে। মেয়েরা বড় বড় চুল রাখে তবে মণিপুরের কুকী বালিকারা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চুল ছাঁটে (Bobbed-hair)। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কাণে মাকড়ী থাকে, পিতলের, লোহার বা কালো, লাল সূতার। লুসাইয়ের কুকী স্ত্রীলোকেরা কানের নরম চামড়াটীকে বিদ্ধ করিয়া বড় বড় গোল মাকড়ী পরে। নাকে কোন গহনা নাই, গলায় হাড়ের, রজনের (amber) এবং আরও অনেক প্রকার দ্রব্যের মালা দেখিতে পাওয়া যায়। হাতের গহনা তেমন চলতি নাই। পোষাকের মধ্যে পুরুষেরা মেয়েদের তাঁতে বোনা ছোট কাপড়, চাদর ও পাগড়ী ব্যবহার করে। অবশ্য আজকাল সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা অনেকে জামা, কোট, কামিজ প্রভৃতি পরিতে শিখিয়াছে। নাচের সময় বা উৎসবে যুবকেরা অনেক বিদেশীয় পোষাকের আমদানী করিয়া সৌখীন বাবু সাজিয়া থাকে। কুকী স্ত্রীলোকেরা শাড়ী পরে কিন্তু তাহাদের পরিবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। শাড়ীটাকে সাধারণতঃ বুকের উপর হইতেই জড়াইয়া বাঁধে এবং তাহা

হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। শীতের প্রকোপে চাদর কিংবা জামাও তাহারা ব্যবহার করে। হাত পর্য্যন্ত গরম জামা পরিবার সময়ে তাহারা শাড়ীটীকে লুঙ্গী করিয়া পরে। উহাদের শাড়ী গুলি ভারী সুন্দর ঘোর বেগুনি রঙের আগাগোড়া ডোরা কাটা, পাড়ের নক্সার কাজও অতি সূক্ষ্ম। শাড়ীর দৈর্ঘ্য অবশ্য বেশী নয়। এই সমস্ত ছাড়া নৃত্যে, উৎসবে কুকিরা মূল্যবান রঙীন পোষাক পরিচ্ছদ ও ব্যবহার করে।

কুকীদের মধ্যে অনেকগুলি ভাগ (tribe) আছে এবং প্রতি ভাগে বিস্তর দল (clan) আছে। সাধারণতঃ এক একটি দল এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগ্রামে বাস করে। তাহাদের প্রত্যেকের ভাষা ভিন্ন। পরস্পরে কোন সংস্রব ও নাই যদিও দেখিতে শুনিতে আচার ব্যবহারে উহাদের যথেষ্ট মিল আছে। কুকীরা একটু যাযাবর প্রকৃতির জাতি একই স্থানে তাহারা বেশী দিন বাস করিতে চাহেনা। তাহাদের নাতি পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলিতে ৬০।৭০টী করিয়া গৃহস্থ থাকে। তাহাদের পর্ণকুটীর গুলি সাধারণতঃ কাঠের বা পাথরের খুঁটীর উপর নির্ম্মাণ করা হয়। ধানের গোলা গুলির উপর অবস্থিত। প্রতি গৃহের (একটী করিয়া ঘর বিশিষ্ট) একটি বিশিষ্ট স্থানকে উহারা গৃহদেবতার আসন বলিয়া ধরিয়া লয়; গৃহের মঙ্গলের জন্য এই গৃহদেবতার প্রতি তাহারা সদাই ভীত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রতি গ্রামে একটী করিয়া মোড়ল থাকে সে গ্রামের বয়স্কদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গ্রামের শাসন রাখে। কুকীদের কয়েকটী গ্রামে প্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিষ উহাদের অবিবাহিত-দের থাকিবার জন্য পৃথক একটী কুটীর (Bachelors house) ভাল কথায় যাকে আমরা কুমারসঙ্ঘ বলি। সেখানে গ্রামস্থ সমস্ত অবিবাহিত যুবকরা শুধু আড্ডা দেয় না, বাস ও করে। এই বাড়ীটিকে লুসাইরা জাল্‌বাক (Zaulbak) বলে। সাধারণতঃ এই বাড়ীটি গ্রামের এক কিনারায় থাকে। যুবকেরা খাওয়া দাওয়া অবশ্য পিতৃগৃহে করে কিন্তু বাকী সময়টুকু এই বাড়ীতেই যাপন করে। এখানে উহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গীতবাদ্যের ও দৈহিক শক্তির চর্চ্চা করে। রাত্রে ওইখানেই সকলে শয়ন করে। কিন্তু বিবাহের পর যে যার গৃহে গিয়া বাস করে।

কুকী সর্দ্দার

গ্রামের বাহিরে গোরস্থান, সেখানে মৃতব্যক্তিদের পবিত্রভাবে গোর দেওয়া হয়। গোরস্থানকে উহারা বেশ ভয়ের চক্ষেই দেখে কারণ উহারা মৃত্যু-দেবতার বিষয়ে সকল সময়েই একটু সন্ত্রস্ত থাকে। কুকীরা পরকাল বিশ্বাস করে এবং সেইজন্য মৃতব্যক্তির ব্যবহারের জন্য তাহারা প্রত্যেকের কবরের উপর গোর দিবার সময় চুবড়ী, কলস, কোদাল, বর্শা, তীর-ধনুক প্রভৃতি ইহজীবনের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি রাখিয়া দেয়। উহারা মনে করে পরজীবনে ও মানুষকে ইহজীবনের ন্যায়ই জীবন ধারণ করিতে হয়। উহাদের বিশ্বাস সকল মানুষ মরিয়া একটী বিশেষ স্থানে (লুসাই, কুকীরা তাহাকে মি-থি-কুয়া বলে) চলিয়া যায়। মৃত ব্যক্তির আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা মাঝে মাঝে কবরের উপর খাদ্য ও পানীয় রাখিয়া যায়।

গ্রামের আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে কুকীদের ধানের ক্ষেত। ধান ও তুলার চাস-ই বেশী। তাহাদের চাস করিবার পদ্ধতিকে জুমিং বা ঝুমিং (Jhuming) বলা হয়। প্রথমে জমির উপর উৎপন্ন আগাছা গুলিকে কৃষকবৃন্দ দল বাঁধিয়া নোয়াইয়া বা কাটিয়া মারিতে থাকে, তারপর সেই আগাছা-গুলি শুকাইয়া গেলে আগুন ধরাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ফলে জমি সহজেই পরিষ্কার হইয়া যায় এবং পোড়া ছাইগুলিও সার (manure) হিসাবে খুব কাজে লাগে। তারপর অই ঝুম্ (ওই রকম কৃত জমি) বৃষ্টিতে নরম হইয়া গেলে কোদাল (hoe)

দিয়া খনন করিয়া বীজ ছড়ান হয়। এই জাতির আর একটী বিশেষত্ব যে উহারা পাহাড়ের গায়ে চাষ করিবার জন্ম আমাদের দেশের কৃষকদের মত লাঙ্গল ব্যবহার করে না। শরৎকালের নির্ম্মল

কুমারসঙ্গল

আকাশের তলে পাহাড়ের বুকে বুকে কুকী কৃষকদের জুমিং করিবার ঐক্য স্বরের অদ্ভুত গান তোমরা যদি ওদিকে কখনও যাও ত শুনিতে পাইবে।

কুকীরা কখনও গরু বা বলদ পালন করে না এবং শুধু গরুর কেন কোন জন্তুরই দুগ্ধ ইহারা পান করে না। খাদ্যের প্রয়োজনীয় হিসাবে শূকর, মুরগী, কুকুর, মিথান (Bison) এই গুলিই ইহারা সাধারণতঃ পালন করে। অবশ্য সমস্ত জন্তুরই মাংস উহারা ভক্ষণ করে। মাঝে মাঝে গ্রামস্থ পুরুষেরা মিলিয়া শিকারে বাহির হয় এবং পশু মারিয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া উৎসব করিয়া নাচিয়া গাহিয়া শিকারের মাংস রন্ধন করিয়া আহার করে। কুকীদের কিন্তু একটা ভয়ানক দোষ রহিয়াছে উহারা ভয়ানক মদ্য পান করে। প্রতি গ্রামে মোড়ল বা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে উহাদের 'জু'দে প্রস্তুত হয় এবং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই জু পান করে। শিকারে, হাটে, ভ্রমণে তৃষ্ণানিবারণের জন্ম উহারা সকল সময়েই জু সঙ্গে রাখে। উৎসব বা পূজা পালন-পার্ব্বনে ত কথাই নাই। এই জু উহাদের শারীরিক ও নৈতিক অধঃপতনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কুকী পুরুষ অপেক্ষা কুকী স্ত্রীলোকেরা অধিক কর্ম্মঠ। পুরুষেরা অধীন হইলেও স্ত্রীলোকেরা বেশ স্বাধীন ভাবেই ঘুরিয়া বেড়ায়। শীতকালে ক্ষেতের কোন কাজ না থাকায় পুরুষেরা সাধারণতঃ সারাদিনটা আলস্যেই কাটাইয়া দেয় কিন্তু কৃষির সময়ে সকাল হইতেই ক্ষেতের কাজে চলিয়া যায় এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃকালে উঠিয়া বাঁশের প্রস্তুত করা পাইপের মত অনেকগুলি সরু পাত্র লইয়া নিকটস্থ নদী বা ঝরণা হইতে জল আনে, রন্ধন করে, পুরুষদের জন্ম ক্ষেতে খাবার লইয়া যায়, সূতা কাটে, কাপড় বোনে (তাঁতে) পাতার রসে সিদ্ধ করিয়া কাপড় রং করে, ধান ভাঙ্গে, হাটে বেচাকেনা করে এবং আরও অনেক কিছু গৃহস্থালীর কাজ করে। চরকা ছাড়া তুলা পিজিবার ভারি সুন্দর একপ্রকার কাঠের যন্ত্র এই অঞ্চলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে চরকার মত হাতল ঘুরাইলে অতি শীঘ্র তুলা পিজা যায়। বালকবালিকারা ওইরূপ যন্ত্রে বেশ তুলা পিজিতে পারে। অর্দ্ধ সভ্য হইলে কি হয় কুকীদের ভিতর এই কুটীর-শিল্প (cottage-industry) আজও বিদ্যমান। ইহা ছাড়া শক্ত রকমের কাজগুলি

কুকী বালিকাগণ

অবশ্য পুরুষেরাই করে। কুটীর নির্ম্মাণ করা, কাঠ-কাটা, চুবড়ী প্রস্তুত করা, অস্ত্র প্রস্তুত করা প্রভৃতি পুরুষের কাজ। এ সব পুরুষেরাই করে।

কুকীদের সাধারণতঃ একটী করিয়াই স্ত্রী থাকে, তবে যার পয়সা আছে, যেমন মোড়লরা অনেক সময় দুটা তিনটী করিয়া স্ত্রী রাখে। কিন্তু সতীনের ঝগড়ার ভয়ে উহারা বড় একটা একত্রে বেশী দার-পরিগ্রহ করে না। স্বামী বা স্ত্রী মরিয়া গেলে উহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করে। উহাদের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হয়, বয়স্থ পিতা, মামা, খুড়া ও গ্রামস্থ প্রবীণে মিলিয়া বিবাহের দিনও বরবধূ স্থির করে। কিন্তু পাত্রকে পাত্রীর পিতা, মাতুল ও অন্যান্য গুরুজনদের কন্যার মূল্য হিসাবে কিছু অর্থ ও পণ (bride-price) দান করিতে হয়। বিবাহ গ্রামাপুরোহিত আসিয়া সমাপন করে, তারপর নাচ গান, তামাসা, আহার ও পানে সারারাত্রি ধরিয়া বিবাহের উৎসব চলে। পর অল্প বলিয়া আপনা-আপনির ভিতর এদের অনেক বিবাহ হয়। কয়েক জাতিয় কুকীদের ভিতর মামাত, পিসতুত ভাইবোনে বা ঠাকুর্দ্দা নাতনী সম্পর্কে বিবাহ ও দেখা যায়। অন্যগ্রামে বিবাহ দিতে উহারা বড় চায় না, কারণ একটা স্বজাতীয় পল্লীগ্রামগুলি নিকটে বড় থাকে না। স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হইলে উহারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করে। স্ত্রী ঝগড়া করিয়া চলিয়া যাইলে, তাহার পিতাকে মূল্য (bride-price) ফেরৎ দিতে হয়।

কুকীদের ব্যবহার করিবার জিনিষের মধ্যে কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র ও ধূমপানের পাইপ লক্ষ্য করিবার জিনিষ। রচেম্ (Rotchem) বলিয়া একটী বাদ্যযন্ত্র ভারি অদ্ভুত রকমের। ইহা অনেকটা ব্যাগপাইপের মত মুখ দিয়া বাজাইলে বাঁশীর মত অনেক প্রকার সুর নির্গত হয়। কুমড়ার শুষ্ক খোলে কয়েকটী বাঁশের পাইপ লাগাইয়া নিজেরাই উহা প্রস্তুত করে। ইহা ছাড়া, কাঁসার ঢোল, বাঁশী ও তারের যন্ত্রও কুকীরা ব্যবহার করে। ঠাণ্ডা দেশে থাকে বলিয়া ধূমপানে ও কুকীরা খুব পটু—তামাক সাজিয়া পান করা অপেক্ষা ছোট ছোট বাঁশের পাইপ ইহারা পথে ঘাটে ধূমপান করিয়া বেড়ায়।

কুকীরা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে বড় ভয় করে। প্রকৃতির নিয়মের কোন কিছু ব্যতিক্রম হইলেই তাহারা সেটাকে অশান্তি-সূচক কিছু মনে করে। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টি, বৃক্ষ, নদী, ঝরণা, গৃহ, পল্লী, ক্ষেত সব স্থানেরই একটী করিয়া দেবতা (Huai) আছে এবং সকলেরই তুষ্টির জন্য কোন কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহারা মাঝে মাঝে নৈবেদ্য দিয়া পূজা করে। উহাদের কুসংস্কারের অন্ত নাই। কোনও দিন যদি একটী তারাকে চন্দ্রের খুব নিকটে দেখিতে পায় ত উহারা বলে যে সে দিন নিশ্চয়ই কোন শত্রু আসিয়া তাদের গ্রাম আক্রমণ করিবে। কোনদিন মধ্যরাত্রে যদি অদ্ভুত ভাবে যুবগী ডাকে তবে উহারা ভাবিয়া লয় যে কেহ হয়ত তাহাদের (কুকীদের) মধ্যে মরিয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক রকম কাল্পনিক ভীতি উহারা

কুকীদের নৃত্য

মনের মধ্যে পোষণ করে। কোনরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে অমনি অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া বসে। মৃত পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে উহারা পূজা করে। তুক তাক ইহকাল পরকাল, ভাগ্য ও যাদু ভয়ানক বিশ্বাস করে। কারণ অনেক কিছুর অর্থই উহাদের বোধগম্য হয় না। যাদুমন্ত্রে বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় ইহাদের অদ্ভুত বিশ্বাস। একটী গল্প আছে যে লুসাই কুকীদের ভিতর একবার একটী ডাইনী একটা লোকের পদচিহ্ন লইয়া উনানের উপর শুকাইতে দিয়াছিল এবং সেই পদচিহ্ন যতই শুকাইতে লাগিল, দেখা গেল সেই লোকটীর পা-টী ও তত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল এমনি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত লোকটী মরিয়াই গেল

[তোমরা 'শিশু-ভারতী' (৭৬২ পৃষ্ঠা) শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চরিত পড়িয়াছ। তাঁহার সময়ে তদীয় সহচরদের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ ছিলেন প্রধান। আর কথিত আছে মাধবেন্দ্রপুরীই বাঙ্গলাদেশে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের সূত্রপাত করেন।]

নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্রপুরী

১৪৯৪ পৃষ্ঠার পর

নিত্যানন্দ---ইনি হাড়াই ওঝার পুত্র---বাড়ী বীরভূম, একচাকা গ্রাম। ইনি নিমাই হইতে নয় বৎসরের বড়, সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ইঁহার কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছিল। বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পূতনাবধ, কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের নানারূপ লীলার অভিনয় করিয়া বাল্যসঙ্গীদের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বৎসর কাল ভারতবর্ষের সর্ব্বতীর্থ ঘুরিয়া বেড়ান।

মাধবেন্দ্রপুরী

শ্রীপর্ব্বতে ইঁহার সঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ হয়। এই মাধবেন্দ্রপুরীই বঙ্গদেশে প্রথম কৃষ্ণ-প্রেমের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। নানাকারণে মনে হয় **পুরী** বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি অযাচক-বৃত্তি সন্ন্যাসী ছিলেন, কেহ কিছু স্বেচ্ছায় দিলে খাইতেন---নতুবা উপবাসী থাকিতেন। "চৈতন্যচরিতামৃতে" লিখিত আছে, ইনি একদা বৃন্দাবনে যাইয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত দর্শনে কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া তথায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। তিন দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, তথাপি দৈহিক কোন কষ্ট হয় নাই, শতদলের মত মুখখানি প্রেমে ঢলঢল করিতেছে। সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণ একটি পরম সুন্দর কিশোরবয়স্ক বালক এক ভাঁড় দুধ মাথায় করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি এই দুগ্ধ পান করিয়া তৃপ্ত হউন। সম্মুখে ঐ ঝরণার জল— উহাতে ভাণ্ডটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিবেন,— আমি খানিক পরে আসিয়া লইয়া যাইব।" মাধবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে তোমাকে এই দুধ দিয়া পাঠাইয়াছে?" বালক বলিল, "ব্রজমায়েরা তোমার উপবাসের কথা জানেন, তাঁহারাই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, এখানে কত সাধুসন্ন্যাসী আসেন,

সকলেই তাঁহাদের কাছে আহার্য্য ভিক্ষা করেন, কেহ যব, ছাতু, দুগ্ধ, রুটি, কেহ-বা ফল-মূল ভিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের কাছে কিছুই চাও নাই। তাঁহারাই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যিনি কাহারও কাছে কিছু চাননা, আমি তাঁহার খাবার যোগাইয়া থাকি।" এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল, তাহার পরম সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং সুন্দররূপ সন্ন্যাসীর মন মুগ্ধ করিল।

মাধব সেই দুগ্ধ পান করিলেন, তাহা অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু, ভাণ্ডটি ধুইয়া মুছিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় তপস্যায় বসিলেন। কৃষ্ণের করুণা-স্মরণে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। শেষরাত্রে তন্দ্রার অবস্থায় ধ্যানের বশে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই তরুণ বয়স্ক বালক তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া,—বড় মধুর তাঁহার মূর্ত্তি, কিন্তু বড় বিষণ্ণ! গদ্‌গদকণ্ঠে বালক যেন বলিতেছে, "মাধব! আমি বহুদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছি, মৃত্তিকার নীচে শীতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে, এই প্রত্যাশায় আমি কত বর্ষ কাটাইয়া দিয়াছি—কারণ জগতে তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, এরূপ কেহ আমাকে ভালবাসে না।" এই বলিয়া স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া বালক অন্তর্হিত হইল। তখন গোবর্দ্ধনের শৃঙ্গে রাঙ্গা মাণিকের মত সূর্য্যকিরণের প্রথম ঝলক ঝিকি-মিকি করিতেছিল—সন্ন্যাসী সাশ্রুনেত্রে বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটিলেন। বহুলোক কোদাল ও সাবল লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গোবর্দ্ধন পাহাড়ে ছুটিল। নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িয়া তাঁহারা এক বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি পাইলেন, এই গোপালমূর্ত্তি মাধবাচার্য্য বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত, আনিয়া সেই মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই বালক তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন—"মাধব! বহুদিন ভূনিম্নে থাকিয়া আমার শরীরের তাপ দূর হয় নাই—উড়িষ্যাতে খুব উৎকৃষ্ট চন্দন আছে, তুমি যদি তাহা আমার অঙ্গে লেপন কর, তবে এই জ্বালা জুড়াইবে।" মাধব উড়িষ্যার অভিমুখে চলিলেন, তখন পথে রাজায় রাজায় বিরোধ, অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। মাধবের মাত্র কটিবাস সম্বল, বিপদ সম্পদ্ তাঁহার জ্ঞান নাই- তিনি রেমুনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ-বিগ্রহ দর্শন করিলেন, এই বিগ্রহকে ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয়—গোপীনাথের ক্ষীর ভোগ অতি প্রসিদ্ধ। মাধব ভাবিলেন, "যদি এই ক্ষীরের একটু আস্বাদ পাইতাম তবে আমি বৃন্দাবনে যাইয়া গোপালকে এইরূপ ক্ষীরভোগ দিতে পারিতাম।" কিন্তু পরক্ষণেই বিরাগ উপস্থিত হইল, "ছিঃ আমার ক্ষীর খাইবার জন্য জিহ্বার লালসা হইয়াছে!" অনুতপ্ত হইয়া তিনি বাজারের অনতিদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোপীনাথ-মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা দেবতাকে ভোগ দেওয়ার পর আহারাদি সমাপ্ত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এবং দ্রুতগতিতে যাইয়া দেখিলেন গোপীনাথের পৃষ্ঠে তাঁহার উত্তরীয়ের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাঁধা আছে। তখন পাণ্ডার দুইচক্ষু জলে পূর্ণ। তিনি উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "গোপীনাথ আমায় বলিতেছেন, 'আজ আমি ভোগ খাই নাই, আমা ভিন্ন জানে না সেই মাধব না খাইয়া বাজারে উপবাসী হইয়া পড়িয়া আছে, তাঁহার জন্য আঁচলে কতকটা ক্ষীর রাখিয়াছি মাধবকে ক্ষীর খাওয়াইয়া এস, তবে আমি ভোগ পাইব।" সেই ক্ষীর খণ্ড হাতে করিয়া পাগলের মত পাণ্ডা বাজারে ছুটিলেন, "এমন ভাগ্যবান্ কে যাঁহার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের পুণ্য কবে পাইব? কোন্ সন্ন্যাসীর নাম মাধব?" এই চীৎকারে মাধবের ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি ধরা দিলেন। ইহার মধ্যেই সমুদ্র-তরঙ্গের মত বিপুল জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমস্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ক্ষীর প্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত রেমুনাবাসী লোক নৃত্য করিতে লাগিল—তাহারা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। কিন্তু প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবদের চক্ষে অতি ঘৃণার বিষয়, এই প্রতিষ্ঠার ভয় পাইয়া সন্ন্যাসী রেমুনা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন; রাত্রে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইয়া

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয়
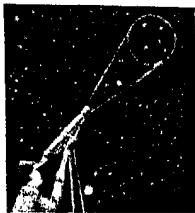
দৃষ্টিক্ষেত্র
দূরবীণের লক্ষ্য পদার্থ

দোলদণ্ড

পূর্ণচন্দ্র

ছায়াপথ
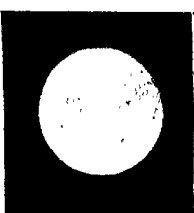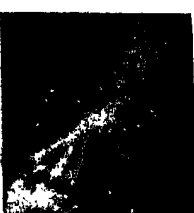
অধোবিন্দু
আকাশমণ্ডলস্থ যে বিন্দু
আমাদের ঠিক নিম্নদিকে
অবস্থিত

নীহারিকা

নিউটনের দূরবীণ

সূর্যের গায়ের কৃষ্ণ চিহ্ন
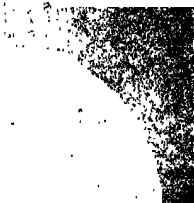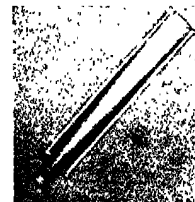
পরাবর্তনীয় দূরদর্শক

শনিগ্রহ
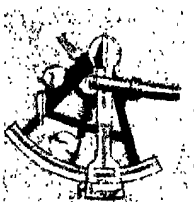
সেক্সটান্ট যন্ত্র
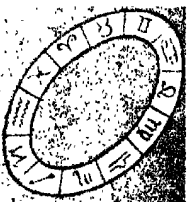
রাশিচক্র

হেলিয়োসট্যাট বা কাচ
প্রভৃতির ভিতর দিয়া সূর্য্যকিরণ
কেন্দ্রীভূত করিবার যন্ত্র

হার্শেলের দূরবীক্ষণ
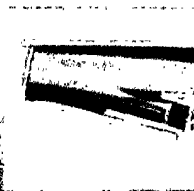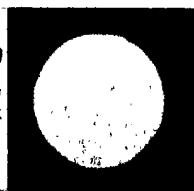
পরিমাপের জন্য
আলোকিত স্থান
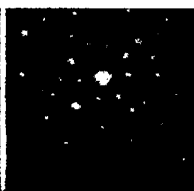
দীপ্তিময় তারকামণ্ডলী
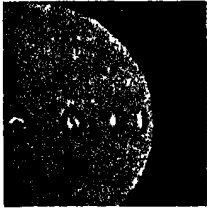
সৌর কলঙ্ক

থিয়োডোলাইট

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ

যাম্যোত্তর গমন
কোন স্থানের যাম্যোত্তর
বৃত্তের উপর দিয়া কোন
জ্যোতিষ্কের গমন

বিষুবরেখা

নাড়ীমণ্ডল দর্শক
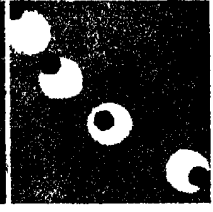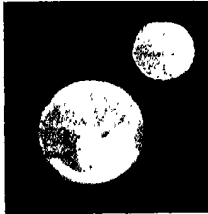
নেত্রতাল
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যে কাচখণ্ড
চক্ষুর নিকটে থাকে

যামমণ্ডলস্থ বিন্দু

উল্কাপিণ্ড- অনলশিখা

উল্কাবর্ষণ
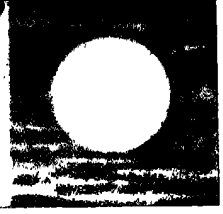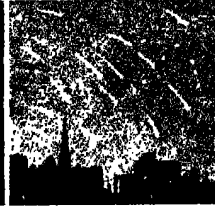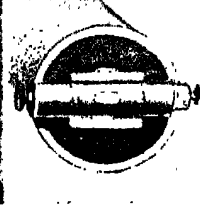
মাইক্রোমিটার
দূরবীক্ষণের সংলগ্ন একটি যন্ত্র
ইহার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদির
দূরত্ব মাপা যায়
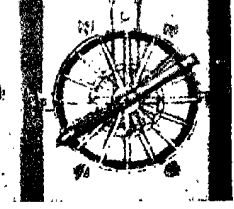
মুরোল গোলক
গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব
মাপক যন্ত্র

সূর্যশিখা

সপ্তবঞ্জন

কুণ্ডলিত নীহারিকা
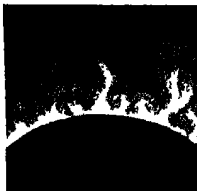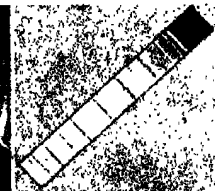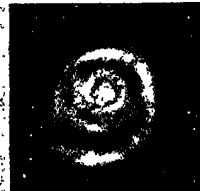
নক্ষত্রপুঞ্জ

বহুদূর চলিয়া গেলেন। এখনও বৃন্দাবনের পাণ্ডারা বাঙ্গলায় রচিত এই দুইটি চরণ আবৃত্তি করিয়া থাকে—

"ধন্য ধন্য মহাভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী।
যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি"॥

চুরির এই অপখ্যাতি উক্ত বিগ্রহের এখনও যায় নাই—এখনও রেমুনার গোপীনাথ "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ" নামে পরিচিত। পুরী হইতে চন্দন লইয়া মাধবেন্দ্র বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীপর্ব্বতে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রের ভক্তি অসাধারণ—আকাশে মেঘোদয় হইলেই তিনি কৃষ্ণ-ভ্রমে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

"মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘদর্শন মাত্রে হয় অচেতন।"

এই মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত শ্লোকগুলি চৈতন্য আগ্রহ সহকারে আবৃত্তি করিতেন। তন্মধ্যে একটি শ্লোক "অয়ি দীন-দয়ার্দ্র-নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্"—চৈতন্যের অতি প্রিয় ছিল; তিনি বলিতেন, "এই শ্লোকচন্দ্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচনা করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনি উপলব্ধ হয়।

রত্নগণমধ্যে শোভে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে এই শ্লোক গণি।"
(চৈ, চ, মধ্য ৪র্থ পঃ)

এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সাশ্রুনেত্রে গদগদকণ্ঠে শুধু—"অয়ি দীন, অয়ি দীন' বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন নাই, পুনরায় সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন। নিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর মাধবেন্দ্রের ভক্তি দর্শনে বলিয়াছিলেন,—"যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি তাহার সর্ব্বপ্রধান এই মাধবেন্দ্র-পুরীসঙ্গমস্থান, তুমি সর্ব্বতীর্থের সার, যে হেতু তোমার মধ্যে যেরূপ আর কোথাও এরূপ কৃষ্ণভক্তির বিকাশ দেখিতে পাই না।

তীর্থগুলি পড়িয়া আছে—সিংহাসন শূন্য, কোথাও ঠাকুরকে পাইলাম না। "তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন কেহ বলিতেছেন, "তুমি গৌড়ে ফিরিয়া যাও, সেইখানে কৃষ্ণের দর্শন পাইবে, নবদ্বীপে তাঁহার লীলা দেখিবে।" এই বাণী কোন দুজ্ঞেয় অলক্ষ্য শক্তিতে তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী টানিয়া আনিয়াছিল।

মাধবেন্দ্রপুরীই ভক্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—ইঁহার উপাধি ছিল "ভক্তিচন্দ্রোদয়"। তিনি মহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্ব্বে বা পরে স্বর্গগত হন, অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে **অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ, কেশবভারতী ও ঈশ্বরপুরী** প্রধান। এই বৈষ্ণবচক্রই শেষে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াছিল।

অদ্বৈতাচার্য্য

শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর নগরে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্য হইতে ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন। **রাজা গণেশের** প্রধান মন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। শান্তিপুরের শাস্ত্যাচার্য্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট পাঠ সম্পন্ন করিয়া ইনি শান্তিপুরেই উপনিবিষ্ট হন। ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে ইঁহার রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকার নাম ছিল **'উপকারিকা'**। ইঁহার দুই স্ত্রী সীতা ও শ্রী বৈষ্ণব সমাজে সুবিদিতা। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য একবার শান্তিপুরে ইঁহার বাড়ীতে যাইয়া 'উপকারিকায়' দশ দিন আথিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, যখন তিনি শান্তিপুর ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "তুমি নিজেই যদি এইরূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বৃদ্ধা মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?" অদ্বৈতের টোলে বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের নানা স্থান হইতে ছাত্র পড়িতে আসিত। 'অদ্বৈতাচার্য্য' তাঁহার উপাধি, নাম ছিল—কমলাকর ভট্টাচার্য্য। শান্তিপুরে অদ্বৈতের বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। ১৪৩৪ খৃঃ অঃ ইঁহার জন্ম এবং ইঁহার মৃত্যু ১৫৮৪ খৃঃ অঃ ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

গ্রীস—এথেন্স

২৫৩৩ পৃষ্ঠার পর

ক্লিস্থিনিস্—হিপ্পিয়াসের এথেন্স্ ত্যাগের পর আবার দেশে আত্মকলহ জাগিয়া উঠিল। সমুদ্রকূলের নেতা ক্লিস্থিনিসের সঙ্গে সমতলভূমির নেতা আইসাগোরাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ক্লিস্থিনিসের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আইসাগোরাস্ নিরুপায় হইয়া স্পার্টার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। স্পার্টার রাজা ক্লিওমিনিস্ (Cleomenes) সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যে আসিলে ক্লিস্থিনিস্ তাঁহাকে কোনরূপ বাধা না দিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণ বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতিতে ক্ষেপিয়া গিয়া ক্লিওমিনিস্ ও আইসাগোরাস্‌কে অবরোধ করিল ও অবিলম্বে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিল। তখন ক্লিস্থিনিস্ দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।
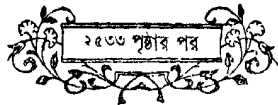
ক্লিস্থিনিস্ দেখিলেন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সোলোনের শাসনপদ্ধতির আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন। যে ভাবেই হউক বড় বড় বংশ (Clan) ও স্থানীয় দলের প্রভাব খর্ব্ব করিতে হইবে। এই বংশগুলি এক একটি গোষ্ঠির (Tribe) অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সাধারণতঃ তাহারা দেশের কোন বিশেষ স্থানে বাস করিত। গোষ্ঠিগুলির হাতে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকাতে তাহারা সমগ্র দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কোন বিশেষ বংশ অথবা কোন বিশেষ স্থানের অধিবাসীদের সুবিধা ও প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইত। ফলে আত্মবিরোধ ও দলাদলি দেশে লাগিয়াই থাকিত; এবং তাহার সুযোগ লইয়া স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (Tyranny) প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিত। এইভাবে দেশ দিন দিন ধ্বংসের দিকেই যাইতেছিল।

শাসনভার হাতে লইয়া ক্লিস্থিনিস্ সর্ব্বাগ্রে পুরাতন চারিটী গোষ্ঠিই তুলিয়া দিলেন এবং তাহার স্থানে দশটি কৃত্রিম গোষ্ঠি সৃষ্টি করিলেন। এই নূতন গোষ্ঠীগুলি এমন ভাবে গড়িলেন যে প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই বিভিন্নবংশের ও বিভিন্ন স্থানের লোক রহিল। কাজেই গোষ্ঠীগুলিতে আর কোন বিশেষ বংশ অথবা বিশেষ স্থানের প্রতিপত্তি রহিল না। তাহারা এখন হইতে বংশবিশেষের অথবা স্থানবিশেষের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া সমগ্র দেশেরই কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবে। বংশগুলিও ছত্রভঙ্গ হইয়া আর নিজেদের স্বার্থ অথবা প্রভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে না। এইভাবে ক্লিস্থিনিস্ তাঁহার

স্বদেশকে আত্মকলহ ও অরাজকতা হইতে মুক্ত করিলেন। এই খানেই তাঁহার চরম কৃতিত্ব।

বিজয়া দেবী

সোলোন এরিওপেগাস্ সভার (Council of Areopagus) হাত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লইয়া বুলে (Boule) নামে ৪০০ সভ্যের একটী নূতন সভার হাতে ন্যস্ত করেন। এই সভায় প্রত্যেক গোষ্ঠী হইতে ১০০ সভ্য লওয়া হইত। এই সভ্যদের গোষ্ঠীর লোকেরা মনোনীত করিত। খুব সম্ভব এই মনোনয়ন ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া করা হইত। তবে থীট্‌সরা মনোনীত হইতে পারিত না। ক্লিস্থিনিস্ বুলের সভ্যসংখ্যা বাড়াইয়া ৫০০ করেন। প্রত্যেক গোষ্ঠী হইতে ৫০ জন সভ্য লওয়া হইত। ভাগ্য পরীক্ষা-দ্বারা সভ্যদের মনোনীত করা হইত।

এই ৫০০ সভ্যের সভার হাতে শাসন-সংক্রান্ত চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়। শাসন ব্যাপারে আর্কণ প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেটদের বুলের নির্দ্দেশমত কাজ করিতে হইত। শুধু শাসন ব্যাপারেই নয় আইন প্রণয়নে ও বুলের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। বুলে সভায় পূর্ব্বে আলোচনা না করিয়া কোন প্রস্তাবই ইক্লেশিয়াতে (Ecclesis জনসভা) উত্থাপন করা যাইত না। কোন কোন ব্যাপারে এই সভার বিচার করিবার ও অধিকার ছিল। কর্ম্মচারীদের বিচার বুলে অথবা ইক্লেশিয়াতে হইত।

ক্লিস্থিনিস্‌কে অষ্ট্রাকিসম্ (Ostracism) নামে একটী অদ্ভুত শাসনবিধির প্রণেতা বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল ক্ষমতাশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে দশবৎসরের জন্য দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া অন্তর্বিপ্লব ও স্বৈরাচার হইতে দেশকে রক্ষা করা। প্রত্যেক বৎসর ষষ্ঠমাসে (দশমাসে এথেনীয়দের বৎসর হইত। ইক্লেশিয়ায় আলোচনা হইত অষ্ট্রাকিসমের প্রয়োজন আছে কি না। জনসভা যদি সিদ্ধান্ত করিত যে কোন ব্যক্তি অত্যধিক শক্তিশালী হওয়াতে অথবা কোন দুই ব্যক্তির দ্বন্দ্বে দেশের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে তখন অষ্ট্রাকিসমের একটি তারিখ স্থির করা হইত। নির্দ্দিষ্ট দিনে নাগরিকেরা প্রত্যেকে ঝিনুকের খোলসে অথবা খোলার উপর যাহার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ তাহার নাম লিখিয়া একটী পাত্রের মধ্যে ফেলিয়া দিত। যদি অন্ততঃ পক্ষে ৬০০০ লোক এইভাবে মত প্রকাশ করিত তাহা হইলে যাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট হইত তাহাকে দশ

বাদ্যযন্ত্র হস্তে প্রাচীন গ্রীসের কবি

দিনের মধ্যে অ্যাটিকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইত এবং দশবৎসরের মধ্যে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে

পারিত না। ইহাকেই অষ্ট্রাকিস্‌ম্‌ বলা হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এথেন্সের প্রায় অধিকাংশ বিখ্যাত লোকই কখন না কখন এইভাবে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

পারসিকদের আক্রমণ

তোমরা আগেই পড়িয়াছ যে গ্রীকেরা খুবই সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষ ছিল। অতি প্রাচীনকালেই তাহারা নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এসিয়ামাইনরের সাগরকূলে ও ঈজীয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে তাহারা এত গুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে প্রকৃতপক্ষে এই অংশকে গ্রীসের অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করা হইত। এসিয়ামাইনরের গ্রীক রাজ্যগুলি কিন্তু বেশী দিন তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন বিদেশী শক্তির কাছে পদানত হইতে হইয়াছে। প্রথমে তাহারা লিডিয়ার রাজা ক্রীসাসের (Lydian King Croesus) বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তারপর পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুরুশ (Cyrus) ক্রীসাসকে পরাজিত করিয়া লিডিয়া অধিকার করিলে তাঁহার সেনা হরপাগাস্‌ এসিয়ামাইনরের গ্রীকরাজ্যগুলি জয় করিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে আনয়ন করেন। গ্রীকরাজ্যগুলির সঙ্গে এই সর্ত্ত করা হইল যে তাহারা পারস্যরাজকে নিয়মিত ভাবে কর দিবে এবং প্রয়োজনমত সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবে।

কুরুশের পর পারস্য সাম্রাজ্যের রাজা হন কম্বুজীয় (Cambyses)। কম্বুজিয়য়ের মৃত্যুর পর বিস্তস্পের পুত্র দারয়বৌস (Darius) পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি থে্রস অধিকার করিতে মনস্থ করেন। স্যামস্‌দ্বীপের একজন শিল্পী বস্ফরাস-প্রণালীর উপর একটী নৌসেতু তৈয়ারী করে। দারয়াবৌসের সৈন্যেরা এই সেতুর উপর দিয়া ইউরোপে পদার্পণ করে। এসিয়ামাইনরের গ্রীকরাজ্যগুলি অনেক যুদ্ধজাহাজ তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করে। তিনি ক্রমাগত উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং ড্যানিউব নদী পার হইয়া সিথিয়া (Scythia) আক্রমণ করেন। তারপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গ্রীক-ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্‌ বলেন যে দারয়বৌস সিথিয়ায় ভীষণভাবে পরাজিত হন; এবং অল্পের জন্য প্রাণ নিয়া পলাইতে সক্ষম হন। সে যাহা হউক দারয়বৌস মেগাবাজাজ নামে একজন সেনাপতিকে থ্রেস জয় করিবার জন্য রাখিয়া আসেন। তিনি থ্রেসদেশে পারস্যরাজার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ম্যাকিদনিয়াও (Macedonia) পারস্যের অধীনতা স্বীকার করে।

সেকালের গ্রীক যোদ্ধা—খৃঃ পূঃ ৫৩০

ইহার বারো বৎসর পরে মিলেটাসের (Miletus) শাসনকর্ত্তা অ্যারিষ্টগোরাসের (Aristagorus) নেতৃত্বে এসিয়ামাইনরের গ্রীক রাজ্যগুলি বিদ্রোহ করে। অ্যারিষ্টগোরাস্ স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফলকাম হইয়া এথেন্সের দ্বারস্থ হন। এথেন্স ও ইউবিয়া দ্বীপের এরিট্রিয়া (Eritria) রাজ্য তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে পারস্য-সৈন্য মিলেটাস্ অবরোধ করে। সুতরাং অ্যারিষ্টগোরাস মিত্রসৈন্য লইয়া এসিয়ামাইনরের রাজধানী সার্ডিস্ আক্রমণ করেন ও বিনা আয়াসে অধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু হঠাৎ আগুন লাগিয়া নগরটী ভস্মীভূত হওয়াতে গ্রীকসৈন্যেরা সেইস্থান ত্যাগ করে। পথে পারস্যরাজ্যের সৈন্যদের সঙ্গে এফেসাসের (Ephesus) সন্নিকটে তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসে।

সার্ডিসের ভস্মের কথা শুনিয়া দারয়বৌস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার রাগ পড়িল বিশেষ ভাবে এথেন্সের উপর। ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি ধনুকে শরসন্ধান করিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাইলেন, "প্রভো! সহায় হও, আমি যেন এথেনীয়দের উপর প্রতিশোধ লইতে পারি।" একজন ভৃত্যকে আদেশ দেওয়া হইল সে যেন প্রতিদিন আহারের সময় তিন বার করিয়া বলে, "মহারাজ এথেনীয়দের কথা মনে রাখিবেন।"

এসিয়ামাইনরের গ্রীকদের বিদ্রোহ দারয়বৌস অতি সহজেই দমন করিলেন। তারপর তিনি জামাতা মার্দনিয়াসকে (Mardonius) গ্রীস অধিকার করিতে পাঠান। মার্দনিয়াস থ্রেস ও ম্যাকিদনিয়া সহজেই পদানত করেন। কিন্তু এথস্ অন্তরীপের নিকট তাঁহার যুদ্ধ জাহাজগুলি ঝড়ে ধ্বংস হওয়াতে দেশে ফিরিতে বাধ্য হন। দারয়বৌস কিন্তু মোটেই দমিলেন না। দুই বৎসর পর তিনি পুনরায় দতিস্ (Datis) ও আর্তাফার্নেসের (Artaphernes) অধীনে নূতন অভিযান প্রেরণ করেন। এইবার পারস্যের যুদ্ধপোত গুলি সোজা সাগর পাড়ি দিয়া অ্যাটিকার দিকে অগ্রসর হইল। পথে গ্রীকদ্বীপগুলি তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিল। এইভাবে তাহারা ইউবিয়া দ্বীপে পদার্পণ করিয়া ইরেট্রিয়া রাজ্য অধিকার করিল। ইহার পর পারস্যের সৈন্য ইউবিয়া ও গ্রীসের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী পার হইয়া মারাথানে পদার্পণ করিল (দ্রঃ পৃঃ ৪৯০)।

সিথিয়ার যুদ্ধ দৃশ্য

এদিকে গ্রীকেরাও চুপ করিয়া বসিয়াছিল না। ইতিমধ্যে পারস্যরাজের দূত গ্রীকরাজ্যগুলিতে আসিয়া বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ মৃত্তিকা ও জল দাবী করে। অধিকাংশ গ্রীকরাজ্যই এতদূর ভীত হইয়াছিল যে বিনা প্রতিবাদে পারস্যের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু স্পার্টাও এথেন্স ঘৃণাভরে এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে। কথিত আছে এথেনীয়েরা পারস্যরাজার দূতকে একটা গভীর খাদে নিক্ষেপ করে ও স্পার্টানরা তাহাকে একটী কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেখান হইতে

জল ও মৃত্তিকা লইতে বলে। তারপর তাহারা পারসিকদের বাধা প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। ইরেট্রিয়ার পতনের সংবাদ পাইবা মাত্র এথেন্সের লোকেরা একজন দ্রুতগামী পত্র-বাহীকে স্পার্টায় সাহায্য প্রেরণের জন্য পাঠায়। স্পার্টানরা কিন্তু বলিয়া পাঠায় যে তাহারা সাহায্য পাঠাইতে বাধ্য এবং নিশ্চয়ই অবিলম্বে সাহায্য পাঠাইত—তবে পূর্ণিমা না পার হইলে তাহারা সৈন্য প্রেরণ করিয়া অধর্ম্ম করিতে পারে না।

ইতিমধ্যে এথেনীয়েরা পারসিকদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য মারাথনের দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ক্যালিমেকাস্ (Callimachus) এবং তাঁহার অধীনে আরও দশজন সেনাপতি ছিলেন। এই সেনাপতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও কৌশলী ছিলেন মিলটিয়াডিস্ (Miltides) সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার হাতেই সৈন্যচালনার ভার দেওয়া হয়। স্পার্টার উত্তর শুনিয়া এথেনীয়েরা যদিও অনেকটা দমিয়া গিয়াছিল, মিলটাইডিস তাহাদিগের প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় প্লেটিয়ারাজ্য হইতে একদল সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থে আসে।

মারাথনের যুদ্ধ গ্রীক ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কাহিনী। পারস্যরাজের সৈন্যেরা গ্রীকদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। ছত্রভঙ্গ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা তাহাদের জাহাজে আশ্রয় লয়। যুদ্ধপোতগুলি এথেন্সের অভিমুখে রওনা হয় উদ্দেশ্য অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া এথেন্স দখল করা। কিন্তু এথেনীয়বীরেরা ইতিমধ্যে এথেন্সে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নগররক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিয়া পারসিকেরা আর এথেন্স আক্রমণ না করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এবারকার মতন গ্রীস পারস্যরাজের হাত হইতে নিস্তার পায়।

মারাথন যুদ্ধের ফলে গ্রীস সাময়িক ভাবে পারস্যের হাত হইতে নিস্তার পায়। দারয়বৌস কিন্তু কিছুতেই দমিলেন না। গ্রীস জয় করিবার জন্য পুনরায় তিনি অভিযান পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রীকদেবী—দিমেতার বা জননী পৃথিবী

এই সময়ে গ্রীসে ঈজিনা (Aegina) ছিল নৌশক্তিতে সব চাইতে বড়। তাহার সঙ্গে এথেন্সের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। নানা কারণে এই দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ঈজিনার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে হইলে এথেন্সের দরকার নৌশক্তি বৃদ্ধি করা। কাজেই থেমিষ্টক্লিসের (Themistocles) পরামর্শে অনেক নূতন যুদ্ধের জাহাজ তৈয়ারী করা হইল।

কোর্-আন

হজ্
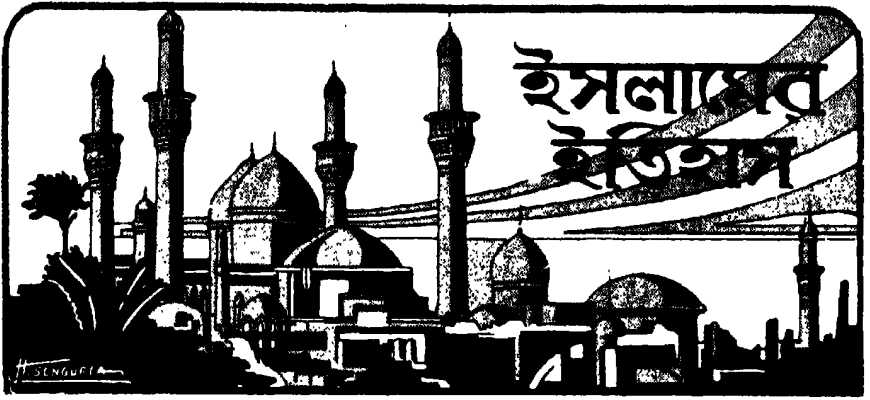
হজ শব্দের অর্থ তীর্থ। আল্লাহ্ কোরআনে বলিয়াছেন "যে ব্যক্তির হজে যাইবার সঙ্গতি আছে, তাহার পক্ষে হজ্ অবশ্য কর্ত্তব্য।"

২৪৭২ পৃষ্ঠার পর

ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাচীন কীর্ত্তি ও স্মৃতি গুলি পরিদর্শন করাকেই **তীর্থ** বলা হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মই তীর্থ দর্শনকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

আরব দেশে মক্কা ও মদীনা নামে দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এই দুইটী স্থানই হজরৎ মোহাম্মদের জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র। মক্কায় তাঁহার জন্ম হয় মদীনায় মৃত্যু হয়।

মক্কা শরীফে **'কাবা'** নামে একটী বহু প্রাচীন উপাসনাগৃহ আছে। এই গৃহকে বয়তুল্লাহ্ বা আল্লার ঘর বলা হয়।

মক্কার পূর্ব্বদিকে প্রায় ১২ মাইল দূরে 'আরাফা' (Arafa) নামক একটী প্রান্তর আছে। এই প্রান্তরে নমাজ পড়া এবং কাবার ঘরে নমাজ পড়া ও তোয়াফ (প্রদক্ষিণ) করাকেই সাধারণতঃ হজ্ বলা হয়।

তোমরা জান কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। সুতরাং কাবার ঘরে ও আরাফার মাঠে নামাজ পড়া মোছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য কেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদের অবশ্যই কৌতূহল হইতেছে।

তোমরা আদি মানব হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়ার কথা শুনিয়াছ। কোর-আন বলিতেছে "যখন আল্লাহ্ তাঁহার ফেরেস্তা (দূত) গণকে বলিলেন 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি স্থাপন করিব' তখন ফেরেস্তাগণ বলিলেন 'যে পৃথিবীতে ঝগড়া বিবাদ করিবে, রক্তপাত করিবে, আপনি তাহাকে পৃথিবীতে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? আমরাই আপনার গুণগান ও প্রশংসা করিব। তখন আল্লাহ্ বলিলেন 'আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।' এই বলিয়া তিনি আদমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে কতক গুলি দ্রব্যের নাম শিখাইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'তুমিও তোমার স্ত্রী স্বর্গে অবস্থান কর, এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই ভক্ষণ কর, কিন্তু 'এই' বৃক্ষের নিকট যাইও না; তাহা হইলে তোমাদের অধঃপতন হইবে।'

কিন্তু মানুষের পরম শত্রু শয়তান সর্পের আকার ধারণ করিয়া ময়ূরের সহায়তায় স্বর্গে প্রবেশ করিয়া বিবি হাওয়াকে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার জন্য নানারূপ প্রলোভন দিতে লাগিল। বিবি হাওয়া শয়তানের স্তোক বাক্যে ভুলিয়া সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল নিজেও ভক্ষণ করিলেন, স্বামী আদমকেও খাওইয়ালেন। যেমন তাঁহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন অমনি তাঁহাদের চক্ষুতে লজ্জা দেখা দিল। এতদিন তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় রহিয়াছেন; কিন্তু এখন জ্ঞান-চক্ষু ফুটিল, আর অসহনীয় হইয়া উঠিল। তখন একে অন্যের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

একদিন হজরৎ আদম বর্ত্তমান মক্কা নগরীর পূর্ব্ব দিকের এক প্রান্তরে উপনীত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া স্বীয় কৃতাপরাধের জন্য এই বলিয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজ আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তুমি যদি ক্ষমা না কর, তুমি যদি দয়া না কর, তাহা হইলে আমাদের আর উদ্ধার নাই।" প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া পরম দয়ালু
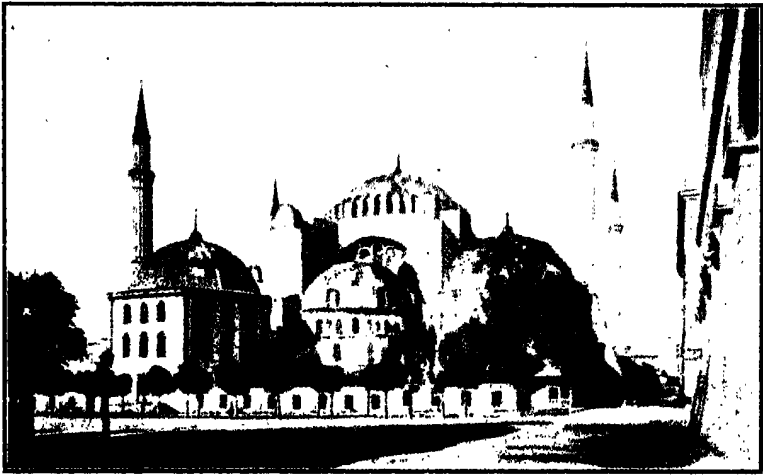
তুরস্কের একটি প্রধান মসজিদ (পূর্ব্বে সেণ্ট সোফিয়া নামে খৃষ্টানদের গীর্জ্জা ছিল)

সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই নিজ নিজ লজ্জা নিবারণের জন্য বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে বলিলেন 'আমি ত পূর্ব্বেই তোমাদিগকে 'এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছি। এখন তোমরা আর স্বর্গে স্থান পাইবে না। তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন কর।' এই বলিয়া তাঁহা-দিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলেন। আদেশমাত্র স্বামী স্ত্রী উভয়ে বিভিন্ন দিকে বিতাড়িত হইলেন।

কিছুদিন পর্য্যন্ত কেহই কাহারও কোন খোঁজ পাইলেন না। ক্রমে এই বিচ্ছেদ উভয়েরই মনেই আল্লাহ্ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। এই জন্য আজিও এই পাহাড়ের নাম **'জবল রহমৎ'** বা দয়ার পাহাড়। এখনও হাজীগণ এই পাহাড়ে স্বীয় পাপের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

এ দিকে বিবি হাওয়া স্বামীর অন্বেষণে পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বর্ত্তমান লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী একস্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম **'জেদ্দা'**। জেদ্দা শব্দের অর্থ পিতামহী। তিনি সর্ব্ব প্রথমে এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন এবং উত্তর কালে তাঁহার মৃত দেহ এই স্থানেই সমাহিত

করা হয়। আজিও এই স্থানে তাঁহার কবর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত এই স্থানকে **জেদ্দা বা পিতামহীর স্থান** বলা হয়।

বিবি হাওয়া স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া যে স্থানে হজরৎ আদম উপাসনারত ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। হজরৎ আদম, বহুদিন পরে সহধর্ম্মিণীর দর্শন পাইয়া আবেগ ভরে পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত-নিম্নস্থ প্রান্তরে উভয়ের পুনর্মিলন হইল। এই পুনর্মিলনের জন্য এই স্থানের নাম **'আরাফা'** (Arafa) হইল। আরাফা (Arafa) শব্দের অর্থ পরিচয় বা মিলন [illegible]দি পিতা হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়ার এই পবিত্র মিলন ক্ষেত্রে আজিও তাহাদের বংশধরগণ হজ্ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং যে 'দয়ার পাহাড়ে' আদি পিতা স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তথায় স্বীয় পাপের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

আশাতীত ভাবে উভয়ের পুনর্মিলনে এবং পাপের ক্ষমা লাভ করিয়া উভয়ের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। সুতরাং দয়াময়ের এই অসীম দয়ার প্রতিদানস্বরূপ, হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয় স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনের এই গোপন বাসনা অন্তর্য্যামীর অবিদিত রহিল না। মক্কায় উপাসনা গৃহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এবং নির্দ্দেশানুযায়ী চারিদিকে সামান্য প্রাচীর দিয়া একটী [illegible] নির্ম্মাণ করতঃ উভয়ে তাহাতেই হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল ; কিন্তু বনের ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আর কত দিন চলিবে ? সুতরাং অচিরেই জীবিকার জন্য উভয়ে চিন্তিত হইলেন। কিন্তু যে স্থানে আল্লার এই অপার করুণা লাভ করিলেন, সেস্থান ছাড়িয়া মন অন্যত্র যাইতে চাহিল না। তথাপি জীবিকার তাড়নায় খাদ্যান্বেষণে তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হইল। এইরূপে ক্রমে তাঁহারা মক্কার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরেই এ স্থানও জীবিকার অযোগ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং কালক্রমে তাঁহারা মক্কার উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এক অতি উর্ব্বর স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানে জীবিকা অত্যন্ত সুলভ দেখিয়া ক্রমে তাঁহারা তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ এবং কৃষি-কার্য্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এইরূপে উভয়ে এই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই সেই পূর্ব্ব স্মৃতি— সেই বিচ্ছেদ ও মিলনের কথা—মনে হইত, তখনই কৃতজ্ঞতাসিক্ত হৃদয়ে উভয়ে সেই 'আরাফার' মাঠে গমন করিতেন ; সেই দয়ার পাহাড়ের উপরে উঠিয়া স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন ; এবং কাবা গৃহে আসিয়া তোয়াফ ও উপাসনা করিতেন।

এই বাবিলনের সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিতে করিতে ক্রমে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মাতাপিতার অনুকরণে সন্তান-সন্ততিগণও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই 'আরাফার' মাঠে, সেই দয়ার পাহাড়ে, সেই কাবার ঘরে এক আল্লার উপাসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইহা তাঁহাদের কুল প্রথায় পরিণত হইল। তাঁহাদের এই তীর্থ পর্য্যটনকেই হজ্ বলা হয়।

চান্দ্র বৎসরের শেষ মাসের নাম **জুলহজ্** অর্থাৎ হজের মাস। প্রতি বৎসর এই মাসের প্রথম ভাগে আরবের অধিবাসিগণ হজরৎ মোহাম্মদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই হজকে তাঁহাদের জাতীয় মহাপর্ব্ব মনে করিয়া বংশানুক্রমে মহাড়ম্বরে হজ ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। হজরৎ মোহাম্মদের পূর্ব্বে আরব জাতি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও বর্ব্বর ছিল। মারামারি কাটাকাটি তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। অথচ এই মাসকে তাহারা এত পবিত্র মনে করিত যে, এই মাসে সমস্ত হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া শোণিতপাতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিত। জুলহজ মাসের ৯ই তারিখে এখনও সেই আরাফার মাঠে এই হজ্ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যে স্থানে মানবের আদি পিতা ও আদি মাতার পবিত্র মিলন হইয়াছিল, সেই স্থানে আজিও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ স্থানগত, বর্ণগত বিভিন্নতা ভুলিয়া, সাগরাদির দূরত্ব মুছিয়া, আপনা-

দিগকে এক পিতামাতার ঔরসজাত সহোদর ভ্রাতা মনে করিয়া, বুকে বুকে, প্রাণে প্রাণে মিলিবে ইহা মানব মাত্রেরই কাম্য। সুতরাং এই স্থান মানব মাত্রেরই তীর্থ। কোর্‌আন বলিয়াছে "প্রত্যেক বিশ্বাসী-ব্যক্তিই একে অপরের ভাই।" এইজন্য বিশ্বের প্রত্যেক দেশের মোছলমানই নিজের মাতৃভূমি অপেক্ষা যে দেশে তাঁহাদের আদি পিতা-মাতার পুণ্যস্মৃতি আজিও বক্ষে ধারণ করিতেছে, সেই পবিত্র দেশকেই অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহাতে সংকীর্ণতা নাই, আছে সীমাহীন উদারতা; ইহাতে স্বার্থের পূতিগন্ধ নাই, আছে স্বার্থহীনতার ভুবনমোহন স্বর্গীয় সৌরভ; ইহাতে স্বদেশদ্রোহিতা নাই, আছে বিশ্বপ্রেমের শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ মলয় বাতাস।

মক্কার প্রাচীন নাম **বাক্কা**। কোর-আনে এই নামেই উহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। এই বাক্কা নগরীর যে উপাসনা গৃহ, মানব সভ্যতার প্রাককালে আদি মানব হজরৎ আদম তাহার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহাতেই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্ত্তা, নিরাকার নির্বিকার সর্ব্ব-শক্তিমান, পরাৎপর একমাত্র আল্লার উপাসনা করিতেন। আল্লা কোর-আনে বলিয়াছেন "নিশ্চয় বাক্কাস্থিত গৃহটী মানবের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রথম উপাসনা গৃহ। ইহা অতি পবিত্র এবং মানবজাতির পথ প্রদর্শক।" তোমরা বড় হইয়া (William Muir) সাহেবের লিখিত "হজরৎ মোহাম্মদের জীবনী" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে দেখিবে তিনি ও ইহাকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উপাসনা গৃহ বলিয়াছেন। এখন পৃথিবীর এই প্রাচীনতম উপাসনা গৃহের ইতিবৃত্ত অবগত হইতে নিশ্চয় তোমাদের কৌতূহল হইতেছে।

কাবার ইতিহাস

হজরৎ আদম, বিভুনির্দ্দিষ্ট স্থানে, প্রথমে কাদার লেপ দিয়া পাথরের দেওয়াল গাঁথিয়া উহাতেই উপাসনা করিতেন। ইহাই গৃহশিল্পের প্রথম আদর্শ। সুতরাং আধুনিক কালের গৃহের ন্যায় উহা সুন্দর ছিল না। উহা তখন ছাদবিহীন এবং চার হাতের অনধিক উচ্চ ছিল। ইহাতেই তিনি এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ এক আল্লার উপাসনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র **শীষ** উহার সংস্কার করেন। এবং তাঁহার বংশধরগণ বহুযুগ ধরিয়া উহাতে পিতৃপ্রদর্শিত প্রথানুযায়ী একেশ্বর-বাদের উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর হজরৎ ইদ্রিস (Enoch) উহার পুনঃসংস্কার করেন। হজরৎ ইদ্রিসের মৃত্যুর পর জাতি আবার অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া নানা পাপাচার আরম্ভ করিলে, **হজরৎ নূহের** সময় যে মহাপ্লাবন উপস্থিত হয় তাহাতে ঐ ঘর ধসিয়া যায়। এবং বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই থাকে। কিন্তু তথাকার অধিবাসিগণ পূর্ব্বপুরুষদের আচরণ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা ঐ ধ্বংস স্তূপের নিকট আসিয়া চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বৎসরান্তে মহা সমারোহে হজক্রিয়া উদযাপন করিয়া যাইত। কিন্তু এখন হজ ক্রিয়ার মধ্যে ইস্লামের সাত্ত্বিক ভাবের পরিবর্ত্তে পৌত্তলিকতার তামসিক ভাবের প্রাবল্য দেখা দিয়াছিল।

হজরৎ নূহের প্লাবনের প্রায় ৩৭০৯ বৎসর পরে পুনরায় আল্লার আদেশে হজরৎ এব্রাহিম তৎপুত্র ইছমাইলের সহায়তায় নিকটবর্ত্তী ছাফা ও মারোয়া পর্ব্বতদ্বয়ের প্রস্তর দ্বারা ঐ ধ্বংস স্তূপের উপর নূতন করিয়া উহার ভিত্তি স্থাপন করেন। খৃঃ পূঃ ১৯১০ অব্দে **হজরৎ ইছমাইলের** জন্ম হয়। সুতরাং কাবার এই সংস্কার কার্য্য সমাধা হইয়াছিল খৃষ্ট পূর্ব্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তিনি আল্লার আদেশে নিকটস্থ **'আবুকোবেছ'** পর্ব্বত হইতে একখণ্ড প্রস্তর আনিয়া কাবাগৃহের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে স্থাপিত করেন। ইহাকে **'হাজারল আছওয়াদ'** বা কৃষ্ণপ্রস্তর বলা হয়। হজরৎ এব্রাহিমের সময়ের তথাকার অধিবাসিগণ অর্দ্ধসভ্য ছিল। হজের সময় তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে বর্ব্বরের ন্যায় কাবার তোয়াফ (Towaf) করিত। এই উচ্ছৃঙ্খল বর্ব্বরতার অপনোদন মানসে তাঁহার সময় হইতে, তোয়াফের সময় এই হাজারল আছওয়াদ প্রস্তরকে চুম্বন করিয়া দক্ষিণ হইতে বাম দিকে সাত বার কাবার তোয়াফ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এই নিয়ম শৃঙ্খলার দ্বারা সেই বর্ব্বর প্রথার পরিবর্ত্তে সভ্যজনোচিত সাত্ত্বিক ভাবের

উপাসনা পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। এখনও মক্কার তীর্থযাত্রিগণ হজরৎ ইব্রাহিম প্রবর্ত্তিত এই নব বিধানানুযায়ী 'তাবাফ' সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

হজরৎ ইব্রাহিম কর্ত্তৃক বিবি হাজেরা ও হজরৎ ইছমাইলের নির্ব্বাসনের কথা পরে তোমরা জানিতে পারিবে। এই নির্ব্বাসনের কিছুদিন পর হজরৎ ইব্রাহিম একদিন পুত্র দর্শন মানসে কেনান হইতে মক্কায় গমন করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন কিন্তু প্রথমা স্ত্রী 'ছারা' তাঁহাকে বলিলেন "স্বামিন্ আপনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করুন কিন্তু তথায় গিয়া মৃত্তিকায় অবতরণ করিবেন না। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবেন। হজরৎ ইব্রাহিম স্ত্রীর কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হজরৎ ইব্রাহিম মক্কায় উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পর স্বামীমুখ দর্শন করিয়া স্বামীগতপ্রাণা সতীর হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে বলিলেন কিন্তু হজরৎ ইব্রাহিম স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। স্বামীভক্ত হাজেরা স্বামীর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আর জেদ করিলেন না; বরং তাঁহার পদতলে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করিয়া তাঁহাকে তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণিক বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। হজরৎ ইব্রাহিম তাহাই করিলেন। পরবর্ত্তীকালে কাবা নির্ম্মাণের সময় তিনি এই প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নির্ম্মাণ শেষে তিনি ঐ প্রস্তরকে কাবা গৃহের বহির্দ্দেশে স্থাপন করিয়া তদুপরি নামাজ পড়িতেন। অদ্যাবধি ঐ প্রস্তরকে **'মাকামে ইব্রাহিম'** বা ইব্রাহিমের স্থান বলা হয়। হাজিগণ ঐ প্রস্তরের উপরে আজিও নামাজ পড়িয়া থাকেন।

ক্রমে হজরৎ ইছমাইল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পিতৃভূমি কেনানে আর ফিরিয়া গেলেন না। সেই নির্ব্বাসন স্থানে থাকিয়া কাবার তত্ত্বাবধান এবং তীর্থযাত্রিগণের নিকট আল্লার বাণী প্রচার করিয়া পুত্রপরিবারাদি সহ সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন ধরিয়া কাবার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু কালক্রমে ইছমাইল বংশীয়গণ হীনবল হইয়া পড়িলে আমালেকাগণ ঐ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া কাবার সংস্কার সাধন করেন। আমালেকগণ হীনবল হইলে জরহাম বংশীয়গণ তাহাদের নিকট হইতে কাবার কর্ত্তৃত্ব ভার কাড়িয়া লন। মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া জরহাম বংশীয়গণ আবার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন, এবং পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া মক্কাবাসিগণের উপর নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন। তখন ইছমাইল বংশীয়গণ ও কতুরাবংশীয়গণ একত্রিত হইয়া জরহাম বংশীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দলপতি ওমরের আদেশে কাবা গৃহের হাজারল আজওয়াদ নামক প্রস্তর জমজম কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহাকে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত করতঃ মক্কা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

তৎপর বহুবংশের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কাবাগৃহ অবশেষে কোরেশ বংশের হাতে আসিয়া পড়ে। এই কোরেশ বংশের স্বনামধন্য মহাপুরুষ, **হজরৎ মোহাম্মদের** পিতামহ আবদুল মোত্তালেব একদিন স্বপ্নযোগে জমজম কূপের প্রচ্ছন্নাবস্থার কথা জানিতে পারিয়া স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া জমজম কূপের উদ্ধার করতঃ হাজারল আছওয়াদ উত্তোলন করেন। আব্দুল মোত্তালেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আবদুল্লার হাতে কাবার কর্ত্তৃত্বভার আসিয়া পড়ে। হজরৎ মোহাম্মদের বয়স যখন ৩৫ বৎসর তখন এই গৃহের পুনরায় সংস্কার হয়। এবং হাজারল আছওয়াদ পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত হয়। হজরৎ ইব্রাহিম যে পর্য্যন্ত কাবার ভিত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ব্যয়সংকোচের জন্য কোরেশগণ তদপেক্ষা উহার আয়তন সাতগজ কম করেন। এই পরিত্যক্ত স্থানটিকে **'হাতিম'** বলা হয়। এখানে কাবার ঘর না থাকিলেও উহাকে পবিত্র ঘরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করা হয় এবং তোয়াফের (towaf) সময় হজরৎ ইব্রাহিমের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া এইস্থান সহতোয়াফ (towaf) করিতে হয়। হজরৎ ইব্রাহিমের সময় কাবাগৃহের উচ্চতা ৯গজ ছিল। এই সময় উহা ১৮ গজে পরিণত হয়। হজরৎ মোহাম্মদের পর তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা

(Khalifa) হজরৎ ওমর ও তৃতীয় খলিফা হজরৎ ওছমান উহার আয়তন সমধিক বৰ্দ্ধিত করতঃ উহার ছাদ নিৰ্ম্মাণ করেন। বৰ্ত্তমানে কাবার ঘরের আয়তন ৫০ × ৫৫ ফুট। কিন্তু যে উঠানের মধ্যে ইহা অবস্থিত তাহার আয়তন ৫৩০ × ৫ ফুট। ইহাকে ছোট হরম বলা হয়।

তুরস্কের ছোলতান মোরাদখানের সময় ইহার শেষ সংস্কার কার্য্য সমাধা হয়। তিনি ছিজরিতে তৎকালীন স্থাপত্যশিল্পের আদর্শরূপে এই পবিত্র গৃহের নিৰ্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। ইহার পর অন্যান্য খলিফাগণ ইহার স্বল্পবিস্তর সাময়িক সংস্কার মাত্র করিয়াছেন। এইরূপে মানব-সভ্যতার আদিকাল হইতে কালের সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির সহিত অনন্ত সংগ্রাম করিয়া, অনন্ত সভ্যতার স্মৃতি অঙ্গে মাখিয়া সেই নির্জ্জন অন্ধকারময় সুদূর অতীতের একমাত্র পথিক স্রষ্টার স্থাপিত তাঁহার আলোকবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া বৰ্ত্তমান সভ্যতার মুক্ত ময়দানে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।

পূর্ব্বে কাবার মছজিদ অনাবৃত অবস্থায় থাকিত কিন্তু তুরস্কের ছোলতান পুণ্যশ্লোক ইছমাইল বহু অর্থব্যয়ে উহার একটি মূল্যবান আবরণ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। এবং ঐ কার্য্যের বিরাট ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মিসরের অন্তর্গত একটী পরগণা ওয়াকফ (wakf) করিয়া দেন। তৎপর ছোলতান মোরাদ খানের পিতা ছোলতান ছলিমখান আরও কতিপয় মৌজা উক্ত ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইদানীং ঐ সম্পত্তির আয় হইতেই এই আবরণ নিৰ্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে আরব ও হেজাজের ছোলতান **এবনেছদউদ** স্বীয় রাজকোষ হইতে উহার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। বৎসরান্তে পুরাতন আবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে একটী নূতন আবরণ দেওয়া হয়। আবরণখানি বাস্তবিক বস্ত্রশিল্পের চরম উন্নতির নিদর্শন। উহা অতি মূল্যবান সূতার দ্বারা তৈয়ারি এবং বয়ন কৌশল এত সুন্দর ও কারুকার্য্যময় যে দর্শন করিলে শিল্পের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

কাবাগৃহে পূর্ব্বে ঝাড়ি ও একপ্রকার মাটীর বাতির ব্যবস্থা ছিল। ছোলতান **এবনেছাউদের** আমলে ইহাতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হজরৎ এবাহিমের দুই পুত্র। হজরৎ **ইছমাইল** ও হজরৎ **ইছহাক**। নির্ব্বাসনের পর হইতে হজরৎ ইছমাইল মক্কায় রহিয়া গেলেন। ওদিকে হজরৎ ইছহাক পিতৃভূমি কেনানে স্বীয় জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিলেন। হজরৎ ইছহাকের বংশে আরও বহু পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন ব্যাবিলনীয়া, মেসোপটেমিয়া, আসিরিয়া, আর্ম্মেনিয়া, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণতীরবর্ত্তী মিশর দেশে জনস্রোত উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে, সুতরাং এই সকল স্থানে ধৰ্ম্মগত অনাচার, কুসংস্কার, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। এই নিমিত্ত এই সকল স্থানে আল্লার বাণী প্রচারের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য অধিকাংশ পয়গম্বরই এই দেশগুলিকেই আপন জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইয়াছেন, দক্ষিণ দিকের দেশ গুলিতে তাঁহাদের নজর বড় একটা পড়িবার অবসর পায় নাই।

এদিকে হজরৎ ইছমাইলের বংশে প্রায় ২৫০০ বৎসর ধরিয়া কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং কাবার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান গুলিতে একেশ্বরবাদের বিমল চন্দ্র পৌত্তলিকতার তামসী মেঘের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছিল। এমন কি কাবার ঘরে একেশ্বরবাদের পরিবর্ত্তে লাৎ, মানাৎ ওজ্জা, হাবল, জাবল, ভোদ, সোয়া, ইয়াগুছ, নাছার দোয়ার প্রভৃতি অন্যূন ৩৬০টী দেবতার মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু যদিও আরবগণ পৌত্তলিকতার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া ধৰ্ম্মগত অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা পূর্ব্ব পুরুষদের চিরাচরিত প্রথা ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা পূর্ব্ব পুরুষদের মতই হজের সময় সকল স্থান হইতে সকলে মক্কায় সমবেত হইয়া মহা-সমারোহে হজক্রিয়া সম্পাদন করিত। কিন্তু তাহাদের হজ ও পূর্ব্ব পুরুষদের হজ নামতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ উহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিপরীত ভাবাপন্ন ছিল। পূর্ব্ব পুরুষদের হজ ছিল ইছলামের বিধানানুযায়ী একেশ্বরবাদের আদর্শে, আর এখন-

কার হজ হইয়াছিল নিছক পৌত্তলিকতার আদর্শে। যাহা হউক আরবগণ ইহাকে তাহাদের জাতীয় মহাপর্ব্ব এবং কাবার ঘরকে জাতীয় মহাতীর্থ স্থান মনে করিয়া তাহাকে অতি ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত।

আবিসিনিয়ার শাসনকর্ত্তা নাজ্জাসির, আবরাহা-বেন-ছাবা নামক এক কর্মচারী ইয়েমেনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ক্ষমতাগর্ব্বে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। সুতরাং কাবার এই বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতি দেখিয়া ঈর্ষার উদ্রেক হইল। তিনি তখন স্বীয় রাজধানীতে কাবা গৃহ অপেক্ষা সুন্দর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সকলকে তথায় উপাসনা করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু তাহাতে কেহই কর্ণপাত করিল না। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তিনি বৃহৎ একদল গজারোহী সৈন্য লইয়া কাবার ঘর ধ্বংস করিবার মানসে উহা আক্রমণ করিলেন। সে বিনা বাধায় মক্কায় উপনীত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ দক্ষিণ দিক হইতে বিরাট এক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখী আসিয়া তাঁহার সৈন্যের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে আবরাহার সৈন্য সামন্ত এবং হস্তিযূথ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। কাবার ঘর দৈব প্রভাবে রক্ষিত হইল। এতৎ সম্বন্ধে কোর-আনে আছে—"হে মোহাম্মদ তুমি কি শুন নাই তোমার প্রতিপালক সেই গজারোহী সৈন্য দলের সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন? তিনি কি তাহাদের সমস্ত কৌশল ভ্রান্তিতে পর্য্যবসিত করেন নাই? অতঃপর তিনি 'আবাবিল' নামক একদল ক্ষুদ্রপাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল পাখী তাহাদের উপর 'দোজ্জল' নামক পাথরের কণা নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে চর্ব্বিত তৃণের ন্যায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।"

এই ঘটনা হজরৎ মোহাম্মদের জন্মের ৫৫ দিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, এখনও আরবি সাহিত্যে এই বৎসরকে "**আম-উল্ ফিল** (Amul feel) বা হস্তীর বৎসর বলা হয়।

হজ তীর্থের অন্যতম দর্শনীয় স্থান—জমজম কূপ, ছাফা (Safa) মারওয়া পর্ব্বত, এবং মীনার কোর-বাণীর স্থান। এতৎ সম্বন্ধে জানিতে হইলে হজরৎ ইব্রাহিম ও হজরৎ ইছমাইল সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানা দরকার।

হজরৎ ইব্রাহিমের দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী ছারা। তাঁহার কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি মিশর কন্যা হাজেরাকে বিবাহ করেন। কালক্রমে এই হাজেরার গর্ভে ইছমাইল নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে প্রথমা স্ত্রী ঈর্ষান্বিতা হইয়া সপত্নীকে নির্ব্বাসিতা করিবার জন্য স্বামীকে জেদ করিতে লাগিলেন। হজরৎ ইব্রাহিমও ঐশী-প্রত্যাদেশে স্ত্রীর মনস্কামনা পূর্ণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। সুতরাং স্ত্রীর অন্যায় আবদারে আপত্তি না করিয়া শিশুপুত্র ইছমাইল সহ বিবি হাজেরাকে মক্কার নিকটবর্ত্তী এক নির্জ্জন অরণ্যে নির্ব্বাসন দিয়া আসিলেন। আজকাল অপরাধীর জেল বা মৃত্যু দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে অপরাধীর নির্ব্বাসন দণ্ড হইত। তোমরা রামায়ণের রাম ও সীতার ও মহাভারতের পাণ্ডবদের বনবাসের কথা শুনিয়াছ। হাজেরার নির্ব্বাসন ইহার প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

আরবদেশ মরুময় তাহা তোমরা জান। হিব্রু ভাষায় '**আরাবা**' শব্দের অর্থ মরুভূমি। ইহা হইতেই এই দেশের নাম আরব হইয়াছে। এ দেশে জলের সম্পূর্ণ অভাব। নির্ব্বাসনের পর শিশুপুত্রকে লইয়া দুঃখিনী হাজেরা এই জনমানবহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে গভীর দুঃখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যে খাদ্য ও পানীয় ছিল তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া মাতা জলান্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু জল পাইবেন কোথায়? নিকটবর্ত্তী ছাফা (Safa) পর্ব্বতে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কোন সন্ধান মিলিল না। সম্মুখে প্রায় ২০০ গজ পরিমিত এক ক্ষুদ্র উপত্যকা তৎপর আবার একটী পর্ব্বত। এই দ্বিতীয় পর্ব্বতের নাম **মারওয়া**। মাতা পাগলিনীর ন্যায় জলান্বেষণে দ্রুতপদে উপত্যকা অতিক্রম করিয়া মারওয়া পর্ব্বতের উপর উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সকল দিকে দৃষ্টি না পড়িতেই অসহায় শিশুর কথা মনে পড়িল। অমনি তথা হইতে দৌড়িয়া ছাফা (Safa)

পর্ব্বতোপরি আসিয়া সন্তানকে নিরাপদ দেখিলেন। কিন্তু জলাভাবে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে। তাই আবার পূর্ব্ববৎ পশ্চাতে ফিরিয়া জলান্বেষণে ছুটিলেন। এইরূপে তিনি সাতবার ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতের মধ্যস্থানে দ্রুতপদে গতায়াত করিলেন। অবশেষে শেষবারে সন্তান দেখিবার জন্য আসিয়া দেখিলেন শিশু যে স্থানে খেলা করিতেছিল, তথায় এক উৎসের উদ্ভব হইয়াছে। এই অলৌকিক ব্যাপারে তিনি ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে আল্লার নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। এই উৎসই বর্ত্তমানে কাবা মছজিদ মধ্যস্থিত **জমজম কূপ।** এই কূপের জল মোছলমানগণের নিকট অতি পবিত্র। এবং ইছমাইল জননী বিবি হাজেরা জলান্বেষণে **ছাফা (Safa) ও মারওয়া** নামক যে দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় দ্রুতপদে সাত বার গতায়াত করিয়াছিলেন, আজিও তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য হজের তীর্থ যাত্রিগণ হজের সময় এই দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় দ্রুতপদে সাত বার গমাগমন করিয়া থাকেন। কোরআন বলিতেছে "ছাফা (Safa) ও মারওয়া আল্লার দুইটি নিদর্শন। যে ব্যক্তি হজ করিতে অথবা কাবার ঘর দর্শন করিতে যায় এই উভয় স্থান পরিভ্রমণ করা তাহার পক্ষে অন্যায় কার্য্য নহে।

আরবদেশ মরুময় তাহা তোমরা জান। একে ত মরুভূমি তাহাতে আবার এখনকার মতন তখন পৃথিবীতে জনসংখ্যার আধিক্য ছিল না। সুতরাং যে স্থানে বিবি হাজেরা নির্ব্বাসিতা হন তথায় পবিত্র কাবাগৃহ ব্যতীত কোন জনমানবের বসতি ছিল না। বৎসরান্তে তীর্থযাত্রিগণ দেশদেশান্তর হইতে তথায় সমবেত হইয়া হজব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়া যাইত। সুতরাং হজান্তে স্থানটী মৌন তাপসের ন্যায় নিঝুম নির্জ্জনতার আঁচলে অস্তিত্ব ঢাকিয়া পুনরায় সুদূর জুলহজ মাসের আগমন প্রতীক্ষায় স্তিমিত নয়নে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিত।

কালক্রমে হজরৎ ইছমাইলের কল্যাণে এই কাবা গৃহের নিকট একটী প্রস্রবণের উদ্ভব হওয়ায় বিদেশী বণিকগণ তথায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। ঐতিহাসিকগণের মতে জরহাম বংশীয় বণিকগণই সর্ব্বপ্রথমে বিবি হাজেরার প্রতিবেশীরূপে কাবার নিকট বাস করিতে আরম্ভ করেন। একে আল্লার উপাসনার আদিগৃহ তাহাতে আবার মরুভূমিতে একটী জলের উৎস সুতরাং দলে দলে লোক আসিয়া কাবার চতুর্দ্দিকে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথিবীর সেই প্রাচীনতম উপাসনা গৃহের নিকট একটী সমৃদ্ধি-শালিনী নগরীর পত্তন হইল।

যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বজগতের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ শূন্যমার্গে একনিয়মে অনন্ত কাল হইতে ভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটী জীবনকোষ হইতে বিশ্বের জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছায় গভীর অরণ্যানীর মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ-শালী নগরী জননীর উদ্ভব হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাই তিনি তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার ভক্ত শ্রেষ্ঠ ইব্রাহিমকে একদিন স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের নির্ব্বাসনের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন; এবং মরুর বুক চিরিয়া করুণার ধারারূপে **জমজমকূপের** উদ্ভব করিয়াছিলেন। ইহাই বিধাতার ঈপ্সিত জগতের প্রাচীনতম নগরী। এই জন্য কোরআন ইহাকে **"উম্মুল কোরা"** বা **'নগরী জননী'** নামে আখ্যাত করিয়াছে।

মক্কা সহর এক প্রকার মরুর মধ্যে অবস্থিত বলিলেও চলে। ইহার চারিদিকের ভূভাগ প্রস্তরময়। তাহার কৃষিকার্য্যের সুবিধা বড়ই কম। মক্কার কুড়ি ক্রোশ দূরে জেড্ডা নামক বন্দর অবস্থিত। তাহার অপর পারে হাবসীদের দেশ, এবং ঐ দেশের মূল্যবান পণ্য সামগ্রী সকল এক সময়ে মক্কার উপর দিয়া বেহরিন্ প্রদেশের নগর সকলে নীত হইত এবং সেখান হইতে মুক্তাফল ও অন্যান্য পণ্যের সহিত ইয়ুফ্রেতিস নদীতে প্রবিষ্ট হইত। এদিকে উত্তরে সীরিয়া ও দক্ষিণে য়ীমেন্ প্রদেশের প্রায় সমান দূরে মক্কা অবস্থিত।

পর্ব্বতের শৃঙ্গ ত্রিকোণাকার হয় কেন ?

২৬৪০ পৃষ্ঠার পর

তোমরা অনেকেই হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বত এবং ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল-পরগণার ছোট ছোট পাহাড়-গুলি দেখিয়া থাকিবে। দূর হইতে পর্ব্বতশ্রেণী মেঘের মত নীল দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের শিখরগুলি পিরামিডের মত ত্রিকোণাকার। পর্ব্বত বা পাহাড়ের শিখর বা চূড়াগুলি কেন এইরূপ হয়, বলিতে পার কি ?

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ শীতল হওয়াতে উহার আয়তন সঙ্কোচিত হইতেছে

পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পর্ব্বত এক আশ্চর্য্য পদার্থ। পর্ব্বত কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে স্বাভাবিক নিয়মে ভূপৃষ্ঠ বিশালরূপে উন্নত হইলে সেই উন্নত ভূভাগকে পর্ব্বত কহে। সাধারণতঃ ১০০০ ফুট অথবা তাহার চেয়ে একটু অল্পতর উন্নত স্থানকে পাহাড় বলা যায়। হিমালয় বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত ও পার্শ্বনাথ প্রভৃতি পাহাড় পর্ব্বতের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহার অনেক কথা ভূ-বিজ্ঞানে (শিশু-ভারতী…) পড়িয়াছ। ভূগর্ভের আন্তরিক উত্তাপ বশতঃ উহার অন্তর্গত দ্রব্যাদি গলিত ও প্রসারিত হইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করে এবং কখন কখন ঐ আন্তরিক প্রভাব এতদূর প্রবল হইয়া উঠে, যে সেই সময় ভূমিকম্পাদি দ্বারা ভূ-ভাগ উন্নত হয়। আমরা জানি যে, তাপ-সংযোগে প্রায় যাবতীয় পার্থিব পদার্থেরই আয়তন বর্দ্ধিত হয়, এবং তাপ কমিয়া পদার্থ শীতল হইলে উহার সঙ্কোচ হয়। পৃথিবীও এই নিয়মের অধীন। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ ক্রমশঃ শীতল হওয়াতে উহার আয়তনের সঙ্কোচ হইতেছে। নিম্নস্থ ভূ-গর্ভের যে ভাগ যখন তাপহীন হইয়াছে, তখনই উহার উপরিস্থ ভূপৃষ্ঠ নিরালম্ব হওয়াতে মাধ্যাকর্ষণ বশতঃ নিম্নগামী হইয়া চূর্ণীকৃত হইয়াছে এবং উঁচু নীচু হইয়া পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর আন্তরিক উত্তাপ উহার সর্ব্বাংশে যুগপৎ সমান ভাবে কমে না। যখন যে অংশের উত্তাপ কমিয়া যায়, তখনই উহা আকুঞ্চিত হইয়া বসিয়া যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত
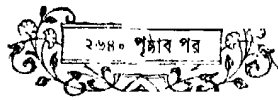
কারণেই কোথাও অধিত্যকা, কোথাও গভীর খাত কোথাও মালভূমির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপেই হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণীর গগনভেদী শৃঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। উপরের দিক হইতে ক্রমাগত

আগ্নেয়গিরির পর্ব্বত শিখর, ধাতুনিস্রব হেতু ত্রিকোণাকার ধারণ করিয়াছে
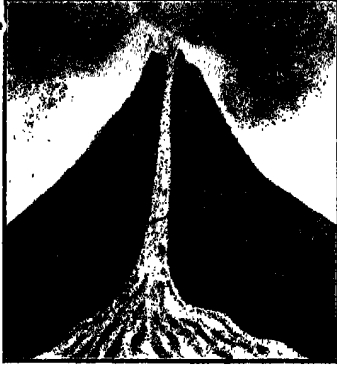
বৃষ্টির ধারা, বরফ, মাটি, পাথর ইত্যাদি নীচে আসিতে থাকে বলিয়া, উপরের দিকটা ক্রমশঃ সরু এবং ধীরে ধীরে ত্রিকোণাকার হয়। পর্ব্বত-সৃষ্টির সময় উহার যে অংশটি যেরূপ উদ্গম বেগবশতঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই বেগের তারতম্য হেতু শৃঙ্গ সমূহ কোনটি অধিক উন্নত, কোনটি অল্প উন্নত। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা এভারেষ্ট সাগরতটরেখা হইতে ২৯,০০২ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৫½ মাইল উচ্চ, কিন্তু উহা পৃথিবীর ব্যাসের [illegible] ভাগ মাত্র। সুতরাং পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গগুলি ও ভূপৃষ্ঠে বালুকাকণার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। পর্ব্বতদ্বারা আমাদের নানা উপকার হয়। পর্ব্বত শিখরে বরফ জমিয়া থাকে। ঐ বরফ গলিত হইয়া নদীরূপে নানা দেশ বিদেশে প্রবাহিত হইয়া ভূ-ভাগকে উর্ব্বর ও শস্য-শ্যামল করে।

সিমুম কেন হয় ?

বিরাট বিস্তৃত বালুকাকীর্ণ ভূমিকে মরুভূমি বলে। মরুভূমি বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান। তাহার কোথাও পর্ব্বত রহিয়াছে, কোথাও গভীর খাত রহিয়াছে, কোথাও বা আবার ঢেউ খেলানো বালুকাভূমি। মরুভূমির বুকের উপর মাঝে মাঝে ভয়ানক ঝড় উঠে। সে ঝড় বড় ভীষণ। মনে হয় যেন প্রকৃতি পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। সাগরের বুক যেমন নিস্তরঙ্গ থাকে না, তেমনি মরুভূমির বিশাল প্রান্তর ও কখন বায়ুবিহীন থাকে না। তবে সে বাতাস পশ্চিমের লুর চেয়ে ও লক্ষগুণ ভীষণ! তাহার নাম সিমুম। সিমুমের হাতে পড়িলে মানুষ, উট ইত্যাদি কিছুই বাঁচে না। এই যে সিমুমের কথা বলিলাম, এই সিমুম সময় সময় অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তখন বালুকা রাশি স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়া আকাশের সহিত মিশিয়া যায়। মনে হয় যেন শত শত থাম হাতে

মরুভূমিতে বালুকাস্তম্ভ

লইয়া ঝড়ের দেবতা সৃষ্টি ধ্বংস করিতে আসিতেছে। এখানে মরুভূমিতে উত্থিত সেই বালুকাস্তম্ভের ছবি দিলাম।

রাবার নাম হইল কেন ?

তোমাদের সকলেরই রাবারের দরকার হয়। রাবার হইতেছে একজাতীয় বৃক্ষের রস। এই গাছ মালয়দ্বীপে, বোর্ণিও এবং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ইহার দ্বারা পেন্সিলের দাগ ঘষিয়া তোলা যায় বলিয়া নাম দিলেন রাবার (Rubber)। সেই নামই এখন চলিয়া আসিতেছে। রাবারের চাষের জন্য মালয় দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ বিখ্যাত। সেখান হইতে নানা দেশ-বিদেশে রাবার প্রেরিত হইয়া থাকে। রাবারের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক।

উদ্ভিদের শিকার

২৬২১ পৃষ্ঠার পর

নিরীহ, চলচ্ছক্তিহীন, অত্যাচারের প্রতিকারে অসমর্থ উদ্ভিদ ! সে আবার শিকার করে, প্রাণী ধরিয়া তাহাদের মাংস খায় এ আবার কেমন কথা ? আমরা তো দেখি প্রাণীরাই উদ্ভিদ খায়, উদ্ভিদের উপর কত না অত্যাচারই তাহারা করে ! আর সে সব অত্যাচার, উৎপীড়নের কথা ভুলিয়া সেই উদ্ভিদই সমস্ত প্রাণিজগতের খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছে। অহিংসাব্রতী উদ্ভিদ হিংসার প্রতিদানে যিশুখ্রীষ্টের উপদেশকে হার মানাইয়াছে, চৈতন্যের 'মেরেছে কলসীর কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দেব না'—প্রেমধর্ম্মকেও ছাড়াইয়াছে। সেই উদ্ভিদ যে হিংসা করে, প্রাণী বধ করে—সে কথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায় ?
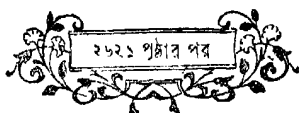
গাছের তো শিকার করিবার হাতিয়ার নাই, গমনাগমনের শক্তি নাই, লোকবলও নাই, তবে কি করিয়া সে শিকার করিবে ? আর কেনই বা সে শিকার করিবে ? তাহার খাদ্য তো জল, বাতাস ও মাটিতে প্রচুর আছে, আর কাহারও উপর তো সে খাদ্যদ্রব্যের জন্য নির্ভর করে না. তবে কি শুধু শিকারের আনন্দের জন্যই সে শিকার করে ? মাংস হইতে আমরা আমাদের দেহের উপাদান প্রোটিন খাদ্য পাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহারা মাছ মাংস খান না। আর যাঁহারা মাংসাশী তাঁহাদের মাছ মাংসই ভাল লাগে। কিন্তু মাছ মাংস না পাইলে যে তাঁহাদের চলে না এমন নহে। মাংসাশী উদ্ভিদ অনেকটা মাংসাশী মানুষের মত। পোকামাকড় ধরিতে না পারিলে ইহাদের বাঁচিবার কোন ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু মাংস পাইলে ইহারা তাড়াতাড়ি বড় হয়, আর থাকে ভাল।

কিন্তু ইহারা শিকার ধরে কেমন করিয়া ? শিকার ধরিতে ইহারা যে কৌশল ও বুদ্ধির পরিচয় দেয় তাহা মানুষের

বুদ্ধিকেও হার মানায়। শিকার ধরিবার কৌশল ইহাদের সকলেরই এক প্রকারের নহে। শিকারী উদ্ভিদের মধ্যে যাহারা সব চাইতে কম আয়াসে শিকার ধরে তাহারা তাহাদের পাতার সারা গায়ে একপ্রকার আঠা লাগাইয়া রাখে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা আটকাইয়া ক্রমশঃ সেইখানেই মারা পড়ে। তারপর হজমী রস নিঃসৃত করিয়া গাছ তাহাদিগকে জীর্ণ করে। ইহাদের সহিত বাজারের 'মাছিধরা' কাগজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এ গাছ আমাদের দেশে জন্মায় না। ইহাদিগকে মরক্কো ও পর্তুগাল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের অপেক্ষা যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান তাহারা নিজেদের পাতাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া শিকার ধরার ফাঁদ প্রস্তুত করে। ফাঁদগুলিতে ঢুকিবার দরজা থাকে মাত্র একটী, আর তার নির্ম্মাণ কৌশল এমন পরিপাটি যে দরজার পাল্লা বাহির হইতে অল্প ঠেলিলেই ভিতরের দিকে খুলিয়া যায়, কিন্তু ভিতর হইতে হাজার ঠেলাঠেলি করিলেও খোলে না। এ রকম ফাঁদ পাতিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গৃহস্থরা নদীতে মাছ ধরে, আর ইঁদুরের হাত হইতে রক্ষা পাইতে ইঁদুর ধরিবার এই ব্যবস্থার খাঁচা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর শিকারী উদ্ভিদ আমাদেরই বাংলাদেশের খালে বিলে বর্ষাকালে প্রচুর দেখা যায়।

উপরোক্ত শিকারী উদ্ভিদ ফাঁদ পাতিয়াই বসিয়া থাকে, শিকারকে ভুলাইয়া আনিবার কোন ব্যবস্থা ইহাদের নাই। অন্য প্রাণীর তাড়া খাইয়া কিংবা রাস্তা চলিতে আশ্রয় স্থান পাইবার আশায় কেহ কপাট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলে ইহারা তাহাকে কায়দায় পায়, কিন্তু ইহাদেরই আর এক গোষ্ঠী বুদ্ধিতে ইহাদিগকে একেবারেই হারাইয়া দিয়াছে, ইহারা পাকা শিকারী। বিজন বনে অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যার মূর্ত্তি ধরিয়া রাক্ষসী বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজপুত্র চলিয়াছেন ঘোড়ায় চড়িয়া। কান্না শুনিয়া কাছে আসিয়া দেখিলেন অসহায়া সুন্দরী কন্যা গাছতলায় বসিয়া অঝোরে কাঁদিতেছেন। আরও কাছে গেলেন—কোথায় গেল রাজকন্যা, আর প্রাণ হারাইলেন রাজপুত্র! ইহারা ফাঁদকে এমন মনভুলান করিয়া সাজাইয়া রাখে যে কীটপতঙ্গ লোভে আসিয়া উহার ভিতর পড়িয়া প্রাণ হারায়। এই শ্রেণীর গাছও আমাদের দেশের আসামের খাসিয়া, গারো পাহাড়ে প্রচুর জন্মে।

আর একপ্রকার শিকারী উদ্ভিদ আছে যাহারা শুধু সুন্দর ফাঁদ পাতিয়াই বসিয়া থাকে না, শিকারের সংস্পর্শ পাইলেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া দম বন্ধ করিয়া কিংবা চাপিয়া মারিয়া ফেলে। পরে রস চুষিয়া খায়। ইহাদেরও দুই একটী জাতিকে আমাদেরই বাংলাদেশে সবুজ ঘাসের আস্তরণের মধ্যে বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর জেলায় দেখা যায়। আমি এখানে বাংলা দেশের শিকারী উদ্ভিদের কথা দিয়াই তাহাদের সহিত তোমাদের পরিচয় করাইব।

প্রায় সারা বছর দেখা গেলেও বর্ষাকালেই খালে, বিলে, ডোবায়, ঝিলে এক-প্রকার শিকারী জলজ উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইহাদিগকে ঝাঁঝি, নীলঝাঁঝি, বড় ঝাঁঝি বলা হয়। ইংরাজীতে বলে Bladderworts বা Utricularia। চলতি নদীতে ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতবর্ষের নানাস্থানে ইহারা জন্মে, যেমন করমণ্ডল উপকূল, বম্বে, নেপাল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি।

ঝাঁঝির শিকড় থাকে না কিন্তু জলের একটু নীচেই ইহাদের বিড়ালের লেজের মত দেখিতে অথচ সবুজ, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত দেহ বড় সুন্দর দেখায়। ইহার সবুজ পাতাগুলি

সরু সরু গোছা গোছা রোমের মত। ডাঁটার গায়ে পাতা রূপান্তরিত করিয়া ইহারা শিকার ধরিবার ফাঁদ প্রস্তুত করে। সবুজ পাতা-গুচ্ছের মধ্যে মুক্তার মত ফাঁদগুলি গাছের সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়াইয়া তোলে। বর্ষার শেষে ইহার হলুদবর্ণের ফুলগুলি ডাঁটায় ভর করিয়া জল ছাড়িয়া উপরে উঠে।

ফাঁদগুলি কতকটা ডিমের মত দেখিতে। ইহাদের প্রত্যেকের মুখে কতকগুলি শক্ত
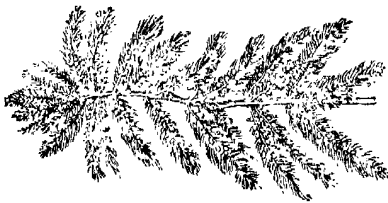
ঝাঁঝির পাতা ও ফাঁদ

শুঁয়া (bristles) থাকে, আর তাহাদের পিছনে থাকে ফাঁদে প্রবেশ করিবার পথের কপাটখানি লুকান অবস্থায়। কপাটখানি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে একটু ঠেলিলেই উহা ভিতরের দিকে খুলিয়া যাইবে, এবং পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে, ভিতর হইতে শত চেষ্টাতেও আর খুলিবে না। ফাঁদ-গুলি জলের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ধরিবার জন্য নির্ম্মিত, তাই অপেক্ষাকৃত বড় বড় জলজ প্রাণীকে বাধা দিবার জন্যই ফাঁদের মুখে শক্ত শুঁয়া। এক একটা ফাঁদে এক সঙ্গে ১২।১৫টি পোকার দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

বড় বড় পোকামাকড়ের তাড়া খাইয়া, কিংবা আশ্রয়ের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ইহার ভিতর সহজেই ঢুকিয়া পড়ে, কিন্তু বাহিরে আসিতে পারে না। নিজের অবস্থা যখন সে বুঝিতে পারে তখন বাহিরে আসিবার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা! আলিবাবার কাসেমের কথা তোমাদের মনে আছে? একবার ভাব দেখি তখনকার মনের অবস্থা! বাহিরে আসিবার বৃথা চেষ্টায় শেষে ইহারা হয়রান হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় দুই একদিন বাঁচিয়াও থাকে। তারপর অনাহার ও দমবন্ধ হইয়া মৃত্যু। ইতিমধ্যে খাবার দেখিলে আমাদের মুখে যেমন জল আসে, ফাঁদের ভিতর অবস্থিত গ্ল্যাণ্ড হইতে তেমনই হজমীরস নিঃসৃত করিয়া গাছ মৃত পোকাকে জীর্ণ করে এবং তাহার রস শরীরের মধ্যে শুষিয়া লয়।

ঝাঁ একটা জাতি দার্জ্জিলিং পাহাড়ের গায়ে ভিজা মস্ (Moss), লিভারওয়ার্টস (Liverworts) এর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ফাঁদগুলি আরও ছোট হয় এবং অনেক সময় জলীয় পদার্থে ভর্ত্তি থাকে। Observatory Hill এর গায়ে ভিজা মস্ ও লিভারওয়ার্টস এর মধ্যে ইহাদিগকে খোঁজ করিও দেখিতে পাইবে।

এবার যাহাদের কথা বলিব তাহারা বাংলাদেশে জন্মে না, কিন্তু আসামের গারো, খাসিয়া পাহাড়ে ইহাদের দুই একটী জ্ঞাতি-ভাইকে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই শ্রেণীর গাছের ফাঁদগুলি দেখিতে সাধারণতঃ একটী ঢাকনিওয়ালা দুধের জগের (milk jug) মত। ইহারা হয় লতাজাতীয় উদ্ভিদ আর না হয় মাটির উপর বিস্তৃত। যে পাতাগুলি ফাঁদে পরিবর্ত্তিত হয় লতা-জাতীয় গাছে তাহাদের তিনটি অংশ দেখা যায়। গোড়ার বৃন্তটী চওড়া, মধ্যশিরা বর্দ্ধিত হইয়া লম্বা আকর্ষের মত হয়, আর তাহারই আগায় থাকে ফাঁদ। ফাঁদটী একটী পেট মোটা গলা সরু ঘট বা কলসীর মত দেখিতে। সেইজন্য এই গাছগুলিকে **ঘটপত্রী** গাছ (Pitcher plant) বলে। পেট মোটা ফাঁপা গোড়ার দিকটাকে 'উদর' বলা হয়, উদরের উপরদিকটা ক্রমশঃ সরু হইয়া গ্রীবায় শেষ হয়। গ্রীবার প্রান্ত-

দেশ উল্‌টান, শক্ত, মসৃন, চকচকে এবং মধুলিপ্ত। ঘটের উপরকার ঢাক্‌নি দেখিলে সাপের বিস্তৃত ফণার কথা মনে হয়। প্রথম অবস্থায় ঢাকনিটী ঘটের মুখে চাপা থাকে, পরে খুলিয়া যায়, আর বন্ধ হয় না। সম্পূর্ণ পাতাটি ও ঘটের বাহিরের গা নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্র থাকে। ভিতরের দিকে মুখের ঠিক নীচেই নীচের দিকে মুখ করা একস্তর সূক্ষ্মাগ্র শুঁয়া থাকে। তাহার নীচে ঘটের সারা গায়ে থাকে লালাগ্রন্থি। এই গ্রন্থি হইতে হজমীরস নিঃসৃত হইয়া ঘটের তলদেশে জমা থাকে।

কীটপতঙ্গ যাহারা গাছের কাছেই থাকে তাহারা ঘটের বর্ণ-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া গাছের কাছে আসে এবং ডাঁটার গায়ের সুমিষ্ট রস খাইতে খাইতে ক্রমশঃ ঘটের মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর যাহারা উড়িয়া বেড়ায় তাহারা ঘটের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে দূর হইতে আকৃষ্ট হইয়া ঘটের মুখে আসিয়া বসে। মুখের প্রান্তদেশ এত মসৃণ ও পিচ্ছিল যে একটু অসাবধান হইলেই পা পিছলাইয়া ইহারা ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া যায়। একে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তি তার উপর মুখে মধু—বিপদের কথা কি তখন মনে থাকে? একবার ফাঁদে পড়িলে আর উদ্ধার নাই। যতবার উঠিতে চেষ্টা করে ততবারই মুখের নীচের নিম্নমুখী সূচের মত তীক্ষ্ণাগ্র শুঁয়ায় বাধা পায়। এই প্রকারে ক্রমাগত উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া শিকার নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে ঘটের তলদেশে সঞ্চিত হজমীরসে ডুবিয়া মরিয়া যায়। তখন এই রসে তাহার শরীর জীর্ণ করিয়া গাছ তাহাকে খায়।

গারো পাহাড়ের ঘটপত্রী গাছের (Nepenthes) জ্ঞাতি ভাইদের যদি দেখিতে চাও তবে তোমাদিগকে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি,
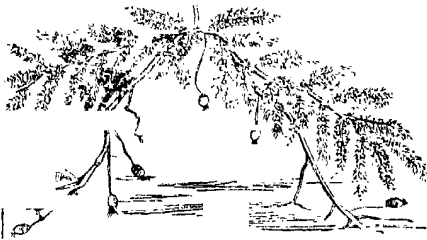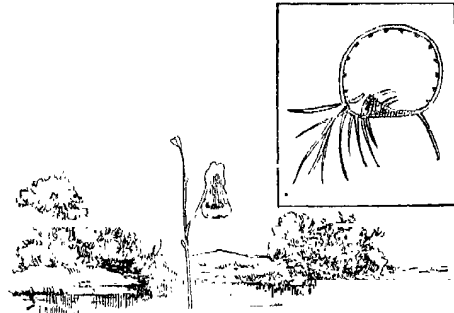
ঝাঁঝির গাছ, ফুল ও ফাঁদ

মাদাগাস্কার, ফিলিপাইন, সিংহল, মালয়, কোচিন, চায়না প্রভৃতি দেশে যাইতে হইবে।

উত্তর আমেরিকার হাডসন উপসাগরের (Hudson Bay) উপকূল হইতে ফ্লোরিডা পর্য্যন্ত **সেরাসেনিয়া** (Sarracenia) নামে আর এক জাতীয় ঘটপত্রী গাছ দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকটী পাতাই এক একটী ঢাকনিওয়ালা ফাঁদ। পাতাগুলি মাটীর

উপর হইতে সোজা উপরের দিকে উঠে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহারা প্রায় সর্ব্বদাই মৃত পোকামাকড় দ্বারা পূর্ণ থাকে। গাছ মরিয়া গেলে এই সমস্ত অর্দ্ধজীর্ণ মৃত পোকামাকড় মাটিতে মিশিয়া মাটিতে জৈব সার (organic manure) দেওয়ার কাজ হয়। ইহা ভিন্ন অনেক মাংসাশী প্রাণী কীট-পতঙ্গপূর্ণ এই ফাঁদগুলি খাইয়া তাহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করে। তাহা হইলে দেখ, ইহারা নিজেরা শিকার করে, মাংসাশী প্রাণীর খাদ্য যোগায়, আবার জমির উর্ব্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি করে। এখানেও ঘটপত্রীর সৌন্দর্য্য ও মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়াই কীটপতঙ্গ প্রাণ হারায়।

ডার্লিংটোনিয়া (Darlingtonia) নামে আর এক প্রকার ঘটপত্রী গাছের কথা বলিয়া ইহাদের পরিচয় শেষ করিব। এই জাতীয় গাছ আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

সেরাসেনিয়ার মত ইহারও প্রত্যেকটী পাতাই ফাঁদ এবং মাটির উপর হইতে উপরের দিকে প্রসারিত। ঘটের মুখে মাছের লেজের মত একটি জিহ্বা নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। জিহ্বার রং নীল ও লালে মিশান। ঘটের নীচের দিকটা সবুজবর্ণের, কিন্তু উপরের অংশে লাল লাল শিরা উপশিরা দেখা যায়, আর স্থানে স্থানে পাটকিলে (purple) রংএর ছিটা দেওয়া। শিরা ও উপশিরার মধ্যের অংশগুলি সাদা ও পাতলা হওয়ায়, উহাদের মধ্য দিয়া ঘটের ভিতর আলো প্রবেশ করে। দেখিতে ও কার্য্যতঃ ইহারা কাচনির্ম্মিত জানালার মত। ঘটের মুখের ঠিক নীচেই ভিতরের দিকে মধু থাকে।

সবুজ, লাল, পাটকিলে ও সাদা রংএর বিচিত্র সমাবেশ ফাঁদটীকে দেখিতে অতি মনোরম করিয়া তুলে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় একটী সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলের মুখে অপূর্ব্ব জিহ্বাটি ভোজনালয়ের দরজার সাইনবোর্ডের মত যেন বলিয়া দেয় এখানে খাবার আছে, হে ক্ষুধার্ত্ত পথিক! নিঃসন্দেহে ভিতরে প্রবেশ কর! হতভাগ্য পথিক আতিথেয়তার মোহে ও পেটের জ্বালায় সমস্ত ভুলিয়া সত্যই ভিতরে প্রবেশ করে, যার প্রবেশ পথেই দেখে মধু! তখন অজানা পথের বিপদের কথা মনে আসে না, আর দরজাতেই এমন অভ্যর্থনা! পথিক আর একটু অগ্রসর হইল তারপর কি হইল মনে নাই, মোহ কাটিলে দেখে সে একেবারে অতল গহ্বরে, কিন্তু দূরে অতিদূরে (এক একটা ফাঁদ ১২" ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়) মাথার উপরে সূর্য্যের আলো দেখা যাইতেছে। ধৃত পতঙ্গ সেইখানে বাহিরে যাইবার জানালা আছে মনে করিয়া উড়িয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধ জানালায় মাথা ঠেকিয়া আবার নীচে পড়িয়া গেল। আবার উড়িয়া উঠে কিন্তু বাধা পাইয়া পুনরায় নীচে পড়ে; ক্রমে ক্রমে পরিশ্রান্ত ও হতাশ হইয়া সে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ফাঁদের মুখ মাটির দিকে থাকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সে মুখের সন্ধান সে আর পায় না। তারপর অনাহারে ও দমবন্ধ হইয়া তাহার সকল কষ্টের শেষ! শিকারী গাছ তখন হজমী রস ঢালিয়া তাহাকে জীর্ণ করে ও খাইয়া ফেলে।

এখন যে শ্রেণীর শিকারী উদ্ভিদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করাইব তাহারা শুধু ফাঁদই পাতে না শিকারের সংস্পর্শ পাইলেই তাহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া ধরিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলে। ইহাদেরই একটী জাতি বীরভূম, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর জেলায় খুব দেখা যায়। সাধারণ লোকে ইহাকে 'পানের পিক্' বলে। সবুজ ঘাসের কার্পেটের উপর স্থানে স্থানে লালবর্ণের এই গাছগুলিকে দেখিলে মনে স্বতঃই আসে কেহ

যেন পান খাইয়া পিক্ ফেলিয়া গিয়াছে। ইহাদের পাতাগুলির আকৃতি অনেকটা চামচের মত, এবং মাটির উপরেই বিস্তৃত। পাতার কিনারা ও উপরে আলপিনের মত অসংখ্য শুঁয়া থাকে। ইহাদিগকে টেন্টাক্লস্ (tentacles) বলে, কার্য্যে ইহারা সামুদ্রিক অক্টোপাসের টেন্টাক্লস এরই মত। প্রত্যেকটি শুঁয়ার আগা একটু মোটা এই মোটা অংশ চট্‌চটে অথচ উজ্জ্বল এক প্রকার পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকায় সূর্য্যালোকে এই আগাগুলিকে উজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মত দেখায় বলিয়া এই গাছগুলিকে ইংরাজীতে সানডিউ (Sundew) বলে। এই উজ্জ্বল বিন্দু ও পাতার লালবর্ণে আকৃষ্ট হইয়া কীট পতঙ্গ দূর হইতে নিকটে আসে, বিন্দুগুলিকে খাদ্য মনে করিয়া পাতার উপরে যেমনই বসা, অমনই চতুর্দ্দিক হইতে শুঁয়াগুলি ঝাঁকিয়া আসিয়া উহাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে শুঁয়ার মোটা আগা হইতে হজমী রস নিস্সৃত করিয়া উহাকে পরিপাক করিয়া ফেলে। শিকার বধ করিয়া খাওয়া শেষ হইলেই শুঁয়াগুলি আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। গাছ এখন ভালমানুষটী সাজিয়া পুনরায় শিকার ধরিবার আশায় ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে।

তোমরা আশ্চর্য্য হইবে যে অনুভবশক্তিতে এই গাছগুলির শুঁয়া মানুষের প্রবল স্পর্শশক্তিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মানুষের জিহ্বার অগ্রভাগ সব চাইতে অনুভবশক্তিসম্পন্ন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে মেয়েদের চুলের এক ইঞ্চির ১২৫ ভাগের একভাগ লম্বা টুক্‌রার,—যাহার ওজন ০.০০০৮২১ মিলিগ্রাম,- সংস্পর্শ ইহাদের শুঁয়াকে উত্তেজিত করিতে পারে, কিন্তু জিহ্বা উহার সংস্পর্শ অনুভব করিতেও পারে না। ইহাদের খাদ্যাখাদ্য বুঝিবার শক্তিও অসাধারণ, মাংস কিংবা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের সংস্পর্শ ভিন্ন অন্য জিনিষের সংস্পর্শে ইহারা উত্তেজিত হয় না।

মলাক্কা ঝাঁঝি (Aldrovanda) নামে এই শ্রেণীর একটী শিকারী উদ্ভিদ ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে বর্ষার শেষ দিকেই খালে বিলে দেখা যায়। ইহারা জলে ভাসিয়া থাকে এবং ইহাদের শিকড় থাকে না, ডাঁটার উপর ঘন বিন্যস্ত প্রত্যেকটি পাতাই শিকার ধরিবার ফাঁদ। পাতার বৃন্ত ফলকের দিকে কিঞ্চিৎ চওড়া, এবং গোলাকৃতি ফলকটি কব্‌জার পাল্লার মত দুইটি অংশে
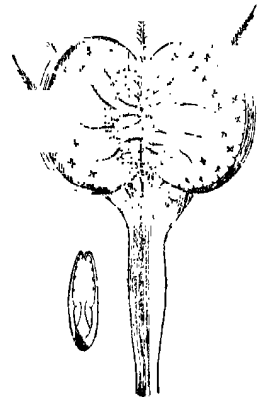
গাছ ও ফাঁদ

বিভক্ত; ইহার আগার দিকে ৫।৬টী কাঁটার মত শক্ত শুঁয়া থাকে। ফলকের পাল্লা দুইটী পরস্পরের সহিত সর্ব্বদাই প্রায় ৯০° ডিগ্রি কোণ করিয়া থাকে। উহাদের উপরিভাগে অনেকগুলি করিয়া শুঁয়া থাকে। শুঁয়া গুলির অনুভবশক্তি অত্যন্ত প্রবল। তদ্ভিন্ন হজমী রসস্রাবী বহু গ্রন্থিও থাকে। পাল্লা দুইটীর কিনারা ভিতরের দিকে ভাঁজ করা, আর ভাজের মুখে করাতের দাঁতের মত কাঁটাবিশিষ্ট। পাল্লা দুইটি যখন বন্ধ হয় তখন ইহাদের মুখের শক্ত কাঁটাগুলি ভিতরের দিকে মুখ করিয়া দুই সারিতে সাজান থাকে যাহাতে ভিতর হইতে কেহ বাহিরে আসিতে না পারে।

জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী সাঁতার দিবার সময় ফলকের উপরিস্থিত উত্তেজনশীল শুঁয়াগুলিকে স্পর্শ করিলেই তৎক্ষণাৎ পাল্লা দুইটী বন্ধ হইয়া যায়। আর শিকার ভিতরে আটক পড়ে। মুখে তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকার জন্য সে আর বাহিরে আসিতে পারে না, ফলে যাহা হয় তাহা তোমরা নিজেরাই অনুমান করিতে পারিবে।

আমেরিকার ফ্লোরিডা দেশে ভেনাসের ফ্লাইট্র্যাপ (Venus's Flytrap) নামে এই জাতীয় আর একটী গাছ দেখা যায়। শিকার ধরিবার ব্যবস্থা ইহাদের মলাক্কা-ঝাঁঝিরই অনুরূপ। পুষ্পদণ্ডটীকে ঘিরিয়া পাতাগুলি মাটির উপরই সজ্জিত থাকে, আর প্রত্যেকটী পাতাই এক একটী ফাঁদ। মধ্যশিরার উপর ফলকের পক্ষ দুইটী কব্জার পাল্লার মতই। এখানেও গাছ ইচ্ছামত ইহাদিগকে খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে, সাধারণ অবস্থায় পক্ষ দুইটী থাকেও একখানা অর্দ্ধেক খোলা পুস্তকের পাতার মত।

ইহাদের শিকার ফাঁদে পড়িয়াছে কি না জানিবার ব্যবস্থাও মলাক্কা-ঝাঁঝিরই অনুরূপ। ফলকের পক্ষ দুইটীর প্রত্যেকের উপরিভাগে তিনটী করিয়া শক্ত শুঁয়া থাকে। এই শুঁয়াগুলিই ইহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়। ফাঁদের কিনারায় করাতের দাঁতের মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত লম্বা, ১২—২০টী করিয়া তীক্ষ্ণ দাঁত থাকে। ফাঁদের (ফলকের) পাল্লা দুইটী যখন মুখে মুখে ভিড়ে, তখন ফাঁদটা দেখিতে হয় ঠিক ইঁদুর ধরা জাঁতিকলের মত, মুখে একটুও ফাঁক থাকে না।
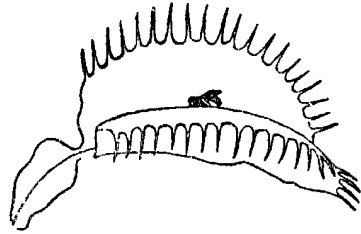
ফাঁদ খোলা

কীটপতঙ্গ পাতার উপর বসিলেই শুঁয়াগুলির সংস্পর্শে আসিবেই, আর তৎক্ষণাৎ পাল্লা দুইটী বন্ধ হইয়া তাহাকে ফাঁদের মধ্যে আটক করে। এই অবস্থায় ৮—১৪ দিন পর্য্যন্ত পাতা বন্ধ থাকে। ইহার মধ্যে মাংস হজম হইয়া পরিপাক হইলেই গাছ আবার ফাঁদ পাতিয়া অন্য শিকারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে মাংস ও মাংসজাতীয় খাদ্য ভিন্ন অন্য কিছু দিয়া তোমরা ইহাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না। সান্‌ডিউ (Sundew—Drosera) এবং এই গাছে উত্তেজনার সময় বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপত্তি হওয়া প্রমাণ হইয়াছে। ইহা কেবল প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। গাছেরও ও যে স্নায়ু ও পেশী থাকিতে পারে তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই দুই জাতীয় গাছ হইতেও পাওয়া যায়।

আর এক প্রকার শিকারী উদ্ভিদ আছে যাহাকে **বাটারওয়ার্ট** (Butterwort) বলে। মেক্সিকো, দক্ষিণ ও পশ্চিম য়ুরোপ, গ্রীনল্যাণ্ড, সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশে ইহাদের প্রায় ৪০টী জাতি দেখা যায়।

এই গাছগুলি ছোট ছোট, বেশী বড় হয় না। ইহাদের বেগুনি ও নীল রং মিশান ফুলগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহাদের পাতাগুলিও মাটির কাছেই থাকে, আর প্রত্যেকটী পাতাই একটী করিয়া ফাঁদ। পাতাগুলি ১"—৩" ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে; উপরিভাগ মাখনের মত এক প্রকার চট্‌চটে পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া

ফাঁদ বন্ধ

এই গাছগুলিকে ইংরাজীতে বাটারওয়ার্টস (butter=মাখন) বলে। একটা গাছে ৬ হইতে ৯টী পাতা থাকিতে পারে, আর তাহাদের উপরিভাগে প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রন্থি থাকে। পাতাগুলির কিনারা উপরের দিকে উল্টান, দেখিতে অনেকটা থালার উঁচু প্রান্তের মত। কীট বা পতঙ্গ পাতার উপর বসিলেই উপরের দিকে বাঁকা প্রান্ত আরও বাঁকিয়া শিকারকে বন্দী করিয়া ফেলে। শিকার হজম হইলেই পাতা আবার খুলিয়া যায়।

যদি কোন মক্ষিকা বা অন্য শিকার ইহার পাতার বোঁটার দিকে কিংবা কিনারায় বসে তবে এমন ভাবে ইহারা পাতা গুটায় যে শিকার পাতার মাঝখানে আসিবেই। ইহা না হইলে তাহাকে চাপা দেওয়া কঠিন হয়। ইহাদের হজম শক্তিও অতি প্রবল। এক টুক্‌রা তরুণাস্থি (cartilage) পাতার উপর রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই উহা গলিয়া যায়। শিকারের নরম মাংস অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা হজম করিয়া ফেলিতে পারে।

ইহাদিগকেও খাদ্য সম্বন্ধে সহজে ঠকাইতে পারিবে না। মাংস, মাংসজাতীয় খাদ্য, দুধ, রক্ত ভিন্ন অন্য কোন জিনিষের সংস্পর্শ ইহাদিগকে উত্তেজিত করিতে পারে না। ইহাদের আর একটী গুণ আছে। রেনেট (rennet) মিশাইলে দুধ যেমন কাটিয়া যায় ইহাদের পাতা সংযোগে দুধ তেমনই কাটিয়া যায়। এই প্রকারেই ল্যাপল্যাণ্ড দেশের দুগ্ধজাত খাদ্য "TatMiolk" বাটার-ওয়ার্ট পাতার উপর বাঁটগরম দুধ ঢালিয়া প্রস্তুত করা হয়। আল্পস্ পর্ব্বতের পশু-পালকগণ গাভীর বাঁটে ঘা হইলে তাহার প্রতিষেধক হিসাবে ইহার পাতা ব্যবহার করে।

আর একটী গাছের কথা বলিয়াই ইহাদের কথা শেষ করিব। এই জাতীয় গাছের সাধারণ নাম **মাছি-ধরা** গাছ (Fly-Catcher)। পর্ত্তুগাল, মরক্কো ও কাছাকাছি দেশে ইহাদেরই একজনকে দেখা যায়—নাম **ড্রসোফাইলাম্** (Drosophyllum)। ইহারা জলহীন শুষ্ক স্থানেই বেশী জন্মে। ইহাদের কাণ্ড প্রায় ৯" ইঞ্চি লম্বা হয়। কাণ্ডের নিম্ন প্রদেশ হইতেই সরু সরু লম্বা পাতা বাহির হয়। পাতাগুলি চওড়া হয় না আর দেখিতে অনেকটা লাউ কুমড়ার আকর্ষের মত। পাতার সারা গায়ে লাল-বর্ণের গ্রন্থি; গ্রন্থির মাথায় শিশিরের ন্যায় উজ্জ্বল চট্‌চটে বিন্দু। রৌদ্র পড়িলেই এগুলি চকচক্ করে। এই কারণেই গাছ-গুলিকে **শিশিরপত্রী** (Drosophyllum Dewleaf) বলে। এই গ্রন্থিগুলি ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হজমীরস নিঃস্রাবী আরও বহু গ্রন্থি

নেপেন্থিস্ স্যারাসেনিয়া ২(ক)। ডার্লিংটোনিয়া বাটারওয়ার্ট

৪। ড্রসেরা ৪(ক) ঐ মক্ষিকা শিকার ভেনাসের ফাঁদ

৬। নীল ঝাঁঝি ৬(ক)। ঐ ফাঁদ

পাতার গায়ে থাকে। মক্ষিকা বা অন্য কোন ক্ষুদ্র প্রাণী ইহাদের উপর বসিলেই তাহার পেট, বুক, পাখা প্রভৃতি আঠায় আটকাইয়া

শিশিরপত্রী

যায় ; ছাড়াইতে যতই চেষ্টা করে ততই আরও জড়াইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে দমবন্ধ হইয়া সে মারা পড়ে। ইতিমধ্যে হজমী কার্য্য আরম্ভ হইয়া যায় ও পাচক রসে ক্রমশঃই দ্রবীভূত করিয়া গাছ ধৃত প্রাণীকে পরিপাক করে।

যে দেশে এই গাছগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মে সেখানকার কৃষকেরা ইহাদের পাতা তাহাদের ঘরে ঝুলাইয়া রাখে। ইহাতে মাছি মশার উপদ্রব বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। কারণ এক একটী পাতা বহু সংখ্যক মক্ষিকা ধরিতে পারে।

আমাদের দেশে এই জাতীয় শিকারী গাছ না থাকিলেও লাল-ভেরাণ্ডা ও তামাক গাছের কাণ্ডের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থি থাকে যাহারা চট্‌চটে রস নিঃসৃত করে। ইহাদের গায়ে হাত দিয়া দেখিও হাতে আঠা লাগিয়া যাইবে। আর লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে বহু পোকা ইহাদের গায়ে আট-কাইয়া মরিয়া আছে। এই গাছগুলি মাংস খাওয়ার জন্য প্রাণী শিকার করে কি না তাহা আজও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। তবে অনেকেই মনে করেন ইহারা আংশিক ভাবে মাংসাশী।

শিকারী উদ্ভিদের কথা এইখানেই শেষ করিলাম, সারা পৃথিবীতে ইহাদের জাতি হিসাবে মোট সংখ্যা পাঁচ শতের কিছু উপর হইবে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহারা আছে।

গল্প ও কাহিনী

জ্যাক ও শিমগাছের কাহিনী

এক

এক গ্রামের একটি ছোট্ট কুটীরে এক দরিদ্র বিধবা বাস করতেন। সংসারে তাঁর আপন বলতে ছিল একমাত্র পুত্র। তার নাম জ্যাক।

জ্যাক কোন কাজকর্ম্ম করত না; মায়ের আদরে সে দিনের পর দিন অলস এবং বেহিসাবী হয়ে উঠছিল। আয় না থাকায় তাদের সামান্য যা সঞ্চয় ছিল তা খরচ হয়ে গিয়েছিল। ছিল মাত্র একটি গরু। অবশেষে সেই গরুটিকেও বিক্রয় করা ভিন্ন তাদের অন্য উপায় আর রইল না।

একদিন জ্যাক গরুটিকে বিক্রয় করবার জন্য তাকে হাটে নিয়ে চলল। পথে তার সঙ্গে সহসা এক বৃদ্ধ ফেরিওয়ালার দেখা হ'ল। জ্যাক গরুটি বিক্রয় করতে চায় জেনে ফেরিওয়ালা বললে যে, সে গরুটি কিনতে পারে, তবে তার কাছে টাকা নেই, টাকার বদলে সে জ্যাককে কতকগুলি শিমগাছের চারা দিতে পারে, যেগুলি মাটিতে রোপণ করলে শীঘ্রই বড় শিমগাছে পরিণত হবে এবং সেই গাছ থেকে প্রচুর শিম উৎপন্ন হবে। এই বলে ফেরিওয়ালা জ্যাককে শিমগুলি দেখালে। সেগুলি সাধারণ শিম নয়, তাদের আকার, গঠন ও বর্ণ ভারী বিচিত্র। জ্যাক সেগুলি দেখে আকৃষ্ট হয়ে গরুর বদলে সেই শিমগুলি নিয়ে বাড়ী ফিরল।

দামী গরুর বদলে কতকগুলো বাজে সব্জি! মায়ের রাগ ও দুঃখের অবধি রইল না। শিমগুলোকে জানলা গলিয়ে বাগানের মধ্যে ফেলে দিয়ে অধীর

ফেরিওয়ালা জ্যাককে শিমগুলি দেখালে

কণ্ঠে তিনি বললেন—"উচ্ছন্নে যাক তোমার মূল্যবান জিনিস! এতে আমার দরকার নেই।"

এই বলে তিনি চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ছেলে মাকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করলে। সে-রাত্রে মা ও ছেলের কারুর খাওয়া হ'ল না।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে জ্যাক দেখলে, তার ঘরের জানলার ওপর একটা কালো ছায়া পরেছে; কাছে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, জানলার বাইরে বাগানের জমির ওপর একটা প্রকাণ্ড লম্ব-চওড়া শিমগাছ রাতারাতি গজিয়ে উঠে বিরাট আকার ধারণ করেছে; যেমনি তার মোটা শিকড় তেমনি ডাল পালার ঝাড়; ডালগুলো পরস্পর জড়াজড়ি

কৃতসঙ্কল্প হয়ে সে গাছে চড়লে

ক'রে মই-এর মত আকার ধারণ ক'রে উপর দিকে উঠে গেছে; গাছের মাথা নীচে থেকে দেখা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে যেন তার মগ্‌-ডালটা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে।

দুই

জ্যাক ছিল সাহসী ছেলে। এই আশ্চর্য্য বিচিত্র শিমগাছের মগডালে উঠবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হয়ে সে গাছে চড়লে। উঠ্‌ছে তো উঠ্‌ছেই—ডাল-পালার ঝাড় আর ফুরোয় না। অবশেষে, কয়েক-ঘণ্টা অনবরত উঠবার পর সে গাছের মাথায় পৌঁছলো। কিন্তু একি! চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখলে যে, সে এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নতুন দেশে এসে পড়েছে; চারিদিকে ধু ধু করছে মাঠ, কোথাও কোন গাছপালা বা জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায়

জ্যাক তাঁর কাছে রাত্রের মতো আশ্রয় ও খাদ্য ভিক্ষা করলে

না—তার সামনে যেন একটা সীমাহীন রিক্ত শুষ্ক মরুভূমি পড়ে রয়েছে।

সেই আজব দেশের রাস্তা ধরে জ্যাক চলতে আরম্ভ করলে। তার তৃষ্ণা পেয়েছে খুব; ক্ষুধাও কম পায়নি। কোথাও যদি কোন মানুষের দেখা পাওয়া যায় তাহলে কিছু আহার ও আশ্রয় মিলতে পারে এই আশায় জ্যাক এগিয়ে চল্‌ল।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার আবছা আলোয় জ্যাক দেখতে পেলে অদূরে একটা বাড়ী মাথা উঁচু ক'রে যেন তাকেই ডাকছে। দ্রুতপদে কাছে গিয়ে সে দেখলে, দরজার পাশে একজন মমতা-ময়ী রমণী দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যাক তাঁর কাছে রাত্রের মতো আশ্রয় ও আহার ভিক্ষা করলে।

রমণী আশ্চর্য্য হয়ে বললেন যে, এ-অঞ্চলে জ্যাকের মতো মানুষের দেখা পাওয়া খুব বিস্ময়ের ব্যাপার, কারণ তার স্বামী হচ্ছে একজন প্রকাণ্ড শক্তিশালী দৈত্য, নরমাংস যার অতিশয় প্রিয় এবং মানুষ দেখলেই যে তাকে ধ'রে তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেলে। তার ভয়ে কোন মানুষ এ-দিকে আসে না; নরমাংস সংগ্রহের জন্যে রাক্ষস প্রত্যহ পঞ্চাশ মাইল ঘুরে আসে।

রমণীর কথা শুনে জ্যাকের বুক কেঁপে উঠ্‌ল; কিন্তু রাত বেড়ে উঠেছে তখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই, তাই সে রমণীকে বললে যে, যদি তিনি তাকে কোনস্থানে লুকিয়ে রাখেন তাহলে তাঁর স্বামী তাকে দেখতে পাবে না, সে বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, ফিরে যাবার মত শক্তি তার দেহে আর

যত্ন সহকারে তাকে নানাবিধ খাবার খাওয়ালেন

এক ফোঁটাও নেই, শুধু একটা রাতের মত তাকে আশ্রয় দেওয়া হোক।

করুণাময়ী রমণী জ্যাকের কথা শুনে তার কথায় রাজী না হয়ে পারলেন না। তাকে বাড়ীর ভিতরে এনে প্রথমে পরম যত্নসহকারে নানাবিধ খাবার খাওয়ালেন, তারপর তাকে একটা উনুনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ীখানা পায়ের দাপে কাঁপাতে কাঁপাতে দৈত্য ভিতরে এসে বিকট কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"ফী-ফো-ফাম!—আমি যে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।"

রমণী তাড়াতাড়ি বললেন—"না, না। মানুষ কোথায়! এ পথে কি মানুষ আসে! তোমার

তোমার কাঁধে যে দুটো বাছুর রয়েছে তুমি তারই গন্ধ পাচ্ছো

কাঁধে যে দুটো বাছুর রয়েছে তুমি তারই গন্ধ পাচ্ছো।"

রাক্ষস আর কোন কথা না বলে আহার করতে বস্‌ল। উনুনের ফাঁক দিয়ে জ্যাক তার খাবার বহর দেখে আতঙ্কে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে আহার শেষ ক'রে বজ্রের মত আওয়াজে দৈত্য বললে—'আমার মুরগীটাকে নিয়ে এসো।"

দৈত্য-পত্নী ভিতরকার ঘর থেকে একটি সুন্দর মুরগী এনে তাকে রাক্ষসের সামনে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলেন।

দৈত্য তার দিকে চেয়ে বললে—"ডিম পাড়্‌" সঙ্গে সঙ্গে মুরগীটা একটি নিরেট সোনার ডিম পাড়লে।

"আর একটা। আর একটা।"

এমনি করে রাক্ষস যতবার বল্‌লে ততবার মুরগীর পেট থেকে এক একটা সোণার ডিম বেরুতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রাক্ষস খুশী হয়ে তার স্ত্রীকে

একটি সুন্দর মুরগী এনে তাকে রাক্ষসের সামনে টেবিলের উপর বসিয়ে দিলেন

শয়ন করতে যেতে বললে এবং নিজেও সেইখানে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে আরম্ভ করলে।

তিন

সুযোগ বুঝে জ্যাক উনুন থেকে বেরিয়ে মুরগীটাকে দুহাতে বগল দাবা ক'রে ভোঁ-দৌড়! দৈত্য তার এই দুঃসাহসিক কাণ্ড জানতে পারলে না। জ্যাক নিরাপদে শিম গাছ বেয়ে নিজের বাড়ী এসে পৌছল।

মা ছেলেকে দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ছেলেটা হয়ত কোন ভীষণ বিপদে পড়েছে। তারপর জ্যাক যখন তাঁর সামনে একটা মুরগী বসিয়ে তাকে দিয়ে পরপর অনেকগুলি সোণার ডিম পাড়ালে তখন মায়ের আনন্দ দশ গুণ বেড়ে উঠ্‌ল।

জ্যাক এবং তার মায়ের দুঃখ ঘুচে গেল। সোণার ডিম বেচে অনেক টাকা পেয়ে তারা পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগল।

কয়েকমাস পরে জ্যাকের মনে হল, আর-একবার সেই রাক্ষসের দেশে গেলে মন্দ হয় না;

মুরগীটাকে দুহাতে বগল দাবা করে ভোঁ-দৌড়

তাহলে আরও কিছু ধন-দৌলত সংগ্রহ করে আনা যায়।

কল্পনাকে কাজে পরিণত করতে সে দেরী করলে না। তাকে চিনতে পারলে পাছে দৈত্য-পত্নী তাকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে না দেয় এই জন্য সে এবার একটা ছদ্মবেশ পরলে।

এবারও সেই রমণী ঠিক পূর্ব্বের মত দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে জ্যাক অতি কাতরভাবে জানালে যে, সে পথ হারিয়েছে, একটি রাতের মত সে একটু আশ্রয় চায়।

দৈত্য-পত্নী তাকে বললেন যে, তাঁর স্বামী একজন নিষ্ঠুর রাক্ষস, তার সামনে পড়লে রক্ষা নেই! আরও বললেন যে, কয়েক মাস আগে ঠিক এমনি অবস্থায় তিনি অন্য একটি ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ছেলেটি তাঁর স্বামীর একটি মূল্যবান রত্ন নিয়ে পালায় এবং সেই ঘটনার পর থেকে তাঁর স্বামী অতিশয় রাগান্বিত হয়ে আছেন।

যাই হোক, অবশেষে জ্যাকের কাকুতিতে বিগলিত হয়ে রমণী তাকে আশ্রয় দিলেন এবং

শিমগাছ বেয়ে নিজের বাড়ী এসে পৌছল

তাকে একটা অব্যবহৃত জিনিস-পত্র-বোঝাই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন।

চার

দৈত্য যথাসময়ে ফিরে এল। আগুনের পাশে বসে শীত নিবারণ করতে করতে দৈত্য হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"ফী-ফো-ফাম! আজো যে আবার মানুষের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি! এর মানে কি?"

তার স্ত্রী তাকে বললেন—"তোমার অনুমান ভুল। মানুষ কোথাও নেই।"

দৈত্য স্ত্রীর কথা বিশ্বাস ক'রে আহার করতে বসল। ভোজন-পর্ব্ব শেষ হলে সে বললে—"আমার টাকার থলিগুলি নিয়ে এসো।"

জ্যাক বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল, একটা থলি থেকে বেরুচ্ছে কেবল মোহর, অন্য থলি থেকে রূপার টাকা!

কিছুক্ষণ ধরে দৈত্য টাকাগুলো নিয়ে খেলা করলে, তারপর তাদের থলির মধ্যে ভ'রে থলি দুটো পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

সময় বুঝে জ্যাক তার গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে থলি দুটো নিঃশব্দে উঠিয়ে নিয়ে পলায়ন করলে।

শিমগাছের কাছে এসে সে হাঁপিয়ে পড়ল। থলি দুটো ভীষণ ভারী; তাদের নিয়ে গাছ বেয়ে নেমে যাওয়া সম্ভবপর নয়; তাই সে থলির মুখ খুলে টাকাগুলো বাগানের মধ্যে ঢেলে দিলে তারপর তরতর্ করে নেমে এল।

তার মা গাছের তলায় তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ ঝন্ঝন্ শব্দে তাঁর মাথায় টাকার বৃষ্টি পড়তে লাগল। শূন্য আকাশ থেকে ঝরঝর করে বৃষ্টির মত টাকা ঝরে পড়তে দেখে

আজো যে আবার মানুষের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি

প্রথমে তিনি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন, তারপর ছেলেকে দেখে এবং তার মুখে ব্যাপার শুনে তাঁর আনন্দ এবং সুখের অবধি রইল না।

তারপর তিন বছর জ্যাক আর শিমগাছের ওপর উঠল না। কিন্তু তিন বছর পরে তার মন আবার উস্খুস করতে লাগল—আর-একবার সে সেই দৈত্য-পুরীতে হানা দিতে চায়! তার সংকল্প শুনে তার মা ভয় পেলেন এবং তাকে অনেকবার বারণ করলেন, কিন্তু সাহসী ছেলে জ্যাক তার মাকে আশ্বস্ত ক'রে অন্য-একটি ছদ্মবেশ পরে

পরদিন প্রত্যূষে আবার শিমগাছে আরোহণ করলে।

সন্ধ্যার সময় রাক্ষসের বাড়ীর সুমুখে পৌছে সে দেখলে, সেই রমণী ঠিক তেমনিভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ছদ্মবেশী জ্যাককে তিনি চিনতে পারলেন না, তার কান্না-ভেজা কণ্ঠের মিনতিপূর্ণ কথায় ভুলে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং

কিছুক্ষণ ধরে দৈত্য টাকাগুলো নিয়ে খেলা করলে

অন্যান্যবারের মত এবারও তাকে একটি প্রকাণ্ড উনুনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন।

পাঁচ

আগেরই মত রাত্রে দৈত্যরাজ বাড়ী এসেই গর্জ্জন ক'রে উঠল—"ফী-ফো-ফাম! আমি আজ আবার নর রক্তের গন্ধ পাচ্ছি।"

এই বলে সে চতুর্দ্দিক খুঁজতে লাগল। ভয়ে জ্যাকের বুকের রক্ত বরফ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল, এইবার বুঝি সে ধরা পড়ে যাবে এবং তাহলে আর রক্ষা নেই! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দৈত্য জ্যাকের গুপ্তস্থানের কাছে গিয়েও তাকে দেখতে পেলে না।

আহারাদি শেষ ক'রে দৈত্য তার স্ত্রীকে তার প্রিয় বীণাটি নিয়ে আসতে বললে। জ্যাক দেখলে, দৈত্য-পত্নী একটি অতি সুদৃশ্য বীণা এনে স্বামীর সামনে রাখলেন। দৈত্য বীণাকে আদেশ করলে—"বাজো।" অমনি সেই বাদ্য যন্ত্রের ভিতর থেকে

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে তার মাথায় টাকার বৃষ্টি পড়তে লাগল

অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুর নির্গত হ'তে লাগল। সেই সুর শুনতে শুনতে দৈত্য ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন জ্যাক উনুন থেকে বেরিয়ে এল। এই আশ্চর্য্য বীণা-যন্ত্রটি তার চাই! কাছে গিয়ে সে বীণাটি তুলে নিলে। কিন্তু সে-বীণাটি ছিল মন্ত্রঃপূত; জ্যাক তাকে হাতে তুলে নিতেই সে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠল—"কর্ত্তা, কর্ত্তা, জাগুন। আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।"

দানবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পলায়নরত জ্যাককে দেখে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"ওরে সয়তান! তুই-ই তাহলে আমার মুরগী আর টাকা নিয়েছিস! এখন আমার বীণা নিয়ে পালাচ্ছিস! দাঁড়া, তোকে ধরে আমি জীবন্তে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো।"

এই বলে দৈত্য জ্যাকের পিছু পিছু ধাবিত হ'ল।

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে জ্যাক শিমগাছের

কাছে এসে ক্ষিপ্রবেগে নেমে পড়ল। নীচে নেমে সে দেখলে, তার মা তার বিপদের আশঙ্কা ক'রে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।

উনুনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন

জ্যাক বললে—"মা, আমি এসেছি। কেঁদো না। চট ক'রে আমায় একটা কুড়ুল এনে দাও।"

মাথার উপর প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। দৈত্য গাছ বেয়ে নীচে নামছে।

কুড়ুল হাতে নিয়ে জ্যাক শিমগাছের কাছে গিয়ে দু-তিন কোপে তার গোড়া কেটে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় ক'রে রাক্ষসটা উঁচু থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। পড়বার সময় তার মাথাটা ছিল নীচের দিকে, তাইতে তার মাথায় এমন সাংঘাতিক আঘাত লাগল যে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল।

তখন জ্যাকের আনন্দ দেখে কে? সে সোল্লাসে চীৎকার করে তার মাকে ডেকে এনে দৈত্যটাকে দেখালে এবং একে একে দৈত্যপুরীর সব কথা তাকে বললে। জ্যাকের মা ত এসব কিছু জানতেন না। তিনি সব কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেন এবং জ্যাক যে এমন বিপদের হাত থেকে বেঁচে এসেছে, সেজন্য ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন।

তার পর? তারপর আর কি! জ্যাক এবং তার মায়ের আর কোন ভয় রইল না। অনেক

দৈত্য জ্যাকের পিছু পিছু ধাবিত হইল

ধন-সম্পদ লাভ ক'রে তারা পরম সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

কোর্-আন্

কোর্বাণী
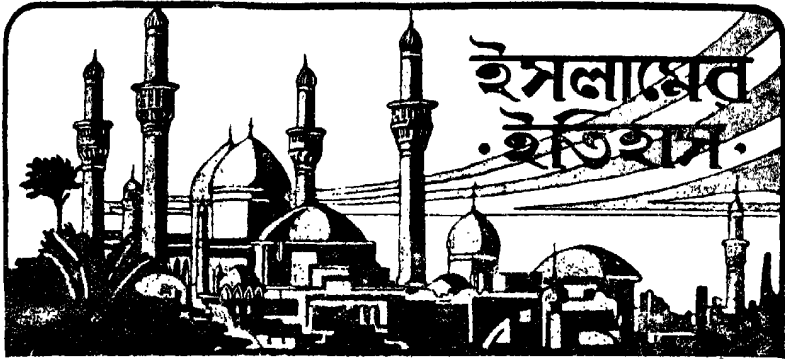
হজরৎ ইছমাইল ও বিবি হাজেরার নির্বাসনের কথা তোমরা পড়িয়াছ। ইছমাইল যখন দশ বৎসরের বালক তখন একদিন রাত্রিতে হজরৎ ইব্রাহিম, কোরবাণী করিবার জন্য স্বপ্নযোগে এক স্বর্গীয় আদেশ প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী তিনি পরদিন প্রত্যূষে আল্লার উদ্দেশে কতিপয় উট কোরবাণী করিলেন। পর দিন রাত্রিতে আবার পূর্ব্ববৎ স্বপ্নাদেশ হইল; এবারও পূর্ব্ববৎ আরও কতিপয় উট কোরবাণী করিলেন। তৃতীয় রজনীতে আবার স্বপ্নাদেশ হইল, "ইব্রাহিম, তোমার প্রিয়তম বস্তুকে তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে কোরবাণী কর।" হজরৎ ইছমাইল তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র। সুতরাং তিনিই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। ভক্তশ্রেষ্ঠ ইব্রাহিম স্থির করিলেন তাঁহার এই প্রিয়তম পুত্রকেই আল্লার উদ্দেশে কোরবাণী দিবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনে, নিমন্ত্রণ রক্ষার ভাণ করিয়া পুত্রসহ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সঙ্গে গোপনভাবে একটী ছুরি ও একখণ্ড রশিও লইলেন। পথিমধ্যে শয়তান ইছমাইলকে বলিল—"ইছমাইল, তোমার পিতা তোমাকে কোরবাণী করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। তুমি পলায়ন কর।"
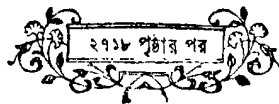
ইছমাইল শয়তানের কথায় কর্ণপাত করিলেন না বরং মনে মনে বলিলেন, "পিতা কখনও পুত্রকে কোরবাণী করে?" এই বলিয়া শয়তানের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন—শয়তান অন্তর্দ্ধান করিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে শয়তান আবার পূর্ব্ববৎ ইছমাইলকে বাধা দিল। এবারও তিনি শয়তানের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে পূর্ব্ববৎ কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। শয়তান ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া এবারও ফিরিয়া গেল। কিন্তু সে দমিবার পাত্র নহে। সে ইছমাইলকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য আরও উৎকৃষ্ট ফন্দি খুঁজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার ইছমাইলের পথরোধ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "ইছমাইল, তুমি বালক, তোমার পিতার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার বিমাতার আদেশে সে তোমাকে হত্যা করিতে লইয়া যাইতেছে। ঐ দেখ তাঁহার জামার মধ্যে রশি ও ছুরিকা লুক্কায়িত।" এবার ইছমাইলের

মনে ধরিল। তিনি তখন পিতাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আপনার জামার মধ্যে ছুরি ও রশি কেন?" পিতা এখন আর উদ্দেশ্য গোপন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "বাছা, গত রাত্রিতে আমি তোমাকে আল্লার উদ্দেশে কোরবাণী করিবার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়াছি, তাই তোমাকে কোরবাণী করিবার জন্য রশি ও ছুরিকা সহ এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছি।" এই বলিয়া পুত্রস্নেহে দরদর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইছমাইলও বাল্যকাল হইতেই পিতার ন্যায় পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি পিতাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "পিতঃ আশ্বস্ত হউন, আপনিই বলেন 'আল্লার উপর সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভর করাই ইছলাম'। সুতরাং আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সেই মঙ্গলময় একমাত্র আল্লার উপর সম্পূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য হউক।" এই বলিয়া তিনি শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। ইছলামের আদিগুরু হজরৎ ইব্রাহিম ও হজরৎ ইছমাইলের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য এখনও হাজীগণ উক্ত তিন স্থানে শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

অতঃপর মক্কা হইতে পূর্ব্বদিকে ছয় মাইল দূরে মীনা নামক পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী এক নির্জ্জন উপত্যকায় পুত্রের হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক, পুত্র-স্নেহ যাহাতে এই সৎকার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে না পারে তজ্জন্য তাহাকে মৃত্তিকাভিমুখী করিয়া শোওয়াইয়া নিজ চক্ষু বস্ত্রাবৃত করতঃ পুত্রের গ্রীবাদেশে তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা দিয়া আঘাত করিলেন। ছুরিকা চর্ম্মভেদ করিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার আবার সজোরে ছুরিকা চালনা করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তীক্ষ্ণধার ছুরিকা গ্রীবার একটী পশমও কাটিতে পারিল না। আল্লার আদেশ পালনে বাধা হইতেছে দেখিয়া ভক্তপ্রবর ইব্রাহিম রাগান্বিত হইয়া ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে পুত্র অধীর হইয়া পিতাকে পুনঃপুনঃ তাগিদ দিতে-ছেন। ইব্রাহিম ছুরিকা আনিবার জন্য চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, তীক্ষ্ণধার ছুরি অদূরে পাহাড়ের গায়ে পড়িয়া পাষাণ ভেদ করিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। আজিও মীনা পাহাড়ে সেই দ্বিধা-বিভক্ত পাষাণখণ্ড অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। হজরৎ ইব্রাহিম লজ্জিত বদনে আবার ছুরিকা হাতে লইয়া পূর্ব্ববৎ চক্ষু আবৃত করিয়া পুত্রের গ্রীবায় আঘাত করিতে যাইবেন এমন সময় দৈবাদেশ হইল, "ইব্রাহিম, তোমার কোরবাণী কবুল হইয়াছে। পুত্রকে আর কোরবাণী করিতে হইবে না। চক্ষু খোল, পুত্রের পরিবর্ত্তে দুম্বা কোরবাণী কর।" হজরৎ ইব্রাহিম চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। নদী যেমন তার সমস্ত জলধারা সিন্ধুর চরণে ঢালিয়া দেয়, হজরৎ ইব্রাহিমও আজ তাঁহার হৃদয়ের এই অপরিমেয় কৃতজ্ঞতার সলিল-ধারা, সমস্ত ভক্তির, সমস্ত কৃতজ্ঞ-তার আধার, অসীম আল্লার পায়ে, পরম আগ্রহে ঢালিয়া দিবার জন্য নদীর ন্যায় ছেজদায় অবনত হইলেন। অতঃপর পুত্র সমভিব্যাহারে দুম্বা কোরবাণী করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এই প্রথার অনুকরণ করিয়া আজিও হাজীগণ জুলহজ মাসের ১০ই, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই তারিখে মীনায় উট, দুম্বা প্রভৃতি কোরবাণী করিয়া থাকেন; এবং সমগ্র মোছলেম জগৎ এই কয়দিন ধরিয়া এই প্রাচীন প্রথানুযায়ী কোরবাণী করিয়া থাকেন।

কোর্-আনের বিধানানুযায়ী প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির পক্ষে কোরবাণী করা 'ওয়াজেব'। ৭ জনে মিলিয়া একটী গরু বা উট কোরবাণী করিতে পারে কিন্তু ছাগল, মেষ, দুম্বা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটী করিয়া কোরবাণী করিতে হয়। কোর-বাণীর পশুর মাংস দীন দরিদ্রদিগকে দান করিতে হয়। সুতরাং কোরবাণী দরিদ্রের সেবার একটী উৎকৃষ্ট বিধান। দরিদ্রের সেবাই ধর্ম্ম!

শুধু পশুবলিই কোরবাণীর উদ্দেশ্য নহে। হজরৎ ইব্রাহিম শত শত উট কোরবাণী করিয়াছেন কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। অবশেষে যখন স্বীয় প্রিয়তম পুত্রকে কোরবাণী করিতে উদ্যত হইলেন, তখনই উহা কবুল হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে পশুবলিই কোরবাণীর উদ্দেশ্য নহে। মানুষের অন্যতর উপাদান 'পশুত্ব'। এই পশুত্বকে কোরবাণী করাই কোরবাণীর মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বার্থই এই পশুত্ব। ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিকৃষ্ট পদার্থ হইতে প্রাণীজগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব মানবের উদ্ভব হইয়াছে। এই মানুষের মধ্যে চন্দ্রের কলঙ্কবৎ পশুত্বরূপ যে কলঙ্ক বিদ্যমান রহিয়াছে, স্রষ্টার এই বাঞ্ছিত প্রাণী মানব, সেই কলঙ্ক হইতে

মুক্ত হইতে পারিলেই দেবত্বের সীমায় উপনীত হইতে পারে। ক্রমবিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যও তাহাই। মানুষ যাহাতে তাহার পশুত্বকে পরিহার করিয়া দেবত্বে উপনীত হইতে পারে তজ্জন্যই স্রষ্টার এই কোরবাণীর বিধান।

কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ হজরৎ ইব্রাহিমের ন্যায় অতটা সবল নহে। সেইজন্য আমাদের প্রতি পুত্র কোরবাণীর আদেশ না হইয়া পশু কোরবাণীর আদেশ হইয়াছে। এই নিমিত্ত কোরবাণীর পশু এমন হওয়া আবশ্যক যেন তাহাতে কোরবাণী-দাতার অন্তরের ঐকান্তিক স্নেহ-মমতা জন্মে। এই জন্য কোরবাণীর পশু নিখুঁত হওয়া আবশ্যক; এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে অপত্য-স্নেহে লালন-পালন করিতে হয়, যেন তাহাতে পুত্রবাৎসল্য জন্মে। এই প্রিয় বস্তুকে যিনি অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক নিঃস্বার্থ, তিনিই মহান্। যিনি স্বার্থহীন তিনিই বিশ্বপ্রেমিক, তিনিই মানবশ্রেষ্ঠ। সুতরাং কোরবাণীর বিধান, মানুষকে দেবত্বে উপনীত করিবার অন্যতম সোপান।

হজের অন্যতম বিধান **'এহ্‌রাম'**। এহ্‌রাম শব্দের অর্থ নিষেধ। পবিত্র কাবা গৃহের চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী কতিপয় মাইল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে **'বৃহত্তর হরম'** এবং কাবার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে **'ক্ষুদ্র হরম'** বলা হয়। হরম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ স্থান। হজরৎ মোহাম্মদের পূর্ব্বে আরববাসিগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দুরন্ত ছিল। ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীকরণোদ্দেশ্যে কাবার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী এই নির্দ্দিষ্ট স্থানকে 'নিষিদ্ধ স্থান' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই স্থানে ১০ই জুলহজ পর্য্যন্ত হজের নির্দ্দিষ্ট কয়দিন হাজী-দিগকে 'এহ্‌রাম ব্রত' পালন করিতে হয়। এই ব্রত উদ্‌যাপনের সময় সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা, বর্ব্বরতা, নৃশংসতা এমন কি পরস্পরে হিংসা পর্য্যন্ত পোষণ করা নিষেধ। মানুষ দূরের কথা, কোনরূপ প্রাণিহত্যা এমন কি মশা, মাছি, ছারপোকা পর্য্যন্ত বধ করা, নিজ শরীরের লোম নখাদি কাটা, কোন প্রকার বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এই কঠোর বিধানের ফলে বর্ব্বর উচ্ছৃঙ্খল আরব জাতি বংশপরম্পরাগত হিংসা, বিদ্বেষ ভুলিয়া উদার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক বিরাট সভ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। আল্লাহ্ কোর্-আনে বলিয়াছেন, "তোমরা জ্বলন্ত অগ্নির ধারে ছিলে আমরা তোমাদিগকে শান্তির কোলে আনয়ন করিয়াছি।"

হজরৎ আদম

পৃথিবীর যুগকে পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সময় হইতে জ্ঞানের প্রসার ও লেখাপড়ার বিস্তার হইয়াছে, এবং জাতির বিবরণ অল্প বিস্তর লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই সময় হইতে পরবর্ত্তী কালকে ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়। ইহার পূর্ব্বের অন্ধকার যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়।

ইতিহাসের কোন প্রত্যক্ষ উপাদান বর্ত্তমান না থাকিলেও এই অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে চলে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে পণ্ডিতগণ যুগের এই অন্ধকার অজ্ঞাত প্রদেশে অভিযান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। আশা করা যায় অচিরকাল মধ্যে অভিযানকারিগণ দৃশ্যমান অন্ধকারের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারিবেন। তখন সত্যই যুগের পার্থক্য মুছিয়া যাইবে।

যদিও আমাদের সে সময় এখনও আসে নাই তথাপি স্বল্প জ্ঞানে আমরা দেখি মানবের উৎপত্তির একটা নির্দ্দিষ্ট কাল ছিল। একই সময় পৃথিবীতে এতগুলি মানবের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ইহা অবিসম্বাদিতরূপে সত্য যে, মানব জাতির একজন আদি পিতা ছিলেন। সেই আদি পিতা হইতেই বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কোর্-আন্ ও বাইবেল হইতেই আমরা এই আদি-মানবের সম্বন্ধে কতক ইঙ্গিত পাইতে পারি।

কোর্-আনের টীকাকারগণ ও আরব ভৌগোলিকগণ সিংহল দ্বীপকে আদি মানবের উৎপত্তিস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে এখনও **আদমের পর্ব্বত** (Adam's Peak) প্রভৃতি তাহার অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন, সিংহল হইতে তিনি পত্নীহারা হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় দুইশতাধিক বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ

করিতে করিতে অবশেষে আরবের অন্তর্গত আরাফা (Arafa) নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন।

আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণের মতে যবদ্বীপই আদি মানবের উৎপত্তিস্থান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোর্-আনের টীকাকারগণের উক্তিতে ও আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণের মতে বিশেষ পার্থক্য নাই। সিংহলে বা যবদ্বীপে, যেখানেই হউক ভারত মহাসাগরীয় একদ্বীপে যে আদি মানবের উদ্ভব হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এই উভয় মতই এক।

যাহা হউক এই আদি মানবের প্রথম উৎপত্তি স্থান লইয়া বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেহ বলেন, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপে, কেহ বলেন চীনে, আবার কেহ বলেন ভারতে, কেহ বলেন ইউরোপে প্রথম তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাঁহার এই প্রথম উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারিবেন কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। এখন তাঁহার উৎপত্তির কালই আমাদের বিচার্য্য।

প্রাণিবিজ্ঞান অনুযায়ী পশু হইতে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যে স্থান হইতে পশু-জীবন শেষ হইয়া মানব জীবনের আরম্ভ হইয়াছে সেই ভেদরেখার পরিকল্পনা যদিও জ্যামিতি শাস্ত্রের রেখার ন্যায় অবাস্তবের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, তথাপি অঙ্কশাস্ত্রের সূক্ষ্ম অঙ্কুশাঘাতে উহার একটা বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তথাপি এই ভেদ-রেখার অব্যবহিত পরবর্ত্তী জীবকে মানব নামে আখ্যাত করা হইবে কি না তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন। এই ভেদরেখার পরমুহূর্ত্ত হইতেই যে জীবের কল্পনা করা হয় কোর্-আন্ তাহাকে মানব নামে আখ্যাত করে নাই। কারণ তখনও পশুত্বই এই শ্রেণীর জীবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্য-মান ছিল। কালক্রমে বহুযুগের পর ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে, এই শ্রেণীর জীবের মধ্যে যখন বিবেক বুদ্ধির সঞ্চার হইল, ভাষার উৎপত্তি হইল, অঙ্গাবরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল, বাসগৃহ নির্ম্মাণ, কৃষি-কার্য্য প্রভৃতির কৌশল উদ্ভাবিত হইল—এক কথায় যখনই এই শ্রেণীর জীব মানবোচিত জীবন যাপন করিতে শিখিল, তখন হইতে তাহাকে মানব নামে আখ্যাত করা হইল। ইনিই কোর্-আনের আদম বা আদি মানব। সুতরাং কোর্-আনের আদমকে নব প্রস্তর যুগের প্রথম মানুষ বলা যায়। কারণ তাঁহারই সময় পাথরের ব্যবহার ও পাথর হইতে অগ্নি উৎপাদন-প্রথা উদ্ভাবন হয়। রামায়ণে মানব জাতির অপেক্ষাকৃত সভ্য শাখাকেই শুধু মানব নামে আখ্যাত করা হইয়াছে; অসভ্য শাখাকে তখনও বানর নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

কোর্-আন্ বলিতেছে—"যখন তোমার প্রতি-পালক স্বর্গীয় দূতগণকে বলিলেন আমি পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী স্থাপন করিব, তখন দূতগণ বলিলেন, যাহারা পৃথিবীতে কলহ বিবাদ সৃষ্টি করিবে, রক্তপাত করিবে, আপনি তাহাদিগের উদ্ভব করিতে যাইতেছেন? আমরাই আপনার উপাসনা অর্চ্চ-নাদি সম্পাদন করিব। তখন আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।' অতঃপর তিনি আদমকে সমস্ত দ্রব্যের নাম শিখাই-লেন। আদম আল্লার নিকট হইতে সমস্ত দ্রব্যের নাম শিখিয়া তাঁহারই আদেশে দূতগণের নিকট ঐগুলি প্রকাশ করিলেন। দূতগণ লজ্জিত হইলেন। অতঃপর তিনি দূতগণকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা আদমকে অভিবাদন কর'। ইব্লিছ ব্যতীত সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখন আল্লাহ্ আদমকে বলিলেন, 'হে আদম, আজ হইতে ইব্লিছ তোমাদের শত্রু হইল। তুমি ও তোমার স্ত্রী এই স্বর্গের বাগানে অবস্থান কর; যাহা ইচ্ছা ভক্ষণ কর কিন্তু 'এই' বৃক্ষের নিকটে যাইও না, তাহা হইলে তোমাদের অধঃপতন হইবে।'

আদমকে অভিবাদন করিল না বলিয়া আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হইয়া, ইব্লিছকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলেন। সুতরাং যাহার জন্য তাহার এই অধঃপতন, তাহার শত্রুতা সাধন করিতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

আদমকে আল্লাহ 'এই' বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সুতরাং ইব্লিছ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিপথগামী করিতে প্রয়াস পাইল। সে তখন সর্পের আকার ধারণ করিয়া ময়ূরের সহায়তায়, সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের নীচে গিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। বিলাপ শুনিয়া আদম ও হাওয়া সেই বৃক্ষের নীচে গমন করিলেন। শয়তান তখন তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া অবনত মস্তকে করুণস্বরে বলিতে লাগিল, "আদম, আল্লাহ্ তোমাদিগকে 'এই' বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার

কারণ কি জান? 'এই' বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে। তোমরা যাহাতে অমরত্ব লাভ করিতে না পার সেই জন্যই আল্লাহ্ তোমাদিগকে ইহার ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তোমরা আমার কথা শুন, এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া অমরত্ব লাভ কর।" হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়া আদিমানব সুলভ নগ্ন দেহে আলুলায়িত কুন্তলে সেই বৃক্ষনিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া, শয়তানের উপদেশ বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

লীলাময়ের লীলা বুঝে কার সাধ্য? তিনি সকল বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সুতরাং কখন কি ভাবে কোন যন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন তাহা তিনি ভিন্ন কে বুঝিবে? তিনি সকল রাসায়নিকের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক; সুতরাং কি ভাবে কাহার সহিত কিসের মিশ্রণ করিয়া কোন্ অবস্থার উদ্ভাবন করিতেছেন তিনি ভিন্ন তাহা কে বুঝিবে? তিনি আদমকে পূর্ব্বেই 'এই' বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অথচ আদম আল্লার নিষেধের কথা ভুলিয়া শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন। মানুষ জড়জগতের রাসায়নিক; আর আল্লাহ্ আধ্যাত্মিক জগতের রাসায়নিক। সুতরাং কোন্ ভাবের সংমিশ্রণে তিনি কোন্ পরিস্থিতির উদ্ভব করেন, তিনি ভিন্ন তাহা আর কেহই জানেন না। এই জন্যই তিনি কোর্-আনে বলিয়াছেন, "আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।" ফলতঃ জগতের শিক্ষার জন্য, জগতের মহাকল্যাণের জন্য, তিনি এইরূপ অকল্পিত-পূর্ব্ব পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়া থাকেন।

শয়তানের প্রলোভনে ভুলিয়া হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়া যেমন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন, অমনি তাঁহাদের চক্ষে লজ্জা দেখা দিল। তখন তাঁহারা বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া বৃক্ষপত্র দ্বারা লজ্জা-নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মানবের মনে এই প্রথম লজ্জার উন্মেষ হইল ও তাহা নিবারণের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। দৈববাণী হইল, "আদম, তোমাকে পূর্ব্বেই ত নিষেধ করিয়াছিলাম; তুমি কেন সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে? এখন স্বর্গে আর তোমাদের স্থান হইবে না; তোমরা পৃথিবীতে যাও; সেখানে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ কর।"

আদম ও হাওয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উভয়ে বিভিন্ন দিকে গমন করিলেন। বহুদিন একের সহিত অন্যের সাক্ষাৎ হইল না। উভয়েই বিচ্ছেদানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। এই বিচ্ছেদের সময়টা বাস্তবিকই তাঁহাদের কাছে অতি ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কোথাও শ্বাপদসঙ্কুল সীমাহীন দুর্গম অরণ্যানী, কোথাও দিগন্তপ্রসারী নিরবচ্ছিন্ন বালুকারাশি, কোথাও অভ্রভেদী দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা, কোথাও বা উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত অনন্ত বিস্তৃত জলরাশি! বন্য পশুপক্ষিগণ তাঁহাদের উদ্‌ভ্রান্ত আকৃতি দেখিয়া, সবিস্ময়ে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে; সকলেই যেন আজ হিংসা ভুলিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহাদের প্রাণে শান্তি আসিতেছে? কখন ভয়ে, কখন বিস্ময়ে, কখন বিরহ-বেদনে, তাঁহাদের শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে! আবার স্বীয় কৃতা-পরাধের জন্য অনুতাপে হৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতেছে। এই পশুপক্ষিসমাকুল জনমানবহীন দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যানী মধ্যে একাকী একটী মাত্র মানবের অবস্থান যে কত ভয়াবহ, কত মর্ম্মন্তুদ, তাহা হয়ত তোমরা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছ না! এ হেন মহাবিপদের সময় যদি কেহ তাঁহাদের এই দুঃখের অমানিশার অবসান করিতে পারেন, তবে তিনি বাস্তবিকই তাঁহাদের ভক্তির পাত্র, সন্দেহ নাই।

স্রষ্টার অপার মহিমা। তিনি এক অলৌকিক আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ধরণীর এই দিগভ্রান্ত নবীন অতিথিদিগকে কেন্দ্রাভিমুখী করিলেন। আদম ভ্রমণ করিতে করিতে মক্কার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী আরাফা (Arafa) নামক স্থানে উপনীত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে দয়াময় আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছি; তুমি যদি ক্ষমা না কর, তুমি যদি দয়া না কর, তবে আমাদের উদ্ধার নাই।" প্রার্থনা কবুল হইল। দৈবাদেশ হইল, "হে আদম তোমার প্রার্থনা কবুল করিলাম। তোমার পাপ ক্ষমা করিলাম। তোমরা আবার মৃত্যুর পরে স্বর্গে স্থান লাভ করিবে।"

এদিকে বিবি হাওয়াও স্বামীর ন্যায় নানাস্থান

ভ্রমণ করার পর মক্কার পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী **জেদ্দা** নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে তিনিও তথা হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া সেই **আরাফার** (Arafa) **মাঠে** উপস্থিত হইলেন। হজরৎ আদম প্রার্থনা শেষ করিয়া চক্ষু ফিরাইতেই দেখিলেন তাঁহারই নিম্নে, উপত্যকায় তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দণ্ডায়মানা। উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। হজরৎ আদম ত্বরিত গতিতে পর্ব্বতশিখর হইতে অবরোহণ করিয়া পত্নী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত বিস্তৃত আরাফার (Arafa) মাঠে উভয়ের শুভ-মিলন হইল। এই মিলনের স্থানকে আজিও **আরাফা** (Arafa) নামে অভিহিত করা হয়। **আরাফা** শব্দের অর্থ মিলন।

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনে তাঁহাদের অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-প্রসূত কৃতজ্ঞতার উদয় হইয়াছিল তাহার পরিমাণ করে কার সাধ্য? একদিন বুদ্ধিভ্রমে যাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহার কোপে উভয়ে বহুদিন বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, বহু ক্লেশ ভোগের পর আবার তাঁহারই অপার করুণায় পুনর্মিলিত হাওয়ায় তাঁহারই চরণে স্বতঃই তাঁহাদের মস্তক অবনত হইয়া আসিল। সেই দয়ার পাহাড়ে উঠিয়া, উভয়ে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তির ধারা সেই দয়াময়ের চরণে ঢালিয়া দিলেন। আজিও হাজীগণ তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থে ঐ স্থানে দুই **রেকা-আৎ নফল** (Nafal) নামাজ পড়েন এবং দয়াময় আল্লার নিকট স্বীয় পাপের ক্ষমা ভিক্ষা চান।

কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বনের পশুও উপকারীর নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সুতরাং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাহার উপকারীর নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে তাহা অতি স্বাভাবিক। অন্তরের এই কৃতজ্ঞতা হইতেই মানুষের মনে প্রথম ধর্ম্ম ভাবের উদয় হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, বৃষ্টি, ঝটিকা ভূমিকম্প, রোগ-শোক প্রভৃতির অপরিমেয় উপকার ও প্রকোপের বিষয় স্মরণ করিয়া ঐগুলিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মানবের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। এবং ঐ গুলির সৃষ্টি ও বিধানকর্ত্তা, নিরাকার আল্লার সন্ধান যাহারা পায় নাই, তাহারা ঐ গুলিকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়াছে। এই ভাবেই প্রকৃতি পূজার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু একবার বাস্তবের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করিলে মন আর অবাস্তবের শত চাকচিক্যে বিমোহিত হয় না। আদম ও হাওয়ার চোখের উপর দিয়া প্রকৃতির কত লীলা-তরঙ্গ চলিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহাদের মনশ্চক্ষু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাঁহারা ত আজ বিবেকের পাঠশালার নবীন ছাত্র। চন্দ্র-সূর্য্যের অপূর্ব্ব আভা, বৃক্ষলতাদির অপরূপ শোভা, বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীত, ফল শস্যের মিষ্ট মধুর স্বাদ, ঝড়বৃষ্টির নিষ্ঠুর প্রকোপ, রোগ-শোকের মর্ম্মন্তুদ ব্যথা, কিছুতেই তাঁহাদের মন বিচলিত হইল না— তাঁহাদের মন কোনটীকে দেবতাজ্ঞানে স্তুতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। যে **আরাফার** (Arafa) **মাঠে** আশাতীত ভাবে উভয়ের মিলন ঘটিল, আদম ও হাওয়ার মন দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত না হইলে হয়ত সেই **আরাফার মাঠ** বা সেই **জবলরহমৎ** পর্ব্বতকেই উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিত। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, দিব্যালোকে উদ্ভাসিত আদমের মন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম দয়ালু নিরাকার আল্লার উপাসনা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী একটী গৃহ-নির্ম্মাণের কামনাও তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। কামনার সঙ্গে দৈবাদেশের দ্বারা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনিও কাদার প্রলেপ দিয়া পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া, চার হাতের অনুচ্চ একটী দেয়াল দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানটী ঘিরিয়া লইলেন। **কাবার** উপাসনাগৃহের ভিত্তি প্রথম স্থাপিত হইল। ইহাই গৃহশিল্পের প্রথম আদর্শ।

আদম তখনও কৃষিকার্য্য শিখেন নাই। সুতরাং স্বভাবজ ফলমূলাদি আহরণ করিয়াই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে আর কতদিন চলিবে? মক্কার নিকটস্থ স্থানগুলির ফলমূলে আর তাঁহাদের আহার্য্য সঙ্কুলান হইতেছে না দেখিয়া ক্রমে তাঁহারা আহারান্বেষণে দূরবর্ত্তীস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

উত্তরে আর্ম্মেনিয়ার **কারাসু** (Kar-su) পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া **টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস** নামক দুইটী নদী প্রায় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইয়া পারস্যোপসাগরে পড়িয়াছে। এই দুইটী নদীর

মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি এত অধিক উর্ব্বরা যে, বিনা পরিশ্রমে বা অতি অল্প পরিশ্রমে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হইত। হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়া ক্রমে পূর্ব্ব-উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে এই উর্ব্বর ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন; এবং সেখানে জীবিকা অনায়াসলব্ধ দেখিয়া তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

ক্রমে তাঁহাদের বহু সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু আল্লার ইচ্ছায় প্রত্যেকবারেই একটী পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিত। প্রথমবার '**কাবিল**' নামক একটী পুত্র ও **আকলিমা** নাম্নী একটী কন্যা, দ্বিতীয়বার '**হাবিল**' নামক একটী পুত্র ও **গাজ** নাম্নী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

এখনকার ন্যায় তখন বহু জনসংখ্যা ছিল না; সুতরাং বিভিন্ন পরিবারে পুত্রকন্যার বিবাহের সুযোগ ছিল না। এই নিমিত্ত সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। হজরৎ আদম স্থির করিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র **কাবিলের** সহিত গাজের এবং কনিষ্ঠপুত্র **হাবিলের** সহিত আকলিমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু গাজ অপেক্ষা আকলিমা অধিকতর রূপলাবণ্যবতী ছিলেন বলিয়া কাবিল গাজকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল। মাতাপিতা অনেক বুঝাইলেন। কোনই ফল হইল না। কাবিল অচল অটল। সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ আদম, ন্যায় বিচারের মালিক আল্লার উপরে ইহার মীমাংসার ভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়া, পুত্রগণকে বলিলেন, "তোমরা মীণা পাহাড়ে কোরবাণী দাও; যাহার কোরবাণী স্বর্গীয় অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইবে, তাহার সহিত আকলিমার বিবাহ হইবে। উভয়েই মহা আনন্দিত। প্রত্যেকেই মনে করিতেছে তাহার কোরবাণীই কবুল হইবে। কিন্তু—

> পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি
> মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্যামী।

উপদেশানুযায়ী মীনা পাহাড়ে কোরবাণী দেওয়া হইল। কিন্তু আল্লার মহিমা মানববুদ্ধির অগম্য। হাবিলের কোরবাণী স্বর্গীয় অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইল। অতএব হাবিলের সহিতই আকলিমার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। (এই মীনা পাহাড়ে পরবর্ত্তীকালে হজরৎ ইব্রাহিম স্বীয় একমাত্র পুত্র হজরৎ ইছমাইলকে কোরবাণী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এখনও হজ্বের সময় হাজীগণ এখানে কোরবাণী করিয়া থাকেন।)

নির্দ্দিষ্ট দিনে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু কাবিল অনুদিন প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। সে কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল কেমন করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহার সুখের পথের কণ্টক দূরীভূত হইবে।

প্রথম মানব। কূটবুদ্ধি তখনও তাহার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে নাই। কিরূপে সে তাহার পরম শত্রুর নিধন সাধন করিবে, সে জ্ঞান তাহার মাথায় তখনও গজায় নাই। অথচ সে শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে সকল সময়ই এই চিন্তায় ব্যস্ত। তাহার চিন্তার অবধি নাই।

একদিন একটী সর্প তাহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ প্রকাণ্ড এক খণ্ড প্রস্তর কোথা হইতে সবেগে সর্পের উপর পতিত হইল। সর্পের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সর্প হতচেতন হইল। প্রকৃতির নিকট হইতে কাবিল মহা শিক্ষালাভ করিল। তাহার অসদুদ্দেশ্য সাধনের উপায় নির্ণীত হইল।

জুলহজ মাস। আদম সস্ত্রীক হজব্রত সম্পাদন করিতে মক্কায় গমন করিয়াছেন। একদিন হাবিল পাহাড়ের সান্নদেশে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া কে যেন কাবিলের মনের মধ্য হইতে ডাক দিয়া বলিল—"কাবিল, তোমার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র অন্তরায়কে তুমি এই সুযোগে নিঃশেষ কর। পিতা গৃহে ফিরিলে এ সুযোগ আর পাইবে না।" কাবিলের মন ভবিষ্যৎ সুখের সোনালি আশায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অতি সন্তর্পণে বৃহৎ এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া কম্পিত কলেবরে কনিষ্ঠের মস্তকোপরি সজোরে নিক্ষেপ করিল। বিশাল প্রস্তরের আঘাতে নিদ্রাভিভূত হাবিল মহানিদ্রার ক্রোড়ে অনন্ত কালের জন্য ঢলিয়া পড়িল। স্বর্গের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার জন্য যে স্বার্থের তীব্র হলাহল হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়ার নিষ্কলঙ্ক অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল আজ তাহাই বিষধর আকারে অযুত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির অন্তরে নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা

দিল। প্রথম ভ্রাতৃরক্তে ধরণীবক্ষ কলঙ্কিত হইল।

উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হইল। কিন্তু তাহার অন্তর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনের কোন গোপন কোণ হইতে যেন ভয়ের অযুত অক্ষৌহিণী অবিশ্রান্ত গতিতে তাহার অন্তরাত্মার উপর দিয়া সদাপে গমন করিতে লাগিল। মনের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিল। তাই কিসে ভাইয়ের দেহ পিতার চক্ষুর অন্তরাল করিবে সে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

স্বয়ং প্রকৃতি শিক্ষয়িত্রীর আসনে বসিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিল। হঠাৎ একটী কাক আর একটী কাককে নিহত করিয়া স্বীয় চঞ্চুপুট দ্বারা মৃত্তিকায় গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে নিহত কাকটীর দেহ রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত করিল। প্রকৃতির শিক্ষায় কাবিলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। সে সত্বর মৃত্তিকা-গর্ভে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া ভ্রাতার নিহত দেহ তন্মধ্যে প্রোথিত করিল।

হজ সমাপনান্তে হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু হাবিলের কোন সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। একদিন স্বর্গীয় দূত **জিব্রিলের** নিকট শুনিলেন কাবিল কর্ত্তৃক হাবিল নিহত হইয়াছে। তখন তিনি পুত্রশোকে উন্মত্তের ন্যায় পুত্রের মৃতদেহের উদ্দেশে ছুটিলেন। দূতবর **জিব্রিলের** নিকট কবরের সন্ধান পাইয়া উহা খনন করতঃ মৃতদেহের উদ্ধার করিলেন। মাতাপিতা পুত্রশোকে অধীর হইলেন। সমস্ত প্রকৃতি আজ তাঁহাদের সন্তপ্ত হৃদয়ের গভীর শোকে স্তব্ধ হইল। পৃথিবীতে শোকের বন্যা বহিয়া গেল। অতঃপর তাঁহারা আল্লার আদেশে মৃতদেহ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সযত্নে কবরস্থ করিলেন। মোছলমানগণ এখনও এই প্রথার অনুকরণে মৃতদেহ কবরস্থ করিয়া থাকেন।

হজরৎ আদম ও বিবি হাওয়ার বহু সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল। এই বংশ বৃদ্ধির জন্য স্বভাবজ ফলমূলের দ্বারা তাঁহাদের সকলের ভরণ-পোষণ চলিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহারা ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উদ্ভব হইল। এবং তদুপযোগী যন্ত্রপাতিরও উদ্ভব হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ তাঁহারা নিজ হাতেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তারপর বনের পশু বশীভূত করিয়া তদ্দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। হিংস্র পশ্বাদির কবল হইতে এবং রৌদ্রবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং উৎপন্ন শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখার জন্য গৃহের আবশ্যকতার উপলব্ধি হইল। বন জঙ্গল কাটিয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া খুঁটির বেড়া দিয়া তাঁহারা মাটী পাথর প্রভৃতি দ্বারা দেওয়াল গাঁথিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতে হইত। বনের কাঁচা ফলমূল ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে রন্ধনের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পাথরে পাথরে ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা শীত নিবারণ ও রন্ধন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এখনকার মত তখন ঔষধপত্র ও ডাক্তার কবিরাজ ছিল না। সুতরাং রোগেশোকে বিপদাপদের সময় তাঁহারা একমাত্র আল্লার উপরই নির্ভর করিয়া তাঁহারই সাহায্য ভিক্ষা করিতেন।

এইরূপে বহুদিন মেসোপটেমিয়ার উর্বর ক্ষেত্রে বাস করিয়া পরিণত বয়সে হজরৎ আদম মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইলেন। তখন পুত্রগণকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ, তোমরা জান, আমরা পূর্ব্বে পরমানন্দে ফেরদৌছে (Ferdouse) ছিলাম। কিন্তু বুদ্ধিভ্রমে শয়তানের প্ররোচনায় আল্লার আদেশ অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। তোমরা আমাদের সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ রাখিও। কখনও আল্লার আদেশ অমান্য করিও না। আমি যাহা বলিতেছি ও যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি তাহাই আল্লার আদেশ। তোমরা কখনই ইহার ব্যতিক্রম করিও না। তোমরা একমাত্র আল্লার উপাসনা করিবে; সম্পদে-বিপদে তাঁহার উপর নির্ভর করিবে; তাঁহারই সাহায্য ভিক্ষা করিবে। হজব্রত সম্পাদন করিবে এবং পরস্পরে সদ্ভাবে থাকিবে।" এই বলিতে বলিতে সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পৃথিবীর অতিথিশালা ত্যাগ করিয়া আদমের আত্মা স্বর্গের স্থায়ী ভবনে গমন করিল। পুত্রগণ পিতৃপ্রদর্শিত রীতি অনুসারে

তাঁহার পার্থিব দেহ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া **আবু কোবেছ** পর্ব্বতের উপর দাফন করিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার ৯৩০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

পতি-বিয়োগ-বিধুরা বিবি হাওয়াও ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া দুই বৎসর পরে স্নেহের পুত্তলি পুত্রগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পৃথিবীর সকল মায়া মমতা এড়াইয়া **ফেরদৌছে** (Ferdouse) পতিপার্শ্বে গমন করিলেন। পুত্রগণ তাঁহার পার্থিব দেহ লোহিতসাগরের তীরবর্ত্তী **জেদ্দা** নামক স্থানে যথারীতি দাফন করিলেন। আদিমাতা বিবি হাওয়ার পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার বংশধরগণ এই স্থানকে **জেদ্দা** নামে অভিহিত করিলেন। জেদ্দা শব্দের অর্থ পিতামহী বা মাতামহী।

হজরৎ শিশ

হজরৎ আদমের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে হজরৎ শিশ পিতার ন্যায় অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ এবং পিতার একান্ত বাধ্য ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই আল্লার উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। পিতার উপদেশানুযায়ী অন্যান্য ভ্রাতৃগণ শিশের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিত এবং তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার জন্য সকলে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহার কিয়দংশ শিশকে দিত। অবশিষ্টাংশ দ্বারা নিজের পরিবার পোষণ করি অসুস্থতা নিবন্ধন বা বা অন্য কোন কারণে কেহ কোন সময় শস্যোৎপাদনে অক্ষম হইলে, অথবা দেশে অজন্মা হইলে হজরৎ শিশ নিজের সেই অংশ হইতে অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন করিতেন। তাঁহার এই সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া অতঃপর সকলে শস্যোৎপাদন করিয়া লাভা শিশকে সম্পূর্ণ উপহার দিতেন। শিশ ঐগুলি আবশ্যক মত সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। এইভাবে হজরৎ শিশ বিমল ভ্রাতৃপ্রেমে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিশ্বপ্রেমই আল্লার কাম্য। উহাই ইছলামের শিক্ষা। কিন্তু যে স্বার্থের বীজ অন্তরে একবার উপ্ত হইয়াছে তাহা যে কালে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবে এবং মানব-মনের প্রতি স্তরে উহার ধ্বংসকারী শিকড় প্রবেশ করাইয়া তাহাকে জরাজীর্ণ করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সকলেই পরিশ্রম করে কিন্তু শিশ বিনা শ্রমেই তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন। ইহা সকলের প্রাণে সহ্য হইবে কেন? বিশেষতঃ যাহারা কম পরিশ্রম করে তাহারাও যাহা পায় যাহারা অত্যধিক পরিশ্রম করে তাহারাও তাই পায় এমন কি বিনাশ্রমেও কেহ সমান ভাগ পায়। সুতরাং শিশের প্রাধান্যে ভ্রাতৃগণের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শস্যোৎপাদন করিয়া এখন আর সকলে শিশকে উপহার দেয় না। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের ভাব দেখা দিল। হজরৎ শিশ নানা সদুপদেশ দান করিয়া আল্লার আদেশবাণী শুনাইতেন এবং স্বার্থত্যাগ করিয়া সকলকে ভ্রাতৃভাবে বাস করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

গ্রীস—এথেন্স

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে থেমিষ্টক্লিস্ যখন এথেন্সের প্রধান রাষ্ট্রপতি অথবা আর্কণ ছিলেন, তিনি এথেন্সকে নৌ-শক্তিতে শক্তিশালী করিবার জন্য এথেন্সের বন্দর পিরীয়াস্‌কে (Piroeus) প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। সেখানে পোতাশ্রয়ও নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করা হয়। এইভাবে থেমিষ্টক্লিসই এথেন্সকে শক্তিশালী নৌশক্তিতে পরিণত করেন। এইজন্য তাঁহাকে এথেন্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বলা হয়।

দারয়ৌসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ক্ষয়ার্শ (Xerxes) পারস্য সাম্রাজ্যের রাজা হন। মার্দনিয়াসের (Mardonius) পরামর্শে তিনি গ্রীস জয় করিতে মনস্থ করেন। এই জন্য তিনি একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী সজ্জিত করেন। হেলেস্পণ্ট্ (Hellespont) প্রণালীর উপর নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দিয়া তিনি স্বয়ং সসৈন্যে থ্রেসে পদার্পণ করেন। ম্যাকিদন ও থেসালির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সময় কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। একে একে উত্তর গ্রীসের রাজ্যগুলি তাঁহার পদানত হইল।
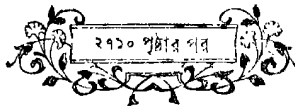
এদিকে গ্রীকেরা ও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। এথেনীয়েরা ও স্পার্টানেরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দেশরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাহারা একটি সর্ব্বগ্রীকসম্মিলন আহ্বান করিল। এই মহাসভায় অনেক গ্রীক রাজ্যের প্রতিনিধি উপস্থিত হইল। তবে উত্তর গ্রীসের অধিকাংশ রাজ্যই কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিল না। স্পার্টাই এই সম্মেলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। ইহাতে স্থির হইল গ্রীকদের মিলিতবাহিনীর নেতা হইবেন স্পার্টার রাজা লিওনিডাস (Leonidas)—আর তাহাদের নৌবাহিনীর কর্ণধার হইবেন ইউরিবিয়াদাস্ (Eurybiadas) নামে একজন স্পার্টান। এই গ্রীকসঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য অন্যান্য রাজ্যে দূত পাঠান হইল। পারসিকদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী হইল এথেনীয়েরা। তাহারা অন্যান্য সব কাজ ফেলিয়া দেশরক্ষার জন্য মাতিয়া উঠিল। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। গত দশ-বৎসর যে সমস্ত লোককে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে বলা হইল।

ইহাদের মধ্যে অ্যারিষ্টাইডিস্ (Aristides) ও জান্থিপাস্ (Xanthippus) নামে দুইজন বিশিষ্ট নেতাও ছিলেন। তাঁহাদিগকে সেনাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল।

গ্রীকেরা ঠিক করিল যে তাহারা থার্মপাইলী বা থার্মপালী (Thermopylae) গিরিবর্ত্মে পারসিকদের বাধা দিবে। রাজা লিওনিডাস্

পেরিক্লিস্—গ্রীক্ রাষ্ট্রনেতা

তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার সঙ্গে প্রায় ৭০০০ লোক ছিল—ইহাদের মধ্যে মোট ৪০০০ সৈন্য স্পার্টা ও পেলোপোনেসাসের অন্যান্য রাজ্য হইতে আসিয়াছিল। পেলোপোনেসাস হইতে এত অল্প সৈন্য আসার কারণ এই যে স্পার্টানদের প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল উত্তর গ্রীস ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ গ্রীস রক্ষা করা। এইজন্য তাহারা মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে অপ্রশস্ত করিন্থের যোজকে (Isthmus of Corinth) তাহারা পারসিকদের আক্রমণ প্রতিহত করিবে। আর এথেনীয়দের এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে কার্ণিয়ান্ উৎসব (Carnean Festival) শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বেশী সৈন্য পাঠাইতে পারিল না। আপাততঃ লিওনিডাসকে পাঠান হইল—উৎসব শেষ হইলেই অবশিষ্ট সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে যাইবে।

ক্ষয়ার্শ থার্মপাইলীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে লিওনিডাসের অধীনে গ্রীকসৈন্যেরা গিরিবর্ত্মের প্রবেশপথ রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছে। চার দিন অপেক্ষা করিয়া পঞ্চম দিন তিনি গ্রীকদের আক্রমণ করিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহাদিগকে হটাইতে পারিলেন না। পরদিনের আক্রমণেরও একই ফল হইল। তখন একদল পারস্যসৈন্য একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীকের সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারে গুপ্তপথে পাহাড় অতিক্রম করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে গ্রীক-সৈন্যদের আক্রমণ করিল। লিওনিডাস যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন তিনি তিন শত স্পার্টানসৈন্য লইয়া মৃত্যুপণ করিয়া পারস্য-সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া গ্রীকসৈন্যবাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হইল। লিওনিডাস্ ও বীর স্পার্টানসৈন্যেরা অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। (৪৮০ খৃঃ পূঃ)।

গ্রীক নৌবাহিনী আর্টিমিশিয়ামে অপেক্ষা করিতেছিল। থার্মপাইলীর পরাজয়ের সংবাদ শুনিবামাত্র তাহারা অ্যাটিকা অভিমুখে রওনা হইল। কারণ তাহারা এথেন্সের রক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। ৩২৪টি যুদ্ধ-জাহাজের মধ্যে এথেন্সের ছিল ২০০খানা। তাহারা আসিয়া দেখিল যে পেলোপনেসীয়েরা উত্তর গ্রীস শত্রু হস্তে ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ গ্রীস রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বীওশিয়া (Boeotia) ও অ্যাটিকার জন্য তাহারা কিছুমাত্র চিন্তিত নহে। এই অবস্থায় থেমিষ্টক্লিস্ ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা স্থির করিলেন যে এথেন্স রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং এথেনীয়দের আপাততঃ উহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। কাজেই তাঁহাদের ঘোষণামত এথেনীয়েরা স্ত্রী-পুত্র পরিবার

লইয়া এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া ঈজিনা স্যালামিস্ প্রভৃতি দ্বীপে আশ্রয় লইল। গ্রীকনৌবাহিনীও স্যালামিস্ দ্বীপে নোঙ্গর করিল।

এদিকে ক্ষয়ার্শ বিনা বাধায় ফোকিস (Phocis) ও বীওশিয়ার মধ্য দিয়া অ্যাটিকায় প্রবেশ করিলেন। এথেন্সে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন নগর জনশূন্য। শুধু অল্পসংখ্যক বীর অ্যাক্রপলিস (Acropolis) রক্ষা করিবার জন্য জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছে। তিনি তখন অ্যাক্রপলিস অবরোধ করিলেন এবং প্রায় দুই সপ্তাহ ভীষণ যুদ্ধের পরে উহা দখল করিতে সক্ষম হইলেন। পরাজিত গ্রীকেরা নিহত হইল; তাহাদের মন্দির, ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল।

এই সময়ে গ্রীক নৌ সৈন্যাধ্যক্ষেরা (Admirals) স্থির করিল যে স্যালামিসে নৌবাহিনী রাখা বিপজ্জনক। তাহাদের উচিত রণতরীগুলি করিন্থ যোজকে স্থলসৈন্যের সন্নিকটে লইয়া যাওয়া। থেমিষ্টক্লিস্ দেখিলেন ইহার ফলে মেগারা (Megara) স্যালামিস ও ঈজিনা শত্রুহস্তে পতিত হইবে। যে করিয়াই হউক, এই প্রস্তাব নাকচ করিতে হইবে। তিনি গোপনে নৌসেনাপতি ইউরিবিয়াদিসের সঙ্গে দেখা করিয়া স্যালামিসে অবস্থান করিবার সুবিধা বুঝাইয়া দিলেন। নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষদের জানাইলেন যে যদি গ্রীকনৌবাহিনী স্যালামিস পরিত্যাগ করে তবে এথেন্সের যুদ্ধ-জাহাজগুলি আর তাহাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিবে না—অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

ওদিকে ক্ষয়ার্শের আদেশে পারস্যের নৌবাহিনী স্যালামিস প্রণালীর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইল। ইহা দেখিয়া গ্রীক নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষেরা সেখান হইতে পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। থেমিষ্টক্লিস্ দেখিলেন আর পারা যাইবে না। কাজেই তিনি নিরুপায় হইয়া চাতুরীর আশ্রয় লইলেন। গোপনে তিনি তাঁহার এক বিশ্বস্ত ক্রীতদাসকে ক্ষয়ার্শের নিকট প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পারস্য-রাজের বন্ধু। কাজেই তিনি জানাইতেছেন যে রাত্রিযোগে গ্রীক্ নৌবাহিনী স্যালামিস পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। পারস্য-রাজের উচিত তাহাতে বাধা দেওয়া; কারণ স্যালামিসে যুদ্ধ হইলে পারসিক বাহিনীর জয় ধ্রুব নিশ্চিত। তাঁহার পরামর্শমত পারস্য রণতরী স্যালামিস্ প্রণালীর নির্গম পথ রুদ্ধ করিল। এইবার থেমিষ্টক্লিস্ গ্রীক নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষদের জানাইলেন যে স্যালামিস্ পরিত্যাগ করা অসম্ভব—পারস্য যুদ্ধজাহাজ তাহাদের প্রবেশ ও নির্গমনের
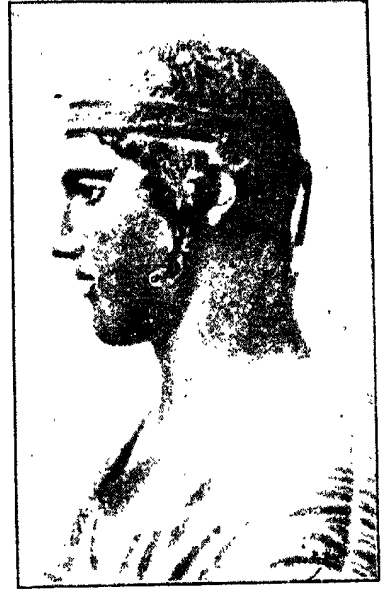
গ্রীক্ রথচালক—৪৭৫ খৃঃ পূর্ব্ব

পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। তখন নিরুপায় হইয়া স্যালামিসেই যুদ্ধ হইবে স্থির হইল।

পরদিন ভোরবেলা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমস্ত-দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। দুই পক্ষই অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। গ্রীকদের অপেক্ষা পারসিকদের যুদ্ধজাহাজ অনেক বেশী ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে সঙ্কীর্ণ জায়গায় অধিকসংখ্যক পোত থাকাতে তাহারা মোটেই রণ-নৈপুণ্য দেখাইতে পারিল না। পদে পদে তাহাদের বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। নিজেদের জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি হইতে লাগিল। স্বচ্ছন্দমত মোটেই তাহারা ঘুরাফেরা করিতে পারিল না। সুতরাং ফলে হইল এই যে দ্রুতগামী গ্রীকজাহাজগুলি নানাদিক হইতে

আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। দিবা অবসানে যখন যুদ্ধ শেষ হইল তখন দেখা গেল দুইশত পারস্যরণতরী ধ্বংস হইয়াছে। স্যালামিসের যুদ্ধে পারস্যের নৌশক্তি অনেকটা খর্ব্ব হইল।

ক্ষয়ার্শ ভাবিলেন স্যালামিসের পরাজয় সংবাদ শুনিলে এসিয়ামাইনরের, বিশেষতঃ আইও-

তরুণ গ্রীকবীর—ওলিম্পিয়ায় আবিষ্কৃত

নিয়ার গ্রীকেরা বিদ্রোহ করিতে পারে। কাজেই হেলেস্পণ্টের সেতু রক্ষা করিবার জন্য তিনি অবশিষ্ট যুদ্ধজাহাজগুলি সেখানে পাঠাইলেন এবং নিজে ৬০,০০০ সৈন্য লইয়া স্থলপথে সে-দিকে অগ্রসর হইলেন। মূল সেনাবাহিনী তিনি মার্দনিয়াসের নেতৃত্বে রাখিয়া গেলেন গ্রীস-বিজয় সম্পূর্ণ করিতে। কিন্তু শীত আসিয়া পড়াতে তখনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

পর বৎসর বসন্তকালে আর্ত্তবাজাজের (Artabazus) নেতৃত্বে ক্ষয়ার্শের সৈন্যদল আসিয়া মার্দনিয়াসের সঙ্গে মিলিত হইল। মার্দনিয়াস ম্যাকিদনরাজ আলেকসন্দরকে এথেন্সে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। যদি এথে-নীয়েরা স্বাধীনশক্তিরূপে পারস্যরাজের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী হয় তবে গত-যুদ্ধে এথেন্সের যাহা ক্ষতি হইয়াছে পারস্য-রাজ তাহা সানন্দে পূরণ করিবেন—শুধু তাহাই নহে নূতন রাজ্য জয় করিতেও সাহায্য করিবেন। মার্দনিয়াস আশা করিয়াছিলেন যে এথেন্স যখন স্পার্টা ও পেলোপনেসাসের অন্য রাজ্যদের কাছে ভাল ব্যবহার পায় নাই তখন এথেন্স নিশ্চয়ই তাঁহার লোভনীয় প্রস্তাবে সাগ্রহে রাজী হইবে। কিন্তু মার্দনিয়াস এথেনীয়দের চিনিতে পারেন নাই। নিজেদের হীন স্বার্থের জন্য তাহারা গ্রীসের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে রাজী হইল না। ঘৃণার সঙ্গে মার্দনিয়াসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে জানাইল, "মার্দনিয়াস জানিয়া রাখুন, যতদিন সূর্য্য তাহার নিজ পথে চলিবে, ততদিন এথেনীয়েরা ক্ষয়ার্শের সঙ্গে সন্ধি করিবে না।"

স্পার্টানদের কিন্তু ভয় হইল যে তাহারা যদি এথেনীয়দের সাহায্য না পাঠায় তবে তাহারা বেশীদিন আর পারস্যের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিবে না। কাজেই তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল শীঘ্রই তাহারা এথেনীয়দের সাহায্যের জন্য বীওশিয়াতে সৈন্য পাঠাইবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে করিন্থ যোজকের প্রাচীর সম্পূর্ণ হওয়াতে তাহাদের ভয় দূর হইল এবং কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ করিল না। এবারও তাহাদের ছলের অভাব হইল না। কি করিয়া তাহারা সৈন্য পাঠাইবে হায়াসিন্থিয়া উৎসব (Hyacinthia) যে সামনে!

মার্দনিয়াস অ্যাটিকা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে বীওশিয়ায় সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আশা ছিল এথেনীয়েরা এখন নিশ্চয়ই তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হইবে। কিন্তু এবারও তাহারা তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া স্যালামিস্ দ্বীপে আশ্রয় লইল। তবে এইবার এথেন্স, প্লেটিয়া (Plataca) ও মেগারা একযোগে স্পার্টাকে জানাইল যে যদি অবিলম্বে সৈন্য না পাঠান হয় তবে তাহারা পারস্যের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে। স্পার্টা বুঝিল আর ছল ছুতায় হইবে না—সাহায্য পাঠাইতেই হইবে। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহারা পসানিয়াসের (Pausanius) নেতৃত্বে একদল স্পার্টান সৈন্য পাঠাইল। পথে পেলোপনেসাসের অন্যান্য রাজ্য

হইতেও ঈজিনা, মেগারা ও ইউবিয়া হইতে সৈন্যদল আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। এথেন্স ও প্লেটিয়া অ্যারিষ্টাইডিসের অধীনে সৈন্য পাঠাইল।

প্লেটিয়া নগরের সন্নিকটে, আসোপাস্ (Ascpus) নদ ও কিথীরণ পর্ব্বতের (Mount Cithaeron) মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মার্দনিয়াস্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলে পারসিক সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। তখন আর্ত্তবাজজ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া বীওশিয়া পরিত্যাগ করিয়া হেলেস্পণ্টের দিকে অগ্রসর হন। ইয়োরোপীয় গ্রীস পারসিক আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায়।

এদিকে পারস্যের নৌবাহিনী স্যামস্দ্বীপের কূলে অবস্থান করিতেছিল। সমুদ্রের অন্য কূলে মাইকেল অন্তরীপে (Cape Mycale) একটি বিরাট পারস্য সৈন্যবাহিনীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রাজা লিওটি-কাইডাসের (Leotychidas) নেতৃত্বে গ্রীক্-নৌবাহিনী স্যামস্দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিল। গ্রীকনৌবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া পারস্য রণপোতগুলি স্যামস্ পরিত্যাগ করিয়া মাইকেলে গমন করিল। এখানে গ্রীক্‌দের আক্রমণের ভয়ে তাহারা জাহাজগুলি তীরের কাছাকাছি নোঙ্গর করিয়া রাখিল এবং তাহার সম্মুখে একটা প্রাচীর খাড়া করিল। গ্রীকেরা সেখানেও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পারসিকদের পরাস্ত করিল ও তাহাদের যুদ্ধের জাহাজগুলি ধ্বংস করিল। তখন পেলোপনেসিয়েরা লিওটিকাইডাসের অধীনে দেশে ফিরিয়া গেল; কিন্তু এথেনীয়েরা জান্থিপাসের (Xanthippus) নেতৃত্বে হেলেস্পণ্ট অভিমুখে যাত্রা করিল।

গ্রীক্ ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ বলেন,—পারসিকদের এইরূপ ভীষণ পরাজয়ে উৎসাহিত হইয়া এসিয়ার কোন কোন নগরের গ্রীক্ অধিবাসীরা দ্বিতীয়বার পারসিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।—এই যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়াই ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ (Herodotus) তাঁহার ইতিহাসের নবম খণ্ড সম্পূর্ণ করেন।

হিরোডোটাস্ আনুমানিক ৪৮৪ খৃঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই প্লেটিয়ার যুদ্ধের সময়

পিওনিয়াস নির্ম্মিত ভগ্ন বিজয়িনীমূর্ত্তি
খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী

তিনি কেবলমাত্র পাঁচবছরের বালক ছিলেন। কাজেই এই যুদ্ধের কথা লিখিতে তাঁহার সে সময়কার জীবিত লোকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হয়ত সে যুদ্ধে যে সব সৈনিকেরা যোগদান করিয়াছিলেন, কিংবা অন্য কোনও প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানী ও বিবেচক নাগরিকের কথার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে এই যুদ্ধের বিবরণী লিখিতে হইয়াছিল।

অমর জীবন
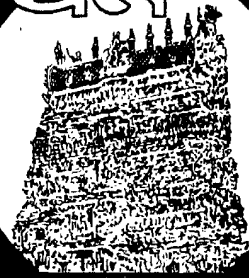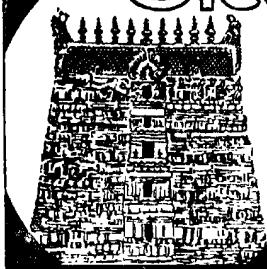
শ্রীরামানুজ

[১]

মাদ্রাজ হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে শ্রীপেরেমবুদুর নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম শ্রীমহাভূতপুরী। সে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আসুরি কেশবাচার্য্য নামে এক সাধু ও মহৎ ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করিতেন। আসুরি কেশবাচার্য্য যজ্ঞনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "সর্ব্বক্রতু" উপাধি দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ণ নাম, শ্রীমদাসুরি সর্ব্বক্রতু কেশবদীক্ষিত।

শ্রীশৈলপূর্ণ নামে একজন সাধু মহাপুরুষের ভগিনী কান্তিমতীকে কেশবদীক্ষিত বিবাহ করিয়া শ্রীপেরেমবুদুরে বেশ সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্র না হওয়ায় বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। মনে কোনরূপ শান্তি ছিল না। অবশেষে কেশবাচার্য্য সস্ত্রীক বৃন্দারণ্য নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীপার্থসারথির কুমুদ সরোবর বা তিরুইল্লি কেণির (তিরু-শ্রী, ইল্লি-কুমুদ, কেণি-সরোবর) তীরে পুত্র কামনায় এক যজ্ঞ করিলেন।
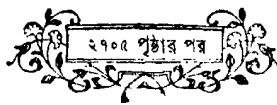
যজ্ঞ শেষ হইলে পর—সেদিন রাত্রিতে কেশবাচার্য্য নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীমৎ পার্থসারথি (শ্রীকৃষ্ণ) কে স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। তুমি স্ত্রীর সহিত গৃহে গমন কর।"

এই ঘটনার এক বৎসর পরে ৪১১৮ কল্যব্দে, ৯৩৯ শকাব্দে বা ১০১৭ খৃষ্টাব্দে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত চৈত্রমাসের দ্বাদশ দিবসে, শুক্র পঞ্চমী তিথিতে, কর্কটলগ্নে বৃহস্পতিবারে কান্তিমতী এক সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। এই পুত্রই হইতেছেন জগৎ প্রসিদ্ধ শ্রীরামানুজ।

বাল্যকাল হইতেই রামানুজ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের মুখ হইতে একবার পাঠ শুনিলেই, যেরূপ দুরূহ পাঠই হউক না কেন, তিনি অনায়াসে তাহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন।—কিন্তু সেই অতি শৈশব হইতেই সাধুসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন।

সেই সময়ে শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ নামে একজন পণ্ডিত ও সাধুব্যক্তি কাঞ্চীনগরীতে বাস করিতেন।

শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ প্রতিদিন কাঞ্চী হইতে দেবপূজা করিবার জন্য পুনামেলি নামক গ্রামে গমন করিতেন। শ্রীপেরেমবুদুর ছিল এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ জাতিতে শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় রামানুজের অধ্যাপকের গৃহ হইতে ফিরিবার পথে শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামানুজ অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সেই রাত্রিটি তাঁহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণও বালকের সুমিষ্ট অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে অতিথি পাইয়া রামানুজের আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহাকে বেশ সুচারুরূপে ভিক্ষা করাইয়া শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। অতিথি তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন,—"আমি নীচ, শূদ্র। আপনি ব্রাহ্মণ ও পরম বৈষ্ণব। কোথায় আমি আপনার পদসেবা করিব, তাহা না হইয়া আপনি কিনা দাসের সেবা করিতে চাহিতেছেন?" শ্রীরামানুজ তাহাতে দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, "বুঝিলাম, আমার অদৃষ্ট মন্দ সেজন্যই আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সেবার অধিকার পাইলাম না। মহাশয়, উপবীত ধারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? যিনি হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দেখুন তিরুপ্পান আলোয়ার চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইয়াছেন।" বালকের ভক্তি দেখিয়া কাঞ্চিপূর্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এইদিন হইতে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তাহা চিরদিন বিদ্যমান ছিল।

শ্রীরামানুজ

[২]
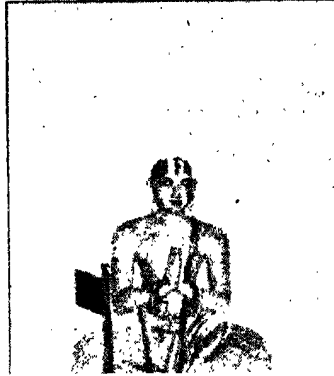
শ্রীরামানুজ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার শুভবিবাহ হইল। পিতা, মাতা, আত্মীয় ও প্রতিবেশিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। নববধূ দেখিয়া পিতা বৃদ্ধ কেশবাচার্য্য ও মাতা দেবী কান্তিমতী পরম আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ, বিবাহের একমাস পরেই পিতা কেশবাচার্য্যের মৃত্যু হইল। যথা সময়ে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। ইহার পর রামানুজ কিছু দিন শ্রীপেরেমবুদুরে রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা ও তিনি তথায় শান্তিলাভ করিতে না পারায় কাঞ্চিপুরে একটি বাটি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

এ সময়ে কাঞ্চি নগরীতে যাদবপ্রকাশ নামে একজন সুবিখ্যাত অদ্বৈতবাদী অধ্যাপক বহু শিষ্যসহ বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। যাদবপ্রকাশ অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈতবাদ অদ্যাপি—"যাদবীয় সিদ্ধান্ত" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি ঈশ্বরের সাকাররূপ স্বীকার করিতেন না।—অতি অল্প দিনের মধ্যেই রামানুজ তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন ও যাদবপ্রকাশের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই প্রীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিল না। কেন হইতে পারিল না, তাহাই বলিতেছি।

একদিন যাদবপ্রকাশ তৈত্তিরীয় উপনিষদের "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের অর্থে—ব্রহ্মাকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ বলিয়া

ব্যাখ্যা করিলেন, শ্রীরামানুজ তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন যে,—"ব্রহ্ম সত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, অসত্যধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, জ্ঞানই তাঁহার ধর্ম্ম, অজ্ঞান নহে এবং তিনি অনন্ত, সান্ত নহেন। তিনি সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত গুণের গুণী। ইহাদিগকে তাঁহার স্বরূপ বলা কোনওরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। এগুলি তাঁহার, কিন্তু তিনি নহেন। যেমন দেহ আমার আমি দেহ নহি।"—রামানুজের ব্যাখ্যা শুনিয়া অধ্যাপক সরোষে কহিলেন—"ওহে দুষ্ট বালক, তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শুনিতে না চাও, কেন বৃথা এখানে আগমন কর? নিজের বাড়ীতেই একটা টোল খোলনা কেন?"—কি জানি কেন যাদবপ্রকাশের রামানুজের প্রতি একটা ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন,—"হয়ত এই বালক কালে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত স্থাপন করিবে। ইহার হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? সনাতন অদ্বৈতমত রক্ষার জন্য ইহার প্রাণসংহার পর্যন্ত করা উচিত।"

এক দিবস গোপনে তিনি শিষ্যদিগকে রামানুজের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন—"দেখ, তোমরা সকলে আমার ব্যাখ্যার কোন দোষ দেখিতে পাও না। কিন্তু রামানুজ যখন তখনই আমার অর্থের প্রতিবাদ করে।—বুদ্ধিমান হইলে কি হইবে, উহার মন দ্বৈতবাদরূপ পাষণ্ডতায় পূর্ণ। এ পাষণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি?—শিষ্যদের মধ্যে নানাজনে নানাকথা বলিতে আরম্ভ করিল,—কেহ বলিল, মহাশয়, উহাকে পাঠমণ্ডপে না আসিতে দিলেই হইল। কেহবা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"তাহা হইলে, যাহার জন্য অধ্যাপক মহাশয় ভীত হইয়াছেন তাহাই হইবে, রামানুজ স্বয়ং এক টোল খুলিয়া দ্বৈতবাদ প্রচার করিবে।"—শেষে যাদব কহিলেন, "চল আমরা গঙ্গাস্নানে যাই। তোমরা সকলে রামানুজকে এই অভিপ্রায় প্রকাশ কর এবং যাহাতে সেও আমাদের সঙ্গে আইসে সেই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হও। কারণ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল ঐ পাষণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। পথিমধ্যে উহাকে বিনাশ করিয়া ভাগীরথী সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব।—অদ্বৈতমতের কণ্টক এইভাবে উৎপাটিত হইবে।"—শিষ্যেরা গুরুর এই অদ্ভুত যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবেই রাজি হইল। তাহারা রামানুজকে গঙ্গাস্নানের পুণ্যলাভের প্রলোভন দেখাইতে চলিল।

গোবিন্দ নামে রামানুজের এক মাসতুত ভাই ছিলেন। তিনি জননী কান্তিমতীর ভগিনী মহাদেবীর পুত্র। গোবিন্দ রামানুজকে প্রাণাপেক্ষাও বেশী ভালবাসিতেন। শ্রীপেরেমবুদুর পরিত্যাগ করিয়া রামানুজ যখন কাঞ্চিপুরে আসিয়া বাস করিলেন তৎসঙ্গে গোবিন্দও তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। রামানুজ ও তিনি উভয়ে সমবয়স্ক। রামানুজ যাদবপ্রকাশের শিষ্য হইলে গোবিন্দও তাঁহার শিষ্য হইলেন। উভয়ে এক সঙ্গে অধ্যয়নমণ্ডপে যাইতেন ও এক সঙ্গে আবার ফিরিয়া আসিতেন।—যাদবের শিষ্যগণ রামানুজকে গঙ্গাস্নানে সম্মত করিলেন। সুতরাং রামানুজের সঙ্গে গোবিন্দও বিশেষ আগ্রহের সহিত তীর্থযাত্রায় ও গঙ্গাস্নানে যাইতে অত্যন্ত আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে যাদবপ্রকাশ শিষ্যমণ্ডলীসহ আর্য্যাবর্ত্তের দিকে যাত্রা করিলেন।—জননী কান্তিদেবী ধর্ম্মশীলা মহিলা ছিলেন, তিনি পুত্রের এই ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিলেন না।

ক্রমে তাঁহারা বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের নীচে বিশাল গোণ্ডারণ্যে উপস্থিত হইলেন। অতি নির্জ্জন দেশ। সেই গভীর অরণ্য-প্রদেশে মানুষের বসতি নাই বলিলেই চলে। এই স্থানে দুর্ব্বৃত্ত অধ্যাপক শিষ্যগণকে সেই নৃশংস ও ভয়ঙ্কর কার্য্যের জন্য উদ্যোগী হইতে বলিলেন। গোবিন্দ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন।—একদিন রামানুজ ও গোবিন্দ পথের ধারে একটী সরোবরে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে রামানুজকে নির্জ্জনে পাইয়া গোবিন্দ কহিলেন,—দুর্ব্বৃত্তগণ এই নির্জ্জন অরণ্যে তোমাকে বধ করিবে। সুতরাং তুমি কোথাও পলায়ন কর। ইহা বলিয়া গোবিন্দ অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইলেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলেন, তিনি শিষ্যদের দলমধ্যে নাই। তখন তাঁহার নাম লইয়া চারিদিকে ডাকাডাকি চলিল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। অবশেষে রামানুজ নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া পাষণ্ড যাদবপ্রকাশ এবং তাহার শিষ্যগণ

সকলে প্রীত হইল। যাদবপ্রকাশ, মৌখিকভাবে গোবিন্দকে তাঁহার আত্মীয় জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া শিষ্যগণকে জীবনের অনিত্যতা বুঝাইয়া বলিলেন, সংসার মিথ্যা, কেহ কাহারও নয়।"

[৩]

গোবিন্দ চলিয়া গেলে রামানুজ সেই নির্জ্জন অরণ্যে সহায়হীন ও বান্ধবহীন হইয়া কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু সহসা তাঁহার মনে উৎসাহ ও আনন্দ জাগরিত হইল—কে যেন ভিতর হইতে তাঁহাকে বলিয়া উঠিল—'ভয় কি? নারায়ণ আছেন।' সত্যসত্যই ঈশ্বরের কৃপায় এক ব্যাধ-দম্পতির সাহায্যে তিনি কাঞ্চিপুরে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন।

এখন শ্রীরামানুজ স্বগৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করেন। যাদবপ্রকাশও ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অধ্যাপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। রামানুজকে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস, তুমি যে জীবিত আছ, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। বিন্ধ্যারণ্যে তোমার জন্য আমরা যে কি কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা আর কি বলিয়া জানাইব।—রামানুজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"সকলই আপনার অনুগ্রহ।"

এ সময়ে কাঞ্চিপুরের এক রাজকুমারী ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহই আরোগ্য করিতে পারিল না। গুরু যাদবপ্রকাশ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া শ্রীমান্ রামানুজকে লইয়া তথায় আসিলেন এবং গুরুর আদেশে রামানুজ রাজকুমারীর মস্তকে স্বীয় পদদ্বয় স্থাপন করিবামাত্রই ব্রহ্মরাক্ষস রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে রামানুজের নাম সমুদয় চোল রাজ্যে বিখ্যাত হইয়া পড়িল।—কিছুকাল পরে পুনরায় যাদবপ্রকাশের সঙ্গে ব্যাখ্যা লইয়া তাঁহার গোলযোগ হইল। যাদবপ্রকাশ পূর্ব্বের ন্যায় এইবারও ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হইয়া রামানুজকে কহিলেন,—যদি আমার ব্যাখ্যা তোমার ভাল না লাগে, তাহা হইলে তুমি আর আমার নিকট আসিও না। রামানুজ দৃঢ়কণ্ঠে—"আপনার যেরূপ অনুমতি তাহাই হইবে" ইহা বলিয়া গুরুকে বন্দনা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

[ ]

কিছুকাল পরে জননী কান্তিমতী পরলোকগমন করিলেন। শ্রীরামানুজের পত্নী জমাম্বা হইলেন এখন গৃহিণী। তিনি পরম রূপবতী ছিলেন। আপনার স্বার্থে হস্ত না পড়িলে, তিনি সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা পতির সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নবতী হইতেন।—কিন্তু পতির সংসারের প্রতি অনাসক্তি দেখিয়া মনে মনে অশান্তি বোধ করিতেন।

এ সময়ে শ্রীরঙ্গমের মঠের জন্য একজন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পরম পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন হইল। মঠের অধ্যক্ষ তিরুবরঙ্গ শ্রীরামানুজের পাণ্ডিত্য ও ভক্তির কথা শুনিয়াছিলেন। এদিকে রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণের নিকট গমন করিলে, তিনি বলিলেন, বৎস, তোমার সম্বন্ধে গত রজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ কহিয়াছেন,—সর্ব্বগুণসম্পন্ন, মহাত্মা, মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। রামানুজ এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এদিকে মহাপূর্ণও তিরুবরঙ্গের আদেশে রামানুজকে দীক্ষা দিয়া শ্রীরঙ্গমে আনিবার জন্য সস্ত্রীক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন।—পথে মধুরান্তক নগর। সেই নগরে শ্রীবিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর। সেই সরোবরের তীরে মহাপূর্ণ সস্ত্রীক বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দেখেন যে, যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল, সেই রামানুজ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন।—মহাপূর্ণ রামানুজকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বৎস, আমি তোমাকে এখানে দেখিতে পাইব, এইরূপ আশা করিতে পারি নাই, সকলই নারায়ণের কৃপা।—তুমি এই পথে কোথা যাইতেছিলে?" রামানুজ বলিলেন,—"আমি আপনাকে দর্শনের জন্য কাঞ্চিপুর যাইতেছি। শ্রীবরদরাজ কাঞ্চিপূর্ণের মুখ দিয়া আপনাকে গুরু বরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আপনি অবিলম্বে আমাকে দীক্ষা দিয়া পবিত্র করুন।"

মহাপূর্ণ বলিলেন—'চল আমরা কাঞ্চিপুরে যাইয়া বরদরাজের সম্মুখে এই কার্য্য সম্পন্ন করি।' কাঞ্চিপুরে আসিলে পর মহাপূর্ণ রামানুজকে ও তাঁহার অনুরোধে তাঁহার পত্নী জমাম্বাকেও

দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত হইবার পর হইতে রামানুজ মনে শান্তিলাভ করিলেন।—কিন্তু এদিকে তাঁহার স্ত্রীর কোপনস্বভাবের জন্য তাঁহাকে নানারূপ মানসিক অশান্তি বোধ করিতে হইতেছিল।—জমাম্বা একবার গুরুপত্নীকে অপমান করেন, আবার একদিন এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে কর্কশবাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রামানুজের সহিত সেই ব্রাহ্মণের পথে সাক্ষাৎ হইলে তিনি সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। রামানুজ কহিলেন,—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন, এই বলিয়া কৌশল করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন এবং তাহাতে শ্বশুরের নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন যে আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইবে। যদি কার্য্যের বিশেষ গুরুত্ব না থাকে তাহা হইলে তুমি এখানে আসিবে, যদি একান্তই আসিতে না পার, তাহা হইলে জমাম্বাকে অতি অবশ্য পাঠাইয়া দিবে।"—ব্রাহ্মণ এইবার রামানুজ পত্নীর নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিলেন।—জমাম্বা রামানুজের হস্তে পত্র দিলে তিনি তাহার মর্ম্ম তাহাকে শুনাইলেন এবং বলিলেন—তুমি আহারাদি করিয়া এই ব্রাহ্মণের সহিত পিত্রালয়ে গমন কর। আমি পরে যাইতে চেষ্টা করিব। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পদে আমার প্রণাম জানাইও।—জমাম্বা স্বীকৃতা হইলেন এবং যথা সময়ে সেই বিপ্রের সহিত পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন।—এই ভাবে তিনি পত্নীর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে সেই সময় "যতিরাজ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

[৫]

যতিরাজ রামানুজ কিছুকাল শ্রীরঙ্গমের মঠে থাকিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষাদান করিতেন। এবং প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর শ্রীরঙ্গনাথস্বামীকে দেখিবার জন্য মন্দিরে গমন করিতেন। শ্রীরামানুজের অতুল কীর্ত্তি, তাঁহার প্রতি সকলের অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়া শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক তাঁহার প্রাণনাশের জন্য একবার বিষমিশ্রিত জল দান করেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবন নাশ হইল না। অর্চ্চক তাঁহার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

এই সময় তিনি যজ্ঞমূর্ত্তি নামে কোনও বিখ্যাত পণ্ডিতকে পরাজিত করেন। যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার কাছে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পরে অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া—লোকহিত-সাধন-কার্য্যে ব্রতী হইতে আরম্ভ করিল।—সে সময়ে শ্রীরামানুজের শ্রীরঙ্গমস্থ মঠে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় একশত শিষ্য অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে কৃতবিদ্য, পরম ত্যাগী ও পরম ভক্তিমান ছিলেন। এই সকল শিষ্যগণকে তিনি ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রালাপ প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্ত করিতেন।

ঐ সময়েই তিনি যামুন মুনির নিকট প্রতিশ্রুত শ্রীভাষ্য রচনা করেন। এই যামুন মুনির সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। যামুন মুনি বা যামুনাচার্য্য সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সে পাণ্ডিত্য প্রভাবে পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্য রাজধানী মদুরা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপকগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম শ্রীমহাপূর্ণাচার্য্য। এই মহাপুরুষ যামুনাচার্য্যের মৃত্যু সময়ে রামানুজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে মহর্ষির দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ রহিয়াছে। রামানুজ ইহাতে কৌতূহলি হইয়া তাঁহার শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—জীবিতকালেও কি মহর্ষির অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া থাকিত? শিষ্যেরা বলিলেন—আজ্ঞে না, সহজ ভাবেই থাকিত। এখন এইরূপ কেন হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

এইকথা শুনিয়া রামানুজ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন আমি বিষ্ণু মতে থাকিয়া—এ দেশের সকল ব্যক্তিগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত দ্রাবিড়বেদবিশারদ এবং নারায়ণের শরণাগত করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল! রামানুজ আবার বলিলেন—"আমি লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বার্থ সংগ্রহ করিয়া শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব।"

আর একটি অঙ্গুলি সরল হইয়া গেল। রামানুজ আবার বলিলেন—"যে কৃপাময় মুনিবর পরাশর লোকের প্রতি দয়াবশতঃ জীব, ঈশ্বর, জগৎ, তাহাদের স্বভাব ও তাহাদের উন্নতিপথ স্পষ্টরূপে

বুঝাইয়া দিয়া পুরাণরত্ন (বিষ্ণুপুরাণ) রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমি কোন এক মহা পণ্ডিত বৈষ্ণবকে তন্নামে অভিহিত করিব।" ইহা বলিবামাত্র অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি খুলিয়া গেল। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইলেন।

শ্রীযামুন মুনির নিকট এই প্রতিশ্রুতির জন্যই তিনি শ্রীভাষ্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য কুরেশ তাঁহার লেখক হইয়াছিলেন। কাশ্মীরের সারদাপীঠে রক্ষিত 'বোধায়ন বৃত্তি' হইতে তিনি অনেক সাহায্য লইয়াছিলেন। শ্রীভাষ্য রচনা পরিসমাপ্ত হইলে তিনি একে একে 'বেদান্তদীপন', 'বেদান্তসার', 'বেদার্থসংগ্রহ' ও 'গীতাভাষ্যম' নামক চারিখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় মতকে **'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'** নামে অভিহিত করিলেন। এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রচনা করিয়াই শ্রীরামানুজ জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

ভক্তগণের সুখ ও শান্তি বিধান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞান দানে ধন্য করিয়া এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ এবং অলৌকিক কার্য্য সাধন করিবার পর শ্রীরামানুজ একদিন শিষ্যদিগকে বলিলেন—তোমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়াছে, তোমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে জগতে ভক্ত ও ভগবান এক। সুতরাং প্রকৃত ভক্ত কিরূপে ভগবান্ হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারেন? আমি তোমাদের ভিতর ও তোমরা আমার ভিতর নিরন্তর রহিয়াছ। সুতরাং আমার এই নশ্বর দেহের অদর্শনে ব্যথিত হইও না।—শিষ্যগণ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বলিলেন,—প্রভু, যাহাতে আপনার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আমরা বঞ্চিত না হই, এরূপ বিধান করুন। ভক্তগণের জন্য ব্যথিত হইয়া শ্রীরামানুজ বলিলেন—"আচ্ছা তোমরা কতিপয় সুনিপুণ [illegible]কে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে আমার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আদেশ কর।" তিন দিনের মধ্যে সুনিপুণ শিল্পীরা তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল।—তারপর এক শুভমুহূর্ত্তে কাবেরীজলে সেই মূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পীঠোপরি সংস্থাপন করিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন—"বৎসগণ, এই মূর্ত্তি আমার দ্বিতীয় স্বরূপ। ইহাতে ও আমাতে কোনও ভেদ নাই, আমি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি এই নূতন দেহে আশ্রয় করিলাম।" এইরূপ বলিয়া শ্রীরামানুজ গোবিন্দের ক্রোড়ে স্বীয় মস্তক এবং শিষ্য অন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে স্বীয় চরণদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক ১০৫৯ শকাব্দায় (খ্রীঃ অঃ ১১৩৭) মাঘীয় শুক্লা দশমী, শনিবার মধ্যাহ্নকালে সম্মুখে স্থাপিত নিজ গুরু মহাপূর্ণের শ্রীপাদুকাদ্বয় দর্শন করিতে করিতে শ্রীবিষ্ণুর পরম-পদে বিলীন হইলেন।

রামানুজের বাণী

মৃত্যুর সময়াসময় জ্ঞান নাই। মনুষ্য নিদ্রিতই হউক, ভোজনই করুক, পথেই গমন করুক, যুবকই হউক বা বালকই হউক মৃত্যু সকল অবস্থাতেই তাহাকে আপনার বশে আনয়ন করেন। অতএব যাহা করিবার তাহা শীঘ্রই করা কর্ত্তব্য।

* * * *

একটী ধর্ম্ম বা মতকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। স্বধর্ম্ম আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহা প্রকৃতিগত বলিয়া তাহার দ্বারা সহজেই উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বধর্ম্ম পালন করিতে যাইয়া পরধর্ম্মের দোষ দর্শন করা মহা ক্ষুদ্র চিত্তের লক্ষণ।

* * * *

গুণই কল্যাণের কারণ, জাতি নহে, সুতরাং সকলে জাতির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুণবান হইতে যত্নশীল হও। জাতি অহঙ্কারের প্রসূতি হইলে তাহার ন্যায় শত্রু মানবের আর দ্বিতীয় থাকে না। ইহা স্মরণ রাখিবে।

সাহিত্য

দাশরথি রায়

২৫৭০ পৃষ্ঠার পর

ভারতচন্দ্র যে কথার বাঁধুনী রচনা করিয়াছিলেন, সোজাসুজি, সুন্দর, সরস ভাষায় চোখা চোখা কথা বলিয়াছিলেন তাহার আর তুলনা নাই। কত লোকে তাঁহার লেখা পড়িয়া মুগ্ধ হয়। তাঁহার রচনা যেন আপনা আপনি মানুষের মনে গাঁথিয়া যায়! তাঁহার সে কথার বাঁধুনী শুনিয়া আর এক জনের কথা মনে পড়ে। তিনিও কথা বলিতে আরম্ভ করিলে দেশের সকলে, চাষাভূষা জমিদার-গৃহস্থ পণ্ডিত-মূর্খ স্ত্রী-পুরুষ সকলে কান পাতিয়া শুনিত। কাহারও কথা সকলের ভাল লাগিলে লোকে বলে, তাহার কথা সকলে 'গিলিতেছে'। মানুষ ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত হইলে, বহুদিন উপবাসী থাকিলে, যেমন আগ্রহে খাইতে বসে সরস-মধুর কথা তেমন আগ্রহে শোনে। দাশরথির কথাও লোকে 'গিলিত'।

দাশরথিকে লোকে, আপনার করিয়া লইয়াছিল। তাই তাঁহার প্রচলিত নাম 'দাশুরায়'। তিনি পাঁচালী গাহিতেন। আসরে নানা শ্রেণীর লোক বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনি কোনও বিষয়ে পালা গান গাহিবার জন্য দাঁড়াইলেন। গান করিয়া আসর জমাইলেন, যত পাণ্ডিত্য, যত সরসতা, যত ভক্তি, যত বিদ্যা—সব ঐ গানে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গে যাহারা থাকিতেন, সেই সব সঙ্গীরা তাঁহার গানকেই আরও সজীব করিয়া তুলিতেন। তখনকার দিনে, শুধু তখনকার দিনেই বা কেন, তাহারও বহু আগে হইতে রামায়ণ মহাভারত সকলই পাঁচালীতে গাওয়া হইত। পাঁচজনে এক বিষয় লইয়া শুধু গানে গানেই আলাপ চলিত। বড় বড় পাঁচালীকার যখন কথা কহিতেন, তখন তাঁহাদের মুখে যেন খৈ ফুটিত। এইরূপ একজন পাঁচালীকার সাবিত্রীর কথা আরম্ভ করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—
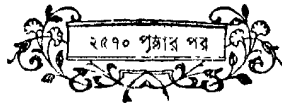
নদীর রত্ন গঙ্গা যেমন জীবের মোক্ষধাম।
রূপের রত্ন কুমার যেমন ভূপের রত্ন রাম॥

তরুর রত্ন তুলসী বিল্ব গগন-রত্ন ভানু।
পক্ষি-রত্ন শারী শুক গো-রত্ন কামধেনু॥
দাতা'র রত্ন কর্ণ আর বলি রাজাকে বলি।
কথার রত্ন কথার মধ্যে হরি কথাকে বলি॥
বর্ণের রত্ন বাল যেমন বর্ণের রত্ন দ্বিজ।
দেহের রত্ন চক্ষু যেমন পুষ্পে সরসিজ॥
কর্ম্মের রত্ন পরোপকার ধর্ম্মের রত্ন দয়া।
দৈত্যের রত্ন প্রহ্লাদ যেমন তীর্থের রত্ন গয়া॥
কপির রত্ন মারুতি যেমন পশুর রত্ন হরি।
স্ত্রীকুলেতে রত্ন তেমনি সাবিত্রী সুন্দরী॥

সব সময়ে পাঁচালীকারেরা যে ভাল কথা লইয়াই থাকিতেন, গম্ভীরভাবে সাবিত্রী-বন্দনা করিতেন তাহা নহে; কখনও কখনও, একটু সুযোগ পাইলেই, লোক হাসাইতে জানিতেন। একজন পেটুক বর্ব্বর চাষার কথা হইতেছে:

গুণে ঘাটি নাই পুরুষের,
সওয়া সিকার তিনটী সের,
ভিজে চালই জলপাণিতে হয়।
ক্ষুদ্র বাগস অবতংস, দুটী বেলা অন্নধ্বংস,
পাঁচসেরের পাকীর কম নয়॥
খেয়ে কাঁচা কলায়ের দালি,
খোস্তা কুড়ালি কোদালি,
হস্তেতে লাঙ্গল বিদ নই।
নিড়ানিতে হাত সাধা, বিছার মধ্যে বোয়া বাঁধা,
সর্ব্বদা সে করে বেড়ায় ঐ॥
কালির অক্ষর নাই পেটে, ফিরে বেড়ায় গোঠে মাঠে
দেখলে তারে জ্বলে যায় কায়া।
কাজেতে আসান পায় বরেকে খসান্ খায়,
পাষাণ সদৃশ নাহি দয়া॥

আবার কথায় কথায় 'অতি' শব্দটা হয়তে আসিয়া পড়িল। আর কোথায় যায়— পাঁচালীকার মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন, বা গাহিতে আরম্ভ করিলেন,—

অতি শব্দে অতি মন্দ ঘটে।
অতি শব্দ যথা তথা পুরাণ প্রমাণ কথা
অতিশয় পড়েছে সঙ্কটে॥
অতি দর্পে লঙ্কানাশ, অতি রূপে বনবাস,
সীতার হইল ত্রেতা যুগে।
অতি শব্দ ভাল কি বলি, অতি দানে রাজা বলি,
পাতালে গেলেন কর্ম্ম ভোগে॥
অভিমানে দুর্য্যোধন সবংশে হইল নিধন,
অতি পাপে কীচক হ'ল নষ্ট।
অতি বেড়ে বিন্ধ্যগিরি আছেন অধঃশির করি,
অগস্ত্য দিলেন কত কষ্ট॥
অতি প্রেমে রাধিকার কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অধিকার,
অতি হাস্যে রোদন অবশ্য॥
অতি দর্পে হল চূর্ণ, গরুড়ের দর্পচূর্ণ,
অতি ভারে রসাতল বিশ্ব॥
কৃপণ হলে অতিশয় তার ধন তস্করে লয়,
অতি শব্দে সুখী কোন্ জন।
অতিশয় বক্তা হলে লোকে তারে বাচাল বলে,
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ॥
জ্বরের সঙ্গে অতিসার হ'লে প্রাণে বাঁচা ভার,
অতিশয় ভোজনে হয় কষ্ট।
অতি খরচে বর্দ্ধনা কড়ি অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি,
অতিশয় চিন্তায় দেহ নষ্ট॥
হ'লে অতি অহঙ্কার সেই পুরুষ প্রিয় কার,
অতিশয় না সয় কারু পক্ষে।
অতিশয় প্রণয় যথা, অতিশয় বিচ্ছেদ তথা,
লাগে ঝড় অতি বড় বৃক্ষে॥

* * *

অতিশয় কষ্ট তার, নড়ে চড়ে বসা ভার,
যে শরীর অতিশয় মোটা।
বর্ষা হলে অতিশয় শস্যেতে ঘটে সংশয়,
অতিশয় উত্তাপে সুখী কেটা॥

প্রায় সোওয়া শত বৎসরেরও অধিক-কাল পূর্ব্বে দাশরথি বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বাঁধমুড়া গ্রামে ১২১২ সালে (ইংরেজী ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে) মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মামার বাড়ীতে থাকিয়া তিনি মানুষ হন এবং সামান্য বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিখিয়া এক নীলকুঠিতে কেরাণীর কাজ করিতেন। তাহার পর কাজকর্ম্ম যায়, গ্রামে বসিয়া একদল সমবয়সী লোক লইয়া তিনি পাঁচালীর দল গঠন করেন,—ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়, রোজগারও কম

হয় নাই। পাঁচালীর গানের কথা উঠিলে সাধারণতঃ তাঁহারই কথা মনে পড়ে। একশত বৎসরও হয় নাই তিনি মারা গিয়াছেন। তবু পাঁচালীর কথা বলিতে গেলেই তাঁহারই কথা মনে পড়ে। দাশুরায়ের ভক্তির গান শুনিয়া বৈষ্ণব পণ্ডিতদের চোখে ঝরঝর করিয়া জল পড়িত। সে সব গানের মধ্যে কবির কৌশলেরও পরিচয় পাওয়া যাইত। কলঙ্কভঞ্জনের পালায় রাধিকাকে এক কলসী জল আনিতে বলা হইল, কলসীতে বহু ছিদ্র থাকিবে তবু এক ফোটা জল পড়িবে না তবে রাধিকাকে ভাল বলা হইবে, তাঁহার কলঙ্কভঞ্জন হইবে। জল আনিতে যাইবার সময় রাধিকা শ্রীহরির উদ্দেশে স্তব করিতেছেন,--প্রতি চারি লাইনের প্রথম অক্ষর এক ক; তাহার পরে--খ; তাহার পরে--গ ইত্যাদি।

ওহে কৃষ্ণ কংসারি! কৃতান্ত-ভয়ান্তকারি!
করপুটে কাঁদে কিশোরী, করুণার প্রয়াসী।
কঠিন কিসের তরে, কৃপা নাই কি কলেবরে?
কক্ষে দেও কেমন ক'রে কলঙ্ক-কলসী।
খর খর বচন ব'লে খল খল হাসিবে খলে,
ক্ষুদ্রগণের খেদ পুরাবেন ওহে ক্ষীরোদবাসি।
কি খেলা নাথ! খেলাইলে. ক্ষিতি হতে খেদাইলে
খুন প্রায় ক্ষতি করিলে এই বড় ক্ষেদ বাসি॥
গোবিন্দ গোলকের পতি পতিহীনগণের পতি,
জ্ঞানহীনে গায় কি সঙ্গতি গুণের গরিমে।
গোপগণ কাঁদে গোপনে গোধন কাঁদে গোবদ্ধনে,
গোপাল কি মনে গ'ণে, গা ঢেলেছে ভুমে॥

কৃষ্ণ কৃতান্ত করপুট কিশোরী কঠিন কৃপা কলেবর যেন সাজিয়া গুজিয়া দাশরথির কথার প্রতি চরণে আসিয়া বসিয়াছে; কবিতায় হয়তো কোথাও এক আধটু খুঁৎ আছে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না,--খুন প্রায় ক্ষতি করিলে ইহার অর্থ যে 'এমন ক্ষতি করিয়াছ যে তাহা প্রায় খুন করিয়া মারিয়া ফেলার মত'--তাহা বুঝিতে হয়তো একটু সময় লাগে, কিন্তু খ--এর খেলা কবি দেখাইয়া গেলেন, আর সে খেলা দেখিয়া সকলে খুশিও হইল।

আবার উপমা, তুলনার কথায়, মর্ম্মস্পর্শী চিত্রে, দাশরথির পাঁচালী মনোরম। এই সকল উপমা অনেকটা, যে সব লোক পাঁচালী শুনিতে আসিত তাহারা বুঝিতে পারিত--পাঁচালীকার হয়ত উপমার নামটার জায়গায় আসিয়া থামিয়াছেন, অমনি বহু লোকে সমস্বরে নামটা উচ্চারণ করিত, সে নামটী পূর্ব্বেকার চরণের শেষ বর্ণের সঙ্গে মিলিয়া যাইত। দাশরথির গানে আছে,--

যেমন বৃত্তির সেরা ব্রহ্মোত্তর মূর্ত্তির সেরা শশী।
কীর্ত্তির সেরা দিত্যাদান তীর্থের সেরা কাশী॥
জাতির সেরা ব্রহ্মকুল ধাতুর সেরা স্বর্ণ।
বুদ্ধির সেরা বৃহস্পতি যোদ্ধার সেরা কর্ণ॥
পক্ষীর সেরা খঞ্জন, চক্ষের কত ব্যাখ্যা।
বৃক্ষের সেরা অশ্বত্থ, দুঃখের সেরা ভিক্ষা॥
ব্রাহ্মণ দলের সেরা মান্য ভূমণ্ডলে।
পদ্মফুল ফুলের সেরা, কুলের সেরা ফুলে॥

এখানে তীর্থের সেরা বলিয়া পাঁচালীকার যেই থামিলেন, অমনি যাহারা শুনিতে আসিত তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, 'কাশী' শশীর সঙ্গে মিলাইয়া ভাল একটি তীর্থের নাম করা তাহাদের পক্ষে বেশী কঠিন হইত না। সেইরূপ যোদ্ধার সেরা যে কর্ণ, দুঃখের সেরা যে ভিক্ষা, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলের সেরা যে ফুলিয়ার মেল,--এ কথা পাচালীকারকে আর বলিতে হইত না তাঁহার মুখের কথা অমনি কাড়িয়া লইয়া আর কেহ বলিয়া ফেলিত।

দাশরথি লোককে হাসাইতে পারিতেন, আবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাঁদাইতেও পারিতেন, জ্ঞান ভক্তির কথা শুনিয়া লোকে ধর্ম্মভাব বোধ করিত। রাবণবধের পালায় ইহার সুন্দর উদাহরণ আছে। জানা গেল, মন্দোদরার নিকটে রাবণের মৃত্যুবাণ আছে। তাহা মন্দোদরীর নিকট হইতে ভুলাইয়া না

আনিতে পারিলে কোনও মতেই রাবণকে বধ করা যাইবে না। হনুমান বুড়া বামুন সাজিয়া মন্দোদরীর নিকট হইতে সেই বাণ ভুলাইয়া লইয়াছেন, আর প্রাচীরে উঠিয়া বসিয়াছেন। সমস্ত লঙ্কায় সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। বনের হনুমানকে ভুলাইয়া ঐ মৃত্যুবাণ কি আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়? না হইলে তো বড় মুস্কিল!

একজন রাক্ষসী বলিল,
কতকগুলো ফল আনলো দিদি।
সৃষ্টি জগদম্বার ও বড় ভক্ত রম্ভার,
তাই এক ভার শীঘ্র আনা বিধি।
দেখাই বরং বর্তমান গোটা দশ বারো মর্ত্তমান,
রম্ভা এনে তামাসা দেখ বসে।
তত্ত্বকথা যাবে ভুলে খাবে মত্ত হয়ে বগল তুলে,
মর্ত্ত্যে বাণ অমনি পড়বে খসে॥
ও পাগল কলার লাগি, কলার জন্য গৃহত্যাগী,
কদলী কাননে বাস করে।
কলা পেলে আর কিছু না চায়
কাঁচকলাগুলো কাঁচা খায়,
মোক্ষফল ফেলে মোচা ফল ধরে।

আর একজন বলিল,—না না, বোধ হয় আমই বেশী ভালবাসে; লঙ্কায় প্রথম আসিয়া তো আমের বনই ভাঙ্গিল, পাশেই কদলীবন ছিল—তাহার তো কিছু করে নাই। তা ছাড়া সীতা উহাকে পাঁচটা আম দিয়াছিলেন, তার চারিটি ও একাই পথে খাইয়াছিল,—লোভের দণ্ডও পাইয়াছিল যথেষ্ট, দম ফাটিয়া মরে আর কি। এমনি কেহ কুল আনিল, কেহ শশা, কেহ বা ডালিম, কেহ আনারস আনিল। একজন আনিল দুইটি বেগুন; বেগুন কেন?

বলে—যদি বেগুনে গুণ ধরে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—হনুমান ভুলিবার লোক নহেন। তিনি গানেই উহাদের জল্পনা-কল্পনার উত্তর দিলেন,—

আমার কি ফলের অভাব
তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরামচরণ কল্পতরু মূলে বই,
যে ফল বাঞ্ছা মনে সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও-ফল কাঙ্গাল নই,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥

সফল বিফল ও ফল প্রতিফল লইয়া

হনুমানের হাতে রাবণের মৃত্যুবাণ
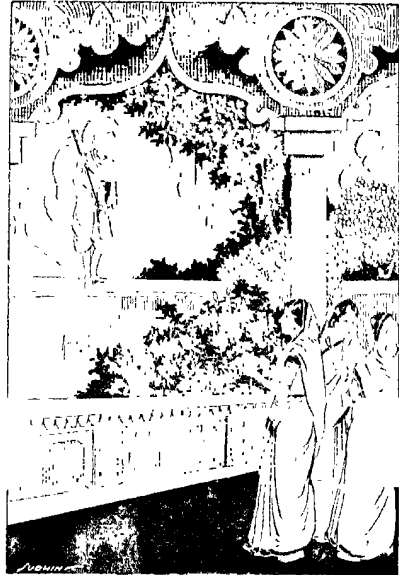
রামভক্ত হনুমান ভক্তি ও তত্ত্বের কথা যাহা শুনাইয়া গেলেন তাহাতে ছোট বড় সকলের মনে ভক্তির তরঙ্গ উঠিল,—সরসভাবে কথাগুলি পৌঁছিল বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে গিয়া লাগিল, পাঁচালীকার, শুধু কথার কচ্‌কচিতে নহে, অন্তরের ভক্তি ও সংসারে বড় জিনিষকে বাছিয়া লইবার শক্তি আছে

বলিয়া, সভায় উপস্থিত সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। দাশুরায় পাঁচালী সাহিত্যের সাহায্যে শিক্ষাও কম দেন নাই।

দাশরথির রচিত কয়েকটি সঙ্গীত আজ পর্য্যন্তও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছে যথা—

দোষ কারো নয়গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা!
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল—কালরূপ জল—কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণী,
ত্রিগুণ ধারিণী, বিগুণ করেছি স্বগুণে;
কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে;
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
তবে তরি চরণ-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করী, করি ক্ষমা।

'কোদণ্ড' শব্দে ধনুক বুঝায়: কিন্তু দাশরথি এই স্থলে 'কোদালি' অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য এই রচনার ভ্রম প্রদর্শন করিলে স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, যখন দাশরথির মুখে বাহির হইয়াছে, তখন উহার অর্থ কোদালিই ধরিয়া লইতে হইবে। ইহা দাশরথির পক্ষে কম গৌরবের নহে।

তাঁহার এই সঙ্গীতটি অত্যন্ত জনপ্রিয়—

হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি কামনা আমারই, হবে বৃন্দে গোপনারী,
আমার দেহ হবে নন্দের পুরী,
স্নেহ হবে মা যশোমতী।

*　　　*　　　*

বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পুরাও, পদে তোমার এই মিনতি।
প্রেমরূপ যমুনার কূলে, আশা বংশীবট মূলে,
'দাস' ভেবে সদয় হ'য়ে, সদা কর বসতি॥
যদি বল সে রাখাল প্রেমে, বদ্ধ আছে ব্রজধামে
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হ'তে চায় দাশরথি।

তোমরা অনেক সময়ে নিম্নলিখিত গান দুইটি ভিখারীদের মুখে শুনিতে পাইবে—

নন্দি! গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়নতারা।
তারাহারা হ'য়ে আমি, হয়ে আছি যে তারা হারা।
যে দিন তিন দিন বলে, গেছেরে সেই দীন-তারা,
সেই দিনে তখনি আমি, দেখেছিরে দিনে তারা;
তারাশোকে বহিছে তারায় তারা কারা ধারা।
ব'সে যোগাসনে সেই তারারূপে।
যারা আছেরে তারা সঁপে,
ওরে নন্দি, তারা কি ধন জেনেছেরে তারা;
তোরা কি এত কাল, মিথ্যা ধরে কাল হরিলি,
জ্ঞান হয়েরে জ্ঞান চক্ষে, মোর তারা না চেনিলি,
জলাভাবে আকুল—সিন্ধুকূলে থেকে তোরা॥

কিংবা—

গিরি, গৌরি আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে,　　চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকালো॥
কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার।
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার।
আমি ভাবি, গিরি! কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো॥

দাশরথি ১২৬৪ সালের ২রা কার্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথির সেই শুভ মুহূর্ত্তে গঙ্গাতীরে গঙ্গাবলোকন করিতে করিতে পরলোক গমন করেন।

F. 6—35
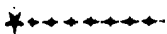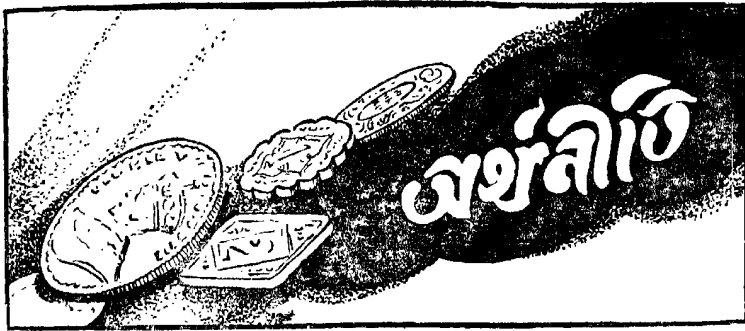
টাকার কথা

তোমরা জান যে যখনই কোন বস্তু ক্রয় করার প্রয়োজন হয় তখনই টাকা-পয়সার দরকার। চানাচুর-ওলার নিকট হইতে চানা আদায় করিতে হইলে তাহাকে পয়সা দিতে হয়; কাগজ-কলমও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তোমার আবশ্যকীয় যাহা-কিছু সংগ্রহ করিতে যাওনা কেন, তোমার তাহার জন্য টাকা, আনা বা পয়সা দিতে হয়। সুতরাং টাকাকড়ি বলিলে কি বুঝায় তোমায় প্রশ্ন করিলে তুমি জবাব দিবে যে—যে-বস্তু দিয়া পণ্য খরিদ করা যায় তাহাই টাকা-কড়ি। তোমার এই কথাটাই আমরা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব।

তোমার চিনাবাদাম খাইবার সখ হইলে তুমি একটি পয়সা দিবে; আবার একটা ফুটবল খরিদ করিতে চাহিলে পয়সা দিয়া হইবে না, তোমায় টাকা খরচ করিতে হইবে। এই পয়সা বা টাকার বদলে চিনাবাদাম বা ফুটবল পাওয়া যায় বলিয়া পয়সা টাকা, টাকাকড়ি পর্য্যায়ে পড়িল। কিন্তু পয়সা বা টাকাটা কি বস্তু? একটা টাকা হাতে করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দেখিবে গোলাকার একখণ্ড রূপার উপর রাজা-রাণীর মূর্ত্তি খোদাই করা আছে পয়সাও ঠিক তাই, শুধু রূপার বদলে ইহা তাম্রনির্ম্মিত। এইরূপ গোলাকৃতি ছাপ মারা ধাতুকে আমরা মুদ্রা বলি। দেশের রাজা বা গভর্ণমেণ্ট এইগুলি বার করেন। প্রত্যেক দেশের মুদ্রা আলাদা; আমাদের দেশে টাকা বিলাতে পাউণ্ড, ফ্রান্সে ফ্রাঁ, জার্ম্মাণীতে মার্ক, যুক্তরাষ্ট্রে ডলার, জাপানে ইয়েন ইত্যাদি। সাধারণতঃ যে-দেশের মুদ্রা সেই দেশেই চলে, অন্য দেশে চলে না। মুদ্রাগুলি যে গোলাকৃতির হইবেই এরূপ কোন কথা নাই, তবে সাধারণতঃ গোলাকারই হইয়া থাকে। সরকার মুদ্রাগুলির আকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন।

অধিকন্তু মুদ্রাগুলি যে ধাতু-নির্ম্মিত করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই; তবে আজকাল সব সভ্য দেশেই ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাই চলে। কি ভাবে ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রাই প্রচলিত হইল সেই কথাই সংক্ষেপে বলি।

আদিম যুগে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখে নাই তখন জীবনধারণোপযোগী আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই ব্যক্তিমাত্রকেই উৎপাদন করিতে হইত। সমাজবদ্ধ হইয়া উঠিবার পর মানুষ পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করিয়া অভাব পূরণ করিতে শিখে। যে খাদ্য শস্য উৎপাদন করিয়াছে সে অপরের নিকট হইতে মাংস লইয়া শস্য দিয়া নিজের মাংসের অভাব পূরণ করিল। কিন্তু এই ভাবে একটা জিনিষের

বদলে আর একটা দ্রব্য পাওয়ার মুস্কিল আছে। হয়ত রামের কাছে দুইটি পাখী আছে; কিন্তু তার চাই ছাগলের চামড়া; অথচ যার কাছে ছাগলের চামড়া আছে সে চায় না পাখী। বা হয়ত পাখী নিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাহার চামড়া এতটা পরিমাণ নাই যে তাহার বদলে পাখী পাইতে পারে; বা হয়ত যে-লোকটির ছাগল-চামড়া আছে সে শুধু মাছের সহিতই বিনিময় করিয়াছে, ছাগল চামড়ার সহিত বিনিময় করে নাই, তাই কতটা পরিমাণ চামড়া দিলে একটা পাখী পাওয়া যায় তা জানে না। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা যায়? প্রাচীনেরা ইহারও একটা উপায় বাহির করিয়াছিলেন: ধর 'রাম' একটা পাখীর বদলে 'হরি'র নিকট হইতে মাছ গ্রহণ করিল অথচ রামের মাছের প্রয়োজন নাই, কিন্তু 'যদু'র আছে; হরির নিকট হইতে মাছ লইয়া যদুকে দিল এবং তাহার বদলে যদুর নিকট হইতে ছাগলের চামড়া গ্রহণ করিল। কিন্তু এই সব মুস্কিলের অবসান হয় যদি এমন কোন বস্তু পাওয়া যায় যাহা সকলেই লইতে প্রস্তুত, তাহা হইলে এত হাঙ্গামা করিতে হয় না; সকলের কাম্য বস্তুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে যখন-ইচ্ছা যে-কোন-দ্রব্য ইচ্ছা পাওয়া যাইতে পারে। টাকাকড়ি এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে।

পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করিতে করিতে দেখা গেল যে, এরূপ কতকগুলি পণ্য আছে যাহা সকলেই চায় এবং যাহার বিনিময়ে যে-কোন সময়ে অপর যে-কোন অভীপ্সিত বস্তু পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ পণ্যই বিনিময়ের বাহন হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ কোন পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণের সময় এইরূপ সর্বজন আদৃত পণ্যই আদর্শ ধরা হইত। প্রাচীন কৃষি উপজীবিকা-প্রধান গ্রীক্ সমাজে গবাদি পশু বিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইত। কর্ম্মপটু বাঁদি দাসীর মূল্য ধরা হইত চারটি ষণ্ডের সমান। শুধু গ্রীস বলিয়াই নয় প্রায় সকল কৃষিপ্রধান দেশেই অতি প্রাচীন কালে মেষ, গরু, মহিষ প্রভৃতি পশুই মূল্যের মান বলিয়া ধরা হইত। কিন্তু যে-সব জাতিকে প্রধানতঃ শিকার করিয়া বা মাছ ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহাদের মধ্যে এই সব গৃহপালিত পশুকে মূল্যের মান বা টাকাকড়িরূপে ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল না। আইস্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা মাছকেই বিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহার করিত; তাহারা মেয়েদের পায়ের একজোড়া মোজার দাম ধরিত তিনটি মাছের সমান; আধ পাউণ্ড চর্ব্বির মূল্য পাঁচটি মাছের সমান ইত্যাদি। রুশ দেশে মধ্যযুগে চামড়াই মূল্যের মান ছিল। ভার্জ্জিনিয়ার মান ছিল তামাক।

শিল্পোন্নতি ও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রচলনের পর বিনিময়ের বাহনরূপে ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। শস্য বা পশু দেশ-বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সকল ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নহে এবং বিদেশী ব্যাপারী সকল সময়ে তাহা লইতেও চাহে না। টিন, তামা, রূপা, সোণা প্রভৃতি ধাতু নানা কার্য্যে লাগে এবং স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াও সহজ, সেই হেতু সকল দেশের লোকের কাছে তাহার একটা মূল্য আছে। ধাতুগুলি তাই সহজেই বিনিময়ের বাহন হইতে পারিয়াছিল। ধাতু ওজন করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা হইত। কিন্তু যদি দ্রব্য আদান-প্রদানের সময় সকল ক্ষেত্রে ধাতু ওজন করিয়া মূল্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে কাজের ঝঞ্ঝাট বাড়িয়া যায় এবং ওজনের জুয়াচুরি হইতে নিস্তার পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠে। এই ওজন ঠিক রাখিবার জন্য, যে সব সোনা, রূপা, তামা, টিন সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা কুঠিয়ালের হাতে আসিয়া পড়িত তাঁহারা তাহাতে স্বীয় স্বীয় নাম অঙ্কিত করিয়া দিতেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ সুবিধা হইল না। তখন রাষ্ট্র, ধাতুর উপর স্বীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া লোকের বিশ্বাস বিনিময়ের বাহনের উপর অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। সকল ধাতুর মধ্য হইতে টাকাকড়ি নির্ম্মাণের জন্য সোণা-রূপাকে বিশেষভাবে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে; তাহার কারণ, সোণা-রূপার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

সোণা-রূপা খুব সহজেই এক স্থান হইতে আর একস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। আয়তন ও ওজনের তুলনায় সোণা-রূপার মূল্য অনেক; সেই জন্য একস্থান হইতে আর একস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার খরচাও তুলনায় কম। তাই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোণার দাম এক থাকে; কেন না যেই একটা দেশে সোণা বেশী জমিয়া উঠে অমনি সহজেই সেটা যে-দেশে সোণা ঘাটতি পড়িয়াছে, সেই-দেশে চালান করিয়া দেওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সোণার খনিতে সোণার যে দাম, লণ্ডন সহরে তাহার অপেক্ষা খুব বেশী সোণার দাম নয়। এই হিসাব দেখিলে রূপার তুলনায় সোণাই মুদ্রা হইবার বেশী উপযোগী।

সোণা-রূপা কর্পূরাদির মত উবিয়া যায় না বা মাছ-মাংসের মত পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় না। তাই সোণার মূল্য কখন সময়ের সঙ্গে বাড়ে-কমে না। সোণায় মরিচা ধরে না যে কিছুকাল জমা করিয়া রাখিলে তাহার মূল্য কমিয়া যাইবে। তাই অলঙ্কার তৈরীর জন্য সোণা এত অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশর দেশে যে সকল স্বর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার প্রচলিত ছিল, আজও তাহা সমান উজ্জ্বল আছে। এই গুণের জন্যই লোকে যখন ধন সঞ্চয় করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখে বা লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখে, তখন সোণা-রূপারই আশ্রয় লয়।

বিভিন্ন খনির সোণার রং একটু-আধটু পৃথক হইতে পারে কিন্তু তাহার জন্য ধাতুর মূল্য পৃথক হয় না। ক্যালিফোর্ণিয়ার খনি হইতে উঠান এক সের খাঁটী সোণার বিনিময়-মূল্য অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা বা দাক্ষিণাত্য হইতে পাওয়া এক সের খাঁটী সোণার সমান হয়। অপর কোন পণ্যই সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় না।

এক ভরির একটা সোণার তাল পিটিয়া যতখানি ইচ্ছা লম্বা তার তৈরী করিতে পারা যায়; সেই তারকে কাটিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা যায়। আবার সেই ক্ষুদ্র অংশগুলিকে গলাইয়া লইলে ঠিক সেই এক ভরি সোণাই পাওয়া যাইবে। সোণাকে এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিলেও তাহার মূল্যের পরিবর্ত্তন হয় না। একটা বড় সোণার তালকে যদি দশ খণ্ড করা যায়, তবে ঐ দশ খণ্ডের মূল্য ঐ বৃহৎ তালটির সমানই হইবে, খণ্ড করা হইয়াছে বলিয়া মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না এবং ঐ এক একটি খণ্ডের মূল্য দশ ভাগের একভাগ হইবে। কেহ কেহ হীরককে টাকাকড়ি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু হীরকের এই গুণটি নাই। দশ রতি ওজনের একটি টুকরা হীরার মূল্য এক রতি ওজনের একটা হীরার মূল্যের দশগুণের অনেক বেশী।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যদি সোণা-রূপা উৎপাদন সহজেই করা যাইত বা মাটি খুঁড়িয়া যদি শত সহস্র মণ সোণা তোলা সম্ভব হইত, তবে যোগান কম বেশী হওয়ার জন্য মূল্য বাড়িত বা কমিত। সোণা অতি মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য ধাতু এবং সোণা উৎপাদন করিতে খরচও হয় যথেষ্ট; তাই মূল্যের তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প।

খাঁটি সোণা বা রূপা দিয়া কখনো মুদ্রা তৈয়ারী করা হয় না। সোণা-রূপার সহিত খাদ না মিশাইলে উচিত মত শক্ত হয় না, নরম থাকিয়া যায় এবং সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে; তাই সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ খাদ মিলাইয়া মুদ্রা তৈয়ারী করা হয়। সোণার সহিত রূপা ও তামা এবং রূপার সহিত তামার খাদ দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণমুদ্রায় খাদ থাকে দশভাগের এক ভাগ আর যুক্তরাজ্যে স্বর্ণমুদ্রায় খাদ থাকে বার ভাগের এক ভাগ।

মনে কর, একটা গিনি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে পড়িয়া গেল; যখন সেটিকে উদ্ধার করিলে দেখিলে গিনিটা গলিয়া গিয়া একটা তাল পাকাইয়াছে। এখন সোণার তালটি বিক্রয় করিতে চাহিলে যদি লোকে তোমায় পনেরো টাকা দেয়, তাহা হইলে এটা তুমি বুঝিবে যে গিনি হিসাবে ঐ স্বর্ণ-খণ্ডটির যে মূল্য ছিল ধাতু হিসাবেও উহার সেই মূল্য বজায় আছে অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে পারি যে গিনিটির ধাতুমূল্য এবং মুদ্রামূল্য সমান।

প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট এমন সব মুদ্রা ছাড়েন যাহার মুদ্রা-মূল্য ধাতুমূল্য অপেক্ষা অধিক। সাধারণতঃ তামার ও ব্রোঞ্জের তৈরী মুদ্রাগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে; আমাদের দেশের টাকাও এই শ্রেণীর। একটা টাকার মূল্য ষোল আনা হইলেও সেই টাকায় যে-পরিমাণ রূপা আছে তাহা ষোল আনায় বিকাইবে না। যে-সব মুদ্রার ধাতুর পরিমাণের চেয়ে মুদ্রা হিসাবে মূল্য বেশী তাহাদের "গৌণ মুদ্রা" বা "টোকেন্ কয়েন" কহে। 'গৌণ মুদ্রা'গুলির মূল্য যৎসামান্য হইয়া থাকে। ট্রাম-বাসের টিকিট, সিনেমার টিকিট, এক কাপ চায়ের দাম······এমনি সব ছোট খাট কেনা বেচায় এই সব গৌণ মুদ্রা ব্যবহার হয়।

এই ভাবে ধর যদি গভর্ণমেণ্ট সাত আনার রূপাকে মুদ্রায় পরিণত করিয়া ষোল আনা পয়সা

আদায় করিতে পারেন তাহা হইলে গৌণ মুদ্রা ছাড়ার ফলে সরকারের কিছু লাভ হয়। সুতরাং তোমাদের মনে হইতে পারে যে সরকারের যখন লাভ করিবার এত সুযোগ আছে তখন সরকার ত অনায়াসেই লোকের উপর করের বোঝা না চাপাইয়া বা টাকা কর্জ না লইয়া যত-ইচ্ছা গৌণ মুদ্রা তৈরী করিয়া কাজ সারিতে পারেন। কিন্তু তাহা হয় না; বর্ত্তমান জগতে গৌণ মুদ্রা তৈয়ারী করার জন্য লাভটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আজ-কাল মোটা টাকার লেনদেনে কেহ ধাতু মুদ্রা ব্যবহার করে না খুচরা খরচাদির জন্যই মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং লোকের খুচরা টাকাকড়ি কতটা পরিমাণ দরকার তাহা খতাইয়া সরকারকে ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা ছাড়িতে হয়। তাই অপর্যা মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া মুনাফা করার সখ সরকারকে পাইয়া বসে না।

এতক্ষণ গৌণ মুদ্রা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝিতে পারিতেছ যে সরকারের হুকুমেই গৌণ মুদ্রা চলে: সরকার আদেশ দিয়া বলেন যে "এই রূপার বা অন্যবিধ ধাতুর টুকরাটি শিলিং, টাকা, ফ্রাঁ বা মার্ক হিসাবে চলিবে": তখন যে দেশের মুদ্রা সেই দেশের মধ্যে তাহা চল্‌তি মুদ্রা হইয়া দাঁড়ায়।

প্রত্যেক দেশেই আদর্শ মুদ্রার সহিত (অর্থাৎ যে সব মুদ্রা ধাতু-মূল্যের সহিত মুদ্রা-মূল্য সমান) কিছু পরিমাণ গৌণ মুদ্রাও চলে। আবার শুধু গৌণ মুদ্রা কেন কাগজী মুদ্রাও চলে। এই কাগজী মুদ্রাকে আমরা 'নোট' বলি। ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রাগুলি, তা গৌণ মুদ্রাই হউক আর আদর্শ মুদ্রাই হউক, সরকারের নিজস্ব টাঁকশালেই তৈয়ারী হয়; কিন্তু নোট তৈরী হয় কোন দেশে সরকারী টাঁকশালে আবার কোথাও বা ব্যাঙ্কের কোষ-খানায়। সরকার ব্যাঙ্ককে নোট তৈরী করিবার বিশেষ অধিকার দেন। কোথাও বা দুই তিনটি ব্যাঙ্কের নোট তৈরীর ক্ষমতা আছে আবার কোথাও বা একমাত্র 'কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক' সে ক্ষমতা রাখে। আমাদের দেশে এতদিন যে-সব নোট তৈরী হইত, তাহা প্রস্তুত হইত সরকারী টাঁকশালায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নোট তৈরীর ক্ষমতা ভারত সরকার এই ব্যাঙ্ককে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এক হিসাবে দেখিতে গেলে ধাতুনির্ম্মিত গৌণ-মুদ্রার সহিত কাগজের তৈরী নোটের কোন তফাৎ নাই। গৌণ-মুদ্রার ধাতুমূল্য, মুদ্রামূল্য অপেক্ষা কম; কাগজের তৈরী নোটের বেলায়ও তাই; দুই-ই সরকারের হুকুমে বেশী দামে বিকায়। এদিকে আবার কাগজের নোট তৈরী করিতে খরচাটা হয় অপেক্ষাকৃত কম; তাই কাগজের নোট তৈরী করিয়া অতি সহজেই মোটা মুনাফা পাইবার সরকারের প্রলোভনও অধিক।

বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যক্তি অথবা সঙ্ঘের নিকট মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে রসিদ লইলে, সেই রসিদখানা হইল 'প্রতিভূমুদ্রা' (রিপ্রেজেন-টেটিভ্ পেপার মানি)। ব্যাঙ্ক অথবা সরকার এ কাজ চালাইতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের তহবিলে কমপক্ষে ২০ ডলার জমা রাখিলে, সেই তহবিলের সেক্রেটারী মহাশয় একখানা রসিদ বা সার্টিফিকেট দেন; এই রসিদ বা গোল্ড সার্টিফিকেট হইল প্রতিভূ কাগজী মুদ্রা। সোনার তাতফের হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সরকার এইরূপ গোল্ড সার্টিফিকেট ছাড়েন। যত টাকার গোল্ড সার্টিফিকেট সরকার ছাড়িতে চান, ঠিক তত মূল্যের সোনা তহবিলে জমা করিয়া রাখিতে হয় বলিয়া সরকার কখনো খেয়াল-খুশীমত মুনাফা মারিবার আশায় যত-ইচ্ছা প্রতিভূ কাগজী মুদ্রা ছাড়িতে পারেন না।

লোকের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ও পণ্য খরিদ করিবার জন্যই টাকাকড়ির প্রয়োজন। ধাতু-মুদ্রা দিয়া সহজেই এ কাজ চালান যায় বলিয়া ধাতু-মুদ্রা টাকাকড়িরূপে ব্যবহৃত হয়। মুদ্রাকে একটা আদেশ-পত্র বিশেষও বলা যাইতে পারে—যেন প্রত্যেক উৎপাদককে বলা হইতেছে যে, এই মুদ্রা-বাহককে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য দিবে। যদি মুদ্রাকে এইরূপ আদেশ-পত্ররূপে দেখা যায়, তবে সেই আদেশ কাগজের দ্বারাও জ্ঞাপন করা যাইবে না কেন? অবশ্য এ বিষয়ে সাধারণের সম্মতি থাকা আবশ্যক। সোনা-রূপা সম্বন্ধেও একথাও খাটে। একজন সোনা বা রূপা দিলে আর একজন তাহা লইতে চায় বলিয়াই সোনা-রূপা মুদ্রার আসন পাইয়াছে, তেমনি সাধারণের সম্মতি থাকিলে কাগজও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। লেন-দেনে কাগজী মুদ্রার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিংশ

শতাব্দীর আবিষ্কার নহে। নবম খৃষ্টাব্দে চীন দেশে কাগজী মুদ্রার চলন ছিল; তাহার পূর্ব্বে ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। প্রাচীন আসিরিয়া ও ব্যাবিলনে ইহার ব্যবহার ছিল। প্রাচীন ভারতে ইহার চলন ছিল কিনা জোর করিয়া বলা যায় না।

বর্ত্তমান সভ্যসমাজে মুদ্রাহিসাবে কাগজই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। মোটা টাকার কারবার কাগজী মুদ্রার সাহায্যেই সংঘটিত হয়। তবে বিভিন্ন দেশে নোটের ব্যবহার বিভিন্ন, কোন কোন দেশে খুব কম মূল্যের নোট ছাড়া হয়; এই আমাদের দেশেই কিছুকাল পূর্ব্বে এক টাকার নোট প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। আবার কোন দেশে বা শুধু মোটা টাকার নোটই ছাড়া হয়। যে দেশের পাওনা সাধারণতঃ নোট দিয়া মিটানো হয় সে দেশে হঠাৎ যদি বেশী নোট ছাড়া হয়, তাহা হইলে টাকাকড়ির বাজারে বিপর্যয় উপস্থিত হয়।

আজকাল উন্নত দেশগুলিতে ধাতুমুদ্রা বা নোটের বদলে দেনা-পাওনা মিটানোর সময় চেকই বেশী চলে। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ একখানা চেক্ বহি দিয়া থাকে। এই চেকে টাকার পরিমাণ লিখিয়া সই করিয়া দিলে, ব্যাঙ্ক, দাবী করিলেই সেই পরিমাণ টাকা দিয়া থাকে। চেক্‌গুলি হইল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার ক্ষমতার সার্টিফিকেট। এখন ধরা যাক্ তুমি পিণ্টুকে ১০০৲ টাকা দিতে চাহিতেছ; তুমি তাহা হইলে পিণ্টুকে সঙ্গে করিয়া ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া চেক্ ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা করিয়া ১০০৲ টাকা পিণ্টুকে দিবে। তুমি আর এক কাজও করিতে পার। দু'জনে ব্যাঙ্কে না গিয়া তুমি পিণ্টুকে ১০০৲ টাকার একখানা চেক্ লিখিয়া দিতে পার। পিণ্টু নিজেই চেক্ ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা লইতে পারে বা নিজ ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিতে পারে। ফল এই হইল যে ব্যাঙ্কের খাতায় তোমার নামে ১০০৲ টাকা খরচ পড়িল ও পিণ্টুর নামে সেই টাকা জমা হইল। এই পন্থা অবলম্বন করিলে নগদ টাকার বদলে চেক্‌ই হাতফের করিবে।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে ব্যাঙ্কের চেক্ ভারতে এখনো সুপ্রচলিত নয়। ইংরাজ সমাজে সপ্তাহে গড়পড়তা ১৫০ ক্রোড় টাকার চেক্ দরকার হয়; দিনে তাহা হইলে ইংরেজ নর-নারী, বেপারীই হউক বা সাধারণ গৃহস্থই হউক ১৫০৲ কোটী টাকার চেক্ ব্যবহার করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন কোন ব্যাঙ্কের নোট ছাড়িবার ক্ষমতা আছে; ব্যাঙ্ক যে নোট ছাড়ে, তাহাকে ব্যাঙ্ক-নোট কহে। ব্যাঙ্ক নোট ও চেক্ দুইই শপথ পত্র; নোটের বেলায় ব্যাঙ্ক শপথ করে টাকা মিটাইয়া দিবার আর চেকের বেলায় শপথ করে ব্যক্তি বিশেষ। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি ১০৲ টাকার নোট ছাড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শপথ করিতেছে যে, তুমি যদি ঐ ১০৲ টাকার বদলে দশটি ধাতব মুদ্রা দাবী কর তাহা হইলে ব্যাঙ্ক তাহা তৎক্ষণাৎ দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু মনে কর আমি তোমার নামে ১০৲ টাকার এক চেক্ লিখিয়া দিলাম; ইহার অর্থ এই যে, আমি তোমায় ১০৲ টাকা দিতে শপথ করিতেছি; তুমি ঐ চেক আমার ব্যাঙ্কে দাখিল করিয়া ১০৲ টাকার দাবী করিলেই ব্যাঙ্ক তাহা তৎক্ষণাৎ দিবে।

বিশ্বসাহিত্য

[পিটার প্যান রচয়িতা জেমস্ ব্যারি (Sir James Mathew Barrie Bart., O. M.) বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। নাট্যকার হিসাবে তাঁহার খুব যশঃ ও প্রতিপত্তি রহিয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে ফোরফার-শায়ারের (Forfarshire) অন্তর্গত কিরিয়েমুর (Kirriemuir) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর সাংবাদিক হিসাবে যশঃ লাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে আসেন এবং St James's Gazette, British Weekly, (Gavin Ogilvy), National Observer, Speaker প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি লিখেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'Better Dead' প্রকাশিত হয়। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত ছেলেমেয়েদের নাটক Peter Pan ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই নাটকখানির ন্যায় ছেলেমেয়েদের প্রিয় নাটক অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যারি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে Old Friends, A Slice of Life, Rosalind, The Will প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথীর মৃত্যু হইয়াছে।]
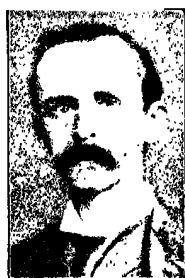
জেমস্ ব্যারি

পিটার প্যান্

-পিটার প্যান্ আর তাহার ছায়া—

২৫৮২ পৃষ্ঠার পর

সে বহুযুগ আগেকার কথা কোন এক দেশে ছোট্ট একটী মেয়ে ছিল, তাহার নাম ছিল ওয়েণ্ডি। ওয়েণ্ডির ছিল দুই ভাই—জন্ নেপোলিয়ান আর মাইকেল নিকোলাস্। ঐ তিন ভাই বোনে মিলিয়া একটী কুকুর পুষিয়াছিল,—কুকুরটীর নাম ছিল নানা।

নানার মত প্রভুভক্ত, চালাক আর কাজের কুকুর পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় না। বাড়ী-ঘরের অনেক কাজকর্ম্ম নানা একা একাই

সম্পন্ন করিত। ঐ ছেলেমেয়ে কয়টিকে দেখাশোনা করাতে সে একেবারে একজন মানুষের মত দক্ষতা দেখাইত। জামা-কাপড় শুকাইয়া না গেলে কাহারও তাহা পরিবার উপায় ছিল না, কারণ স্যাঁৎসেঁতে জামাকাপড় পরিলে চীৎকার করিয়া ও পরণের জামাকাপড় দাঁত দিয়া কামড়াইয়া টানাটানি করিয়া নানা তাহার আপত্তি জানাইত। ঠিক স্নানের সময়ে নানা তাহার মুখ দিয়া জলের কল খুলিয়া ওয়েণ্ডিদের জন্য রোজই জলের গামলা ভরিয়া রাখিত। কেহ যদি কোন দিন স্নান করিতে না চাহিত তাহা হইলে নানা অনেক রকমে তাহাতে আপত্তি জানাইয়া তাহাদিগকে স্নান করিতে বাধ্য করিত। এক কথায় বলিতে গেলে

ওয়েণ্ডিরা তখন ঘুমে অচৈতন্য। ঘরে ঢুকিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার ত একেবারে চক্ষুস্থির! ঘরের মধ্যকার ক্ষীণ আলোতে তিনি দেখিলেন যে সেই ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত মূর্ত্তি খুব ব্যস্তসমস্তভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওয়েণ্ডির মাকে দেখিয়াই সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটি দৌড়াইয়া জানালার দিকে ছুটিল। ওয়েণ্ডির মাও তাহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া ছুটিয়া গেলেন। তাড়া খাইয়া সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটা চট করিয়া জানালা গলিয়া বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মূর্ত্তিটা এইভাবে জানালার বাহিরে লাফাইয়া পড়িতেই ওয়েণ্ডির মা দুম করিয়া সেই

সুখী পরিবার—বাবার পিঠে মাইকেল

নানাই ঐ ছেলেমেয়ে কয়টিকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিল।

ওয়েণ্ডির মা নানাকে বড় ভালবাসিতেন, কারণ তিনি জানিতেন যে নানা থাকিতে তাঁহার ছেলেমেয়েদের কোনদিন কোনও বিপদ-আপদের ভয় নাই।

ওয়েণ্ডিরা তিন ভাইবোনে মিলিয়া এক ঘরে রাত্রে ঘুমাইত—আর সেই ঘরের বাহিরে পাহারা দিত নানা। ওয়েণ্ডির মা নানার মত সাহসী আর বলবান কুকুরটিকে তাঁহার ছেলেমেয়েদের পাহারায় রাখিয়া পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন।

একদিন রাত্রে ওয়েণ্ডির মা ওয়েণ্ডিদের ঘরে কি একটা জিনিস আনিতে গিয়াছিলেন।

জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই মূর্ত্তিটা পালাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ঘরের জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহার ছায়া পড়িয়া রহিল সেই ঘরের মধ্যে ওয়েণ্ডির মায়ের একেবারে পায়ের কাছে। ছায়া কখনও ধরা-ছোঁয়া যায় না। কিন্তু সে ছায়াটা ছিল নিরেট। সেই জন্য তিনি তাড়াতাড়ি সেই ছায়াটাকে তুলিয়া লইয়া একটা দেরাজের টানার ভিতরে রাখিয়া দিলেন।

ওয়েণ্ডির মায়ের ভয়ানক ভয় করিতে লাগিল যে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটা কোনদিন না আবার আসিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ের কোনও অনিষ্ট করিয়া বসে। তবে তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে নানা

পাহারায় থাকিতে তাঁহার ছেলেমেয়ের গায়ে এতটুকু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগিবে না।

এক এক করিয়া কয়েকদিন বেশ কাটিয়া গেল। একদিন ওয়েণ্ডির বাবা ওয়েণ্ডির মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমার কি রকম আক্কেল বলত? কুকুরকে দিয়ে কি আর চিরদিন ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা চলে? ওদের দেখাশোনা করবার জন্য আমি শীঘ্রই একজন লোক ঠিক করবো ভেবেছি।-হ্যাঁ, আর একটা কথা। কুকুরটা নাকি আজকাল আবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে মেঝের উপরেই শুচ্ছে? অবাক কাণ্ড!—আজ থেকে আর ওসব হবে না। নানাকে বাড়ীর উঠানে শোবার একটা জায়গা ক'রে দিয়ো।" ওয়েণ্ডির বাবার কথা শুনিয়া ওয়েণ্ডির মা তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে নানা কুকুর হইলে কি হয়। কোনও মানুষই তাহার মত কাজকর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারে না। কারণ, সে যে ওয়েণ্ডি আর তাহার দুই ভাইকে নিজের সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসে। অত গভীর ভালবাসা মানুষে মানুষেও সম্ভব নয় কিন্তু ওয়েণ্ডির মায়ের অনুনয়-বিনয়ে কোনও ফল হইল না। নানা রাত্রিবেলা আর তাহাদের কাছে শুইবে না। এ খবর পাইয়া ওয়েণ্ডি আর তাহার ভাইয়েরা কত কান্নাকাটী করিল—নানাও অনেক ডাকাডাকি করিয়া ও মাটী আঁচড়াইয়া তাহার আপত্তি জানাইল। কিন্তু কিছুতেই ওয়াণ্ডির বাবার মন গলিল না। নানা ওয়েণ্ডিদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেদিন বাড়ীর উঠানে শুইতে গেল। ওয়েণ্ডির মা এবং ওয়েণ্ডি ও তাহার ভাইয়েরা দেখিল যে নানার চোখের কোনে জল জমিয়াছে—বেচারীর চোখ ছল্‌ছল্ করিতেছে, ইহাতে তাহারও চোখের জল ফেলিল।

যে-রাত্রিতে নানা বাহিরে আশ্রয় লইল সেই রাত্রিতে ওয়েণ্ডিদের ঘরের জানালার বন্ধ শার্শি ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া খুলিয়া গেল—আর সেই জানালা গলিয়া সুড়্‌সুড় করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটা। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সেই মূর্ত্তিটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার হারাইয়া যাওয়া ছায়াটি খুঁজিতেছিল আর আকাশের দিকে কাহাকে যেন উদ্দেশ্য করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "আমার ছায়াটি কোথায় হারালাম? ছায়া হারিয়ে আমি যে একেবারে মন-মরা হ'য়ে বাস করছি।" এই কথা বলিয়া সে ডাকিতে লাগিল "টিঙ্কার বেল টিঙ্কার বেল—আমার ছায়া কোথায় হারিয়েছে খুঁজে দিয়ে যাও ত।" তাহার এই কথা শেষ

সেই মূর্ত্তিটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার ছায়া খুঁজিতে লাগিল

হইতেই ঘরের দেয়ালের উপর কোথা হইতে যেন এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল—সেই আলোর রেখাটুকু ঘরের দেয়ালের এধার-ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—তারপর একবার কড়িকাঠে আর একবার মেঝের উপরে উঠা-নামা করিতে লাগিল। এই আলোর উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে টুংটাং করিয়া বড় চমৎকার মল-বাজার মত একটা আওয়াজ হইতে লাগিল—সে আওয়াজে মানুষের চোখে আপনা আপনিই ঘুম নামিয়া আসে;—এত মধুর আর মিষ্টি সেই আওয়াজ! এই যে মধুর আওয়াজ হইতেছিল উহা টিঙ্কার বেলের পায়ের আওয়াজ—আর সেই যে আলো ঘরের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করিতেছিল তাহা টিঙ্কার বেলের দেহের অপূর্ব্ব দীপ্তি। টিঙ্কার বেল একটি পরী—সে ঐ অদ্ভুত মূর্ত্তিটার আহ্বান শুনিয়া তাহার ছায়া খুঁজিয়া দিতে আসিয়াছিল।

টিঙ্কার বেল মূর্ত্তিটাকে বলিয়া দিল যে তাহার ছায়া দেরাজের টানার মধ্যে রাখা আছে। ছায়ার সন্ধান পাইয়া মূর্ত্তিটা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দেরাজের টানা খুলিয়া তাহার ছায়াটি বাহির করিয়া ফেলিল। তারপর আনন্দে মশগুল হইয়া সে সেই ঘরের মধ্যে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল আর টিঙ্কার বেলও তাহার নাচের তালে তালে তাহার পা ফেলিয়া টুংটাং আওয়াজ করিতে লাগিল। আনন্দে উল্লসিত টিঙ্কার বেলকে তখন দেখাইতেছিল ঠিক যেন একটি আলোয় আলোকিত উজ্জ্বল প্রজাপতি।

কিন্তু খানিক পরেই সেই মূর্ত্তিটার সব আনন্দ কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। তাহার নিরানন্দের কারণ এই যে তাহার ছায়াটা আগের মত আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেছিল না। উহা কেবলই তাহার কাছ হইতে ছিন্ন হইয়া সাত হাত দূরে পড়িয়া থাকিতেছিল। ছায়াটা তাহাকে অনুসরণ করিতেছে না দেখিয়া মূর্ত্তিটা বড়ই দুঃখিত হইল—দুঃখের চোটে সে বেচারী খুব বিমর্ষ হইয়া একপাশে গিয়া বসিয়া কাঁদিতে সুরু করিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ওয়েণ্ডির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া ওয়েণ্ডি তাহাদের ঘরের মধ্যে সেই মূর্ত্তিটি ও টিঙ্কার বেলকে দেখিয়া ভয় পাইল না মোটেই। বরং সে বিছানা হইতে উঠিয়া মূর্ত্তিটার কাছে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই তুমি কাঁদছ কেন? তোমার নামটিই বা কি?" মূর্ত্তিটা ওয়েণ্ডিকে তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া বলিল, আমার নাম **পিটার প্যান।**" পিটার প্যানের কথা শুনিয়া ওয়েণ্ডি সূচ-সূতা আনিয়া সেই ছায়াটাকে পিটার প্যানের দেহের সঙ্গে সেলাই করিয়া জুড়িয়া দিল। এইবার পিটার প্যান্ আবার আহ্লাদে আটখানা হইয়া ঘরের মেঝের উপর নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল—এবার আর তাহার ছায়া তাহার দেহ হইতে আলাদা হইয়া বিচ্ছিন্ন হইল না উহা তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিতে লাগিল।

এইবার পিটার প্যান্ ওয়েণ্ডিকে তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল যে তাহারা পরীর রাজ্যে থাকে—সেখানে সবাই চির নবীন। সেখানে তাহারই মত অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে। পৃথিবীর যত হারিয়ে-যাওয়া ছেলে তাহারা সবাই সেই পরীর রাজ্যে গিয়া জোটে আর সেখানেই তারা বাস করে। তাহাদের সঙ্গে সেখানে অনেক পরীও থাকে—আর, পরীর রাজ্যে তাহারা বাস করে বলিয়া তাহারা চিরদিনই বালক, তাহারা আর কখনও বাড়িয়া উঠিয়া যৌবন বা বার্দ্ধক্যের মুখ দেখিবে না। সেখানে সবাই সর্ব্বদা খুব খুশী। কেবল একটি জিনিসের জন্য পরীরাজ্যের সব ছেলেরা মাঝে মাঝে বড় দুঃখিত হইত। তাহাদের অভাব কিছুরই বিশেষ ছিল না, কেবল মায়ের আদর-যত্ন ও স্নেহ মমতা পাইবার জন্য তাহারা বড় ব্যাকুল হইত। সেই চিরনবীন পরীরাজ্যের ছেলেরা মায়ের অভাব বড়ই অনুভব করিত।

ওয়েণ্ডি জিজ্ঞাসা করিল যে সেখানে কি এমন কোন ছোট মেয়ে নেই যে সেই ছোট ছোট ছেলেদের মায়ের মত হইয়া থাকিতে পারে? ওয়েণ্ডির এই প্রশ্নের উত্তরে পিটার প্যান বলিল, "না সেখানে এমন কোনও মেয়ে নেই।" তারপর সে একটু চুপ করিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই ওয়েণ্ডি, তুমিই চল না আমাদের দেশে—সেখানে গিয়ে তুমি আমাদের মা হয়ে থাকবে,—আমাদের সবাইকে ভালবাসবে স্নেহ যত্ন ও আদর করবে মায়ের মতন।"

ঠিক এই সময়ে ওয়েণ্ডির ভায়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল

যে তাহাদের দিদি, কে একটি ছোট্ট ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারাও গিয়া তাহাদের দিদির গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। পিটার প্যান্ আবার বলিল, "সত্যি ওয়েণ্ডি! তুমি যদি যাও তো তোমাকে আমি উড়্‌তে শিখিয়ে দোব, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে উড়্‌তে উড়্‌তে আমাদের দেশে যাবে।

ওয়েণ্ডির ভাইয়েরা যখন শুনিল যে তাহারাও উড়িতে পারিবে তখন তাহারা আনন্দে একেবারে উৎফুল্ল হইয়া তখনই লাফাইয়া লাফাইয়া বাতাসে উড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাহারা বড্ড নাকাল হইয়া পড়িল। কারণ, প্রত্যেক বারেই তাহারা যেই উড়িবার জন্য বাতাসের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাত-পা ছাড়িয়া দেয় অমনি ধুপ্ ধাপ্ করিয়া হয় ঘরের মেঝের উপরে আছাড় খায় আর নয়ত সজোরে খাটের বিছানার উপর যাইয়া আছড়াইয়া পড়ে।

পিটার প্যান্ তাহাদের এইরকম করিয়া উড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া তাহাদিগকে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, অমনি অমনিই কি আর ওড়া যায়। ওড়্‌বার আগে তোমাদের খুব ভাল ভাল কথা মনে মনে ভাবতে হবে। নইলে কি আর ওড়া যায়!" এই কথা বলিয়া পিটার প্যান্ নিঃশব্দে সেই ঘরের মধ্যে হেলিয়া-দুলিয়া উড়িয়া তাহাদিগকে উড়িবার কৌশল দেখাইয়া দিল।

শীঘ্রই পিটার প্যানের ওড়া দেখিয়া ছেলে দুটি উড়িতে শিখিয়া গেল এবং ঘরের এপাশে-ওপাশে তাহারা উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

এইবার ঘরের জানালাগুলি সব খুলিয়া গেল—বাহিরে তখন অন্ধকার। কাজেই পিটার প্যান্ ওয়েণ্ডি ও তাহার ভাইদের পথ দেখাইয়া আগে আগে উড়িয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের উড়িয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে টিঙ্কার বেল খুব জোরে জোরে টুং টাং করিয়া জলতরঙ্গ বাজনার মত অতি মিষ্টি বাজনা বাজাইতে লাগিল। নানা কিন্তু এই ব্যাপারটা টের পাইয়াছিল সেই নীচের উঠান হইতেই। সেইজন্য যতক্ষণ পিটার প্যান্ ওয়েণ্ডি-দের ঘরে ছিল ততক্ষণ সে ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়াছিল। তাহার পর যখন তাহারা জানালা দিয়া আকাশের দিকে উড়িয়া গিয়াছিল তখন সে চীৎকার করিয়া তাহার গলার বাঁধন ও শিকল প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু তাহা সে পারে নাই। কাজে কাজেই পিটার প্যান্ ওয়েণ্ডি আর তাহার ভাইয়েদেরকে ভুলাইয়া লইয়া উড়িয়া চলিল সুদূর নীল আকাশের বুকে যেখানে কত শত চক্‌চকে উজ্জ্বল তারা ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতেছিল।

—চির নবীন পরীর রাজ্যে ওয়েণ্ডি আর তাহার ভাইয়েরা—

ওদিকে পরীর রাজ্যের ছেলেরা সবাই পিটার-প্যানের জন্য বড় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। পিটার প্যান্ ছিল তাহাদের সর্দ্দার। বহুদিন হয় সে যে কোথায় গিয়াছে তাহা তাহাদের কেহই জানিত না। পিটার প্যানের অবর্ত্তমানে পরী-রাজ্যের ছেলেরা সবাই বুনো জীবজন্তু আর জলদস্যুদের ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া দিন কাটাইতেছিল। পিটার প্যান্ নাই। কোনও বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে কে?—এই তাহাদের ভয়।

প্রতিদিন তাহারা পিটার প্যানের প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। একদিন তাহারা আকাশে একটি সাদা পাখীর মত কি একটা দেখিতে পাইল। তাহারা সকলে অবাক হইয়া সেই পাখীটিকে দেখিতেছে, এমন সময় আশ-পাশের গাছপালার মাথাগুলি আলোয় আলোকিত করিয়া টিঙ্কার বেল বাজাইতে বাজাইতে নামিয়া আসিতে লাগিল আর চীৎকার করিয়া ছেলেগুলিকে বলিল, পিটার প্যান্ আমাকে বলে দিলে তোমরা তীর ধনুক নিয়ে এসে শীগ্র ঐ পাখীটিকে মার।" টিঙ্কার বেলের কথা শুনিয়া তাহারা ছুটিল তীর-ধনুক আনিতে। তীর-ধনুক আনিয়া সেই পাখীটিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ধুপ্ করিয়া সেটি মাটিতে পড়িল,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য সে যে বেচারী ওয়েণ্ডি। তাহার বুকে গিয়া তীরটি বিঁধিয়াছে, আর দরদর করিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার বুক একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে।

পিটার প্যান্‌ কিন্তু এইরূপ একটা অন্যায় করিতে একেবারেই বলে নাই। ওয়েণ্ডিকে দেখা অবধি টিঙ্কার বেলের হিংসা হইয়াছিল ওয়েণ্ডির উপর। তাই সে এই কাণ্ডটি করিয়া বসিল।

যাহা হউক ওয়েণ্ডি আহত হইয়াছিল মাত্র। সে সেই আঘাতের ফলে মারা গেল না। শীঘ্রই সে ভাল হইয়া উঠিল। তারপর একদিন সে তাহার ভাইয়েদের সঙ্গে করিয়া পিটার প্যান্‌ ও পরীরাজ্যের অন্যান্য সব ছেলেদের সামনে প্রতিজ্ঞা

পরীরাজ্যের ছেলেদের তৈরী ওয়েণ্ডির থাকিবার জন্য বনের মধ্যের বাড়ী

করিল যে, সে সেখানে থাকিবে তাহাদের মায়ের মতনই—মায়ের মত স্নেহ-যত্ন ও ভালবাসা সে সেই বালকগুলিকে দিতে চেষ্টা করিবে।

পরীরাজ্যের ছেলেরা ত খুব খুশী। তাহারা অতি যত্ন করিয়া ওয়েণ্ডির থাকিবার জন্য একটি কুটীর তৈয়ারী করিয়া দিল। ওয়েণ্ডি আর তার ভাইয়েরা এবং পরীরাজ্যের সব ছেলেরা এবং পরীরা পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু একমাত্র টিঙ্কার বেলের মনে এতটুকু শান্তি বা আনন্দ ছিল না। সে তাহাদের সকলের আনন্দে হিংসার আগুনে একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দ-কলরবের মধ্য দিয়া তাহাদের দিন যায়। একদিন হঠাৎ খবর আসিল যে, বনের মধ্যে একদল ভীষণ জলদস্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই দস্যুদলের নেতার নাম ছিল ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ হুক্‌। তাহার এমনি দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ—আর সে ছিল এমনি কশাই, যে তাহার নাম শুনিলে ছোট ছোট ছেলেদের গায়ের রক্ত ভয়ে একেবারে জমিয়া যাইত। তাহার দলের দস্যুরাও তাহাকে ভয় করিত যমের মত—আর, তাহার সামান্য চোখের ইসারাতে তাহারা উঠিত বসিত। তাহার কালো কালো বড় বড় ঝাঁকড়া চুল দেখিলে পৌষ মাঘ মাসের শীতে কাঁপার মত ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া ভয়ে কাঁপুনি আসিত, তাহার গায়ের রঙ দেখিলে ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া যাইতে হইত, তাহার কাল কাল ভাঁটার মত চোখ জোড়া দেখিলে বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া উঠিত। এই ডাকাত-সর্দ্দারটি যখন হোঃ হোঃ করিয়া হাসিত তখন মনে হইত যেন গুড়ুম গুড়ুম করিয়া কে বন্দুকের গুলি ছুঁড়িতেছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল সেই ডাকাত-সর্দ্দারের কাটা ডান হাতখানা। আর তাহার তোতলামি। কিভাবে তাহার

ডান হাতখানি খোয়া গিয়াছিল তাহা এক মজার কাহিনী।

একদিন পিটার প্যানের চক্রান্তে এই দস্যু-সর্দ্দারকে বড় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। পিটার চালাকি করিয়া একবার এই দস্যু-সর্দ্দারকে তাহার জাহাজ হইতে জলে ফেলিয়া দেয়। জলে পড়িতে না পড়িতেই সেবারে একটা প্রকাণ্ড কুমীর তাহার ডান হাতখানা গ্রাস করিয়াছিল। তবে সেবার কোন রকমে সর্দ্দার তাহার প্রাণ লইয়া রক্ষা পাইয়াছিল। সর্দ্দারের হাত খানা খাইয়া কুমীরটার এত ভাল লাগিয়াছিল যে সেই কুমীরটা সেদিন হইতে ক্রমাগত সর্দ্দারের সন্ধানে সন্ধানে ফিরিত। তাহার ইচ্ছা আর কিছুই নহে—অত মিষ্টি আর অত উপাদেয় হাত অতটুকু খাইয়া তাহার সাধ মিটে নাই। সেইজন্য যখনই সর্দ্দার জাহাজে করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত তখনই সেই কুমীরটা সর্দ্দারের গন্ধে গন্ধে সেখানে আসিয়া ছুটিয়া জাহাজের পিছু লইত। কুমীরটা কত স্বপ্নই না দেখিত! সে ভাবিত, "হায়, এমন দিন কি আসবে না যেদিন আমি ঐ সর্দ্দারের সমস্ত শরীরটা গিলতে পারবো?" সর্দ্দার তাহার কাটা ডানহাতে সব সময়ে একটা আঁকশি বাঁধিয়া রাখিত। উহার সাহায্যে সে অনেক কাজ করিত। ঐ ডাকাত-সর্দ্দার বেশ জানিত যে সেই কুমীরটা সব সময় তাহার অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। কারণ—একদিন হঠাৎ জাহাজ হইতে হাত ফস্‌কাইয়া সেই ডাকাত-সর্দ্দারের একটা এলার্‌ম্ ঘড়ি সমুদ্রের জলে পড়িয়া যায়। ওদিকে কুমীরটা জলের তলায় গা-ঢাকা দিয়া জাহাজের সঙ্গ লইয়া চলিতেছিল। সর্দ্দার যখন জাহাজের যেদিকে যায় কুমীরটাও গন্ধে গন্ধে সেইদিকে ছোটে। সেদিন ঐ ঘড়িটা ঝপ্ করিয়া জলে পড়িয়া যাইবা মাত্র কুমীরটা ভাবিল যে এই বুঝি তাহার স্বপ্ন ফলিল—বুঝিবা সর্দ্দারই জলে পড়িল। ইহা ভাবিয়া সে টপ্ করিয়া জল হইতে মুখ তুলিয়া ঘড়িটাকেই গিলিয়া ফেলিয়াছিল। সেদিন ডাকাত-সর্দ্দার বুঝিতে পারিয়াছিল যে কুমীরটা যমদূতের মত এখনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে—সেদিন ভয় পাইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল,—"ও বাব্বা! সেই কু-কু-কু-কুমীর!"

ভাগ্যিস্ সেদিন সেই কুমীরটা সর্দ্দারের এলার্‌ম্ ঘড়িটা গিলিয়াছিল! তাই ত সেদিন হইতে সর্দ্দার জাহাজের উপর হইতেই স্পষ্ট টের পাইত যে কুমীরটা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে কি না। কারণ, সেদিন হইতে সেই ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ কুমীরটার পাকস্থলী, গায়ের চামড়া আর জল ভেদ করিয়া সর্দ্দারের কানে আসিত। ঐ শব্দ সর্দ্দারের কানে আসিলেই সে বুঝিতে পারিত যে, সেই সর্ব্বনেশে কুমীরটা তাহাকে গিলিবার জন্য নিকটেই আছে! কিন্তু সর্দ্দারের একটা মস্ত ভয় ছিল এই যে কোনদিন হয়ত কুমীরটা তার পেটের মধ্যকার ঐ ঘড়িটাকে হজম করিয়া ফেলিবে। তখন ত আর কুমীরের কাছে-আসা সেই সর্দ্দার টের পাইবে না, তখন যদি সে অন্যমনস্ক ভাবে ভুলিয়া জলে নামে, তাহা হইলে ত তাহার আর রক্ষা থাকিবে না!

সর্দ্দারের সর্ব্বদা একরকম আতঙ্কে আতঙ্কে থাকার মূল কারণ ঘটাইয়াছিল পিটার। কাজেই পিটারের উপর ডাকাত-সর্দ্দার একেবারে হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল। পিটার ডাকাত-সর্দ্দারের যে অনিষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইয়া পিটারকে মারিয়া ফেলিবার জন্য সেদিন সে দলবল লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল—সে পণ করিয়া আসিয়াছিল যে সেদিন সে পিটারকে উচিত শিক্ষা দিয়া তারপর তাহাকে হত্যা করিবে।

একদল রেড ইণ্ডিয়ান সেই পরীরাজ্যের ছেলেদের বড় ভালবাসিত। তাহারা রোজ বনের ধারে থাকিয়া উহাদের পাহারায় থাকিত। সেদিনও তাহারা প্রতিদিনকার মত পরীরাজ্যের সব বালকদিগকে পাহারা দিতেছিল! কিন্তু দলবল লইয়া সেই ডাকাত-সর্দ্দার তাহাদের আক্রমণ করিয়া খুবই কাবু করিয়া ফেলিল এবং বেচারীদের অনেকে ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাইল। ডাকাতেরা রেড্ ইণ্ডিয়ান্ পাহারা-ওলাদের হারাইয়া দিয়া সে তল্লাট হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিয়া তাহারা নিজেরাই সেই পাহারাওয়ালাদের মত পরীরাজ্যের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কোথাও দিয়া বাহির হইবার এতটুকু জায়গা তাহারা রাখে নাই। তাহাদের মতলব ছিল এই যে পরীরাজ্যের ছেলেগুলো আর পিটার প্যান্ যখন সেই পথে

ডাকাত-সর্দ্দার ও তার সাথী হঠাৎ দেখিল কুমীরটা হাঁ করিয়া আছে

বাহির হইতে যাইবে তখন তাহারা উহাদিগকে আক্রমণ করিবে—আর, বিশেষ করিয়া পিটার প্যান্‌কে শাস্তি দিবে।

কিন্তু এত সব ব্যাপার যে ওদিকে ঘটিয়া গেল তাহার এতটুকু খবরও ঘুণাক্ষরেও ছেলেগুলির কানে পৌছায় নাই। তাহারা তখন খুব মনো-যোগ দিয়া ওয়েণ্ডিকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার কাছে অনেক সুন্দর গল্প শুনিতেছিল!

বাস্তবিক ওয়েণ্ডি অতি অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেগুলিকে মায়ের মতই ভালবাসিয়াছিল ছেলেগুলিও ওয়েণ্ডিকে তাহাদের মায়ের মতই ভক্তি করিত—শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাহারা ওয়েণ্ডির সব কথা শুনিত। ওয়েণ্ডিও তাহাদের অসুখ-বিসুখে তাহাদের খুব সেবা যত্ন করিত—তাহাদের ওষুধ-পথ্য দিত। তাহা ছাড়া মাত্র নয় বৎসরের মেয়ে হইয়া সে যেভাবে মায়ের মত সেই ছেলেগুলিকে সদুপদেশ দিত আর তাহাদের বিছানাপত্র করিয়া তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিত তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

যে-রাত্রে জলদস্যুরা রেড্ ইণ্ডিয়ানদের হারাইয়া দিয়া ছেলেগুলিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল সেই রাত্রে ওয়েণ্ডি পরীরাজ্যের ছেলেদেরকে বলিতেছিল যে পৃথিবীর সব ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন তাহাদের মা-বাবারা। এই কথা বলিয়া সে বলিল যে তাহার মা বাবাও নিশ্চয় তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের হারাইয়া দুঃখে-শোকে এতদিনে পাগলের মত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মা-বাবার জন্য ওয়েণ্ডির ভাইয়ে-দের বড় মন-কেমন করিয়া উঠিল—তাহারা ওয়েণ্ডিকে বলিল, "দিদি, চলনা ভাই! আমরা একবার আমাদের মায়ের কাছে ঘুরিয়া আসি!" ওয়েণ্ডিও তাহার মা-বাবার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, সে বলিল, "হ্যাঁ ভাই! বহুদিন হয় আমরা মা-বাবার কাছ-ছাড়া। এখন একবার আমাদের তাঁহাদের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।

ওয়েণ্ডি ফিরিয়া যাইবে শুনিয়া পরীরাজ্যের যত সব মা-হারা ছেলেরা দুঃখে একেবারে মুসড়িয়া পড়িল—তাহারা ভয়ানক কান্নাকাটি করিতে লাগিল। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া ওয়েণ্ডি বলিল "তোমরা কেঁদোনা। চলনা তোমরা আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়ীতে থাকবে—আমাদের মা-বাবাকে তোমাদের মা-বাবার মত দেখবে। আমার মা-বাবা তোমাদের পেয়ে খুব খুশী হবেন নিশ্চয়। আমরা তখন তাহ'লে সবাই মিলে-মিশে থাকবো। কি বল?" ওয়েণ্ডির কথায় পরীরাজ্যের সব ছেলেরা তাহার সঙ্গে যাইতে রাজী হইল। কেবল রাজী হইল না পিটার প্যান্। সে বলিল, "আমি পৃথিবীতে গিয়া থাকতে পারবো না। আমি এই পরীরাজ্যে পরীদের গান শুনে—পাখীর শিস শুনে চিরনবীন হ'য়ে থাকতে চাই। আমাকে তোমরা তোমাদের সঙ্গে যেতে বল না।"

অগত্যা পিটার প্যান্‌কে সেই পরীরাজ্যে রাখিয়া ওয়েণ্ডি পরীরাজ্যের অন্যান্য ছেলেদের লইয়া রওনা হইল। ওয়েণ্ডির উপর পিটার প্যানের খুব একটা মায়া-মমতা হইয়াছিল। তাই সে যখন পিটার প্যানের কাছ হইতে বিদায় লইল তখন দু'জনেই খুব দুঃখিত হইল।

সেদিন পিটার প্যানের শরীরটা একটু খারাপ ছিল। সেই জন্য ওয়েণ্ডিদের আগাইয়া দিয়া আসিতে পারিল না। ওয়েণ্ডি যাইবার সময়ে এক শিশি ওষুধ পিটারের হাতে দিয়া বার বার করিয়া তাহাকে বলিয়া গেল যে সে যেন পরদিন সকালে উঠিয়াই উহা খায়। পিটার প্রতিজ্ঞা করিল যে সে সকালে উঠিয়াই উহা খাইবে।

ওদিকে ওয়েণ্ডিরা যেই না বনের ধারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে অমনি সেই ডাকাত-সর্দ্দারের হুকুমে ডাকাতেরা হুড়মুড় করিয়া ছেলেগুলির উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। কারণ, ছেলেগুলি ত আর জানিত না যে সেখানে তাহাদের বন্ধুর মত সেই রেড্ ইণ্ডিয়ান্ দল নেই—সেখানে যে ডাকাতেরা সব ওৎ পাতিয়া-ছিল! যাহা হউক, তাহারা ত ডাকাতের হাতে পড়িল। ডাকাতেরা সেই ছেলেগুলিকে আর ওয়েণ্ডিকেও মুখ চাপিয়া ধরিয়া একেবারে তাহাদের জাহাজে লইয়া গিয়া হাজির করিল। এই ব্যাপার যে ঘটিল তাহা পিটার একেবারেই টের পাইল না। এইবার ডাকাত-সর্দ্দার রওনা হইল পিটার প্যানের দফা শেষ করিবার জন্য।

—পিটার প্যান্ ডাকাত দলের হাত হইতে ছেলেদের উদ্ধার করিল—

সে রাত্রে পিটার প্যান্ একা একা একখানি ঘরে শুইয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। সেই সুযোগ বুঝিয়া ডাকাত-সর্দ্দার গিয়া পিটার প্যানের ঘরের দরজার সামনে উপস্থিত হইয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। সেখানে সে উঁকি মারিয়া দেখিল যে পিটার প্যান্ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তখন সে তাহার হাতের আঁকসি দিয়া অনেকবার অনেক রকম করিয়া চেষ্টা করিল দরজার খিল খুলিবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই সে ঐ দরজা খুলিতে পারে নাই।

এই ভাবে সে দরজা খুলিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় একটা জানালার কাছে টেবিলের উপর তাহার নজর পড়িয়া গেল। ঐ টেবিলের উপর ওয়েণ্ডির দেওয়া সেই একশিশি ওষুধ ছিল। উহা দেখিয়াই সর্দ্দারের মাথায় জাগিল দুষ্ট বুদ্ধি। জানালা দিয়া হাত গলাইয়া সে ঐ ওষুধের শিশিটা নাগাল পাইল। তখন সে উহা বাহির করিয়া আনিয়া শিশির ভিতরকার সবটুকু ওষুধ মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাতে তাহার নিজের পকেট হইতে এক শিশি ভীষণ বিষ বাহির করিয়া ভরিয়া দিল। তারপর উহা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সেখানে হইতে চম্পট দিল।

সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই পিটারের মনে পড়িল। ওয়েণ্ডির কথা আর ওয়েণ্ডির দেওয়া ওষুধের কথা। কাজেই সে তাড়াতাড়ি ওষুধের শিশিটি টেবিল হইতে তুলিয়া উহার ছিপি খুলিয়া খাইবার জন্য তুলিয়া লইল। সে ত আর জানিত না যে ঐ শিশিতে ওষুধের বদলে ডাকাত-সর্দ্দার বিষ ভরিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই সে ঐ ওষুধের শিশিটি তাহার মুখে প্রায় ঢালিতে যাইতেছিল আর কি, এমন সময় টুংটাং শব্দ করিতে করিতে টিঙ্কার বেল তাড়াতাড়ি আসিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। সে চীৎকার করিয়া পিটার প্যানকে অনুরোধ করিল যে সে যেন ওই ওষুধ না খায়। তাহার অনুরোধ শুনিয়া পিটার বলিল যে সে কি করিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিবে—সে যে ওয়েণ্ডির কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে সে সকালে উঠিয়াই উহা খাইবে। এই কথা বলিয়া পিটার যখন সত্যসত্যিই ওষুধে চুমুক দিতে গেল তখন তাহার হাত হইতে ওষুধটা কাড়িয়া লইয়া টিঙ্কার বেল উহা খাইয়া ফেলিল। যেই না সেই সর্ব্বনেশে বিষটা খাওয়া অমনি টিঙ্কার বেলের সমস্ত শরীর কালো হইয়া গেল—তাহার চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল।

ব্যাপার দেখিয়া পিটার প্যান্ মহা সমস্যায় পড়িল—সে ভাবিল যে কি করিয়া টিঙ্কার বেলকে বাঁচানো যাইতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত ছোট ছোট ছেলেরা যদি বলে যে তাহারা পরীতে বিশ্বাস করে তাহা হইলে সে বাঁচিবে। সুতরাং পিটার পৃথিবীর সমস্ত ঘুমন্ত ছেলেদের স্বপ্নের মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"তোমরা কি পরী বিশ্বাস কর?" তাহারা সকলেই বলিল যে হ্যাঁ তাহারা পরী বিশ্বাস করে।

এইবার টিঙ্কার বেল চোখ খুলিল। আবার তাহার নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল—সে বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচিয়া উঠিয়া সে পিটারকে সব ব্যাপার বলিল। পিটার যখন শুনিল যে ওয়েণ্ডি আর তার পরীরাজ্যের সব ছেলেরা ডাকাতের হাতে বন্দী হইয়াছে এবং তাহাদের শীঘ্র উদ্ধার না করিলে তাহারা হয়ত ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাইবে।

এই দারুণ খবর শুনিয়া পিটার প্যান্ তাড়াতাড়ি ছুটিল সেই ছেলেদের ও ওয়েণ্ডিকে উদ্ধার করিতে। পিটার যখন সমুদ্রের ধারে জাহাজের কাছাকাছি উপস্থিত হইল তখন ডাকাত-সর্দ্দার সেই ছেলে-গুলিকে আচ্ছা করিয়া চাবুক মারিবার যোগাড়-যন্ত্র করিতেছিল। পিটার সেই জাহাজের কাছে গিয়াই তাহার পকেট হইতে একটা এলার্ম্ ঘড়ি বাহির করিল। উহা বাহির করিতেই তাহার টিক্‌টিক্ শব্দ গেল সর্দ্দারের কানে। যেই না সেই শব্দ সর্দ্দারের কানে যাওয়া অমনি সে একেবারে তিন লাফ মারিয়া জাহাজের ধারের দিক হইতে মাঝখানটায় পলাইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাব্বা! আবার সেই বু-কু-বু-কুমীরটা এসে জুটেছে!"

সর্দ্দারের কাছ হইতে কুমীর আসার খবর

শুনিয়া জাহাজের অন্যান্য ডাকাতেরা যখন ভয়ের চোটে গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল আর অন্যমনস্ক হইল, সেই সুযোগে পিটার সুড়সুড় করিয়া অলক্ষিতে সেই জাহাজে ঢুকিয়া পড়িয়া একটা ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিল। জাহাজের সেই কেবিনের ভিতরে একখানা তলোয়ার ঝুলিতেছিল। তলোয়ারখানা পাড়িয়া লইয়া খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে একা। একা একা ত আর তলোয়ার আবার ডাকাত-সর্দ্দারের হুকুম হইল যে পিটার প্যানের দলের ছেলেগুলোকে আচ্ছা করিয়া বেত মার। তারপর উহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিয়া ওই সর্ব্বনেশে কুমীরটাকে খুশী কর।

এই হুকুম পাইয়া একজন ডাকাত পিটার যে ঘরের পাশে লুকাইয়াছিল সেই ঘরের মধ্যে গেল বেত আনিতে। সুযোগ বুঝিয়া পিটার সেই ডাকাতটার বুকে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া তাহার তলোয়ার ঢুকাইয়া দিল। হঠাৎ এইভাবে
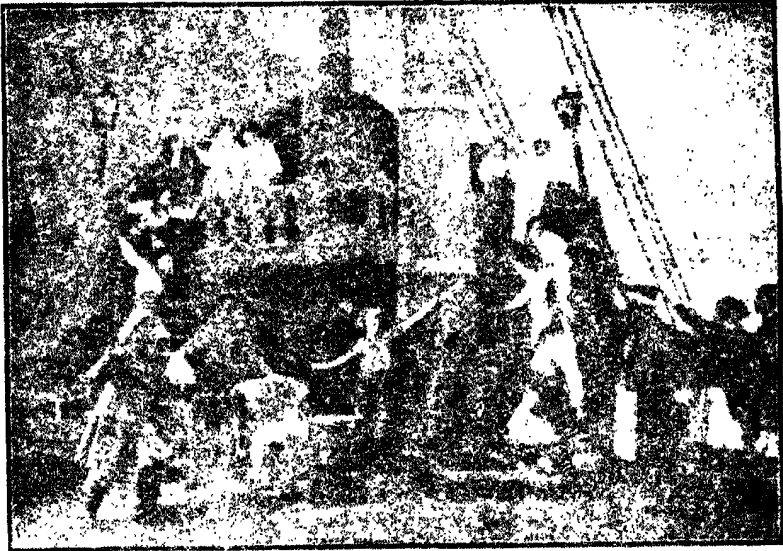
পিটার প্যান জলদস্যুদের হস্ত হইতে ছেলেদের উদ্ধার করিল

লইয়া অতগুলা ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়! কাজে কাজেই সে সুযোগের অপেক্ষায় এক পাশে চুপ করিয়া লুকাইয়া রহিল।

পিটারের পকেটে যখন তাহার এলার্ম ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ কমিয়া গেল—তখন ডাকাত-সর্দ্দার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ডাকাতেরাও ভাবিল যে তাহা হইলে কুমীরটা বিদায় হইয়াছে। এইবার তাহাদের হুড়োহুড়ি ও গোলমাল থামিল। আক্রান্ত হইয়া সে লোকটা ভূত দেখার মত গাঁক্ করিয়া এক বিকট চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল।

কিসের একটা বিকট চীৎকার হইল তাহা দেখিবার জন্য সেইদিকে এক একজন করিয়া ডাকাতগুলো দেখিতে যাইতে লাগিল। কিন্তু একজন করিয়া ঘরে ঢোকে আর আড়ালে থাকিয়া পিটার প্যান্ তাহার তলোয়ার দিয়া উহাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া সাবাড় করিতে লাগিল।

এইভাবে এক এক করিয়া অনেক ডাকাত পিটারের হাতে প্রাণ হারাইল। শেষকালে কয়েকটা ডাকাত এমনই ভয় পাইয়া গেল যে তাহারা তাহাদের সর্দ্দারের হুকুম তামিল না করিতে পারিয়া সমুদ্রে লাফ দিয়া পালাইয়া গেল।

জাহাজের মধ্যে যখন সকলে ভয়ে ও আতঙ্কে হুড়াহুড়ি করিতেছে সেই সুযোগে পিটার প্যান্ উপর কাজেই সে সেই তলোয়ার হাতে করিয়া ডাকাত সর্দ্দারের পিছনে এমনি তাড়া করিল যে সে ত ভয়ে একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহার সেই সর্ব্বনেশে কু-কু-কু-কুমীরের কথা ভুলিয়া গিয়া একেবারে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িল। কুমীরটা কাছাকাছি কোথায় যেন ছিল। সর্দ্দারের গন্ধ পাইয়া সে সেখানে আসিয়া জুটিল আর তাহার বহুদিনের সাধ সেদিন মিটাইল

ছেলে মেয়েরা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদের বাবা, নানার ঘরে শুইয়া আছেন

তাহার রক্তমাখা তলোয়ারখানি হাতে করিয়া জাহাজের কেবিন হইতে তাড়া করিয়া বাহির হইয়া আসিল। নিরস্ত্র ডাকাতেরা সশস্ত্র পিটার প্যানকে হঠাৎ দেখিয়া হাত তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু ডাকাতগুলোর উপর পিটারের তত আক্রোশ ছিল না, যত আক্রোশ ছিল তাহার ডাকাত সর্দ্দারের সেই ডাকাত সর্দ্দারের মিষ্টি দেহখানি দিব্য আরামে গিলিয়া।

এইবার ওয়েণ্ডি পিটারকে ধন্যবাদ দিয়া ও তাহার সাহসিকতার খুব প্রশংসা করিয়া বাড়ীতে ফিরিল। তাহার মা বাবা ত তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের ফিরিয়া পাইয়া পরম সুখী হইলেন।

হার্ণনাণ্ডো কর্টিস

২৬১৫ পৃষ্ঠার পর

স্পেনের এক সহরে সেদিন অসংখ্য লোকের ভিড়। জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে দলের ভিড়ে মিশিয়া একজন লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল চেহারা শীর্ণ, বিবর্ণ—অকালবৃদ্ধ।

এই নগণ্য লোকটির খ্যাতিতেই একদিন সমস্ত স্পেন ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে খ্যাতি ক্রমে ইংল্যাণ্ড ও পরে ইংল্যাণ্ড হইতে সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সকলের মুখে মুখে কেবল তাঁহারই নাম। কিন্তু সেদিন তাঁহাকে কেহই চিনিত না। জনতার চাপে নিষ্পেষিত-প্রায় হইয়া অতি কষ্টে এক প্রান্তে সেই শীর্ণ বিবর্ণ লোকটি দাঁড়াইয়াছিল।

এমন সময় জনতা সচকিত হইয়া উঠিল। ঐ যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এইবারে রাজা আসিতেছেন। সেই বৃদ্ধপ্রায় লোকটি দৃঢবলে জনতা সরাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল তাহার মুখে চোখে একটা স্থির সঙ্কল্পের আভাষ!

রাজকীয় শকট নৃপতি চার্লসকে বহন করিয়া মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময় সমুদয় জনতাকে বিস্মিত ও নৃপতিকে ক্রুদ্ধ করিয়া সেই লোকটি শকটের উপর লাফাইয়া উঠিল।

রাজা রাগিয়া প্রশ্ন করিলেন—তুমি কে?—সগর্ব্বে উত্তর হইল—আমি একজন সামান্য লোক। আমার জন্য আপনি যত রাজ্য লাভ করিয়াছেন তত রাজ্য আপনার পিতাও আপনার জন্য রাখিয়া যান নাই।

ইহার পর নৃপতি কি বলিলেন সে সম্বন্ধে এই কাহিনীটি রচিত। ঐতিহাসিক কিছুই কিন্তু তাহার সন্ধান পান নাই। তবে এপর্য্যন্ত আন্দাজ করা যায় যে সেই উদ্ধত নরপতি নিশ্চয়ই তাহার জন্য কঠোর শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও সেদিন কথাটা নিশ্চয়ই চার্লসের মনে ছিল কারণ হার্ণনাণ্ডো কর্টিস মিথ্যা বড়াই করেন নাই।

জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি দেশের সেবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনিই মেক্সিকো জয় করেন এবং স্পেনের জন্য নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার বুদ্ধির ফলে আমেরিকার বহু উর্ব্বর জমি স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। নব-

আবিষ্কৃত প্রদেশসমূহে নয় বৎসরকাল নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তিনি ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মেক্সিকোর শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের বহু চেষ্টা কর্টেস করিয়াছিলেন। তাছাড়া মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। ইহা ব্যতীত নিম্ন ক্যালিফোর্ণিয়া তাঁহারই আবিষ্কৃত। এই প্রকার বিবিধ অভিযানের নিমিত্ত

হার্ণান্ডো কর্টেস

তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল কিন্তু শেষটায় নিরাশা ও কষ্টই কেবল তাঁহার লাভ হইয়াছিল

কর্টেসের নাম পরে প্রায় লোকে ভুলিয়া যায়। শত্রুদের বিদ্বেষপ্রসূত প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার প্রতি বহু অবিচার হয়। এমনকি কলম্বাসের খ্যাতিও কিছুদিন পরে অনেক কমিয়া যায় এই ছিল ষোড়শ শতাব্দীর বীরগণের আপ্রাণ চেষ্টার পরিণাম।

কর্টেসের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সৈনিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মপ্রচারক সর্ব্ব বিষয়ে তিনি সে সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিলেন। এমন সর্ব্বমুখী প্রতিভা ও সাফল্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার জীবন ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি লাভ করে। মানুষ মাত্রেরই চরিত্রে দোষ-ত্রুটি থাকে, কর্টেসেরও ছিল এবং শত্রুদলেরা তাহা লইয়া তাঁহাকে বহু কষ্ট দিয়াছে।

যখন স্পেনীয়েরা মেক্সিকোস্থিত উপনিবেশগুলি সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন তখন তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহাকে সভায় যাহাতে অপদস্থ করা যায় তাহার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

দীর্ঘজীবনে কর্টেসকে বহু লাঞ্ছনা-অপমান সহিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বহু গর্হিত অপরাধের অভিযোগ আনা হইয়াছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা শত্রুদের প্রচেষ্টার ফল।

কর্টেসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল নির্ম্মমতা। একথা সত্য যে কর্টেসের ব্যবহার বহুক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইত। তবে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কর্টেস যে যুগে বাস করিতেন তখন—'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিই অধিক প্রচলিত ছিল। প্রতিহিংসার ক্ষেত্রে কর্টেস যে নির্ম্মম ছিলেন তাহা নহে। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত তাহাদের তিনি কঠোর দণ্ড-বিধান করিতেন যাহাতে অন্য আর বিপক্ষে দাঁড়াইতে সাহস না করে। সুতরাং কর্টেসকে নিষ্ঠুর বলিয়া অতিরিক্ত দোষী করা সে সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে ঠিক সঙ্গত নয়।

১৪৮৫ খৃঃ অব্দে স্পেনের এক্সট্রিমাডুরা (Estre medura) নামক স্থানে কর্টেসের জন্ম হয়। বাল্যে তিনি অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি যে দীর্ঘজীবী হইয়া খ্যাতিলাভ করিবেন এ কথা কেহ ভাবিতেই পারিতেন না। পরে নিজের চেষ্টায় কর্টেস সুস্থ দেহ লাভ করেন।

কর্টেসের পিতা উচ্চবংশোদ্ভূত ছিলেন কিন্তু তাঁহার অবস্থা তত ভাল ছিল না। তবু তিনি চৌদ্দবৎসর বয়সে পুত্রকে সালামানকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। (University of Salamenca) কিন্তু এ অর্থব্যয়ে কোন ফল হইল না। কর্টেসের আইন অধ্যয়নে কোন উৎসাহ ছিল না, দুইবৎসর পরেই তিনি কলেজ ছাড়িয়া দেন। কর্টেসের পিতা তাঁহাকে আইন ব্যবসা গ্রহণের জন্য বহু অনুরোধ করেন কিন্তু কর্টেস চিরদিনই জেদী প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কিছুতেই আইন পড়িতে সম্মত হইলেন না।

কর্টিস প্রথম ভাবিলেন গঞ্জালভো ডে কর্ডোবার দলভুক্ত হইবেন। এই গঞ্জালভো নামক সৈন্যাধ্যক্ষের নাম তখন দুঃসাহসিক কার্য্যকারী হিসাবে ইউরোপে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে তিনি নিকোলাস ডি ওভাণ্ডোর সহিত যোগ দেন। ওভাণ্ডো তখন সবেমাত্র হিসপ্যানিওলা (Hispaniola) নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া সেখানে সৈন্যদলসহ যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে এ যাত্রায় তাঁহার ওভাণ্ডোর সহিত যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কোন কারণে তাঁহাকে কিছুদিন শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে ওভাণ্ডো রওনা হইয়া গেলেন।

তখন কর্টিস ঠিক করিলেন কর্ডোবার সহিত যোগদান করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি ভ্যালেন্সিয়া যাত্রা করিলেন। এখানে কর্টিসকে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কয়েক মাস কাল এরূপে কাটাইয়া বিশেষ কোন নূতন জ্ঞান লাভ না করিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে কর্টিস গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি এমন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন সুরু করিলেন যে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কর্টিস যে জীবনে কখন খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন একথা কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না।

একদল লোক থাকে যাহারা অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিবার পূর্ব্বে হঠাৎ দৃঢ়বলে রাশ-টানিয়া নিজেকে সংযত করে; কর্টিস ছিলেন এই জাতীয় লোক। যৌবনের একান্ত কামনার কথা ভাবিয়া কর্টিস চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জীবনেও তাহা হইলে কিছুই করা হইল না। তিনি হিস্প্যানিওলা যাইবেন স্থির করিলেন। কর্টিসের পিতামাতা পুত্রের এই আকস্মিক সাধু ইচ্ছায় কোন বাধা দিলেন না; তাঁহারা কর্টিসের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন দেখিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন বরং কর্টিসের পিতা যাতায়াতের খরচ সম্বন্ধে তাঁহাকে সামান্য কিছু সাহায্যও করিলেন।

১৫০৪ খৃঃ অব্দে কর্টিস সান ডমিনিগোর (San Domingo) পথে যাত্রা করিলেন।

পথে এমন সব ব্যাপার ঘটিল যাহাতে মনে হয় কর্টিসের এই অভিযানে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ছিল। পথে খুব ঝড় হয়, জাহাজ ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গেল—আহার্য্য সঙ্গে কিছুই নাই—দিক্ ভুল হইয়া গিয়াছে এমন দুঃসময়ে একটা ঘুঘু (Dove) পাখী আসিয়া জাহাজে বসিল। পাখীটির উড়িবার গতি দেখিয়া দিক নির্ণয় করিয়া জাহাজ আসিয়া তীরে ভিড়িল।

ওভাণ্ডো কর্টিসকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার হাতে কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত করিলেন। কর্টিস সে কাজ সম্পূর্ণ যোগ্যতার সহিত করিতে লাগিলেন। ইহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া ইণ্ডিয়ানদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কর্টিসকে যাইতে হয়। ইহাতে তাঁহার যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অভিজ্ঞতা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে বহু কাজে লাগিয়াছিল। ১৫১১ খৃঃ অব্দে তিনি ভেলাসকোয়েজ (Velasquez) নামক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কিউবা (Cuba) জয় করিবার জন্য যাত্রা করেন। এ-যুদ্ধে কর্টিস বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া সান ডমিনগোর মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দশ বৎসর এই প্রকারে কাটাইয়া কর্টিসের স্বভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উদ্দেশ্যহীন যুবক কর্টিস একজন সুশ্রী, গম্ভীরপ্রকৃতি, প্রিয়ভাষী, দীর্ঘ-শ্মশ্রুশোভিত প্রৌঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন। এখন জীবনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। রাজ্য জয় করিতে হইবে যশঃ লাভ করিতে হইবে।

কিউবা হইতে ফিরিবার পর কর্টিসের সহিত ক্যাটালিনা জুরেজএর (Catalina xuarez) বিবাহ হয়। বিবাহের অনতিকাল পরেই কর্টিসের হস্তে মেক্সিকো বিজয়াভিযানের নেতৃত্বভার ন্যস্ত হয়। মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তখন সবে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে ভাবিত মেক্সিকো বুঝি সোনার দেশ, ধনরত্নের অবধি সেখানে নাই। এমন সময় গুজব শোনা গেল মেক্সিকো বিজয়-অভিযানে কর্টিসকে নেতৃত্ব দেওয়া হইবে না। একথা শুনিয়া কর্টিস যত শীঘ্র পারেন গোপনে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মেক্সিকো জয় অপরে করিবে ইহা কর্টিসের ভাল লাগে নাই। গভর্ণর ভাবিয়াছিলেন কর্টিসকে মেক্সিকো-বিজয়ে পাঠাইবেন না, কিন্তু, কর্টিসের বুদ্ধি ও কৌশলের নিকট তাঁহাকে হার মানিতে হইল। যাত্রার পূর্ব্ব দিনে কর্টিস একজন কসাইএর নিকট হইতে

সমস্ত গরু কিনিয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে একটি সোণার হার দান করিলেন। অবশেষে ১৫১৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই নভেম্বর একটি ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী লইয়া স্যান্টিয়াগো (Santiago) হইতে যাত্রা করিলেন। এইবারে তাঁহার দুঃসাহসিক অভিযান সুরু হইল।

শাসনকর্ত্তা ভেলাসকোয়েজ (Velasquez) কর্টিস যাত্রা করিবার পর বুঝিতে পারিলেন কি ভুল তিনি করিয়াছেন। আর কর্টিস ট্রিনিডাড (Trinidad) পৌঁছিয়া শুনিলেন তাঁহার ফিরিয়া যাইবার আদেশ আসিয়াছে। কর্টিস রাজী হইলেন না। তিনি যখন হাভানায় (Havana) তখন ভেলেসকোয়েজ কর্টিসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সেখানকার শাসনকর্ত্তাকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—কিন্তু কর্টিসকে ধরা তত সহজ ছিল না।

কর্টিস এইবার বুঝিলেন শুধু আপনার শক্তিতে এই বিজয় অভিযান সফল হইবে না। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই আশা ছিল—"ভগবান নিশ্চয়ই তাঁহার সহায় হইবেন।" এরূপ আশাবাদী লোকের ভাগ্য প্রায়ই সুপ্রসন্ন হয়। কর্টিস ও সৌভাগ্যক্রমে দুজন বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যাহাদের সহায়তায় তিনি ভবিষ্যতে বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন।

মেক্সিকোর উপকূলের কিছুদূরে কজুমেল দ্বীপে (Island of Cazumel) একজন স্পেনীয় নাবিকের সহিত কর্টিসের সখ্য হয়। এই নাবিক একটি জাহাজডুবি হইতে কয়েক বৎসর হইল উদ্ধার পাইয়া এদেশে বসবাস করিতেছিল; কাজেই দেশীয় ভাষা, রীতি নীতি সমস্তই ভাল করিয়া জানিত। তা ছাড়া ১৫১৯ খৃঃ অব্দে মেক্সিকোর উপকূলে নামিবার কিছুকাল পরেই একজন দেশীয় সর্দ্দার তাঁহাকে ডোনামেরিনা (Donnamarina) নাম্নী এক সুন্দরী রাজকন্যাকে দাসীরূপে উপহার দেন। কিন্তু কর্টিসের দয়ার্দ্র ব্যবহারে রাজকন্যা মেরিনা তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলেন। এই অভিযানে ডোনামেরিনাও সঙ্গে ছিলেন; তিনি নানাভাবে কর্টিসকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মেক্সিকো দেশে এক পুরাতন কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। এক রক্তপিপাসু দৈত্য এক শুভ্রকায় দেবতাকে এ-দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। সেই শ্বেতবর্ণ দেবতাই ছিলেন এদেশের রাজা। কাজেই শ্বেতকায় কর্টিসের আগমন সংবাদ শুনিয়া তাহারা ভাবিল বোধ হয় এতদিনে তাহাদের পুরাতন দেবতাই ফিরিয়া আসিল। দেশীয়েরা পরম সমাদরের সহিত কর্টিসকে গ্রহণ করিল এবং এ-উপলক্ষে বহু জাঁকজমক ও উৎসব করা হইল।

কর্টিস মেক্সিকোর তখনকার বিখ্যাত সম্রাট মন্টিজুমার (Montizuma) সহিত দেখা করিতে চাহিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন তিনি কিছু স্বর্ণ চান কারণ তিনি এবং তাঁহার লোকেরা এক প্রকার হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন যাহা স্বর্ণ ব্যতীত সারিবার নয়। সম্রাট কর্টিসকে বহু উপঢৌকন পাঠাইলেন কিন্তু দেখা করিলেন না।

কর্টিস বিপদে পড়িলেন। কি করা যায়! এতদূর আসিয়া কি এখনি ফিরিয়া যাইবেন?

সান ডমিনগো ফিরিবারও উপায় নাই, ফিরিলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। অন্য কোন লোক হইলে ফিরিয়া যাওয়াই ঠিক করিতেন। কিন্তু কর্টিস ছিলেন অসাধারণ সাহসী। একবার বিজয়-অভিযানে যাত্রা করিয়া অনর্থক ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার মতে হইল নিদারুণ কাপুরুষতা।

কর্টিস রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ভেরাক্রুজ-এ (Vera Cruz) থাকিতেই ইণ্ডিজ দেশীয়দের সন্দেহ হইল এই শ্বেতকায় ব্যক্তি আমাদের সেই শ্বেতবর্ণ দেবতা কিনা তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এই মনে করিয়া তাহারা ৫০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কর্টিসের শক্তি পরীক্ষা করিতে আসিল।

এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও কর্টিস বিজয়ী হইলেন। ইহার কারণ তাঁহার সঙ্গের ঘোড়াগুলি দেখিয়া দেশীয়েরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিতে লাগিল 'কি সাংঘাতিক জানোয়ার।' তা ছাড়া মেক্সিকোবাসীরা তাহাদের তরবারি ও তীর-ধনুক লইয়া স্পেনীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া পারিবে কেন? ট্লাসকালান্সরা (Tlascalans) যুদ্ধে হারিয়া কর্টিসের দলে যোগ দিল এবং এজটেকসদের (Aztecs) বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া রাজধানী অভিমুখে রওনা হইল। যখন পৌঁছিতে আর একশত মাইল দেরী—এমন সময় এজটেকসরা তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে হঠাৎ

আক্রমণ করিবে স্থির করিল। ডোনামেরিণা কর্টিসকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দেওয়াতে কর্টিস আজটেকসদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিলেন। মেক্সিকো সম্রাট মন্টিজুমা যখন বিজয়ী-দলের আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন তখন রাজ্যের যাদুকরদের কর্টিসের যাত্রা বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু তাহাতে যখন কোন ফল হইল না তখন নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ১৫১৯ খৃঃ অব্দের ১৪ই নভেম্বর কর্টিস বিনা বাধায় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

মন্টিজুমা ও কর্টিসের সাক্ষাৎ

মেক্সিকোর রাজধানীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কর্টিস মোহিত হইলেন। এমন সুন্দর সহর তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। একটি ছোট হ্রদের উপরে, ছোট একটি দ্বীপে সহরটি অবস্থিত তিনটি বৃহৎ সেতু দ্বীপটিকে সমগ্র মেক্সিকো দেশের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছে। এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য যে দেখিলে মানুষের তৈরী মনে হয় না, মনে হয় এ যেন কোন পরীর রাজ্য, সমুচ্চ পর্ব্বতমালা বৃহৎ অট্টালিকা ও প্রাসাদ লইয়া সহরটি যেন সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। স্পেনীয় সৈন্যেরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল—এ-সব কি সত্য—না এ তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে!

কর্টিস সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুমূল্য সজ্জায় সুশোভিত হইয়া মন্টিজুমা কর্টিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার দিলেন। মন্টিজুমা কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কর্টিসের দিক হইতেও চিন্তার কম কারণ ছিল না। এ-দেশীয়েরা যদি এখন বিদ্রোহ করে তাহা হইলে কি হইবে। স্পেনে ফিরিয়া যাওয়াই কি ভাল না ভেরা-ক্রুজেই উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত হইবে। কর্টিস অবশেষে স্থির করিলেন ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা ভাবিয়া বর্ত্তমানে ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। তিনি সম্রাট মন্টিজুমাকে প্রাসাদে নজরবন্দী করিয়া রাখিবেন স্থির করিলেন। ডোনামেরিনা ও একজন পথপ্রদর্শককে মাত্র সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে কর্টিস এ-কথা জানাইলেন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা তখন ছিল কর্টিসের নীতি এবং সে কথা মানিতে গেলে কর্টিসের এই কার্য্য নিতান্ত আশ্চর্য্য দুঃসাহসিকতা বলিয়া মনে হয়। কর্টিসের সৌভাগ্যক্রমে প্রথমে কিছুক্ষণ অস্বীকার করিয়া পরিশেষে মন্টিজুমা সম্মত হইয়া কর্টিসের সহিত চলিলেন।

ইহার পর ছয়মাস কাল নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। কিন্তু ক্রমশঃ লোকজনের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। এজটেকেরা বহু সহ্য করিয়াছিল। নিজেদের সম্রাট একজন স্পেনীয়ের বন্দী হইয়া রহিল। এ অসম্মান স্পেনের রাজার প্রজা বলিয়া নিজেদের স্বীকার করা এ-সবই তাহারা কোন রকমে সহিয়াছিল কিন্তু যখন কর্টিস তাহাদের ধর্ম্ম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন তাহাদের দেবদেবী ভাঙ্গিয়া মানুষ বলি বন্ধ করিয়া দিলেন তখন তাহারা এই 'উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসা' লোকটাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিল।

ঠিক এমন সময় অন্য দিক হইতে অসম্ভাবিত ভাবে আরেক বিপদ ঘনাইয়া আসিল। এক নৌবাহিনী কিউবা হইতে শাসনকর্ত্তার আদেশে কর্টিসকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কর্টিস চিরদিনই প্রত্যুৎপন্নমতিবিশিষ্ট চতুর ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার উপস্থিত-বুদ্ধি এ-ক্ষেত্রে তাঁহার সহায় হইল। প্রথমে তিনি এ নৌবাহিনীর নেতা নারভেজের (Narvaez) সহিত মিত্রতা করিতে চলিলেন; যখন তাহা সম্ভব হইল না তখন কর্টিস নারভেজকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। নারভেজ এই আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না কাজেই অতি সহজে পরাজিত হইলেন। কর্টিস নারভেজকে বন্দী করিয়া স্পেনীয় সৈন্যদলকে নিজের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। নিজের সৈন্যদল বৃদ্ধি হওয়ায় কর্টিসের ভবিষ্যতে খুবই সুবিধা হইয়াছিল।

এইরূপ এক বিপদ ত কোন রকমে কাটান গেল। এমন সময়ে আরেক বিপদ ঘনাইয়া আসিল। কর্টিসের অনুপস্থিতির সুযোগে এজটেক্রেরা বিদ্রোহ করিয়া সহরের ছোট স্পেনীয় দুর্গটি আক্রমণ করিল। কর্টিস এ খবর শুনিয়া আর বিলম্ব না করিয়া রওনা হইলেন। ১৩০০ সৈন্যসহ ১৫২০ খৃঃ অব্দের জুন মাসে কর্টিস সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অবস্থা তখন সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মেক্সিকোবাসিগণ তখন সমস্ত স্পেনীয় দুর্গ অধিকার করিয়া কর্টিসকে নানা উপায়ে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। কর্টিস আহত হওয়া সত্ত্বেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন স্থির করিলেন। এ-চেষ্টায় কর্টিস জয়ী হইয়া নিজেদের দুর্গ ফিরিয়া পাইলেন। জনতাকে ভয় দেখাইবার জন্য মন্টিজুমাকে নিহত করা হইল। ক্রুদ্ধ জনতা তখন ঠিক করিল স্পেনীয়দের না খাইতে দিয়া হত্যা করিবে। কর্টিস তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া স্থির করিলেন তাঁহার ক্ষুদ্র দল লইয়া রাতারাতি সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। দেশীয়গণ ব্যাপারটা আন্দাজে ধরিয়া লইয়া গোলযোগ ও মারামারি সুরু করিয়া দিল। তাহাদের থামাইতে গিয়া কর্টিসের সৈন্যদের দুই তৃতীয়াংশ মারা পড়িল।

এই ভীষণ অভিজ্ঞতার পরে অন্য কেহ হইলে মেক্সিকো বিজয়ের আশা ছাড়িয়া দিত কিন্তু কর্টিস ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। পরম অধ্যবসায় ও দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত কর্টিস পুনরায় তাঁহার লুপ্ত অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নূতন নৌবাহিনী প্রস্তুত হইতে লাগিল। অবশেষে টাস্‌কালানস্‌দের (Tlascalans) সহায়তা লইয়া কর্টিস দ্বীপের নগরটি অবরোধ করিলেন। এজটেক্রেরা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

কর্টিসের অসমসাহসিকতা বিপদকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা ও অসাধারণ নেতৃত্ব কৌশল থাকা সত্ত্বেও মনে হইতে লাগিল এবারে স্পেনীয়দের পক্ষে বিজয়ী হওয়া সহজ হইবে না। অবশেষে যখন তাহাদের নূতন সম্রাট বন্দী হইল এবং দুর্ভিক্ষে ও রোগে দেশ ছাইয়া গেল তখন বীর এজটেক্‌স্‌রা নিজেদের ধরা দিল। ১৫২১ খৃঃ অব্দের ১৩ই আগষ্ট কর্টিস রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেই পরীর রাজ্যে রোগ ও মৃত্যুর করাল ছায়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে কর্টিস

এজটেকস্‌দের পরাজয়ের পরে স্পেনীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কর্টিস তখন দেশের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। মেক্সিকো সহরটি পুনরায় নির্ম্মিত হইল, লোক-

জনের বসতি স্থাপন করা হইল। কৃষি ও অন্যান্য শিল্প প্রভৃতি বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইল। মাঝে মাঝে রণ-অভিযান করিয়া কর্টিস স্পেনীয় অধিকার বাড়াইতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতেও কর্টিস যেমন নিপুণ ছিলেন—দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবারও তাঁহার তেমনি দক্ষতা ছিল।

দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল কারণ কর্টিস খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার দলের লোকেরা কর্টিসকে খুবই ভালবাসিত। তাহাদের অনেকেই সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিল। অনেকেই ছিল আইন-ভঙ্গকারী কিন্তু তাহারা

কর্টিসের এজটেকসূদের রাজধানীতে প্রবেশ

কর্টিসের জন্য যথাসাধ্য করিতে প্রস্তুত ছিল। যখন স্পেন হইতে অন্য লোক আসিয়া কর্টিসের নিকট হইতে নেতৃত্বভার লইবার কথা হইল, তখন দলের লোকেরা কর্টিস ব্যতীত অন্য কাহারও অধীনে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। ১৫২২ খৃঃ অব্দে স্পেন গভর্ণমেণ্ট উপায়ান্তর না দেখিয়া স্পেনের এই নূতন উপনিবেশে কর্টিসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিল।

একবার কর্টিস হণ্ডুরাস (Handuras) বিজয়ে যাত্রা করেন। সে-সময়ে মেক্সিকোতে রটিয়া যায় তিনি মারা গিয়াছেন। মহা হুলুস্থূল গোলমাল সুরু হইল; এমন সময় কর্টিস ফিরিয়া আসাতে শান্তি সংস্থাপনে দেরী হইল না। এরূপ বিপদ কর্টিসের অবর্তমানে বহুবার ঘটিয়াছে। কর্টিসের মত অসাধারণ প্রতিভা ও নৈপুণ্য না থাকিলে মেক্সিকো অধিকারে রাখা সহজ ছিল না। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে কর্টিসের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ দেশে পৌঁছিতে লাগিল। কর্টিস নাকি রাজ তহবিল যথাপূর্ব্ব তছরূপ করিতেছেন এবং নিজেকে রাজা বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

পন্স দে লিওন (Ponce de-leon) নামক এক ব্যক্তি কর্টিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহ তদন্ত করিবার জন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু এদেশে পৌঁছিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। অবশেষে কর্টিস ১৫২৮ খৃঃ অব্দের মে মাসে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য স্পেনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার খ্যাতি তখন স্পেনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেশে তাঁহাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করা হইল। রাজসভায় তাঁহাকে সম্মানিত আসন দেওয়া হইল এবং তাঁহার জনপ্রিয়তার ও খ্যাতির আর অবধি রহিল না।

১৫৩০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে কর্টিস মেক্সিকোতে সৈন্যাধ্যক্ষরূপে ফিরিয়া গেলেন। এবারে আর শাসনকর্তা হিসাবে নয়।

এবারে কর্টিসের ভাগ্যলক্ষ্মী অস্তমিত হইবার পালা। পূর্ব্বের মত কর্টিসকে সৌভাগ্য ভোগ আর এবারে করিতে হয় নাই বরং একাকী দুঃখ, দৈন্য ও বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত নিজের অর্থে তিনি কয়েকটী বিজয়-অভিযানে যাত্রা করেন; দক্ষিণ সমুদ্র (South-sea) আবিষ্কারকের চেষ্টায় নিম্ন ক্যালিফোর্ণিয়া (Lower California) আবিষ্কার করেন।

এই সব আবিষ্কার ও অভিযানের ফলে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া যায়। এ-সব কার্য্যের যথোচিত সমাদর ও পুরস্কারও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। শেষে অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া উঠিল যে স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কিনিতে হইয়াছে।

এবারে এত দুর্গতির কারণ এদেশের শাসন-কর্ত্তা কর্টিসকে এ-সব অভিযান ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক বরং বাধা দিতেন।

অবসর সময়ে কর্টিস মেক্সিকো সহরের বাহিরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ও সন্তানদের সহিত বাস করিতেন। তাহারা কর্টিসের একান্ত প্রিয় ছিল। স্পেনে থাকিয়াও জুয়ানা-দ্যে জুনিগা (Juana-de zuniga) নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল তাহারাও চুপ করিয়া রহিল।

জনসাধারণের স্মরণশক্তি চিরদিনই কম। ভুলিতে তাহাদের মোটেই দেরী হয় না। এই বৃদ্ধ কর্টিসকে দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে পূর্ব্বের সেই সুদর্শন কর্টিস বলিয়া চিনিতে পারিল না। যে দেশের সেবার জন্য তিনি আপ্রাণ খাটিয়াছেন সে দেশ যখন তাঁহাকে এত অবহেলা ও অপমান করিল তখন কর্টিসের হৃদয়ে তাহা বিষম বেদনা-

হার্ণনাণ্ডো কর্টিসের সহিত টাসকালান্সদের সর্দ্দারের সাক্ষাৎ

দায়ক হইয়াছিল। এই জন্যই যেন তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। রাজার অনুগ্রহ ফিরিয়া পাইবার জন্য কর্টিস ১৫৪২ খৃঃ অব্দে আলজিয়ার্সের (Algiers) বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য করিতে গেলেন। কিন্তু কোন ফল লাভ হইল না। নিজের দুঃখ ও অভিযোগ জানাইয়া কর্টিস নৃপতিকে একখানা চিঠি লেখেন। এরূপ করুণ, হৃদয়বিদারক চিঠি খুব কমই লেখা হইয়াছে। চিঠির কিয়দংশ এই :—

এইভাবে দশটী দীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গেল। এ-সময়টা তাঁহার কেবল শাসনকর্ত্তার সহিত কলহ ও অশান্তিতেই কাটিয়াছে। অর্থের অভাবে তাঁহাকে বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছে। ১৫৪০ খৃঃ অব্দে সুবিচার ও প্রতিকারের আশায় কর্টিস স্পেনে ফিরিয়া যান। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তখন বিমুখ হইয়া বসিয়াছেন। পাষাণহৃদয় নরপতির হৃদয় গলিল না। রাজা তাঁহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে জনতা তাঁহাকে সাগ্রহে

—আমি ভাবিয়াছিলাম যৌবনে আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধবয়সে একটু সুখশান্তি লাভ করিব। আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ না ঘুমাইয়া, অখাদ্য

কর্টিসের প্রস্তর মূর্তি—এজটেকস্‌দের নরবলির বেদীর উপর ক্রুশ প্রোথিত করিয়াছেন

খাইয়া, নিজের অর্থসম্পত্তি ব্যয় করিয়া ভগবানের নামে দেশের সেবা করিয়াছি। আজ আমি বৃদ্ধ, দরিদ্র, ঋণদায়গ্রস্ত। বার্দ্ধক্যের কোন শান্তি আমার ভাগ্যে নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে এরূপ অশান্তিই ভোগ করিতে হইবে।”

সুবিচারের আশায় হতাশ হইয়া, হৃতস্বাস্থ্য কর্টিস সেভিল (Seville) সহরের কাছাকাছি একটী ছোট গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। সেইখানে ১৫৪৭ খৃঃ অব্দের ২রা ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে তাঁহার দেহাবশেষ মেক্সিকোতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ ও নির্ম্মমতার কথা ভাবিয়া মৃত্যুর কিছু কাল পরেও তাঁহার স্মৃতির যথোচিত সম্মান করা হয়। পরিশেষে তাঁহার যথোচিত সমাদর হইয়াছে। আজ তাঁহার নাম অতীত যুগের বীরগণের মধ্যে অন্যতম হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমানের মাপকাঠিতে কর্টিসকে বিচার করা চলে না। কারণ মানুষের রীতি ও নীতি যুগের পরে যুগ বদলাইয়াই চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিদ্যার নিয়ম অনুসারে না হইলেও তখনকার নিয়ম অনুসারে তাঁহার মেক্সিকো-বিজয় যথার্থ ই বীরত্বের পরিচায়ক হইয়াছিল। মাঝে মাঝে নিজের স্বার্থচেষ্টা থাকিলেও তাঁহার দেশপ্রীতি ও ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগেই দেখিতে পাওয়া যায়, দেশের জন্য, সমাজের জন্য এবং শিক্ষা সংস্কারের জন্য যাহারা কাজ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবিতকালে যোগ্যতম পুরস্কার লাভ করেন না, যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা মৃত্যুর পর। কর্টিস যে ভাবে আপনার জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া দেশের জন্য জীবন পণ করিয়া নানাভাবে ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিলেন, তাহার সম্মান লাভ হইল মৃত্যুর পরে, ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

[২৩৮৫ পৃষ্ঠার পর]

জয় স্বাধীনতা, জয়

[বর্ত্তমান চীনের জাতীয় সঙ্গীত]

হে বিমুক্তি, স্বাধীনতা, বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ,
শান্তি সনে মৈত্রী করি' আনো আনো বিচিত্র সংবাদ ;
মূর্ত্ত কর পৃথ্বীতলে দশেক সহস্র নবরূপ।
দানব সমান দৃপ্ত, দেবাত্মা সমান সৌম্য ভূপ।
সর্ব্বশীর্ষে ঊর্দ্ধব্যোমে বিস্তারিয়া মহিমা মহান্
এস হে নীরদ-রথে—বায়ু তাতে অশ্ব বেগবান,
এস এস হে রাজন্, তেজ সূর্য্যে বিতাড়ো আঁধার,
ঘুচাও এ দাসত্বের অন্ধকার নরক আগার।
শ্বেতচর্ম্ম ইউরোপ, বিধাতার হে দুলালি সুতা,
গৃহ তব দৈন্যহীন—সুপ্রচুর-অন্ন-খাদ্য-যুতা।
আমি ভালবাসি মুক্তি, মুক্তি মোর প্রিয়া, মোর বধূ,
দিবসে সে চিন্তা মোর, রজনীতে স্বপ্ন সেই মধু।
পিতৃভূমি প্রিয়তম, তোমার বেদনা দেয় ব্যথা !
মুক্তি আসে ছুটি তাই, ছুটি লভিবারে স্বাধীনতা।
চঞ্চল সে স্বাধীনতা মুষ্টি হ'তে ছুটিয়া পালায়।
দুঃখন্যুব্জ লক্ষ-ভ্রাতা দাসত্ব-পেষণে গুমরায়।
বায়ু বহে মনোরম, শিশির শোভিছে ঝলমল।
স্নিগ্ধ গন্ধে পুষ্পদল সুবাসিত করে ধরাতল।
কত নর হেরি ঐ রাজ্য লভি' ভুঞ্জে শত সুখ,—
কেমনে ভুলিব তবু স্বদেশের যন্ত্রণা ও দুখ ?
পিকিংএ হেথায় হের ব্যাঘ্র সম হিংস্রক সম্রাট !
প্রণতি মাগিছে দম্ভে বিলুণ্ঠিয়া সিংহাসন পাট !
অসহ্য বেদনা ! হায়, মৃত আজ মৃত স্বাধীনতা !
সমৃদ্ধ এসিয়া আজ মরুভূমি—বিশাল শুষ্কতা !

এ বিংশ শতাব্দী মোরা গড়িয়া করিব নবযুগ ;
আজি ভরি' বীর্য্যবন্ত দৃপ্ত শত মানবের বুক
জাগিছে এক আশা ধ্বনিয়া উঠিছে এক সুর—
"গড়িব নূতন পৃথ্বী, নব স্বর্গ, গ্লানি করি' দূর।"

দাসত্ব-বিনত পিষ্ট লক্ষ চিত্ত স্বদেশের মম
জাগুক অত্যুচ্চ গর্ব্বে কোয়াংটাং হিমালয় সম।
নাপলেঁঅ*, ওয়াশিংটন, বিমুক্তির দুর্জ্জয় সন্তান,
এসিয়ার কোটি চিত্তে মুক্ত হও,
করো শক্তিমান ;
হে হিন্ন্যান, আদি পিতা,
কোথা পথ, দাও হে অভয়,
এস মুক্তি, স্বাধীনতা, করো ত্রাণ,
জয় তব জয়।

রণ-সঙ্গীত

(ইতালীর ফ্যাসিষ্ট দলের রণ-সঙ্গীত)

জাগো ভাই জাগো, জাগো হে বন্ধু,
হাজার হাজার,
বরিতে নবীন উজ্জ্বল যুগ হও আগুসার ;
চল দলে দল, চল দৃঢ় পদে, নাহিক ভয়,
চল চল ত্বরা, ন্যায়ের যুদ্ধে লভিতে জয় ;
হৃদয়-শোণিতে কিনিব সে জয় কাম্য অতি,
এ সাগর হতে অপর সাগর জানাবে নতি।
এ সারা ইতালা জুড়িয়া আমরা সকলে ভাই,
এক ভাষা আর এক সুখ আশা, দ্বিতীয় নাই।

যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্ত্তি এ ফ্যাসিষ্ট-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।
এই বলে বলী জাগ্রত আজি স্বদেশ মোর
লাঞ্ছনা ক্লেশ আর না সহিছে দুঃখ ঘোর।

নবীন জীবনে জেগেছে আজিকে সুপ্ত দেশ,
গরীয়ান আজি মহীয়ান সে যে দৃপ্ত-বেশ!

জীবন-মশাল উজ্জ্বল করি' উচ্চে জ্বালো'
ঘুচিবে আঁধার, অভিযান-পথ হইবে আলো
চল দৃঢ় ধীর চল সুস্থির শান্ত-গতি,
মুক্তি লভিবে তবে ত পূর্ণ শুদ্ধ-জ্যোতি।

পরিখা-গহ্বরে রজনী জাগিয়া কাটিয়া পথ
গুলির দাহন দলিয়া চলিব, কে করে রদ ?
বহিয়া বহিয়া পতাকা আমরা চলিব দ্রুত,
সমর-ঘূর্ণী মথিয়া রচিব পতাকা পূত ;
বিজয়-লক্ষ্মী লবেন পতাকা—দণ্ড তাঁর ;
মানুষ আমরা মানুষের মত দুর্নিবার।

মোদের ইতালী-ইতালা বলিছে—'কর রে রণ',
ইতালীর নামে লড়িয়া জিনিব দুর্দ্দমন।
যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়।

*নেপোলিয়ান

তোমারি লীলার স্ফূর্তি এই এ ক্যাসিট্-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

বেলুচিস্তান

শোনো বীর! শোনো বন্ধু আমার,
শোনো নবতর তান।
আমি কবি আমি গাথার গায়ক
গাহিব নূতন গান!
মাণিক কুড়ায়ে পেয়েছি গো আমি,
বিঁধেছি মুক্তাফল,
ছন্দের ফাঁদে বাঁধিয়া ফেলেছি
ভাব রাশি চঞ্চল।
কল্য নিশীথে ছিলাম যখন মগন নিদ্রা ঘোরে,
স্বপনে আমার কল্পনা এসে দেখা দিয়ে
গেছে মোরে।
তাজা ঘাসে ভরা ক্ষেত্রের চেয়ে
মধুর সে রুচিমুখ,
দুম্বা মেষের পুচ্ছ জিনিয়া রসে ডগমগ বুক!
শীর্ণবৃন্ত কুসুমের মত বায়ুভরে দোলে কায়,
নাগকেশরের পেলব সুষমা সকল অঙ্গ ছায়!
আমি ভাবি মনে বুঝি
তার সনে মিলিব দিনের দেশে
চির-আলোকিত পরীর রাজ্যে—
শত উৎসের দেশে!

আজ্‌-মার্কিন যুদ্ধ-সঙ্গীত

(মল এজিবোয়া ভাষায় রচিত গানের
ইংরেজী হইতে)

আমার আওয়াজ শোন্ তোরা আজ
লড়ায়ে—বাজ পাখী।
শত্রু মেরে ভোজ দেব রে
আয়রে তোদের ডাকি।
শত্রু-সেনার গণ্ডী তোরা
যাস্ ডিঙ্গিয়ে, তাকাই মোরা—
মোরাও যাব গণ্ডী ভেঙ্গে রক্ত-পাগল আঁখি।
মোর কামনা তোদের ডানার ক্ষিপ্রগতি, ভাই,
শত্রু-শাতন তোদের নখের তীক্ষ্ণতা মোর চাই;
চল্‌ব মোরা তোদের সমান,
আয় তোরা বীর আয়রে জোয়ান।
রোষের আগুন আয় জ্বালিয়ে
বীর মাটি গায় মাখি!

দেশের ডাক

(ব্রাযান্ট হইতে)

ফেলে রেখে আয় কোদাল বড়্‌শ,
পড়ে থাক্ তোর হল,
ছুঁড়ে ফেলে দেরে দোয়াত কলম
কেতাব কাগজ কল।
ধর হাতে অসি, বর্শা, ভল্ল, বন্দুক ধনুশর,
সমর-ক্ষেত্রে যেতে হবে তোরে,
ওঠ্ রে অশ্বপর।
ডেকেছে স্বদেশ, ডেকেছে জননী,
ডেকেছে কাতর ভাই;
রক্তের বানে ভেসে গেল সব,
দেরি নাই—দেরি নাই।
বর্ম্মে আবরি এসেছে বৈরি দংশিতে জননীরে;
শত্রুর সাথে—নিয়তির সাথে যুদ্ধ।
ভাবিস্ কিরে?
ডেকেছে স্বদেশ, আয় তোরা ওরে
জাতের শ্রেষ্ঠ জাত,
সয়েছিস্ কত করকা বৃষ্টি ঘূর্ণা ঝঞ্ঝাবাত!
পাহাড়ের মত হ' দেখি অচল,
দাঁড়া দেখি একবার,
এ যে রে তোদের ভালবাসা দেশ,
দাঁড়া সবে বাঁধি সার।
আছি যেথা মোরা পুণ্যভূমি
এ পিতামহদের দেওয়া;
আমাদের কাজ—ভাগ করে তারে
আমাদেরি করে নেওয়া!

রণ-সঙ্গীত

বাঙালী পলটনের গান

মোরা মৃত্যু করিনা ভয়
জয় রাজাধিরাজের জয়!
জয় জন্মভূমির জয়!
জয় জন্মভূমির জয় (কোরাস্)

জীবন রক্ষা দেশের লাগি,
দেশ রক্ষায় মরণ মাগি,
লজ্জা-হরণ মরণ মাগি,
মৃত্যু অমর কীর্তিময়—
রাজাধিরাজের জয়
জয় জন্মভূমির জয়
জয় জন্মভূমির জয়।

দারা ও পুত্র ভগিনী ভাই,
তোমরা রহিলে আমরা যাই,
ফিরি কি না ফিরি, বেদনা নাই
যদি স্বদেশ মুক্ত রয়।

হর-নিনাদে গগন ভরি
রক্তের বীজ বপন করি,
বৃথাই রক্ত ক্ষরণ নয়।
মরণ রক্ত ক্ষরণ নয়
রাজাধিরাজের জয়
জয় জন্মভূমির জয়
জয় জন্মভূমির জয়।

[সা সা | রা া পা রা রা সা া া] সা রা
মো রা | মৃ ৹ ত্যু ক রি

গা গা গা গা রা গা পা
রা জা ধি রা জে র

ধা -া -ধা ধা পা ধা পা
জ ৹ ন্ম ভূ মি র

না -া -না না ধা না সা া-] া-
জ ৹ ন্ম ভূ মি র

পা ধা পা র্সা া- সা সা সা া- সা
১ জী ব ন র ৹ ক্ষা দে শে র লা
৩ হ র নি না দে গ গ ন ভ রি

(গা)
সা -া র্গা র্রা া মা র্গা র্গা র্রা সা
১ দে শ র ৹ ক্ষায় ম র ণ মা গি
৩ র ক্তে র বী ব প ন ক রি

সিংহল

ওই সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ।
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস !
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায়
এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায়—প্রান্তর তার ছায়,
আজ বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়।

আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্ব্বাণ।

সিংহল দ্বীপটী ভারতবর্ষ হইতে মান্নার উপসাগর এবং পক্‌প্রণালী দ্বারা পৃথক হইয়া আছে। তবে সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত শিলাপাথর ইত্যাদির দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত। রামেশ্বর দ্বীপ এবং মান্নার দ্বীপ ভারতের ও সিংহলের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। এই দুই দ্বীপের মধ্যে যে প্রণালী রহিয়াছে তাহা মাত্র ২১ মাইল বিস্তৃত এবং এই প্রণালীর মধ্যে প্রায় সাত মাইল দীর্ঘ আদামস্ ব্রীজ (Adams bridge)

দাগোবা—অবয়াগিরি—অনুরাধপুর
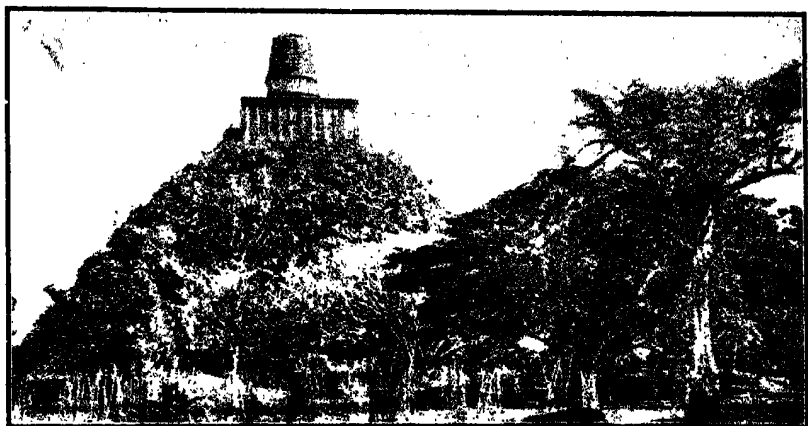
ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ শঙ্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর মেঘ পুষ্করিণীর দশক্রোশ ঠিক বেড়।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর,
হায় লুব্ধের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল রাজ-কন্যার হয় বর।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্ম্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;

বা সেতুবন্ধ নামে একটী প্রবাল দ্বীপ (corals-reef) রহিয়াছে। ইহার উপর পুল তৈয়ারী করিয়া সিংহল ও ভারতবর্ষকে যুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই তাহা হইবে।

সাধারণ বিবরণ—সিংহল দ্বীপটী দেখিতে কেমন তাহা মানচিত্রে বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। দেখিতে কি অনেকটা ন্যাসপাতি ফলের মত নয়? সিংহল আকারে প্রায় ২৫,০০০ বর্গ মাইল। আয়রল্যাণ্ড হইতে আকারে কিছু ছোট। সিংহলের উত্তর ভাগ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। এই সমতল ভূ-ভাগের মধ্যে এমন অনেক দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গল রহিয়াছে যে সেখানে প্রবেশ করা একরূপ

অসম্ভব। কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।' এই দ্বীপের দক্ষিণভাগ পর্ব্বতময় এবং আডামস্ পিক (Adam's Peak) এবং পেড্রোটালাগালা (Pedrotalla galla) এই দুইটী সিংহলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। পেড্রোটালাগালার উচ্চতা ৮,০০০ ফিটের উপর; আডামস্ পিকের উচ্চতা ৭,০০০ ফিট। নদ, নদীর মধ্যে মহাকালী গঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী। এই নদী ত্রিনকোমালী নামক উপসাগরে পড়িয়াছে।

বাস। ইহাদের মধ্যে তিনভাগের দুইভাগ লোকেই সিংহলের আদিম অধিবাসী। ইহারা সিংহলী নামে পরিচিত। ধর্ম্মে সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তামিল হিন্দুর সংখ্যাও এখানে ১১,০০,০০০ (এগারো লক্ষের) কম হইবে না। ইহারা ভারতের দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভূত। তামিলেরা অধিকাংশই মুটে-মজুরের কাজ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। মুসলমানের সংখ্যাও প্রায় ২,৯৪,০০০ হইবে। এখানকার মুসলমান অধিবাসীরা অধিকাংশই আরব বণিকগণের বংশধর। তাছাড়া ইউরোপীয় এবং ইউ-

থুপ্যারামা বিহার—পোল্যান্যারুয়া—সিংহল

সিংহলে কোন হ্রদ নাই। এই দ্বীপ বিষুবরেখার ৬° ডিগ্রির মধ্যে অবস্থিত হইলেও চারিদিক বেড়িয়া সমুদ্র থাকায় মৌসুমীবায়ু প্রবাহের জন্য প্রতি মাসেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য সিংহলের জলবায়ু ঈষদ্-উষ্ণও আর্দ্র। কিন্তু উচ্চ পার্ব্বত্য-দেশ বা গিরিশৃঙ্গের উপরে যে সকল বসতি আছে উহা বেশ সুশীতল এবং স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রের তীরে তীরে যে সকল স্থান আছে, সে সকল স্থানই সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর। ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত এই চারি মাসকে গ্রীষ্মকাল বলা যাইতে পারে। কলম্বোর সর্ব্বনিম্ন তাপ পরিমাণ ৮০° আশী ডিগ্রী। এই সহরটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর।

সিংহলের লোকসংখ্যা প্রায় (পঞ্চাশ লক্ষ) ৫০,০০,০০০। প্রতি বর্গ মাইলে ১৭৮ জন লোকের

রেশিয়ানদের সংখ্যাও মন্দ নহে। ইউরেশিয়ান ১৫,০০০ এবং ইউরোপীয়ান ১১,০০০ হইবে। ধর্ম্মের দিক দিয়া সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মই বিশেষভাবে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত মুসলমান ধর্ম্মও প্রচলিত রহিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৫,০০,০০০।

নগর—সিংহলে কলম্বো (Colombo), জাফ্না (Jaffna), কান্দী (Kandy), কালুতারা (Kalutara), গ্যালে (Galle), নিউআরাইলিয়া, ত্রিনকোমলী, অনুরাধপুর প্রভৃতি প্রধান।

কলম্বো—সিংহলের রাজধানী এবং প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এসিয়ার মধ্যে ইহাকে একটি বৃহৎ বন্দর বলা যাইতে পারে। জনসংখ্যা ২,৮৪,১৫৫। এক সময়ে কলম্বো পর্ত্তুগীজদের অধীনে ছিল। কলম্বো সহর দেখিতে অতি সুন্দর;—

মহাথূপ বা মহাস্তূপ —সিংহল

কলম্বোর একটি বৌদ্ধবিহার ও পথ

প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর, দোকান, হোটেল, গির্জ্জাঘর প্রভৃতি দেখিবার মত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা আনুমানিক ৩০০ জন। কলম্বো হইতে সাতখানি ইংরাজী সংবাদপত্র এবং দুইখানি সিংহলী ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। কলম্বোর যাদুঘরে একটী অদ্ভুত মৃত কচ্ছপের দেহ রক্ষিত আছে। কথিত আছে এই কচ্ছপটী নাকি ২০০ (দুই শত) বৎসর বাঁচিয়াছিল! এই যাদুঘরে একটী বৃহদাকার প্রস্তর নির্মিত সিংহও রহিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া এবং বঙ্গোপসাগরের দিকে পূর্ব্ব এসিয়ার বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত। কলম্বো স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া নানা দেশের লোক এখানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসেন। এইজন্য এখানে ইউরোপীয়দের অনেক দোকান হোটেল, সিনেমা প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

জাফ্‌না—সিংহলের এই সামুদ্রিক বন্দরটী পক্‌ প্রণালীর উপরে অবস্থিত। ইহা উত্তর সিংহলের প্রধান বন্দর। জন সংখ্যা ৪২,৪৩৬।

সিংহলের একটি গুহা মন্দির—গেলে বিহার

কলম্বো ৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদের হাতে আসে। সে সময়ে পর্ত্তুগীজেরা এই বন্দরের নাম ক্রিষ্টোফার কলোম্বাসের (Christopher Columbus) নামানুযায়ী কলম্বো রাখিয়াছিলেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে এই বন্দরটী কাড়িয়া লয়, ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজদের হাত হইতে ইহা ইংরেজদের হাতে আসিয়াছে। এই বন্দর হইতে সিংহলের উৎপন্ন চা, রাবার, নারিকেল, কৃষ্ণসীস, দারুচিনি, কোকো প্রভৃতি নানা দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। নানা দেশের বাণিজ্য-জাহাজগুলি কলম্বো বন্দর হইতে পাথুরিয়া কয়লা সংগ্রহ করিয়া লয়। ইহা ইউরোপ,

কান্দী—এই সহরটী পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। সমুদ্রতট হইতে ইহার উচ্চতা ২০০০ ফিট। ইহা একটী কৃত্রিম হ্রদের তীরে অবস্থিত। কান্দী পূর্ব্বে সিংহলের রাজধানী ছিল। সিংহলের প্রাচীন রাজধানী বলিয়া এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটীর নাম দালাদা-মালিগাওয়া বা দন্তবিহার, (Dala-damalagoa)। এখানে পৃথিবীর সব দেশ হইতেই বৌদ্ধগণ তীর্থ-যাত্রা হিসাবে আসিয়া থাকেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই মন্দির মধ্যে বুদ্ধদেবের একটী দাঁত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সমুদয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের